এনায়েতুল্লাহ আলতামাস

হেজাযের তুফান

মূল

এনায়েতুল্লাহ আলতামাস

ভাষান্তর

মাওলানা মুজাহিদ হুসাইন ইয়াসীন

 বাড কম্প্রিন্ট এন্ড পাবলিকেশন্স

প্রথম প্রকাশ ❑ নভেম্বর-২০০৩
দ্বিতীয় সংস্করণ ❑ জুলাই-২০০৬

হেজাযের তুফান ❑ ইনায়েতুল্লাহ আলতামাস
প্রকাশক ❑ মোহাম্মদ শিহাব উদ্দিন, বাড কম্প্রিন্ট এন্ড পাবলিকেশন্স
৫০ বাংলাবাজার, পাঠকবন্ধু মার্কেট, ঢাকা ১১০০, ফোন ৭১১১৯৯৩
স্বত্ব ❑ প্রকাশক, প্রচ্ছদ শিল্পী ❑ আমিনুল ইসলাম আমিন
কম্পিউটার কম্পোজ ❑ বাড কম্প্রিন্ট ৫০ বাংলাবাজার
মুদ্রণে ❑ পিএ প্রিন্টার্স, সূত্রাপুর, ঢাকা।

মূল্য ❑ ১২০.০০ টাকা মাত্র।

ISBN 984-839-052-9

ভূমিকা

কাহিনী নির্মাণে নিরপেক্ষ-নৈর্ব্যক্তিক থেকে, পটভূমি বিস্তরণের অমোঘতা মেনে নিয়ে, হার্দিকতা ও বৌদ্ধিকতার যুগপৎ মিশেলে বিশ্বস্ত থেকে যে উপন্যাসের চিত্র পত্র-পল্লবিত হয়, পাঠক জগতে দারুণ আলোড়ন তুলতে তার খুব বেশী সময় লাগে না। এনায়েতুল্লাহ আলতামাসের উপন্যাসগুলোও এই নিরীক্ষায় একচ্ছত্রভাবে উত্তীর্ণ। মুসলিম ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির চিরায়ত ধারাই তার উপন্যাসের মূল প্রতিপাদ্য। সে হিসেবে তিনি শতভাগ ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিক। উর্দু সাহিত্যে এ ক্ষেত্রে যদিও দু'একজন উল্লেখযোগ্য সফলতা পেয়েছেন, কিন্তু তার মতো কেউ ইতিহাসের প্রতি এতখানি সত্যাশ্রয়ী থাকার চেষ্টা করেননি। তাই আমরা দেখি আলতামাসের উপন্যাসীয় কলমে শুধু ইতিহাসের জীবন্ত ক্যানভাসই অনূদিত হয় বিশ্বাসের সতেজতা নিয়ে। ইতিহাসকে অবিকৃত রাখতেই যেন তার নিরন্তর সাধনা।

এ কারণেই তার উপন্যাসের গতি দুর্বার–অপ্রতিরোধ্য। পাঠককে নিমিষেই নিয়ে যায় সহস্র বছরের আকাশ পাড়ি দিয়ে বাস্তবতার শুভ্রতায় মোড়ানো এক স্বপ্নালোকে, ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ কোন রণাঙ্গনে কিংবা প্রেমের পবিত্রতায় অম্লান কোন মুহূর্তে। যেখান থেকে পাঠক তার অনিবার্যতা উপভোগ না করে ফিরতে পারে না। এসব নান্দনিক দিকই আলতামাসের প্রতি আমাকে আকৃষ্ট করেছে। 'হেজায কি আন্ধী' নামক উর্দু সাহিত্যের জনপ্রিয় উপন্যাসটি তাই বাংলায় রূপান্তর করেছি। ভাষা-ভাব ও আঙ্গিক অখণ্ডিত রেখে যে কোন রূপান্তর কর্ম মোটামুটি দুরূহ হলেও এখানে যেহেতু পাশ করার একটা উত্তেজনা আছে তাই রোমাঞ্চের ছোঁয়াও আছে। এর প্রতিটি ছত্রেই যেন আমি সেই ছোঁয়া পেয়েছি। রসিক পাঠকও সেই রোমাঞ্চ অনুভব করবেন এমন আশা করাটা নিশ্চয় দোষের কিছু নয়।

মাওলানা মুজাহিদ হুসাইন ইয়াসীন

সিদ্দীকবাজার, ঢাকা।

লেখকের পরবর্তী বই

★ শয়তানের বেহেশত

উৎসর্গ

হাফেজ আহ্মাদ উল্লাহ

কারো কারো কলমের সাময়িক বিরতি
নিস্তরঙ্গ-গোমট মেঘময় করে তুলে
অনেকের মনকেই। আহা মেঘের আঁধার
কেটে যদি স্বর্ণবর্ণা কালির স্পর্শ
হেসে উঠতো তৃষ্ণার্ত চাতকেরা।।

– মুজাহিদ

"খুব কম কাজই সহজসাধ্য। তাকে নিরন্তর সাধনায় নিরবচ্ছিন্ন- একাগ্রতায় সহজসাধ্য ও অনায়াসলব্ধ করা হয়। যেমন আমরা, মুসলমানদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যুদ্ধে জড়ানোর মত বোকামি করি না। তবে আমরা এমন এক তরবারির সূক্ষ্মতায় তাদের লালিত বিশ্বাসের আবরণকে কেটে কুচি কুচি করি, যা কখনো সাদা চোখে ধরা পড়ে না, পরোক্ষ ও পর্দার অন্তরালেই রয়ে যায়।"

মদীনা থেকে ত্রিশ পঁয়ত্রিশ মাইল উত্তরপূর্ব প্রান্তে ছিলো শ্যামলময় নিটোল এক খেজুর উদ্যান। কাছ ঘেঁষে হ্রদাকারে টলটলে স্বচ্ছ পানির ঝিল। ঝিলের সবুজাভ প্রান্ত ধরে খেজুর বৃক্ষের কয়েক ছত্র সারি। মরু সাহারার তৃণশূন্য বিজন প্রান্তরের এই তপ্ত বালিয়াড়ির মধ্যে বৃক্ষময় এই উদ্যানের আচম্বিত শ্যামলতাই স্বর্গতঃ দৃশ্যের অবতারণার জন্য যথেষ্ট ছিলো। যে বালুকা বেলায় সাক্ষাত সূর্যের গনগনতা নেমে আসে, চার দিকে চামড়া ঝলসানো ভাপ ছড়িয়ে দেয়, সেখানে এমন আচানক উদ্যানের মোলায়েম দৃশ্য– মনে হতো যেন সর্বগ্রাসী আগুনের লকলকে অঙ্গারের মধ্যে পাপড়ি ছড়ানো শান্ত-সমাহিত ফুলের গুচ্ছ। কিন্তু এর সংলগ্ন মরু অঞ্চল তার স্বমূর্তিতেই বিভীষিকাময়। তা এমনই ভয়াল দৃশ্য নিয়ে দণ্ডায়মান যে, কোন মুসাফির সেখান দিয়ে গেলে মৃত্যুর শংকা নিয়ে কম্পিত পদে পথ অতিক্রম করতো। পথহারা কোন পথিক বা মরুচারী যদি তার সংলগ্ন মরুতে চলেও আসতো, দূর থেকে সেই উদ্যানের মায়াময় দৃশ্য দেখে তাকে কোন উদ্যান বলে বিশ্বাস করতে প্রস্তুতও থাকতো না। বরং মনে প্রাণে বিশ্বাস করতো তা মরুর মরীচিকা, তাপিত চোখের ধোকা বা অজানা কোন মৃত্যু-ফাঁদ।

অবশ্য মরুর এ দিকটায় এর আশপাশের দূরাঞ্চলেও কিছু খেজুর বাগান ছিলো। কিন্তু শোভায় শ্যামলতায় মুগ্ধতার এমন শিল্পিত চিত্র অন্যগুলোতে খুজে পাওয়া যেতো না। সূর্যের উদয়াচল ও অস্তাচলের দু'দিকের দণ্ডায়মান পাহাড়ের বেষ্টনীই এ উদ্যানটিকে অন্যগুলো থেকে পৃথক সজ্জিত রূপ দিয়েছিলো। পরিবেষ্টিত পাহাড় দুটির আড়ালের কারণে তাই দিনের বেলা সূর্যের দগদগে হলকা বর্ষণ থেকে এর অভ্যন্তরভাগ নিরাপদ থাকতো। আর তাতে খেজুর বৃক্ষের ছায়াময় আস্তরণ ছাড়াও বিপুল পাতাময় অন্যান্য বৃক্ষেরও আনাগোনা ছিলো। যে কারণে এতে অন্যরকম উপভোগ্য স্নিগ্ধতা বিরাজ করতো।

কিন্তু যখনই সূর্য অস্তমিত হওয়ার পূর্বে-উদয়াচলের দিকের পাহাড় সারির আড়ালে চলে যেতো, তখন প্রায় অতর্কিতই যেন ঠাণ্ডার ঘন হিম চাঁদর চারদিক আচ্ছন্ন করে ফেলতো। আর সূর্যাস্তের পর তো ঠাণ্ডার এই তীব্রতা কয়েকগুণ হয়ে বাতাসে সূঁচ বিধাতো। খোলা আকাশের নিচে এ সময় কেউ বসলে কাঁপতে কাঁপতেই জ্ঞান হারাতো।

মনোহরি সে উদ্যানে বিক্ষিপ্ত কয়েকটি তাঁবু ছিলো। একটি তাঁবু এর মধ্যে চতুর্কোণবিশিষ্ট বেশ উঁচু ও বৃহদাকারের। তাঁবুর দু'পাশে দু'টি দরজা। দরজার সামনে ঝুলানো ভারী রেশমের পর্দা। তাঁবুর ভেতরটা দেখলে মনে হতো কোন শাহী মহলের বিশেষ কামরা। সারা মেঝে জুড়ো ইরানী গালিচা, গালিচার এক দিকে কয়েকটি রাজাসনের মতো অভিজাত আসন। সেগুলোর ওপরে ছিলো পাখির পালকের মতো তুলতুলে চাঁদর বিছানো। আর ছিলো হেলান দেয়ার আরাম বালিশ। সেগুলোও কোমল রেশমে মুড়ানো। তার ওপরে ঝুলছিলো নানান রঙের বৈচিত্র্য নিয়ে জ্বলজ্বলে প্রদীপ্ত ঝাড় বাতি। তাঁবুর চার দেয়ালের আচ্ছাদনও ছিলো রঙবেরঙের রেশমের। ভেতরের অবস্থাটা ছিলো চোখ ধাঁধানো।

সময়টা রাতের প্রথম প্রহর। গদির ওপর আরাম বালিশে অলসভাবে হেলান দিয়ে বসা ছিলো তিন ব্যক্তি। কেউ উপবিষ্ট ছিলো। কেউ শরীর এলিয়ে দিয়েছিলো। সামনে রাখা ছিলো নানান সুস্বাদু খাবারের তস্তরি। আর ছিলো কাঁচের সূরা ভরা পানপাত্র। সেই তিন জনের ডানে ও বামে আরো দু'জন করে চার জন লোকও এভাবেই বসাছিলো। শরাবের পানপাত্র কেবল তাদের হাতেই ছিলো। অন্য তিন জনের হাতে শরাবের পাত্র ছিলো না।

শরাবপায়ীদের পোষাক বলে দিচ্ছিল এরা আরব এবং বেশ বিত্তশালী। এদের দেখে মনে হচ্ছিল 'আলিফ লায়লার' উপাখ্যান থেকে উঠে আসা কোন চরিত্র। চেহারা সুরতে ভাবভঙ্গিতে শাহী খান্দানের গাম্ভীর্যতা। এই সাতজনই তখন অর্ধনগ্ন কয়েকটি নর্তকীর কোমনীয় ভঙ্গীর নৃত্যে একেবারে বেহাল। তাঁবুর ভেতর বিভিন্ন রঙের মিশেলে তৈরী দীর্ঘ রশির ফানুস ঝুলছিলো। সেগুলো এত ঘন ও দ্বিভাজ ছিলো যে, দূর থেকে তা কাপড়ের বিন্যাস মনে হতো। এ কারণে নর্তকীদের পুরোপুরি নগ্ন মনে হচ্ছিল না। কিন্তু নৃত্যের তালে তালে একেক সময় তাদের পুরুষ্ট উরু এর বাইরেও চলে আসতো। দর্শকদের চোখ এতেই ধাঁধিয়ে যেতো। নর্তকীদের চুলগুলো ছিলো রেশমের সূক্ষ্ম তারের মতো। যা তাদের কোমল গ্রীবায়-কাঁধে বার বার দোল খাচ্ছিলো।

তাঁবুর আরেক কোণে কয়েকজন সঙ্গীতজ্ঞ বসা ছিলো। তাদের পাশে ছিল সেই নর্তকীদের বয়সী ষোড়ষী দু'জন গায়িকা। মধ্যবয়স্কা এক রূপসী মহিলা তবলা বাজাচ্ছিলো। তারা সঙ্গীত পরিবেশন করে যাচ্ছিলো। গান ও বাঁদকের তাল যে খুব উগ্র ছিলো এমন নয়। নর্তকীদের নৃত্যেও লম্ফ ঝম্পের উন্মাদনা ছিলো না। বাদ্যের তাল ছিলো ধীর লয়ের। যেন ধীরে ধীরে স্বপ্ন থেকে বাস্তবে ফিরে আসা। বাস্তব থেকে ফিরে যাওয়া স্বপ্নের ঘোরে। নর্তকীদের ধীরে ধীরে নৃত্যের দোলা এমন ছিলো যেন 'ফনা তোলা' সাপ মোহিত ভঙ্গিতে শরীর দোলাচ্ছে। শরীরের বিশেষ অঙ্গগুলো বাঁক খাওয়ানোর সময় তারা মদ ভেজা হাসি ছড়িয়ে দিচ্ছিলো আর চোখে মুখে আমন্ত্রণের ইঙ্গিত ফুটিয়ে তুলছিলো। গানের কথা, সুর এবং তাল এমন জাদুময় ও ইংগিতময় ছিলো যে, তাঁবুর বাইরের উটগুলোও উন্মাদপ্রায় হয়ে উঠছিলো।

এভাবেই নৃত্য-গান চলছিলো। মদ্যপান ক্রমেই থিতিয়ে আসছিলো। আর সেই সাতজন তাল আর খেই হারিয়ে ঝিমুচ্ছিলো। আর ঢুলু ঢুলু চোখে তাদেরকে উৎসাহ দিয়ে যাচ্ছিলো। নর্তকীদের নৃত্য শেষ হলে মাথায় হাত রেখে তারা ঝুঁকে দাঁড়াল। আরাম বালিশে হেলান দেয়া একজন হাতের ইশারায় তাদেরকে চলে যেতে বললো।

নর্তকীরাও সিজদার ভঙ্গিতে আনত মস্তকে উল্টো পায়ে তাঁবু থেকে বের হয়ে গেলো। বাদক এবং গায়িকারাও এভাবেই বের হয়ে গেলো।

ঃ 'এখন কিছু কাজের কথা হোক' –আরাম বালিশে হেলান দেয়া মাঝখানের লোকটি কিছুটা অগ্রসর হয়ে বললো– 'দিনে আমাদের কথা তো কোন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেনি। মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার পর মুসলমানরা আবার গোত্র বিভক্ত হয়ে পড়বে, তারপর আমরা পূর্বের মতোই তাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা উস্কে দেবো, মূর্খতা বর্বরতার সেই ঘৃণ্য যুগে পৌঁছে দেবো যেখান থেকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে উদ্ধার করে ছিলেন– এসব ভেবে আমরা বেশ উৎফুল্ল ছিলাম। পরে যখন চতুর্দিক থেকে তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু হলো-যাকে তারা 'ইরতিদাদ' ধর্মদ্রোহীতা বলে তখন এই ভেবে আরো অধিক আনন্দে আমরা মগ্ন হলাম যে, এখন এসব বিদ্রোহীদের হাতেই ইসলাম চিরতরে আরবের মরু ঝড়ে দাফন হয়ে যাবে। এসব ভেবে আমরা আনন্দ সামলাতে না পেরে বিষম খেয়ে ছিলাম। কিন্তু এই বুড়ো আবূবকর এমন ঝড় বইয়ে দিল যে, গোটা কয়েকজন মুসলমানের হাতে মুসায়লামাতুল কাযযাব ও মালেক বিন নুওয়াইরার মতো শক্তিমান বিদ্রোহীরাও চরমভাবে পরাজিত হলো।'

ঃ 'আবু সালমা!'-দ্বিতীয় আরেকজন বললো– 'ইসলামের এই বিদ্রোহীরা বিদ্রোহের পূর্বে যদি একতাবদ্ধ হতো তবে তারা আর পরাজিত হতো না।'

ঃ 'না আবু দাউদ'–আবূ সালমা বললো।

ঃ 'তারা একত্রিত হলেও পরাজয়ই বরণ করতে হতো। বরং এটা বলো যে, মুসলমানদের মধ্যে যদি খালেদ ইবনুল ওয়ালীদ ও আবু উবায়দারা না থাকতো তবে হয়তো এসব বিদ্রোহীরা সফলতার মুখ দেখতো। ইয়াহুদার খোদার কসম! আমাদের গৃহীত পদ্ধতি ও অভিসন্ধি মতো যদি মুসলমানরা চালিত হয় তবে ইসলামের নাম নিশানা কিছুই আর থাকবে না।

ঃ 'আবু সালমা! আমি যা বলছি শোন'– অন্য আরেকজন বলে উঠলো– 'তোমাদের ইহুদী জাতিতে এবং তোমাদের দীর্ঘ ইতিহাসে যা পাওয়া যায় তাহলো শুধু বস্তা বস্তা পরিকল্পনা। ষড়যন্ত্র আর দুরভিসন্ধি তোমাদের মাথায় খেলে। আমার কথায় তোমার দুঃখ পাওয়া উচিত হবে না। আর এটা বুঝে নিয়ো না যে, আমি খ্রিস্টান বলে ইহুদীদের বিরুদ্ধে কথা বলছি।

ঃ 'ইসহাক'–তুমি পরিষ্কার করে বলো' আবু সালমা বললো– 'আমরা তখনই সফল হতে পারবো যখন আমরা পরস্পরের ত্রুটি বিচ্যুতি ও দুর্বলতা চিহ্নিত করতে পারবো। এখানে আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার বা বনী ইসরাঈলের একার অপদস্থতার প্রশ্ন নয়। এসব সংকীর্ণতা এখন আমাদের কাটিয়ে উঠতে হবে। আমরা ইসলামের সমূলে ধ্বংস চাই। এর মোক্ষম সময় এখনই। দেখো, এখানে তোমরা চারজন খ্রিস্টান আর আমরা তিনজন ইহুদী একতাবদ্ধ হয়েছি। আমি তখনকার দৃশ্য কল্পনা করছি, যখন পুরো খ্রিস্টান ও ইহুদী জাতি একতাবদ্ধ হয়ে যাবে। ঠিক আছে এখন তুমি তোমার কথা বলতে পারো।'

ঃ 'হ্যাঁ, আমার উদ্দেশ্য কাউকে অপমান বা অসম্মান করা নয়'–ইসহাক বললো– 'আমি বলতে চাচ্ছি, বনী ইসরাঈলরা সবসময় যুদ্ধ থেকে পেছনে থাকতেই পছন্দ করে এবং রণাঙ্গণ থেকে দূরে অবস্থান করে। যদি আমাদের খ্রিস্টানদের মতো তোমরাও যুদ্ধবাজ হয়ে যাও এবং ইহুদী ও খ্রিস্টানরা একত্রিত হয়ে যায় তবে ইসলামের ধ্বংসের জন্য এটাই একমাত্র পথ হতে পারে।'

ঃ 'অনেক সময় দরকার'–আবু সালমা বললো– 'এই দুই জাতিকে এক করার পেছনে কয়েক বছর ব্যয় হয়ে যাবে। আমাদের মান্যবর মনীষীরা বলে গেছেন, কোন জাতিকে যদি বিনাশ করতে হয় তবে তাদের নেতৃত্বে পাপের দুষ্টক্ষত ঢুকিয়ে দাও। আর নেতাদের মধ্যে যাকে সামলানো সম্ভব নয় তাকে এমন গোপনভাবে হত্যা করে দাও যে, হত্যাকারীর পদচিহ্নও পাওয়া না যায়।'

ঃ 'কয়জনকে হত্যা করবে?' –অন্য এক খ্রিস্টান বলে উঠলো– 'আবুবকরকে তো এই কয়েকদিন আগেও মদীনায় দেখেছি। তিনি এতই বুড়িয়ে গেছেন যে, খুব দ্রুতই দুনিয়া থেকে বিদায় হবেন। তাকে হত্যা করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এটা মেনে নাও তারপর আসবেন উমর ইবনুল খাত্তাব। তখন মুসলমানরা আরো দ্বিগুণ শক্তিশালী হয়ে উঠবে। তাদের রণ-কৌশল ও যুদ্ধক্ষেত্র আরো ভয়ংকর হয়ে উঠবে। সিরিয়ার সীমানা ছাড়িয়েও ইসলাম আরো দূর-দিগন্তে বিজয় কেতন উড়াবে। আমি গুপ্তচরবৃত্তি করে জানতে পেরেছি, তাদের প্রথম খলীফা আবুবকর খালেদ ইবনুল ওয়ালীদকে দামেশকের দিকে প্রেরণ করছেন।'

ঃ 'খালেদ ইবনুল ওয়ালীদ এর কথা বলছো?' –আবু সালমা বললো– 'দুআ করো। আবুবকর এর পর যেন উমর ইবনুল খাত্তাব ই-খেলাফতের দায়িত্ব লাভ করেন। কারণ তাদের মধ্যে এত বেশি বিরোধপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে যে, খালেদ ইবনুল ওয়ালীদের হাতে ইবনুল খাত্তাবের নাম নিশানাও মুছে যাবে।

ঃ 'আমি এটা আদৌ মানছি না' ইসহাক বললো– 'আমি তখন মদীনাতেই ছিলাম যখন উমরের উস্কানিতে বাতাহ থেকে খালেদ ইবনুল ওয়ালীদ কে আবুবকর ডেকে পাঠিয়েছিলেন। কারণ তিনি তখন মুরতাদদের শীর্ষস্থানীয় নেতা মালেক বিন নুওয়াইরাকে হত্যা করে তার রূপসী স্ত্রীকে বিয়ে করেছিলেন। যা হোক খালেদ ইবনুল ওয়ালীদ মদীনায় পৌঁছেই সোজা মসজিদে নববীতে গিয়ে হাজির হন। মসজিদে তখন উমরও ছিলেন। উমর খালেদকে দেখেই তার ওপর ক্রোধে ফেটে পড়লেন। তাকে

এমন করে ভর্ৎসনা করলেন যে, কোন পুত্রও তার পিতার কাছ থেকে এমন ভর্ৎসনা পেলে তা বরদাশত করবে না। কিন্তু খালেদ চমৎকারভাবেই তা সামলে নিলেন। কারণ উমর তার চেয়ে সর্বদিক থেকে বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। আর ইবনুল ওয়ালীদ ইসলামী শিক্ষার প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তিনি তার অপমানকে বরদাশত করলেন। কিন্তু উমর এর মর্যাদা আরো উঁচুতে নিয়ে গেলেন। যে জাতির মধ্যে এমন সম্প্রীতি আর শ্রদ্ধাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে সে জাতিকে ধ্বংস করা একেবারেই অসম্ভব।'

ঃ 'তোমরা কি কোন সহজ পথ গ্রহণ করতে পারো না?'–আবু সালমা বললো– 'এই অসম্ভবকেই আমাদের সহজ করে তুলতে হবে। দেখো, এ বিষয়ে কথা তো কম হয়নি। রাতের পর রাত কথার বুননে কেটে গেছে। বাস্তবের কালিতে নিজেদের বুকে এই সত্যটি লিখে নাও যে, ইসলামের বিনাশ সাধন কোন সহজ কাজ নয়। যুদ্ধের ময়দানে আমরা এ কাজ করতে পারবো না। না ইসলামী লশকরের বিরুদ্ধে আমরা কোন সফলতা দেখাতে পারবো। আমার বক্তব্য একটাই ছিলো এবং কথা আমি একটাই বলে যাবো–মুসলমানদেরকে সমূলে ধ্বংস করতে চাও, তো তাদের নেতৃত্বে অসৎ চিন্তা ঢুকিয়ে দাও। অনৈতিক কার্যকলাপে তাদেরকে অভ্যস্ত করে দাও।'

ঃ 'কিন্তু এটা কিভাবে সম্ভব?'–ইসহাক বললো– 'আমারও এটাই মত, এখন কথার ফুলঝুরি না ছড়িয়ে কাজের কাজ কিছু হোক।'

ঃ 'যে কোন জাতির নেতৃত্বে অনৈতিকতার উৎস হলো সুন্দরী নারী ও বিলাসী মদ'–ইবনে দাউদ বললো–মুসলমানরা এখন মদ ছুঁয়েও দেখে না। তোমরা কি তখন দেখনি, একদিন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঘোষণা দিলেন, "আজ থেকে মদ্য পান হারাম।' সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানরা বড় বড় মদের মটকা-শুরা পাত্রগুলো থেকে নোংরা পানির মত সারা মদীনা মদে ভাসিয়ে দিল। মদের পাত্রগুলোকেও আস্ত রাখল না। আমরা ইহুদীরা তো মদ পান করি না। কিন্তু এই খ্রিস্টান ভাইদেরকে জিজ্ঞেস করো, মদ ছাড়া যাদের এক দণ্ডও চলে না। তাদেরকে বলো, মদের এই মটকাগুলো এবং সামনে রাখা পানপাত্রগুলো বাইরে ফেলে দিতে। দেখবে তারা হাসতে হাসতে টাল খেয়ে যাবে। অথবা তারা উত্তর দেবে, ঠিক আছে আর একদিন যেতে দাও, আমরা মদ ছেড়ে দিয়ে তওবা করে নেবো। কিন্তু তারা মোটেও তওবা করবে না। অথচ মুসলমানরা এক মুহূর্তও বিলম্ব করলো না। সে মুহূর্তেই তারা তওবা করে দেখিয়ে দিলো। আর মদকে 'উম্মুল খাবাইছ'–সকল নোংরামি ও পাপের মূল বলে অভিহিত করলো।'

আবু সালমা এটা শুনে এমন তাচ্ছিল্যের সঙ্গে হেসে উঠলো যেন তার সামনে বসা লোকগুলো চরম নির্বোধ আর পাঠশালার অবুঝ বালকের দল।

ঃ 'মুসলমানরা মদ ছেড়ে দিয়েছে ঠিক'–গম্ভীর ও বিকৃত মুখে আবু সালমা বললো– 'তবে নারীর নেশা আগের মতোই আছে। প্রায় প্রত্যেকেই বিশেষ করে সর্দার গোছের লোকেরা কয়েকজন করে বৌ পালে। সুন্দরী-যুবতী মেয়েদের তালাশে তারা অনেক সময় ব্যয় করে। এটা ভুলে যেয়ো না, যৌবনবতী মেয়েরা এমন প্রতাপ আর শক্তির অধিকারিনী হয় যে, কত বিখ্যাত বীর বাহাদুর আর প্রতাপান্বিত রাজা বাদশাদের শাহী

তাজ তাদের পায়ের নিচে পিষ্ট হয়েছে। আমাদের পুরুষদের দুর্বলতার সুযোগ তারা খুব ভালো করেই কাজে লাগাতে জানে। এটাও মনের মধ্যে বদ্ধমূল করে নাও, মন্দ ও অসৎ বিষয়ে যে স্বাদ রয়েছে, নেকীর কাজে সেই স্বাদ পাওয়া যায় না। মুসলমানরা তো তাদের রাসূলের এই প্রতিশ্রুতির কারণেই আজ এমন পূতঃপবিত্র ও নেককার হয়ে উঠেছে যে, পরকালে তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। যেখানে থাকবে উদ্ভিন্ন যৌবনা-রূপবান হুরপরীরা। আর মধুর চেয়েও মিষ্টি শরাব। এই জান্নাত আমরা তাদেরকে দুনিয়াতেই দেখিয়ে দেবো।'

ঃ 'আপনার কথাই ঠিক বলে মনো হচ্ছে'—চার খ্রিস্টানের মধ্যে আরেকজন বলে উঠলো- 'কিন্তু মুসলমানদেরকে এখন যুদ্ধ আর রণাঙ্গণের উন্মাদনা পেয়ে বসেছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় অন্য কোন দিকে তাদের কোন খেয়াল নেই। কিছু যদি করতেই হয় তবে করণীয় হলো ইহুদী ও খ্রিস্টানদেরকে এমনভাবে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় তৈরী করা যে, প্রকাশ্যে তারা ইসলাম গ্রহণ করে মুসলিম ফৌজে শামিল হয়ে যাবে এবং যুদ্ধের ময়দানে তারা মুসলমানদেরকে ধোঁকা দেবে। আর তাদের পরাজয়ের প্রধান কারণ হয়ে উঠবে। তবে এই পদ্ধতিটিও বেশ ঝুকিপূর্ণ। কারণ মুসলমানদের মধ্যে শুধু যুদ্ধের তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও শাহাদাতের তামান্নাই কাজ করছে না, বরং যুদ্ধের উন্মাদনা তাদেরকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। রণাঙ্গণে তাদের অর্ধেকের বেশি সৈন্যও যদি মৃত্যুমুখে পতিত হয় তবে অবশিষ্টরা পালানোর পথ তালাশ করবে না। বরং দ্বিগুণ বিক্রমে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ে মারা যাওয়া অর্ধেক সৈন্যের শূন্যতা পূরণ করে নেবে—বিপুল দক্ষতার সঙ্গে।'

ঃ 'সময়ে এ কৌশল আমাদেরও গ্রহণ করতে হবে'— আবু সালমা বললো— 'তোমরা তো জানো, ইতিমধ্যেই আমাদের কয়েকজন লোক চিন্তা ও আদর্শগতভাবে মুসলমানদের ধ্বংসসাধনে তৎপর হয়ে উঠেছে। মুসলমানরা তাদের রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হাদীসকে নিজেদের প্রাণের চেয়ে ভালবাসে। 'মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এটা বলে গেছেন' একথা যদি তারা কোথাও শুনতে পায় সঙ্গে সঙ্গে তা তারা লিখে নেয়। যাদের কথা একটু আগে বলেছি- বনী ইসরাঈলের এই লোকগুলো মুসলমানদের মধ্যে স্বরচিত জাল হাদীস বিস্তার করে চলেছে। মুসলমানদের কেউ কেউ এগুলোকেও সহীহ্ হাদীসের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে শুরু করেছে। বনী ইসরাঈলের কিছু শিক্ষিত লোককে নিযুক্ত করেছি, তারা কুরআন অধ্যয়ন করে দূর-দূরান্তে গিয়ে কোন মসজিদের ইমাম বনে যাচ্ছে। তারপর মুসলমানদের মন মস্তিষ্কে কুরআনের অপব্যাখ্যা বসিয়ে দিচ্ছে। বলা চলে এই ময়দানে আমরা সফল। অন্যদিকে আমরা রূপসী রমণীদেরকেও ব্যবহার করবো। তোমরা তো জানো, এই তাঁবুর সংলগ্ন তাঁবুতে যে তিনটি যুবতী মেয়ে আছে তাদেরকে আমরা ভাল করেই তৈরী করেছি। আমার তোমাদেরকে এটাই বলার ছিলো, এই গুরুত্বপূর্ণ কাজ এখনই শুরু করা হবে। ইবনে দাউদ এদেরকে মুসলমান সাজিয়ে তার সঙ্গে নিয়ে যাবে। তোমরা একটু অপেক্ষা করো, এদের কাউকে এখানে ডেকে পাঠাচ্ছি। তাদের সঙ্গে কথা বলে তোমরা আমাকে বলো তারা একাজ করতে পারবে কিনা। আর আমরা এদেরকে যেভাবে শিখিয়ে পড়িয়ে নিয়েছি, তা তারা রপ্ত করতে পেরেছে কি না?'

একটু পরেই দীর্ঘকায় মনোলোভা শরীর নিয়ে তাঁবুতে হাজির হলো একটি মেয়ে, তার চলন বলন, হেলন দোলন সবই কারুকার্যময়, উদ্দীপক ও জাদুময়। তার সামান্য হাঁটা চলাতেও কোন পুরুষকে উন্মাদ করে দেয়ার মতো জাদুময়তা ছিলো।

ঃ 'বিনতে ইয়ামীন!'–আবু সালমা মেয়েটিকে লক্ষ্য করে বললো– 'এখন থেকে তুমি মুসলমান। তোমার নাম এটাই হবে। আর তুমি একজন মুসলমানের স্ত্রী হতে যাচ্ছো।'

বিনতে ইয়ামীনের কাঁধে একটি মসৃণ চাঁদর রাখা ছিলো। আবু সালমার কথা শেষ হওয়ার পরই সে তার দু'হাতে চাদরটি দিয়ে মাথা আবৃত করে নিলো এবং এমনভাবে জড়িয়ে নিলো যে, তার বুক থেকে নিয়ে নাক সংলগ্ন কপালও ঢেকে গেলো। কেবল চোখগুলোই দেখা যাচ্ছিল। তারপর সে কুর্ণিশের মত করে মাথা ঝুঁকিয়ে দিলো।

তাঁবুতে বসা প্রত্যেকেই তার সঙ্গে এটা সেটা বলে গেলো। কেউ কেউ প্রশ্নও করলো। সেও প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিল নিপুণতার সঙ্গে। তার উত্তর দেয়ার সময় তাকে দেখলে মনে হতো, সে যেন লজ্জায় সংকোচে গলে গলে যাচ্ছে। তারপর তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, একজন মুসলমানের স্ত্রী হওয়ার পর তোমার করণীয় কি হবে? যেভাবে তাকে শেখানো পড়ানো হয়েছিলো সেমতে সে সবিস্তারে উত্তর দিয়ে গেলো।

ঃ 'আমার সঙ্গে অধিক কথা বলার প্রয়োজন নেই'–বিনতে ইয়ামীন দৃঢ় স্বরে বললো–'আপনার সকল প্রশ্নের উত্তর আমার কাজের মাধ্যমেই পেয়ে যাবেন। যার জন্য আমি বিলকুল তৈরী।'

আবু সালমা তাকে ইশারায় চলে যেতে বললো। সে তৎক্ষণাৎ মাথা থেকে চাদরটি সরিয়ে শরীরকে অর্ধ অনাবৃত করে পূর্বের মতই তা কাধের ওপর রাখল। তারপর উঠে বাইরে চলে গেলো।

ঃ 'কেমন বুঝছো?'–আবু সালমা তার সঙ্গীদের জিজ্ঞেস করলো।

'কথাবার্তায় তো মেয়েটিকে বেশ সতর্কই মনে হলো'- ইসহাক বললো– 'মুসলমানদের তাবুতে গিয়ে সে কি করে বা কি করতে পারবে এখন তাই দেখার বিষয়।'

ঃ 'এমন একটি সুন্দরী মেয়ে যেকোন মুসলমানকেই জাদুর মতো আচ্ছন্ন করে ফেলবে'- আবু সালমা বললো–

ঃ 'আমি তোমার প্রতিটি কথাতেই একমত আবু সালমা!' এক খ্রিস্টান বললো–'আমাদের আত্মতৃপ্তিবোধে ভোগা উচিত হবে না। আমি চাই আমাদের পূর্ব ব্যর্থতার অভিজ্ঞতা সামনে রাখা হোক। মুসলমানদের বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিটি ষড়যন্ত্রই ব্যর্থ হয়েছে। খায়বার যুদ্ধের কথা আমার মনে পড়ছে। সে যুদ্ধে মুসলমানদের নেতৃত্ব তাদের রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাতে ছিলো। মুসলমানরা এক তরফা বিজয় অর্জন করেছিলো। যয়নাব বিনতে হারিস নামে এক ইহুদী মহিলা- যে সাল্লাম ইবনে শাকমের স্ত্রী ছিলো। সে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যা) করার কি সুন্দর কৌশলটাই না অবলম্বন করেছিলো।'

খ্রিস্টানটি খায়বার যুদ্ধের পরপরই সংঘটিত ঘটনাটি শুনালো। ইহুদী মহিলা-যয়নাব বিনতে হারিস রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি নিজেকে আস্থাবান বলে প্রকাশ করলো। এবং তা খুবই মার্জিত-বিগলিত চিত্তে উপস্থাপন করলো। সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তার ঘরে খাবার খেতে দাওয়াত করলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও তার এমন আবেগ ও আগ্রহ দেখে দাওয়াত কবুল করে নিলেন এবং সেদিন সন্ধ্যাতেই যয়নাব বিনতে হারিসের ঘরে চলে গেলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন সাহাবী বিশির ইবনুল বার।

যয়নাব বিনতে হারিস একটি আস্ত দুম্বা-ভুনা করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে রেখে জিজ্ঞেস করেছি, তিনি দুম্বার কোন অংশ পছন্দ করেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানালেন, তিনি বাহুর গোশত পছন্দ করেন। যয়নাব সে মতে তাঁর সামনে বাহুর গোশত যত্ন করে কেটে সাজিয়ে রাখলো। এদিকে বিশির ইবনুল বার এক টুকরো গোশত কেটে মুখে পুরে চিবোতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও এক টুকরো মুখে পুরে সঙ্গে সঙ্গেই মুখ থেকে উগরে দিলেন এবং বললেন, "ইবনুল বার! গোশত বিষ মিশ্রিত।"

কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরী হয়ে গেছে। বিশির গোশত উগরে দিলেও তিনি যেহেতু গোশত চিবোচ্ছিলেন তাই বিষ তার লালায় মিশে গিয়ে কণ্ঠনালী অতিক্রম করে গিয়েছিলো।

ঃ "হে ইহুদী!"–রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিনতুল হারিসের উদ্দেশে গর্জে উঠলেন–"আল্লাহর কসম! তুমি তো গোশতের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে রেখে ছিলে!" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অগ্নিশর্মা হয়ে উঠতেই সেই ইহুদী স্বীকার করলো যে, সে অত্যন্ত দ্রুত ক্রিয়াশীল বিষ গোশতে মিশিয়ে রেখেছিলো।

ঃ 'হে মুহাম্মদ!' যয়নাব বিনতে হারিস চরম স্পর্ধা দেখিয়ে জবাব দিলো–'ইহুদীদের খোদার কসম! আমি যা করেছি তা আমার জন্য ফরয কর্ম ছিলো, আজ আমি ব্যর্থ হয়েছি। কিন্তু কালই কেউ না কেউ সফলকাম হবে।'

যা হোক বিশির ইবনুল বার তার গলা চেপে উঠে দাঁড়ালেন। তীব্র যন্ত্রণায় তাঁর শরীরটা বেঁকে গেলো। তিনি দাঁড়িয়ে থাকতে পারলেন না। ঘুরে পড়ে গেলেন। বিষের ক্রিয়া এত তীব্র ছিলো যে, বিশির আর উঠতে পারলেন না। বিষের মৃত্যু ছোবলে তিনি ছটফট করতে করতে শহীদ হয়ে গেলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যয়নাব বিনতে হারিস ও তার স্বামী সাল্লামকে হত্যার আদেশ জারী করলেন। তিনি যে খায়বারের ইহুদীদের সঙ্গে সহমর্মীতার আচরণ করে আসছিলেন তা রহিত করে দিলেন। হুকুম করলেন, ইহুদীদের কোন ব্যাপারেই যেন বিশ্বাস না করা হয় এবং তাদের প্রতিটি কথা, কাজে ও পদক্ষেপে কঠিন দৃষ্টি রাখা হয়।

প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ ইবনে ইসহাক লিখেছেন, "মারওয়ান ইবনে উসমান আমাকে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন অন্তিম রোগে শয্যাশায়ী ছিলেন। তাঁর ওফাতের দু'তিন দিন পূর্বে বিশির ইবনুলবার -এর মা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লামের শয্যাপাশে এসে বসলেন। তাকে উদ্দেশ্য করে তিনি বললেন– "উম্মুল বিশির আজও আমি আমার শরীরে সেই বিষের ক্রিয়া অনুভব করি, যা সেই ইহুদী মহিলা গোশতের সঙ্গে মিশিয়ে ছিলো। আমি গোশত চিবোইনি। উগড়ে দিয়ে ছিলাম। কিন্তু আজো এর ক্রিয়া তেমনি রয়েছে।" সন্দেহ নেই, এই বিষক্রিয়াই তাঁর অন্তিম রোগের কারণ ছিলো।

খ্রিস্টান লোকটি এই ঘটনার পূর্ণ বিবরণ আবু সালমা ও ইবনে দাউদসহ সকলকে শোনালো।

ঃ 'এ ঘটনা আমার স্মরণে আছে'– আবু সালমা গম্ভীর মুখে বললো—'ব্যর্থতার অভিজ্ঞতায় ভরপুর ঘটনাগুলো আমি ভুলিনি। মদীনার ওপর কুরাইশরা যে হামলা করেছিলো তা তো বেশিদিন আগের কথা নয়। মুসলমানরা পরিখা খনন করে মদীনাকে প্রায় দুর্গে পরিণত করেছিলো। বনী ইসরাঈলরা মদীনাতেই ছিলো। তারা মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে প্রতিজ্ঞা রক্ষার নিশ্চয়তা দিয়ে আসছিলো এবং মুসলমানরাও তাদের প্রতি আস্থা পোষণ করেছিলো। এই আস্থার প্রতিদান আমরা বিশ্বাসঘাতকতায় দেয়ার ফিকিরে ছিলাম'– এতটুকু বলে আবু সালমা একটু থামলো। তারপর আবার শুরু করলো....

'মুসলমানরা তাদের নারী ও শিশুদেরকে একটি দুর্গে সংরক্ষিত রাখে। আমাদের ইহুদীদের এক লোক মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে হত্যার উদ্দেশে রাতের বেলায় যাচ্ছিলো। সেই দুর্গের সামনে এসে সে থেমে গেলো। হাসসান তাকে দেখে ফেললেন। তিনি অসুস্থ ছিলেন। দেখেই তিনি মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ফুফু সুফিয়াকে জানিয়ে দিলেন যে, এক ইহুদী কেমন সন্দেহজনকভাবে দাঁড়িয়ে আছে। সে ইহুদী গোত্র বনী কুরাইযার লোক ছিলো। তার হাতে ছিলো একটি বর্শা...'

—'সুফিয়া একটি শক্ত লাঠি নিয়ে বাইরে বের হলেন এবং পা টিপে টিপে ইহুদীর পেছনে গিয়ে দাঁড়িয়ে হুংকার ছাড়লেন। ইহুদীটি সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে গেলো এবং হামলা করার জন্য বর্শাটি উঠিয়ে উদ্যত হলো। কিন্তু সুফিয়া এক পলকও বিলম্ব না করে তার মাথার ওপর লাঠিটি দিয়ে স্বজোরে আঘাত করলেন। সে উল্টে পড়ে গেলো। সুফিয়া একের পর এক লাঠির আঘাতে আঘাতে তার মস্তকটি দ্বিখণ্ডিত করে ফেললেন...'

'মদীনার অভ্যন্তরভাগের পরিখার দিকে মুসলমানরা রাতে শুয়ে বা বসে কাটাতো। মওকা বুঝে তাদের ওপর হামলার চিন্তাও করে ছিলাম। কিন্তু সেই ইহুদীর হত্যার পর এটা ফাঁস হয়ে গেলো যে, আমাদের নিয়ত ঠিক নয়। পরিণামে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হুকুমে আমাদের দলের গাদ্দার ইহুদীদেরকে কতল করে দেয়া হলো।'

ঃ 'অথচ সে সময়টাই আমাদের জন্য উপযুক্ত ছিলো'- ইবনে দাউদ অনুতপ্ত গলায় বললো– 'তখন খালেদ ইবনুল অলীদও ইসলাম গ্রহণ করেননি এবং ইকরিমা ও আবু সুফিয়ানও ইসলাম গ্রহণ করেননি। এই তিনজন বীরত্ব ও সাহসিকতায় যেমন অদ্বিতীয় ছিলেন তেমনি ছিলো তাদের প্রতাপ-প্রতিপত্তি ও মেধার সূক্ষ্মতা। খন্দকের যুদ্ধে আমি মদীনা অবরোধে শরীক ছিলাম। কিন্তু মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ফুফু সুফিয়া বনী কুরাইযার সেই ইহুদীকে হত্যা করায় আমাদের এত দিনের লালিত সকল পরিকল্পনার মুখোশ সরে গেলো। আমাদের সকল প্রচেষ্টা ভেস্তে গেলো।'

ঃ 'বন্ধুরা আমার! এটা মনে করো না প্রথম প্রচেষ্টাই কামিয়াব হয়। ব্যর্থতার পুঞ্জীভূত গ্লানির পরই সফলতার বীজ অঙ্কুরিত হয়। এখন আমরা নতুন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করবো। বিনতে ইয়ামীনকে কালই তার মিশনে পাঠিয়ে দেয়া হবে। তোমাদেরকে এটাও বলে দিচ্ছি, ইতিমধ্যে একজন মুসলমানকেও আমরা নির্বাচন করেছি। আমরা আশা করছি বিনতে ইয়ামীনকে দেখে সে তাকে শাদী করতে কালবিলম্ব করবে না।'

ইবনে দাউদ যে মুসলমানের কথা বলছিলো ছিলো হাবীব ইবনে কা'ব। ব্যবসায়িক সূত্রে প্রায়ই মদীনায় যেতো এবং শীর্ষস্থানীয় মুসলমানদের সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠতাও গড়ে উঠেছিলো।এ সময় তার গ্রামের বাড়িতে এসেছিলো। তাঁর স্ত্রী ছিলো দু'জন। এর মধ্যে একজন ছিলো চিকিৎসার উর্ধ্বে মরণ ব্যাধিতে আক্রান্ত। তাঁর চিকিৎসার শেষ একটি চেষ্টার জন্য তিনি গ্রামে এসেছিলেন। মদীনা থেকে প্রায় বিশ মাইল দূরে ছিলো এই গ্রাম।

ইহুদীরা তাদের ষড়যন্ত্রের জাল আগেই বিস্তার করে রেখেছিলো। একদিন বনী কুরাইযার এক ইহুদী সেই গ্রামে এসে হাজির হলো। ব্যবসায়িক পণ্য নিয়ে সে এ গ্রামে মাঝে মধ্যে আসতো। ব্যবসাই ছিলো তার পেশা। সে এসেই জানতে পারলো মদীনার একজন গুরুত্বপূর্ণ লোক সম্প্রতি এখানে এসেছে। ইহুদী তার সঙ্গে আগ বাড়িয়ে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তুললো। আর ভাবতে বসলো এই লোককে মুসলমানদের বিরুদ্ধে কিভাবে ব্যবহার করা যায়। আবু সালমার সঙ্গে তার সাক্ষাত হলে আবু সালমা এই পরিকল্পনা করলো। ইহুদীরা সেটাই এখন বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছে। হাবীব ইবনে কা'বের সাথে যে বন্ধুত্বের অভিনয় করেছিলো সে হাবীবকে তার অসুস্থ স্ত্রীর স্থলে আরেকটি শাদীর পরামার্শ দিল। এটাও বললো, সে তাকে পরমা সুন্দরী এক মুসলিম মেয়ে এনে দেবে।

আশ্বাস পেয়ে হাবীবও শাদীর জন্য তৈরী হয়ে গিয়েছিলো।

সাধারণত বলা হয়, আরবরা শারীরিক কামনা বাসনা চরিতার্থ করার জন্য এবং বিলাসিতার জন্য একাধিক বিয়ে করে। এটা মূর্খোচিত ধারণা। মোটেও ঠিক নয় এ বক্তব্য। আরবরা মূলতঃ অধিক ছেলে সন্তানের জন্য একাধিক বিয়ে করতো। তখন তাকেই শক্তিশালী ও শৌর্য্য বীর্যের অধিকারী মনে করা হতো, যার ভাই ও পুত্র সন্তান অধিক থাকতো। হাবীবও সেসব বলশালী আরবদের একজন ছিলো। তার দুই স্ত্রী ছিলো। একজন ছিলো মরণ ব্যাধিতে আক্রান্ত। এ জন্য তার আরেকটি বিয়ের প্রয়োজন ছিলো।

হাবীবের ইহুদী বন্ধু তাকে আশ্বাস দিয়ে চলে যাওয়ার পর একদিন এক লোক চাদরে মুড়িয়ে এক যুবতী মেয়ে নিয়ে তার ঘরে এলো। সে তার নাম বললো ইবনে দাউদ। তখনকার যুগে ইহুদী খ্রিষ্টান ও মুসলমানদের নাম এক রকমই হতো। ইবনে দাউদ বিশ্বাসভাজন হওয়ার জন্য কয়েকজন ইহুদী ব্যবসায়ীরও কথা বললো।

ঃ 'আমি একজন হতদরিদ্র ও বিপদগ্রস্ত লোক'—গলায় কান্নার ভাজ তুলে ইবনে দাউদ বললো—'আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। এজন্য আমার কবীলার লোকেরা আমাকে নির্যাতন করে আমার সব মালামাল ছিনিয়ে নিয়েছে। তারপর কবীলা থেকে বের করে দিয়েছে। বড় কষ্ট করে আমার বেটিকে লুকিয়ে টুকিয়ে সেখান থেকে বের করে এনেছি। তোমার বন্ধু আমারও বন্ধু। আমি তার কাছেই আশ্রয় নিয়েছিলাম। সে আমাকে তোমার কথা জানিয়ে বললো তোমার নাকি শিগগিরই একটি শাদীর জরুরত হবে......'

'আমার এই পরম আদরের বেটিকে তোমার কাছে নিয়ে এসেছি। আমি একজন নও মুসলিম। আমার প্রতি তো অন্তত এতটুকু মেহেরবানী করতে পারো যে, আমার কন্যার সঙ্গে তুমি আকদ করে নিবে এবং আমাকে মদীনার কোথাও একটি নওকরী তালাশ করে দিবে। সেটা কোন সর্দারের গোলামী হলেও আমার আপত্তি নেই। আর যদি মুসলমানদের ফৌজে আমাকে ভর্তি করে নাও তবে তো তোমার জন্য জীবনভর দোয়া করে যাবো।'

হাবীবের এমনিতেই বিয়ের প্রয়োজন ছিলো। আর যখন ইবনে দাউদের এই বিহ্বল অবস্থা দেখলো তখন কোন চিন্তা না করেই বিয়ের জন্য তৈরী হয়ে গেলো। কিন্তু যখন তার মেয়েকে দেখলো তখন আর বিলম্ব করারও প্রয়োজন মনে করলো না। সেদিন সন্ধ্যাতেই বিয়ের কাজ সমাধা করে ফেললো।

পরদিন বিয়ের রেজিস্ট্রারকে ডেকে হাবীব বিনতে ইয়ামীনকে তার আকদে নিয়ে নিলো।

ঃ 'ইবনে কা'ব!'–ইবনে দাউদ কৃতজ্ঞতার স্বরে বললো– 'তুমি আমার এত বড় বোঝা নিজে বহন করে নিয়েছো, যার নিচে পড়ে আমার ও আমার বেটির ইজ্জত-সম্মান ও জানের নিরাপত্তা-সবই চাপা পড়ে গিয়েছিলো। কিছু দিনের জন্য আমি মদীনা যাচ্ছি। আমার জন্য যদি কোন জীবিকার সন্ধান করতে পারো তবে আমাকে জানিয়ো। আমি তখন এখানে এসে তোমার সঙ্গে মোলাকাত করবো না হয় মদীনায় তোমার কাছে গিয়ে হাজির হবো।'

ঃ 'যদি তোমার কোন ঠিকানা না থাকে তাহলে তো তুমি আমার কাছেই থেকে যেতে পারো। দশ বার দিন পর আমি মদীনায় ফিরে যাবো। তখন আমার সঙ্গেই মদীনায় যেতে পারবে।'

ঃ 'না'–ইবনে দাউদ বললো–'আমি আর এখন তোমার ওপর আমার বোঝা চাপিয়ে দেবো না। এখন মদীনাতেই আমার ঠিকানা বানাবো। যেখানে আমি মুসলমানদের নিরাপত্তা পাবো।'

ঃ 'ঠিক আছে। দশ বার দিন পর তুমি মদীনায় আমার কাছে চলে এসো'– হাবীব ইবনে কা'ব তাকে আশ্বস্ত করে বললো।

ইবনে দাউদ তারপর পিতৃস্নেহের ভূমিকায় বিনতে ইয়ামীনের মাথায় আদরের হাত বুলিয়ে দিয়ে চলে গেলো।

কয়েক দিন পর। সেই খেজুর কুঞ্জই ছিলো। শাহী সজ্জায় সজ্জিত সেই তাঁবুই ছিলো। মাহফিলও ছিলো নৃত্য আর সঙ্গীতের। সেখানেও নাচনেওয়ালী ষোড়ষী আর যৌবনবতী গায়িকাদের শিহরণ জাগানো শরীরের আন্দোলিত কসরত ছিলো। এভাবেই কামনার জ্বলন্ত উন্মাদনা নিয়ে একটি রাত প্রহরান্তরিত হচ্ছিলো।

এক সময় আবু সালমার ইশারায় সঙ্গীতের একঘেয়ে আওয়াজের ঢেকি থেমে গেলো। নাচনেওয়ালীর শরীরের কসরত প্রদর্শনও বিরতি দিল। আবু সালমা মাথা সামান্য নাড়াতেই নর্তকী ও গায়িকার দল তাঁবু থেকে বের হয়ে গেলো।

ঃ 'ইবনে দাউদের তো এতক্ষণে পৌছে যাওয়া উচিত ছিলো'- অভিযোগের স্বরে বললো আবু সালমা।

ঃ 'এসে তো পড়বেই'-ইসহাক বললো- 'আর সে তো কোন ছোট ছেলে নয়। এসে পড়বে। আমি আশা করছি সে কিছু না কিছু করেই আসবে। হয়তো সকালেই এসে যাবে।'

এই ইহুদী ও খ্রিষ্টান দল আবার ইসলামের ধ্বংসলীলা কার্যকর করার বিষয়ে আলাপ শুরু করলো। রাত ক্রমেই গভীর থেকে গভীরতর হলো। আবু সালমাকে তন্দ্রা প্রায় আচ্ছন্ন করেই ফেলেছিলো। মাহফিলও ক্রমেই ঝিমিয়ে আসছিলো।। হঠাৎ খুব কাছ থেকেই ঘন্টার টুংটাং আওয়াজ শোনা যেতে লাগলো। আবু সালমার তন্দ্রার রেশ কেটে যেতেই সে চমকে উঠলো। অন্যরাও কান খাড়া করে রাখলো।

ঃ 'আসছে'-এক সঙ্গেই কয়েকজন বলে উঠলো।

এক খ্রিস্টান দৌড়ে তাঁবু থেকে বের হয়ে গেলো। মরুর রূপালী চাঁদের আলোয় দেখা গেলো আরোহী নিয়ে একটি উট আসছে। তার রুখ এ দিকেই। উটের গলায় বাধা ঘন্টি থেকে জলতরঙের মত রিনিঝিনি শব্দ মরুর এদিকটা কেমন রহস্যময় করে তুলছে। ছোট তাঁবুটি থেকে কয়েকজন নওকর বাইরে বের হয়ে শব্দ উৎসের দিকে চলে গেলো। যে খ্রিস্টানটি তাঁবুর বাইরে এসেছিলো সেও উটের দিকে দৌড়ে চললো।

ঃ 'তুমি নিশ্চয় ইবনে দাউদ'- খ্রিস্টানটি বুলন্দ আওয়াজে বললো।

ঃ 'তবে আর কে হবে!'-উট সওয়ার জবাব দিলো।

উট সওয়ার ইবনে দাউদ কাছে এসেই লাফ দিয়ে উট থেকে নামলো এবং আগত খ্রিস্টানটিকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করলো। এক নওকর সামনে অগ্রসর হয়ে উটের লাগামটি নিজের হাতে নিয়ে নিলো এবং অন্যান্য উট যেখানে বাঁধা ছিলো সেখানে উটটিকে নিয়ে গেলো।

ঃ 'আমি জানতাম আজ রাতেই তুমি এসে পৌঁছুবে'-ইবনে দাউদ তাঁবুতে প্রবেশ করতেই আবু সালমা বলে উঠলো-'এসো এখানটায় বসো। কিছু মুখে দিয়ে নাও। তারপর বলো কি করে এলে?'

ঃ 'দুনিয়ায় এমন অদ্ভুত মানুষও কি আছে, যে এমন সুন্দর-দুর্মূল্যের মনিমুক্তা বিনামূল্যে গ্রহণ না করে থাকবে?'-আবু দাউদ বিজয়ের হাসি হেসে বললো- 'ঐ লোক- যার নাম হাবীব ইবনে কা'ব। কিছুটা আমার কথায় আর অনেকখানিই বিনতে ইয়ামীনকে দেখে নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলো না।

ঃ 'লোকটি কেমন?'-ইসহাক কৌতুহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলো।

'আমাদের কাজ চলে যাবে-ইবনে দাউদ হালকা সুরে বললো-'আমি একজন দরিদ্র ও নির্যাতিত নওমুসলিমের বেশে তার সঙ্গে এমন কাতর সুরে কথা বলেছি যে, সে নিঃসঙ্কোচেই আমার সঙ্গে খোলামেলা আলাপে মশগুল হয়ে গেলো। আমি যখন তাকে আমার জন্য কোন জীবিকার সন্ধান করতে অনুরোধ করলাম সে বললো, এটা কোন ব্যাপারই নয়। মদীনার শীর্ষস্থানীয় লোকদেরকে আমি কিছু বললে তারা তা গুরুত্বের সঙ্গেই নেয়। তোমার ব্যাপারে কোন অসুবিধাই হবে না। আবু সালমা! আমাকে যা বলা হয়েছিলো, বাস্তবেই সে প্রভাবশালী এবং গোত্রের সর্দারদের সঙ্গে তার উঠা-বসা আছে।'

ঃ 'বিনতে ইয়ামীনকে আমরা যেমন করে তৈরী করেছি এবং তার যা করণীয় আশা করি তা হয়ে যাবে'– আবু সালমা আস্থার সুরেই বললো।

ঃ 'আমি তিন চারদিন পর মদীনায় রওয়ানা হবো'- আবু দাউদ বললো– 'তার কথা মতো আমি তার কাছে পৌছে যাবো' যাক, এখন তো আমি শুতে পারি নাকি? বড্ড ক্লান্তি লাগছে।'

ঃ 'হ্যাঁ শুয়ে পড়ো। এটাই ভালো হবে'- আবু সালমা বললো। একথার পরই সেদিনের মজলিস ভেঙে গেলো।

পরদিন সূর্য প্রায় মাথার ওপর উঠে এসেছিলো। তার রাগী চেহারা ক্রমেই লাল হয়ে উঠছিলো। বাগানের যে দিকটায় খেজুর ও অন্যান্য গাছের বিস্তৃত ঝোপ ছিলো সেখানটা ছাদের আকৃতিতে নিচে ছায়া বিস্তার করে ছিলো। যেদিক থেকে লু হাওয়া বইছিলো সেদিকের গাছের ডালগুলোর সঙ্গে তাঁবুর একটি মজবুত ক্যানভাস দেয়ালের মত করে স্থাপিত ছিলো। মরুর লু হাওয়া ও এর সঙ্গের তপ্ত বালুকণা সেটি রুখছিলো। ছাদ আকৃতির ঝোপের নিচে গালিচা বিছানো ছিলো। আবু সালমা, ইবনে দাউদ ও ইসহাক তাদের সঙ্গীদের নিয়ে এর ওপর বসে আয়েশ করছিলো। নওকররা তাদের সামনে খাবার সাজাচ্ছিলো।

হঠাৎ এক উট চালক যে উটের রাখালীও করে– সে দৌড়ে আসল।

ঃ 'প্রভু!– উঠ চালক নওকর আবু সালমাকে সংবাদ দিলো– 'দূরে একটি ঘোড়-সওয়ার দেখা যাচ্ছে। সওয়ারীকে কোন সাধারণ মুসাফির বলে মালুম হচ্ছে না। ঘোড়ার গতিও বেশ তেজদীপ্ত। এদিকেই তার রুখ।'

এরা সবাই উঠে তাঁবুর ক্যানভাসের ওপর থেকে সামনের দিকে দেখতে লাগলো। ঘোড়া এবং তার সওয়ার কোনটাই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিলো না। উত্তপ্ত বালুকণা থেকে অদৃশ্য ভাপ যেন জাহান্নামের দীর্ঘশ্বাস ছড়িয়ে দিচ্ছিলো। আর চার দিক করে তুলছিলো ঝাপসা। এর মধ্যে ঘোড়া ও তার সওয়ারের অবয়ব–আকৃতি এমন দেখাচ্ছিলো যেমন ঝিলের ঝিরঝিরে পানিতে তার প্রান্তের দোলায়িত প্রতিবিম্ব। আগন্তুক কি ঘোড় সওয়ার না উট সওয়ার তা কেবল মরুচারীরাই চিনতে পারতো।

ঃ 'আমাদেরই কেউ হবে'–আবু সালমা বললো–'আর এখান দিয়ে কেই বা পথ অতিক্রম করে'।

তারা অনুমান করছিলো আর পরখ করছিলো। কোন ধরনের ভয় তাদের মনে ছিলো না। কারণ তারা কোন ডাকাতও ছিলো না এবং ডাকাতির কোন মালামালও ছিলো না। তারা ভ্রমণকারী বাণিজ্যিক দল ছিলো। যারা লুটের শংকা করতে পারতো। কিন্তু তাদের প্রতি এই সন্দেহও করা যেত না যে, তারা কোন ছিনতাই ডাকাতির শংকায় শংকিত থাকে।

ঘোড়া যতই নিকটে আসছিলো তার অবয়ব আকৃতি ততই স্পষ্ট হচ্ছিলো। মনে হচ্ছিলো স্বচ্ছ পানির ভেতর দিয়ে সন্তরণ করতে করতে ঘোড়াটি এগিয়ে আসছে। প্রায় শ' গজ দূরে থাকতে বুঝা গেলো এটা ঘোড়া এবং তার ওপর কোন সরওয়ার বসা আছে। সওয়ার তার বাহুসমেত হাত ওপরে উঠিয়ে ডানে ও বায়ে হেলিয়ে ইংগিতই করছিলো যে, আমি তোমাদের নিজস্ব লোক, পর নই। আর তোমাদেরকে পেয়েছি বলে আমি বেশ আনন্দিতও।

আবু সালমা ও তার সঙ্গীরা ঝোপের এক পাশ দিয়ে বের হয়ে গেলো আগত ঘোড় সওয়ারকে শুভেচ্ছা জানাতে। তখন সামান্য ব্যবধান ছিলো। ইবনে দাউদ তাকে চিনতে পেরে 'মূসা' বলে তারস্বরে চিৎকার করে উঠলো। সে ঘোড়ার পেটে গুতো মারতেই ঘোড়া লাফ দিয়ে দৌড়াতে শুরু করলো এবং জটলার সামনে এসে আচমকা থেমে গেলো। মনে হচ্ছিল ঘোড়া বুঝি পড়ে গেলো। কিন্তু না ঘোড়া পড়লো না। মূসা এক লাফে ঘোড়া থেকে নামলো।

ঃ 'যবরদস্ত খবর নিয়ে এসেছি'–মূসা হাঁপাতে হাঁপাতে বললো–'মুসলমানদের প্রথম খলীফা আবুবকর মারা গেছেন।'

তারপর মূসা সবার সঙ্গে মুসাফা করলো। তারা তাকে তাঁবুর দেয়ালের ভেতর নিয়ে গেলো- যেখানে খাবার সাজানো ছিলো।

ঃ 'উমর ইবনুল খাত্তাব তো পরবর্তী খলীফা বনে যাইনি?'–ইসহাক জিজ্ঞেস করলো।

ঃ 'তাহলে আর কে হবে?'–মূসা বললো–আবুবকর মৃত্যুর পূর্বে ওসিয়ত করে গিয়েছেন যে, তার স্থলাভিষিক্ত হবে উমর ইবনুল খাত্তাব।

ঃ 'এটা একটা মন্দ ব্যাপার হলো'- আবু সালমা হতাশ সুরে বললো।

ঃ 'এতো বড়ই জালিম মনের মানুষ। বনী ইসরাঈলের নামও শুনতে পারেন না। আবুবকর কবে মারা গেলেন?'

ঃ 'গত পরশু সন্ধ্যায় সূর্যাস্তের সময়'- মূসা বললো।

ঃ 'আমি কালই চলে আসতাম। কিন্তু এটা দেখা প্রয়োজন ছিলো যে, পরবর্তী খলীফা কে হন এবং কত লোক তার হাতে বায়আত হয় আর কারা বায়আত গ্রহণ থেকে বিরত থাকে।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর ইসলামের প্রথম খলীফা হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রা) এর ওফাত মুসলমানদের জন্য আরেকটি বড় আঘাত ছিলো। ২৩ জমাদি উসসানী ১৩হিঃ মোতাবেক ২২ আগস্ট ৬৩৪ খ্রিঃ সূর্যাস্তের সময় তাঁর ইন্তিকাল হয়। পৃথিবীর মানুষ এবং এর প্রতিটি অংশ দ্বিতীয়বারের মত আবার বড় ইয়াতীম হয়ে গেলো। মদীনার লোকেরা এ সংবাদ শুনতেই পুরুষ মহিলা সবাই ঘর থেকে বের হয়ে আসে। উন্মত্ত তরঙ্গের মত সবাই খলীফায়ে আউয়ালের ঘরের দিকে ছুটতে থাকে। যে তরঙ্গ থেকে শুধু কান্নার রোল আর হেচকির শব্দ আসছিলো। মহিলারা এত বিহবল ও মাতম করছিলো যেন তাদের জন্মদাতা পিতা চলে গেছেন।

আবুবকর (রা) তাঁর জীবনের শেষ দিন তাঁর পরবর্তী স্থলাভিষিক্ত হিসেবে উমর (রা)কে নির্বাচন করেছিলেন। উমর (রা) তা গ্রহণ করতে বার বারই অস্বীকার করে আসছিলেন। কিন্তু আবুবকর (রা) পরিষ্কার ভাষায় বলে দিলেন, 'ইসলামী সালতানার এখন যে নাজুক পরিস্থিতি, এ অবস্থার মোকাবেলা করার যোগ্যতা উমর (রা) ছাড়া আর কারো মধ্যেই নেই।

সে সময় উমর (রা) মানসিক দিক দিয়ে খুবই বিহ্বল অবস্থায় ছিলেন। একে তো আবুবকর (রা) এর মতো উম্মতের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি ও সবচেয়ে বিচক্ষণ সঙ্গী বিদায় নিয়েছেন, তারপর আবার এই আজীবন সঙ্গী তার সমস্ত দায়িত্বভার তাঁরই কাঁধে চাপিয়ে গেছেন। এদিকে ইসলামী সাম্রাজ্যে চলছে এক সঙ্গীন অবস্থা। হযরত উমর (রা) তাই হযরত আবুবকর (রা)-এর জানাযা সামনে রেখে মাতম করে উঠলেন।

"হে খলীফায়ে রাসূলুল্লাহ! এই উম্মতে মুহাম্মদীকে আপনি কি যে মুসীবতে আর পাহাড়সম সংকটে রেখে গিয়েছেন! আপনি বিদায় নিলেন, এখন বলুন কিভাবে আপনার সংস্পর্শ পাবো?"

আবুবকর (রা) তাঁর ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তে উমর (রা)কে খলীফা নির্বাচন করেননি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও কখনো ব্যক্তিগত ইচ্ছায় কোন ফয়সালা করেননি। তিনি যেমন বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর সাহাবীগণের সঙ্গে পরামর্শ করতেন, আবুবকর (রা)ও ওসিয়ত লেখানোর সময় তাঁর সাথীদের কাছ থেকে পরামর্শ নিয়েছিলেন। সর্বপ্রথম তিনি আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা)কে জিজ্ঞেস করেছিলেন উমর (রা) সম্পর্কে তাঁর মতামত কি?

ঃ 'আল্লাহর কসম!' আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা) বলেছিলেন– 'উমর (রা) সম্পর্কে আপনার ফয়সালাই সবচেয়ে উত্তম। কিন্তু তাঁর মেজাযে কিছু রুক্ষতা আছে।'

ঃ 'তা আমি ভালই জানি'- আবুবকর (রা) বলেছিলেন–'তাঁর মেজাজে যে কাঠিন্যতা আছে তা এজন্য যে, আমার মেজাজ খুবই নরম-কোমল। উমর (রা)-এর ওপর যখন দায়িত্ব এসে পড়বে, তখন তিনি নিজেকে ভারসাম্য মেজাজে পরিচালিত করতে পারবেন। আবু মুহাম্মদ! আমি উমর কে অনেক কাছ থেকে দেখেছি, তাকে নিরীক্ষা করেছি এবং পরখ করেছি। আমি সবসময়ই দেখেছি, আমি যখন ক্রুদ্ধ হতাম তখন তিনি আমার ক্রোধ প্রশমনের চেষ্টা করতেন। আর কোন ব্যাপারে যখন আমি শিথিলতার আশ্রয় নিতে চাইতাম উমর তখন আমাকে শক্ত হওয়ার পরামর্শ দিতেন।'

এরপর তিনি উসমানগনী (রা)কে ডেকে উমর (রা) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন।

ঃ 'আল্লাহ তাআলাই আমাদের মধ্যে সবচেয়ে ভাল জানেন'–উসমানগনী (রা) এ ভাষাতেই তাঁর মতামত ব্যক্ত করে গেলেন– 'আমার মতে তাঁর বাহ্যিক অবস্থার চেয়ে আভ্যন্তরিণ অবস্থা আরো উন্নত, সুন্দর ও তাকওয়াভরপুর। তাঁর সঙ্গে আমাদের কোন তুলনাই চলে না।'

আবুবকর (রা) এরপর সাঈদ ইবনে যায়েদ (রা) ও উসায়েদ ইবনে হুযায়ের (রা) সহ বেশ কিছু মুহাজির ও আনসার সাহাবীকে উমর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। উমর (রা)কে তিনি যে খলীফা নির্বাচন করতে যাচ্ছেন তাও তাঁদেরকে জানালেন।

ঃ 'আমার ফয়সালা কতটুকু সঠিক?'-তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন। তারা প্রত্যেকেই পৃথক পৃথক মত পেশ করলেন। কিন্তু সকলের মতামত প্রায় একই ছিলো। তারা বলতে চাচ্ছিলেন, উমর (রা)-এর মেজাজ এতই রুক্ষ ও কঠিন যে, তিনি খলিফা হলে মুসলমানদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা ও কলহ সৃষ্টির আশংকা দেখা দিতে পারে। সেদিনই তালহা (রা) তাদের সকলের প্রতিনিধি হয়ে আবুবকর (রা)-এর কাছে গেলেন।

ঃ 'খলীফাতুররাসূল!'-তালহা আবুবকর (রা) কে উদ্দেশ্য করে আরয করলেন - 'আল্লাহ তাআলা যখন আপনাকে সওয়াল করবেন, তোমার প্রজাসাধারণকে কার কাছে সোপর্দ করে এসেছো তখন আপনি কি জবাব দেবেন? উমর (রা)কে আপনি আপনার স্থলাভিষিক্ত করতে যাচ্ছেন। কিন্তু তিনি লোকজনের সাথে কেমন আচরণ করেন তা কি আপনি কখনো লক্ষ্য করেননি? চিন্তা করে দেখুন, জনসাধারণ যখন উমর (রা) এর ব্যাপারে বাঁধা হয়ে দাঁড়াবে তখন তো আল্লাহ তাআলা আপনার কাছে ঠিকই এর জবাবদিহিতা চাইবেন।'

আবুবকর (রা) এর বয়স বাষট্টি বছরের উর্ধ্বে পৌছে গিয়েছিলো এবং তিনি অসুস্থ ও দুর্বল ছিলেন। প্রায় মুমূর্ষু ছিলেন। তাঁর শরীরে এতটুকু শক্তি ছিলো না যে, তিনি নিজের শক্তিতে উঠে বসবেন। আবুবকর (রা) তালহা (রা) এর কথা শুনে খুবই ক্ষুব্ধ হলেন। অথচ তাঁর মেজাজে রাগ ও ক্রুদ্ধতা বরাবরই কম ছিলো। তিনি উমর (রা) কে অত্যন্ত চিন্তাশীল ও বিচক্ষণ বলে মনে করতেন।

ঃ "আমাকে উঠিয়ে বসাও" ক্ষুব্ধ কণ্ঠে আবুবকর (রা) বললেন।

তাঁর এক আত্মীয় তাঁকে হাতের সাহায্যে উঠিয়ে বসালেন।

ঃ 'তোমরা কি আমাকে আল্লাহর ভয়ের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছো- আবুবকর (রা) কম্পিত আওয়াজে ক্রুদ্ধ সুরে বললেন। 'আমি যদি তোমাদের ওপর কোন জালিমকে চাপিয়ে দিয়ে যাই, তবে আমি ব্যর্থ হয়েই মরবো। আর এটাই হবে আমার পরকালের পাথেয়। আল্লাহর দরবারে আমি আরয করবো, হে আল্লাহ! আমি তোমার বান্দাদের জন্য সে ব্যক্তিকে আমার স্থলাভিষিক্ত করে এসেছি, যিনি আপনার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মতের মধ্যে সর্বাধিক উত্তম।'

দুর্বলতার কারণে আবুবকর (রা)-এর আওয়াজ খুবই ক্ষীণ ছিলো। তাঁর নিকটে বসা দু'একজন লোকই কেবল তাঁর কথাগুলো শুনেছিলো।

ঃ 'তালহা! আমার কথা শোন"-তালহা (রা) কে তিনি কাছে ডেকে বললেন-'যে কথাগুলো আমি এখন বললাম তা তোমার পেছনের লোকগুলোকে শুনিয়ে দাও।'

তালহা খলীফার হুকুম পালন করলেন।

বর্ণিত আছে, সে রাতে আবুবকর (রা) আর ঘুমুতে পারেননি। উম্মতে মুহাম্মদীতে উমর (রা) এর খেলাফত নিয়ে যে মতানৈক্য ছিলো এ ব্যাপারটি তাকে খুবই পীড়া দিচ্ছিল। কোনভাবেই এটা তিনি মেনে নিতে পারেননি। সকাল হতেই আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা) তাঁর শুশ্রূষায় এলেন। তখন ঘরের লোকেরা তাঁকে জানালো, রাতে আবূবকর (রা) আর ঘুমুতে পারেননি।

'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খলীফা! কাল রাত নাকি আপনি নির্ঘুম কাটিয়েছেন?'

'তালহা ও তাঁর সঙ্গীদের কথা আমাকে দারুণ দুঃখ দিয়েছে' আবুবকর (রা) ক্লান্ত স্বরে বললেন।

"আমি আমার যুক্তিপূর্ণ মেধা ও ইলমে শরীয়ত অনুযায়ী খেলাফতের এই গুরুদায়িত্ব তাকে সোপর্দ করতে চাইছি, যিনি তোমাদের মধ্যে সব দিক দিয়েই উত্তম। তোমরা তো আমার ফায়সালা গ্রহণ করতে দ্বিধা করছো। তোমরা কি চাচ্ছ এই কঠিন দায়িত্ব অন্য কারো ওপর সোপর্দ করি? অথচ তোমরা জানো উমর (রা) এর চেয়ে যোগ্য ও উত্তম ব্যক্তি এর মধ্যে আর নেই!'

ঃ 'খলীফাতুর রাসূল! আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন' আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা) শ্রদ্ধাবনত কণ্ঠে বললেন– 'আপনার মনের ওপর আপনি এভাবে কষ্টের বোঝা চাপাবেন না। এতে তো আপনার অসুস্থতা আরো বৃদ্ধি পাবে। আমি যতটুকু জেনেছি, রায়প্রদানকারীরা দু'দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন। একদল তো আপনার রায়-ফয়সালা প্রাণের বিনিময়ে হলেও গ্রহণ করবেন এবং তারা আপনার সঙ্গ কখনো ছাড়বেন না। অন্য দল আপনার ফয়সালার সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করতে চাচ্ছেন। আমার জন্য আফসোসের কারণ হলো, দ্বিতীয় দলের নেতৃত্ব যিনি দিচ্ছেন তিনি আপনার পরামর্শদাতা ও প্রিয় বন্ধুদের একজন। আমরা সবাই এ ব্যাপারে একমত ও আস্থাবান যে, আপনার ফয়সালার ভিত্তি একমাত্র নেক নিয়তের ওপরেই। এর দ্বারা উম্মতের হেদায়েত, পরিশুদ্ধি, সফলতা ও সমৃদ্ধশীলতাই আপনার উদ্দেশ্য।'

আবুবকর (রা)-এর জন্য এ অবস্থাটা বিস্ময় ও দুঃখবোধের যুগপৎ উপলব্ধি ছিলো। তিনি ইচ্ছা করলে তাঁর ফয়সালা অনায়াসেই কার্যকরী করতে পারতেন। কিন্তু তাঁর দূরদর্শী দৃষ্টি প্রতিনিয়ত সে অবস্থাটাই কল্পনা করছিলো যা তাঁর ইন্তিকালের পর উদ্ভূত হতো। তাই তিনি সর্বসাধারণের কাছ থেকে মতামত নেয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। তাঁর কামরা মসজিদ সংলগ্নই ছিলো। মসজিদমুখী তাঁর ঘরের একটি দরজাও ছিলো। এত দুর্বল ও শীর্ণতা সত্ত্বেও তিনি সেই দরজায় এসে দাঁড়ালেন। যোহরের ওয়াক্ত ছিলো। নামাযরত মুসল্লীসহ অন্যদেরকেও বলা হলো খলীফায়ে মুসলিমীন তাদের সঙ্গে আলোচনা সভায় বসবেন। নামাযের পর লোকেরা তাঁকে তাঁর দরজায় দেখতে পেয়ে তাঁর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলো।

'আমি যাকে আমার স্থলাভিষিক্ত করবো তোমরা কি তাকে পছন্দ করবে?'–আবুবকর (রা) সমবেতদের উদ্দেশে জিজ্ঞেস করলেন।

'হ্যাঁ, আপনি যা করবেন, যাকেই নির্বাচন করবেন আমরা তাঁকেই মেনে নেবো'–অনেকেই বলে উঠলো।

'আল্লাহর কসম!'–আবুবকর (রা) আবার বলতে লাগলেন–'আমি অনেক চিন্তা ভাবনার পর আমার অভিজ্ঞতাকে সামনে রেখে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, আমার পর খেলাফতের দায়িত্ব সামলাবেন উমর ইবনুল খাত্তাব। আমি এই গুরুদায়িত্ব আমার কোন নিকটাত্মীয়কে দেইনি। আমি যা বলছি তোমরা তা নিবিষ্ট মনে শোন এবং এই ফয়সালা কবুল করে নাও যে, আমার স্থলাভিষিক্ত হবে উমর ইবনুল খাত্তাব।'

প্রায় সকলেরই এক যোগে আওয়াজ শোনা গেলো– 'আমরা খলীফাতুর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা শুনলাম এবং মেনে নিলাম।'

আবুবকর (রা) এর চোখ অশ্রুতে ঝাপসা হয়ে গেলো! আবেগাপ্লুত হয়ে তিনি তার দু'হাত আকাশের দিকে তুলে ধরলেন।

'হে আল্লাহ!' আবুবকর (রা) সকৃতজ্ঞ ও কম্পিত আওয়াজে বললেন–"আমি উমর (রা)কে আপনার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মতের কল্যাণের জন্যই নির্বাচিত করেছি এবং এজন্য নির্বাচন করেছি যে, তাদের মধ্যে সৃষ্ট মতানৈক্য যাতে তাদের ধ্বংসের কারণ না হয়ে দাঁড়ায়। আমি আপনার পবিত্র সত্তার প্রতি আমার নির্ভরতা সোপর্দ করেই এই ফয়সালা করেছি। হে আল্লাহ! মনের সকল ভেদ আপনিই ভাল জানেন। আমি এক শক্তিমান ব্যক্তিকে আমার স্থলাভিষিক্ত করেছি। আর তার রুক্ষ মেজাজের কারণ হলো তিনি সত্যকে পছন্দ করেন এবং সত্য প্রতিষ্ঠাই তাঁর ব্রত। তিনি মুসলমানদেরকেও সত্যের কান্ডারী করার পবিত্র স্বপ্ন লালন করে থাকেন।'

আবুবকর (রা)-এর এই প্রার্থনার ভাষা শোনার পর দ্বিমত পোষণকারীদের মধ্যে যারা মসজিদে নীরব হয়ে বসা ছিলেন তারাও সমস্বরে বলে উঠলেন, আমরা উমর (রা) এর খেলাফত স্বতঃস্ফূর্ত চিত্তে মেনে নিলাম।

আবুবকর (রা) তাঁর পাথরের মতো ভারী হয়ে যাওয়া দেহভার আর সইতে পারছিলেন না। তিনি ইংগিত করলেন। তখন তাঁকে প্রায় শুইয়েই ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো। কথা বলা তো দূরের কথা এতগুলো কথা বলার ফলে তাঁর মধ্যে নড়াচড়ারও সামর্থ ছিলো না। কিন্তু বিছানায় যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বলে উঠলেন, 'উমর (রা) কে ডাকো।' উমর (রা) আসলেন।

'উমর!'–আবুবকর (রা) বললেন–'আপনি কি আমার ফয়সালা শুনেছেন?'

ঃ 'হ্যাঁ শুনেছি খলীফাতুর রাসূল!'–উমর (রা) বললেন– 'আমি তো এর উপযুক্ত ছিলাম না।'

'কিন্তু এটা আমারই নির্বাচন ও ফয়সালা'–আবুবকর (রা) অস্ফুট গলায় বললেন– "জনগণ আপনার পক্ষেও আছে বিপক্ষেও আছে। কিন্তু আমি মহান আল্লাহর ইংগিতেই এই যিম্মাদারী আপনার কাঁধে চাপিয়েছি। এখন এর বিপরীত কোন কথাই আমি শুনতে প্রস্তুত নই'

'ঠিক আছে,আপনার ফয়সালাই আমার জন্য শিরোধার্য'– উমর (রা) অপ্রস্তুত গলায় জবাব দিলেন।

মুসলমানদের জন্য সেই দিনটি ছিলো বড়ই সংকটময়। অন্য দিকে ইরাক ও সিরিয়ায় রোমকদের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ চলছিলো তাতে মুসলমানদের অবস্থান খুব শক্ত ছিলো না। তাদের পশ্চাদপদ অবস্থানই নজরে আসছিলো। আবুবকর (রা) খালেদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা)কে ইরাকের ঘাটি থেকে সিরিয়ার রণাঙ্গনে স্থানান্তরিত করার পরও আশানুরূপ কোন সংবাদ আসছিলো না। খালেদ ইবনুল ওয়ালীদ ইরাক ত্যাগ করার কারণে ইরাকের ঘাটিও দুর্বল হয়ে গিয়েছিলো। এ অবস্থায় খলীফাতুল মুসলিমীন এটা কল্পনাও করতে পারছিলেন না যে, উভয় সীমান্তের কোন স্থান থেকে কিছু সৈন্য অন্যত্র নিয়ে যাবেন বা পিছে হটার নির্দেশ দেবেন।

ঃ 'উমর!'– আবুবকর (রা) বললেন– 'মনে হচ্ছে আজই আমি দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যাবো। তাই যা আমি বলতে যাচ্ছি তা মন দিয়ে শুনুন এবং আমি চলে যাওয়ার পর তা বাস্তবায়ন করুন। আমার যদি আজই ইন্তিকাল হয়ে যায় সূর্যাস্তের পূর্বেই মুসান্না ইবনে হারিসকে ফৌজসহ ইরাক ও সিরিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠিয়ে দেবেন। আর রাত হয়ে গেলে সকালে সর্বপ্রথম মুসান্নাকে ইরাক ও সিরিয়া অভিমুখে পাঠানোই প্রথম কাজ হবে আপনার। সিরিয়া অঞ্চলে খালেদ ইবনুল ওয়ালীদ যদি বিজয় লাভ করে থাকে তবে তাকেও ইরাকে ফিরে যেতে নির্দেশ দেবেন।'

উমর (রা)কে তিনি আরো অনেক জরুরী কথা বললেন। উমর (রা) সব কথাই নীরবে শুনলেন। উমর (রা) এর জন্য সবচেয়ে কঠিন ব্যাপার ছিলো এই যে, একে তো তিনি খেলাফতের মত এত বড় দায়িত্ব সামলাতে যাচ্ছিলেন দ্বিতীয়ত তিনি নিজে এই পদের জন্য লালায়িত ছিলেন না।

সেদিন সন্ধ্যাতেই ইসলামের প্রথম খলীফা আবুবকর (রা) তাঁর প্রভুর সান্নিধ্যে চলে গেলেন।

আবুবকর (রা)কে যখন গোসল দেয়া হলো তখন রাত অনেক গভীর হয়ে গেছে। যে খাটের ওপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বদন মোবারক রেখে মসজিদে নববীতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো সে খাটের ওপরেই আবুবকর (রা) এর লাশ মোবারকও মসজিদে নববীতে নিয়ে যাওয়া হলো। তারপর তাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পাশেই দাফন করা হলো।

সে রাতটি উমর (রা) চিন্তা ও অস্থিরতার হাজারো সুঁচে বিদ্ধ হতে হতে ছটফট করে কাটালেন। যে চিন্তা তাঁকে বারবার ক্ষতবিক্ষত করছিলো তা হলো, সকালে যখন লোকেরা বায়আত হতে আসবে তখন কি সবাই বায়আতে অংশ গ্রহণ করবে?

সকাল হলে উমর (রা) মসজিদে নববীতে গিয়ে হাজির হলেন। দেখলেন বায়আত হওয়ার জন্য লোকেরা প্রচণ্ড ভীড়ের মধ্যে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে। এটা দেখে তাঁর গতরাতের পুঞ্জিভূত সকল পেরেশানী দূর হয়ে গেলো। বায়আতের সময় এধরনের

সম্ভাব্য কোন বিরোধের আশংকা করেননি যে, তিনি খলীফা হতে পারবেন কি পারবেন না? বরং এই আশংকাই তাঁকে পেরেশান করছিলো যে, সম্ভাব্য বিরোধ যদি সর্বত্র বিস্তার করে তবে মুসলমানদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা ও বিভক্তি সৃষ্টি হবে, যা ইসলামের সামগ্রিক অবস্থাকেই কেবল ক্ষতিগ্রস্ত করবে না, বরং ইসলামের স্থায়িত্বই টলমলে হয়ে যাওয়ার সমূহ শংকা জাগবে।

লোকেরা দলে দলে এসে উমর (রা) এর হাতে বায়আত হতে লাগলো। যোহর পর্যন্ত বায়আতের এই ধারাবাহিকতা চললো। যোহরের আযান হলে উমর (রা) নামাযের ইমামতি করলেন। নামাযের পর তিনি সমবেতদের উদ্দেশ্যে মিম্বরের ওপর দাঁড়ালেন। হযরত আবুবকর (রা) মিম্বরের যে সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে খুতবা দিতেন উমর (রা) তার এক সিঁড়ি নিচে দাঁড়ালেন। এটা দেখে উপস্থিত জনগণের দৃষ্টি শ্রদ্ধায় নুয়ে এলো। সেখানে দাঁড়িয়েই প্রথমে আল্লাহর হামদ ও নাত পাঠ করলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর দরূদ পড়লেন; তারপর আবুবকর (রা) এর উচ্ছ্বসিত প্রশংসাবাণী বর্ণনা করলেন এবং তাঁর অনবদ্য কৃতিত্ব ও অসামান্য অবদানের কথা উল্লেখ করলেন। তারপর দীর্ঘ খুতবা শুরু করলেন। সেই খুতবা আজো ইতিহাসের পাতাকে জীবন্ত করে রেখেছে।

"প্রিয় ভাইয়েরা আমার! আমি আপনাদেরই একজন। আপনাদের মতই মানুষ। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রিয় খলীফার হুকুম প্রত্যাখ্যান করার মত দুঃসাহস যদি আমার থাকতো তবে আমি কখনো এ যিম্মাদারী কবুল করতাম না। আমি জানি লোকেরা আমার রুক্ষ স্বভাব নিয়ে ভীত। আমার স্বভাবজাত কঠোরতার জন্য আমি সমালোচিত। কেউ কেউ একথাও বলেন, উমর তখনও আমাদের প্রতি কঠোরতা দেখিয়েছেন যখন আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রশান্ত ছায়ায় আশ্রয় পেয়েছিলাম। তিনি তখনও আমাদের প্রতি শক্ত আচরণ করেছেন যখন আমাদের ও তাঁর মাঝে আবুবকর (রা) এর স্নেহময় আড়াল ছিলো। কিন্তু এখন যখন তাঁর হাতেই আমাদের দায়-দায়িত্ব অর্পিত তখন না জানি আমাদের কি হাল হবে......

'যারা এ ধরনের কথা বলেন তারা সঠিক কথাই বলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দুর্লভ সংস্পর্শ আমার ভাগ্যাহত জীবনকে সৌভাগ্যে পরিণত করেছে। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গোলাম; এক সামান্য নওকর ছিলাম; এই মানব আধারে তাঁর কোন তুলনা ছিলো না। মহান আল্লাহর শাশ্বত বাণীর ঘোষণা মতে মুমিনের জন্য তিনি ছিলেন রহমত আর প্রশান্তির উৎসারিত বারিধারা। তাঁর মহান দরবারে আমার অবস্থান ছিলো একটি নাঙ্গা তলোয়ারের মতই। তিনি যখন চাইতেন তখন তা কোষবদ্ধ করে ফেলতেন, আর যখন চাইতেন একে কোষমুক্ত করতেন। তাঁর সুমহান দরবারে আমি এভাবেই আশ্রয় পেয়েছিলাম– সেদিন পর্যন্ত যেদিন তাঁকে তাঁর মাহবুব স্মরণ করেছিলেন। তিনি তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আমার প্রতি সন্তুষ্ট ও প্রশান্তচিত্ত ছিলেন। মহান আল্লাহর আমি অগণিত শুকরিয়া আদায় করি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তিনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট রেখেছিলেন। আর তা এত বড় সৌভাগ্যের ব্যাপার যার জন্য আমি আজীবন গর্বে উচ্ছ্বসিত থাকবো।

'নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর আবুবকর (রা)-এর উপর খেলাফতের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। তাঁর সহনশীলতা, কোমলতা, সহমর্মিতা ও উদারতার কথা কেউ অস্বীকার করতে পারবে? আমি আবুবকর (রা) এরও খাদেম ও সহযোগী ছিলাম। আমি আমার কঠোরতাকে তাঁর কোমলতার মধ্যে একাকার করে দিতাম। তাঁর জন্য ও আমি এক উন্মুক্ত তরবারি ছিলাম। যা তিনি কখনো কোষবদ্ধ রাখতেন কখনো তীব্র প্রয়োজনে কোষমুক্ত করতেন। আমি এই উপলব্ধি নিয়েই পূর্ণ আনুগত্যে তাঁর সঙ্গে থেকেছি। অবশেষে তিনিও আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। আল্লাহর কাছে আমি অগণিত কৃতজ্ঞতার ভাষা প্রকাশ করছি যে, আবুবকর (রা)ও সবসময় আমার প্রতি সন্তুষ্ট ও প্রশান্তচিত্ত ছিলেন। এটাও আমার জন্য কম গর্বের বিষয় নয়

'আমার প্রিয় ভাইয়েরা! আর এখন, আপনাদের সমস্ত দায়-দায়িত্ব আমার কাঁধে রাখা হয়েছে। আমি আপনাদেরকে আশ্বস্ত করছি, আমার স্বভাবের যে রুক্ষতা নিয়ে আপনারা বিব্রত তা এখন কোমলতায় রূপান্তরিত হয়ে গেছে। তবে এটাও শুনে রাখুন, আমার কঠোরতা তাদের ব্যাপারে অবশ্যই অটুট থাকবে, যারা কোন মানুষের প্রতি জুলুম ও সীমালংঘনমূলক আচরণ করবে। যারা শান্তি, নিরাপত্তা ও নিশ্চিন্ততার জীবন যাপনে প্রয়াসী হবে। ঈমান দীপ্ত জীবনে উৎফুল্ল থাকবে, তাদের প্রতি আমার আচরণ হবে খুবই কোমল-সহমর্মীতাপূর্ণ। কিন্তু কেউ যদি কারো প্রতি জুলুম করে, তবে যে পর্যন্ত তার মুখ মাটিতে চেপে ধরে আমার পা দিয়ে না পিষবো সে পর্যন্ত সে আমার হাত থেকে রেহাই পাবে না। আর এটা এজন্য করবো, যাতে সে সত্য ও ন্যায়ের সামনে তার হাতিয়ার সমর্পণ করে। এই কঠোরতা ও নির্দয়তা সত্ত্বেও যাদেরকে আমি খোদাভীরু ও ন্যায়ের পথে নিষ্ঠাবান পাবো তাদের জন্য আমার মুখমণ্ডল যমীনে লুটিয়ে দেবো......

'ভায়েরা আমার! আমার প্রতি আপনাদের যে হক রয়েছে তা আপনারা আমার কাছ থেকে আদায় করে নেবেন। সেসব হকের কথা আমি তুলে ধরছি ....'

'আমার প্রতি আপনাদের প্রাপ্য হকের একটি হলো, আল্লাহ তাআলা আপনাদের কর ও যুদ্ধের গণীমত হিসেবে যা দান করেন তা সুষ্ঠু বন্টনে আদায় করে নেয়া! অন্যায়ভাবে আমি সেখান থেকে কিছুই নিতে পারবো না। আরেকটি হক হলো, যোগ্যতা অনুসারে আপনাদের বেতন ভাতা বৃদ্ধি করে দেয়া। মুসলিম রাজ্যের সীমান্তগুলো এমনভাবে রক্ষা বুহ্য হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা যাতে শত্রুপক্ষ এ দিকে রুখ করতে না পারে। আমার কাছে যে ব্যক্তিই আসবেন তিনি যেন তার হক আমার কাছ থেকে আদায় করেন। আমার প্রতি আপনাদের আরেকটি প্রাপ্য হক হলো, কাউকে কোন ধ্বংসের পথে ও বিপদগ্রস্ত অবস্থায় না ফেলা এবং রণাঙ্গন থেকে ফিরে আসার সময় কোনরকম বাঁধার সৃষ্টি না করা। আর যখন কেউ যুদ্ধে যাবে তখন আমার জন্য অবশ্য পালনীয় হলো, একজন দায়িত্ববান পিতার মত তার পরিবার পরিজনকে দেখাশুনা করা ----

'আল্লাহর বান্দাগণ! আপনারা আল্লাহর ভয়কে সবসময় নিজেদের মনে লালন করুন। আমার প্রতি মার্জনার দৃষ্টিতে দেখুন। সবরকম সাহায্য সহযোগিতাই আমার

জন্য উন্মুক্ত রাখুন। আপনারা সৎ কর্মের নির্দেশ ও অসৎ কর্ম থেকে বিরত থাকার ক্ষেত্রে নিঃস্বার্থ সঙ্গ আমাকে দেবেন। আপনাদের যে সেবার জন্য মহান আল্লাহ আমাকে মনোনীত করেছেন তা বাস্তবায়নে আমাকে সৎ পরামর্শ দেবেন। আপনাদেরকে যেমন আমি এসব কথা বলছি তেমনি আপনাদের জন্য এবং আমার জন্যও আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।'

সাধারণ লোকদের মধ্যে তাঁর কঠোরতা ও নির্দয়তা নিয়ে যে শংকা ছিলো তা পুরোপুরিই মুছে গেলো। খুতবার পর তিনি মসজিদ থেকে চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু লোকেরা মসজিদের ভেতরে এবং বাইরে দাঁড়িয়ে-বসে তাঁর ভাষণ নিয়ে মন্তব্য করছিলো। সেখানে সবচেয়ে বেশি যে কথাটি শোনা গিয়েছিলো তা ছিলো- এই উমর (রা) এর বাইরের মতো ভেতরটাও তো স্বচ্ছ। তিনি কঠোরতা সত্ত্বেও ইনসাফ ও ন্যায়ের পথকেই পছন্দ করেন।

মূসা তার গোত্র-সরদার আবু সালমা ও তার সঙ্গীদেরকে আবুবকর (রা) এর ওফাত ও উমর (রা) এর খেলাফত লাভের বিস্তারিত ঘটনা শুনাচ্ছিলো। ঘটনার বিবরণ শেষ হলে সবাই আহারপর্বে লিপ্ত হয়ে গেলো।

ঃ 'আচ্ছা এখন বলো মূসা!'-খাওয়া শেষ করে আবু সালমা তাকে জিজ্ঞেস করলো-'তোমরা দু'জনেই তো সেখান থেকে ঘুরে এলে। সেখানে তোমরা নিশ্চয় লোকদের মনোভাব ও প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করেছো!'

ঃ 'হ্যাঁ, আবু সালমা!'-মূসা বললো-'এ ঘটনাটা শোনানো আমার কর্তব্য। এর মধ্যে উমর (রা) এর খুতবাটা আরো অধিক গুরুত্বপূর্ণ। যা তিনি মসজিদে নববীতে দিয়েছিলেন। আমি নিজেও সেখানে ছিলাম।

এ কথা বলে মূসা খুতবার হুবহু চিত্র ও বর্ণনা তুলে ধরল।

ঃ 'তাঁর বিরোধীরা কি পরে কোন প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিলো?'-আবু মূসাকে জিজ্ঞেস করলো-'কিংবা তারা কোন পদক্ষেপ নিয়েছিলো?'

ঃ 'আমি তো এটাও দেখেছি যারা উমর এর খেলাফত লাভের ব্যাপারে দ্বিধান্বিত ছিলো তারাও তাঁর হাতে নিঃসঙ্কোচে বায়আত হয়েছে'-মূসা জবাব দিলো- 'তোমাদেরকে এটা বলা জরুরী মনে করছি যে, উমর এর ব্যক্তিত্বের মধ্যে এমন এক আশ্চর্য তীব্রতা ও সম্ভ্রম বোধের তেজদৃপ্ততা রয়েছে, যার কারণে তাঁর মুখ নিঃসৃত প্রতিটি শব্দ তাঁর দুশমনের অন্তরেও রেখাপাত করে এবং তা সবাই সানন্দে মেনেও নেয় ----'

'রাত পর্যন্ত আমি মানুষের ভীড়ে, বিভিন্ন জটলায় ঘুরে বেড়িয়েছি এবং আমার চিন্তা চেতনা মানুষের মধ্যে এভাবে ছড়িয়ে দিয়েছি। কারো সঙ্গে আমি উমর এর পক্ষে কথা বললাম আবার কারো সঙ্গে তার বিরুদ্ধে কথা বললাম। এতে আমি লক্ষ্য করলাম, যারা তাঁর বিরোধী ছিলো এখন যদি তারা বিরোধীতা পোষণ করেও থাকে, তবু তাঁর হাতে বায়আত করে নিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ের গভীর থেকেও তাঁকে খলীফা বলে মেনে

নিয়েছে। এখন একটাই মাত্র পথ খোলা আছে যা থেকে আমরা ফায়দা লুটতে পারবো। সেটা হলো, ইরাক ও সিরিয়ায় যুদ্ধরত মুসলিম ফৌজ দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং মদীনার কিছু যোদ্ধা আছে যারা পারস্যদের সঙ্গে যুদ্ধে নামতে ভয় পায়।'

ঃ 'হ্যাঁ, এটাই ঠিক'—আবু দাউদ সমর্থন করে বললো—'মুসলমানদের যুদ্ধক্ষেত্রের এ অবস্থা থেকে অবশ্যই ফায়দা উঠাতে পারি আমরা। মদীনা ও এর আশে পাশের এলাকায় পারস্যদের ভয় ঢুকিয়ে তাদেরকে ভীত করে তুলতে হবে। এতে লোকেরা কমপক্ষে যুদ্ধে যেতে দ্বিধা করবে এবং যুদ্ধ এড়িয়ে চলবে'

'তোমরা তো এই সুবিধার কথাটা জানো, মুসলমানদের নিয়মিত কোন ফৌজ নেই। আর না তাদের বেতনভুক্ত কোন সৈন্যবাহিনী আছে। জিহাদের ঘোষণা করা হয় আর মুসলমানরা দলে দলে জিহাদকে পবিত্র কর্ম মনে করে সবাই একতাবদ্ধ হয়। আর তাদের সালাররা অভিজ্ঞতায় পরীক্ষিত ও বিচক্ষণতায় অতুলনীয় হওয়ার কারণে নিমিষেই আগত মুজাহিদ দলকে নিয়মিত সৈন্য দলের মত সুশৃংখল সৈন্যদলে রূপান্তরিত করেন এবং যুদ্ধের ময়দানে তাদেরকে এমনভাবে লড়াইয়ে উদ্বুদ্ধ করেন যে, জয় তাদের পদতলে এসে লুটিয়ে পড়ে। আমরা কি তাদেরকে জিহাদ থেকে ফিরিয়ে রাখতে পারবো?'

ঃ 'অসম্ভব'—এক খ্রিস্টান বলে উঠলো— 'জিহাদকে তারা ধর্মীয় ফরয কর্ম বলে বিশ্বাস করে।'

ঃ 'আমাদের অসম্ভবকেই সম্ভব করে তুলতে হবে'—আবু সালমা বললো—'আমি প্রথমেই বলেছি এবং বারংবার বলেছি, খুব কম কাজই সহজসাধ্য। তাকে নিরন্তর সাধনায় নিরবচ্ছিন্ন একাগ্রতায় সহজসাধ্য ও অনায়াসলব্ধ করা হয়। যেমন আমরা মুসলমানদের সাথে প্রত্যক্ষ যুদ্ধে জড়ানোর মত বোকামি করি না। তবে আমরা এমন এক তরবারির সূক্ষ্মতায় তাদের লালিত বিশ্বাসের আবরণকে কেটে কুচি কুচি করি, যা কখনো সাধারণের চোখে ধরা পড়ে না। পরোক্ষ ও পর্দার অন্তরালেই রয়ে যায়।'

আবু সালমা ইবনে দাউদকে জিজ্ঞেস করলো, 'বিনতে ইয়ামীনকে হাবীব কবে মদীনায় নিয়ে যাচ্ছে?'

ঃ 'কাল বা পরশু।'

ঃ 'তুমি কাল সকালেই রওয়ানা হয়ে যাও'—'মদীনায় পৌছে তাদের দু'জনের অপেক্ষায় থাকো। তারা পৌছে গেলে তাদের সঙ্গেই লেগে থেকো। হাবীবও তো উমরের হাতে বায়আত করবে। তখন তুমিও তার সঙ্গে থেকো। এরপর কি করতে হবে না করতে হবে তা তো জানাই আছে তোমার। আর তোমার সাথে তো আমাদের যোগাযোগ থাকবেই।'

*"কালনাগের প্রতি তবুও তুমি নির্ভর করতে পারো।
এক পাশে সরে গিয়ে তুমি তাকে পথ করে দিলে সে
তোমার পাশ দিয়ে চলে যাবে। কিন্তু কোন ইহুদী নারীর
প্রতি কখনো নির্ভর করো না। যখনই সে টের পাবে
তুমি মুসলমান, পলকেই তোমাকে দংশন করবে।"*

নববধূ বিনতে ইয়ামীনকে সঙ্গে নিয়ে হাবীব ইবনে কা'ব মদীনায় পৌঁছলো। মদীনায় তার নিজস্ব বাড়ি ছিলো। তার বাড়ি দেখেই বুঝা গেলো সে বেশ অবস্থা সম্পন্ন। নিজ বাড়িতে পৌঁছে সেখানে সে ইবনে দাউদকে দেখতে পেলো।

ঃ 'ইবনে কা'ব! আমি তোমাদের এখানে খুব বেশি দিন থাকবো না'– ইবনে দাউদ কুশল বিনিময়ের পর হাবীবকে বললো–'আমি আমার মেয়েটাকে দেখতে এসেছি। আমার মত অসহায় দরিদ্রের প্রতি তুমি যে অনুগ্রহ দেখিয়েছো সারা জীবনেও তা আমি ভুলবো না। আর আমি এর প্রতিদান দেয়ারও যোগ্য নই।'

ঃ 'আরে সে কি কথা! আমি যদি তোমার প্রতি কোন অনুগ্রহ করে থাকি তবে তো কোন প্রতিদানের আশায় আমি তা করিনি'–হাবীব বললো–'তুমি তো প্রতিদান দিয়ে দিয়েছো। বিনতে ইয়ামীনের চেয়ে অধিক মূল্য ও প্রতিদান আর কি হতে পারে? আর আমি আশা করবো সে আমার সাথে ওফাদারীই করবে।'

ঃ 'আমার বাবা তার কন্যাকে আপনার কাছে সোর্পদ করেছেন' পাশে বসা বিনতে ইয়ামীন হাবীবকে বললো– 'আর আমি আমার শরীরের সঙ্গে আমার মনকেও আপনার কাছে সোপর্দ করে দিয়েছি। আমার ওফাদারী ও কৃতজ্ঞতা কেবল ঘরের চার দেয়ালের ভেতরেই আপনি পরীক্ষা করতে পারবেন না। আপনি যখন জিহাদে যাবেন তখন আমিও আপনার সাথে জিহাদের ময়দানে শরীক হবো। যুদ্ধের ময়দানে আমার ওফাদারী আপনি দেখতে পাবেন।'

হাবীব ইবনে কা'ব এ কথায় হেসে উঠলো। সে হাসিতে ভালবাসার ছন্দোবদ্ধ দোলা ছিলো।

ঃ 'তার একথা হাসিতে উড়িয়ে দিয়ো না ইবনে কা'ব!'–ইবনে দাউদ বললো–'জিহাদে শরীক হওয়ার তার বড়ই খাহেশ। মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালের কয়েক মাস পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছিলাম। এজন্য আমার গোত্রের সবাই আমার শত্রুতে পরিণত হয়েছিলো। পুরো ঘটনা আমি তোমার কাছে খুলে বলিনি। আমার এই মেয়েটাই কেবল আমার সঙ্গ দিয়েছিলো। আমার ছেলেও আমার দুশমনে পরিণত হয়ে গিয়েছিলো। আমার স্ত্রীও আমাকে ত্যাগ করে চলে গিয়েছিলো। গোত্রের লোকেরা আমাকে অনেক মার পিট করেছে। তাই আমি মেয়েটিকে সাথে নিয়ে আমার সেই বন্ধুর কাছে চলে গিয়েছিলাম। যে আমাকে তোমার কাছে পাঠিয়ে ছিলো। সেও একজন ইহুদী। কিন্তু সে আমার সাথে বন্ধুর মতই আচরণ করেছে। সে বলেছিলো, যার যার ধর্ম তার তার কাছে। ধর্ম বন্ধুত্ব ও ভালবাসার পথে প্রতিবন্ধক হতে পারবে না......

'আমার বিনতে ইয়ামীন– বেটি আমার মনে মনে তো আমার আগেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখার জন্য তার বড় ইচ্ছা ছিলো। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যিয়ারতের উদ্দেশে তাকে আমি কয়েক বারই মদীনায় নিয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু সে বলতো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতের জন্য আমাকে এখানেই থেকে যেতে দাও। ইবনে কা'ব! তুমি তো জানো আমার বেটির এই খাহেশ পূরণ করা তার (স) পক্ষে সম্ভব ছিলো না। কারণ তিনি কারো খেদমত কবুল করতেন না। আমি তাকে বললাম, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সবচেয়ে বড় খেদমত হলো, তাঁর বাতলানো পথে নিজেকে পরিচালিত করা------'

ঃ 'ইবনে কা'ব! আহা! তোমাকে কি বলবো! আমার বেটির আর কোন গুণের কথা তোমাকে বলবো? তাকে বললাম, স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পথে চলো। সে বললো– 'তবে আমাকে ঘোড়-সওয়ার বানিয়ে দাও। বর্শা নিক্ষেপ, তীর চালনা, তরবারি ও নেযাবাজী, তিরন্দাজী ইত্যাদি সব আমাকে শিখিয়ে দাও। আল্লাহর রাসূলের বাতলানো উত্তম পথ জিহাদও। কুফরকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার জন্য আমি লড়াই করবো। আমি বিয়ে শাদীর পরিবর্তে আমার জীবনকে জিহাদী যিন্দেগীতে রূপান্তরিত করবো। এজন্যই আমার জীবনকে উৎসর্গ করে দেবো। আমি আমার বন্ধুর বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলাম। তাকে আমি কি করে শাহ সওয়ারী বানাবো?'

ঃ 'এসব আমিই শিখিয়ে দেবো খন!'–হাবীব বললো–'আর ইবনে দাউদ! নিজেকে নিজে তুমি অপারগ ও অন্যের প্রতি মুখাপেক্ষী হওয়ার ভাবনা ছেড়ে দাও। আমিই তোমার রোজগারের বন্দোবস্ত করে দেবো।'

ঃ 'ইবনে কা'ব! সত্যিই তুমি আল্লাহর নেক বান্দাদের একজন।' ইবনে দাউদ বিগলিত হয়ে বললো। 'কিন্তু আমার ইহুদী বন্ধু আমার জন্য রোজগার পাতির ব্যবস্থা করে রেখেছে। এখন আমি তার ওপরেও বোঝা হবো না তোমার ওপরও বোঝা হবো না। এখন আমি আমার খোয়া যাওয়া অবস্থান উদ্ধার করতে পারবো।'

ঃ 'ইবনে দাউদ! আমি একটি কথা বলছি'–হাবীব বললো– 'একজন ইহুদীর কাছ থেকে কোন অনুগ্রহ যদি তুমি না নিতে তবে কতই না ভাল হতো! কোন কোন ইহুদী লোক হিসেবে খুবই ভাল মানুষ হতে পারে। কিন্তু কোন মুসলমানের জন্য সে ভাল বন্ধু হতে পারে না। মোটকথা একজন ইহুদী একজন মুসলমানের কখনো বন্ধু হতে পারে না।'

ঃ 'ইবনে কা'ব! এমন কথা বলো না'–ইবনে দাউদ বললো–'যে ইসলামের জন্য নিজের গোত্র, নিজের ঘর, স্ত্রী চার চারটি ছেলে ত্যাগ করতে পেরেছে সে তো একজন ইহুদীর বন্ধুত্ব খুব সহজেই কুরবান করতে পারে। তুমি কি মনে করো, আমি ইহুদীদের স্বভাব ও মানসিকতা সম্পর্কে জ্ঞাত নই? আমি যেখানেই দেখবো, কোন ইহুদীর হাত ইসলামের ক্ষতির জন্য প্রসারিত তখনই আমার ইহুদী বন্ধুর সকল অনুগ্রহ ভুলে গিয়ে ইসলামকে তার হাত থেকে বাঁচাবো।'

ঃ 'ইবনে দাউদ! সম্ভবত তুমি জানো না'–হাবীব বললো– 'ইহুদীরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যারও চেষ্টা করেছে। আর এ চেষ্টাও তখন করেছে যখন তিনি ইহুদীদের সাথে চুক্তি করে তাদেরকে মদীনাতেই রাখার ফয়সালা করেছিলেন। তুমি যেহেতু ইসলাম গ্রহণ করেছো, তাই আমি চাই ইহুদীদের সম্পর্কে তোমাকে ভাল করে জানিয়ে রাখতে যে, তারা ইসলামের কত ভয়াবহ শত্রু।'

ঃ 'আমি তো তা অবশ্যই শুনতে চাই'– ইবনে দাউদ বললো–'আমি মদীনা থেকে অনেক দূরে থাকি। অনেক কিছুই আমার অজানা রয়েছে।'

ঃ 'ইহুদীদের কয়েকটি গোত্র মদীনায় বসবাস করতো'–হাবীব বলতে শুরু করলো–

—'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটা জানতেন যে, ইহুদীরা ফেতনাবাজ জাতি এবং মুসলমানদের নিকৃষ্টতম শত্রু। তাই তিনি উভয়ের মধ্যে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় থাকবে এ মর্মে তাদের সাথে চুক্তি করলেন এবং বন্ধুর মতই তাদের সাথে আচরণ করে গেলেন। কিন্তু বদরের যুদ্ধের পর তারা চুক্তি ভেঙে ফেললো। তখন মদীনায় বিশেষ করে মদীনার আশ পাশের শহরতলীগুলোতে ইহুদীদের একচেটিয়া ব্যবসা ছিলো এবং তাদের আবাদীও অনেক বেশি ছিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ চুক্তিও তাদের সাথে করেছিলেন যে, মদীনায় কোন শত্রুদল হামলা করলে ইহুদীরা মুসলমানদেরকে মিত্র হিসেবে সাহায্য করবে, শত্রুদলকে সাহায্য করবে না। এর বিনিময়ে মুসলমানরা ইহুদীদের নিরাপত্তার প্রতি পূর্ণদৃষ্টি রাখবে এবং তাদের সাথে সহযোগিতামূলক আচরণ করবে ----'

'এর পর কি হলো জানো ইবনে দাউদ? ইহুদীরা গোপনে গোপনে কুরাইশদের সাথে সম্পর্ক ও নিয়মিত যোগাযোগ রাখলো। তাদের একথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কানে পৌঁছলো যে, 'এরা-কুরাইশরা তো লড়তেই জানে না। মুসলমানরা যদি আমাদের সাথে লড়তো তবে দেখিয়ে দিতাম কিভাবে লড়াই করতে হয়।' এর সঙ্গে সঙ্গেই ইহুদীরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে নিলো। দ্বিতীয় হিজরীর শাওয়াল মাসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেখলেন, ইহুদীরা সন্ধির চুক্তি ভেঙে ফেলেছে। তিনি তখন তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে তাদেরকে মদীনা থেকে বের করে দিলেন। ইহুদীদের এই গোত্রটির নাম ছিলো বনী কায়নুকা......'

'বনী নাযীর ছিলো ইহুদীদের আরেক গোত্র। তারা যেহেতু চুক্তির বিপরীত তেমন কাজ করেনি তাই তাদেরকে মদীনাতেই থাকতে দেয়া হলো। দু'বছর পর চতুর্থ হিজরীতেই তাদের কু-চরিত্রের মুখোশও উন্মোচিত হলো। কোন এক ব্যাপারে তাদের সাথে আলাপ আলোচনার জন্য হযরত আবুবকর ও উমর (রা) কে সঙ্গে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের গোত্র সরদারদের ওখানে রওয়ানা হলেন। পথ আর সামান্যই বাকী ছিলো। কেউ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অগ্রসর হতে বাঁধা দিয়ে কোন এক বাড়ির ছাদের দিকে ইংগিত করলো......'

'বাড়িটি এক ইহুদীর ছিলো। এর ছাদের ওপর আমর ইবনে হজাল নামক এক ইহুদী লুকিয়ে ছিলো। তার কাছে ভারী একটি পাথর দেখা গেলো। আগ থেকেই ইহুদীরা তাকে এখানে বসিয়ে রেখেছিলো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে পৌঁছলেই যেন তাঁর মাথায় পাথরটি ছুড়ে দেয়া হয়। আল্লাহর অসীম মেহেরবানীতে তিনি যখন এই ষড়যন্ত্র সম্পর্কে জানতে পারলেন তখনই তিনি সেখান থেকে ফিরে আসলেন। আর ইহুদীদের কাছে পয়গাম পাঠালেন তারা যেন মদীনা ছেড়ে চলে যায়। বনী নাযীর এর ধারও ধারলো না। তারা লড়াইয়ের প্রস্তুতি শুরু করে দিলো। এ অবস্থাতেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হুকুমে তাদেরকে পাকড়াও করা হলো এবং তাদেরকে মদীনা থেকে বের করে দেয়া হলো।'

—'এদের মধ্যে কিছু সিরিয়ায় চলে গেলো। আর অধিকাংশই খায়বারে গিয়ে বসতি স্থাপন করলো। তুমি তাদের সরদারদের নাম শুনে থাকবে। সাল্লাম ইবনে আবুল হুকায়েক, কিনানা ইবনুর রবী এবং হায় ইবনে আখতাব প্রসিদ্ধ সরদার ছিলো। খায়বারে গিয়ে তারা প্রতিশোধ নেয়ার জন্য প্রস্তুতি নিতে লাগলো। ইহুদীরা ষড়যন্ত্র পাকানোতে খুবই উস্তাদ। তারা মক্কায় গিয়ে কুরাইশদের বিভিন্ন গোত্রকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উস্কে দিতে লাগলো। অন্যান্য এলাকায় গিয়ে লোকদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে এভাবে ভীত করে তুললো যে, মদীনার মধ্যেই যদি মুসলমানদেরকে বিনাশ করা না হয় তবে আর কেউ টিকে থাকতে পারবে না, ধ্বংস হয়ে যাবে........'

'ইবনে দাউদ! তুমি হয়তো জানো; ইহুদীদের দিল দেমাগে চিন্তা চেতনায় কূট ষড়যন্ত্র ছাড়া অন্য কোন কিছুই ঠাঁই পায় না। তারা এমন অন্তরস্পর্শী ভাষায় লোকদেরকে বুঝিয়ে এমনভাবে ক্ষেপিয়ে তুলে যে, প্রত্যেকেই তাদের কথা শুনে নিজেদেরই অন্তরের গোমরানো আওয়াজ বলে মনে করে। কুরাইশ ও অন্যান্য কবীলার সামনে তাদের উদাহরণ পেশ করে বলে থাকে, ইহুদীরা বংশ পরম্পরায় যুগ যুগ ধরে মদীনায় বসবাস করে আসছিলো। অথচ তোমরা কি দেখলে? মুসলমানরা আমাদেরকে ঘর থেকে ঘরহীন এবং দেশ থেকে দেশান্তরিত করে ছাড়লো। এখন মদীনায় যে কয়জন ইহুদী রয়ে গিয়েছে তারা তো মুসলমানদের গোলামী কবুল করে নিয়েছে।'

ঃ 'হ্যাঁ, ইবনে কা'ব!'–নিরীহ কণ্ঠে ইবনে দাউদ বললো– 'ইহুদীদের ঘৃণ্য চরিত্র ও ইসলামের শত্রুতা সম্পর্কে কিছু কিছু জানি। কিন্তু তুমি যা শোনালে তা তো আমি জানতাম না। আমাকে আরো খুলে বলো। আমার উঠা বসা তো প্রায়ই ইহুদীদের সাথেই হয়ে থাকে। অথচ তাদের প্রতিটি কথাই আমি সত্য বলে মনে করি।'

ঃ 'তুমি কি সবটাই শুনতে চাও?'–হাবীব জিজ্ঞেস করলো– 'ক্লান্ত হয়ে যাবে না তো?'

'না ইবনে কা'ব!' ইবনে দাউদ বললো–'আমি সবই শুনতে চাই।'

'এসব কথা বাবার চেয়ে আমারই শোনার আগ্রহ ছিলো আরো বেশি'–বিনতে ইয়ামীন বললো– 'আমি যখন ইসলামের কোন দুশমনের কথা শুনি তখন আমার শরীরে যেন আগুন ধরে যায়। আমার মতে এদের প্রত্যেকটাকে কতল করে ফেলা দরকার এজন্যই ইহুদীদের প্রতি আমার এত ঘৃণা!'

ঃ 'তোমরা উভয়ে শুনতে চাও বা না চাও'–হাবীব বললো–'আমার মন আজ এমন তাতিয়ে উঠেছে যে, শুধু এসবই আমার বলে যেতে ইচ্ছে করছে। এসব তো খুব বেশি দিন আগের কথা নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিদায়ের পর দু'বছরের কিছু বেশি সময় অতিবাহিত হয়েছিলো। কিন্তু তাঁর বরকতময় পদচারণা যেন আমার চোখের সামনেই ঘটছিলো। যুদ্ধের ময়দানে যেন তাঁর গর্জন শোনা যেতো। মুজাহিদদেরকে যেন তিনি নেতৃত্ব দিতেন। সালারদেরকে যেন আবেগদীপ্ত কণ্ঠে হিদায়েত দিতেন। তাঁর নেতৃত্বে আমি খন্দক যুদ্ধে শরীক ছিলাম। তোমরা মদীনার দূরের অধিবাসী। তোমরা হয়তো শুনেছো, কুরাইশরা দশ হাজার ফৌজ জমা করে মদীনায় চড়াও হয়েছিলো। পঞ্চম হিজরীর ঘটনা এটি। মনে হয় গতকালের কথা। অথচ ছয় সাত বছর চলে গেলো।'

ঃ 'আমার স্মরণে আছে'–ইবনে দাউদ বললো– 'কিছু দিন পর এখবর আমাদের গ্রামেও পৌছে গিয়েছিলো। কুরাইশরা ব্যর্থ হয়ে ফিরে গিয়েছিলো।'

ঃ 'তাদের ব্যর্থতার কারণ ছিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হুকুমে মদীনার আশপাশে পরিখা খনন করা হয়েছিলো'–হাবীব বললো–'তোমাকে বলছিলাম, ইহুদীরা মদীনা থেকে বহিস্কৃত হওয়ার পর তারা কুরাইশ গোত্রগুলোসহ অন্যান্য গোত্রগুলোকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে এমনভাবে উস্কিয়ে তুলে যে, আবু সুফিয়ান দশ হাজার সৈন্য সমাবেশ করে মদীনার ওপর চড়াও হয়। কিন্তু পরিখাগুলো তাদেরকে আর অগ্রসর হতে দেয়নি -----'

'দুশমনরা পুরো একমাস মদীনা অবরোধ করে রাখে। তারা খন্দক (পরিখা) ডিঙ্গাতে অনেক চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুকুম দেন, রাতে খন্দকের পাশে পাহারা বসাতে হবে। মদীনা সীমান্তের একদিকের সামান্য অংশে খন্দক ছিলো না। আমি সেদিকেই ছিলাম। দুশমনরা সে প্রান্ত দিয়েই হামলা করার চেষ্টা করেছিলো। সেদিকে সামান্য লড়াইও হয়েছিলো। লড়াইয়ে আমিও ছিলাম। আরবের বিখ্যাত বাহাদুর আমর বিন আবদুদ্দারের নাম তো তোমরা শুনেছো.......'

'বাস্তবেই সে বড় বাহাদুর ছিলো। এ যুদ্ধেই সে আলী (রা) এর হাতে নিহত হয়। সে দাবী করেছিলো। মদীনার মধ্যেই সে ইসলামকে ধ্বংস করে দেবে। কিন্তু নিজেই সে শেষ হয়ে গেলো। আমার মনতো চাচ্ছে, তখনকার প্রতিটি কথাই তোমাদেরকে বলি। কিন্তু আমি তোমাদেরকে ইহুদীদের ভয়ানক ষড়যন্ত্রের কথাই বলে যাচ্ছিলাম........'

'বলছিলাম মদীনার এক দিকে খন্দক ছিলো না। এজন্য সেদিক থেকেই হামলার আশংকা ছিলো। তীরান্দাজ হিসাবে আমরা সেখানে সবসময়ই প্রস্তুত থাকতাম। মদীনায় একটি বড় বাড়ি ছিলো। প্রায় দুর্গের মত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালামের হুকুমে আমাদের শিশু ও নারীদেরকে সেখানে পুনর্বাসন করা হয়েছিলো। তাদের হেফাজতের জন্য এ ব্যবস্থা করা হয়েছিলো। এক রাতে এক লোককে সে বাড়ির পাশ দিয়ে সন্দেহজনকভাবে নিঃশব্দভাবে চলাফেরা করতে দেখা গেলো। তার হাতে একটি

বর্শা ছিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফুফু সুফিয়া (রা) ব্যাপারটা জানতে পেরে মজবুত একটি লাঠি নিয়ে তার ওপর পেছন থেকে হামলা করলেন। এবং লাঠি দিয়ে মাথায় প্রচণ্ড আঘাত করতে করতে তাকে শেষ করে দিলেন।'

ঃ 'সে কে ছিলো?'– বিনতে ইয়ামীন জিজ্ঞেস করলো।'

ঃ 'সে এক ইহুদী ছিলো'– হাবীব বললো– 'বনী কুরাইযার লোক। এমনিতে ধারণা করা হয়েছিলো, তার উদ্দেশ্য ছিলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যা করা। কিন্তু কিছু দিন পর এক ইহুদী তা ফাঁস করে দেয় যে, অত্যন্ত ভয়াবহ এক ষড়যন্ত্র সফল করার জন্য সে সেখানে গিয়েছিলো। লোকটি সেসব ইহুদীদের একজন ছিলো যাদেরকে মদীনা থেকে তখনো বহিষ্কার করা হয়নি। কারণ তারা মুসলমানদের গোলামী মেনে নিয়েছিলো। আর মুসলমানরাও তাদেরকে বিশ্বাস করতে শুরু করেছিলো ----'

'ইহুদীদের ষড়যন্ত্রটি ছিলো এরকম যে, আমাদের নারী ও শিশুদেরকে যে বাড়িটিতে হেফাজতে রাখা হয়েছিলো, ইহুদী লোকটি সেখানে গিয়ে বর্শা দ্বারা আক্রমণ করবে। এতে নারী ও শিশুরা চিৎকার ও চেচামেচি করে উঠবে। তখন স্বাভাবিকভাবেই আমাদের সেখানে যেতে হবে। আর আমরা স্ব-স্ব স্থান ছেড়ে চলে গেলে রাস্তা পরিষ্কার দেখে কুরাইশ ও অন্যান্যরা মুসলমানদের ওপর হামলা করে বসবে। কিন্তু তাদের তরুপের তাস সেই ইহুদীটিই ধরা পড়ে মারা পড়ল এবং দুশমনদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়ে গেলো। আর তাদের সম্মিলিত বাহিনী হতাশ হয়ে চলে গেলো.......'

'কুরাইশ ও তাদের মিত্র গোত্রগুলো তো হার স্বীকার করে নিলো। কিন্তু ইহুদীরা শয়তানের অন্যতম প্রতীক। শয়তানী কর্মকাণ্ডের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক। শয়তানের চরিত্র হলো, কোন শয়তানী কাজেই হার স্বীকার না করা। ইহুদীরা হার স্বীকার করলো না। মন্দ ও পশুত্বকে তারা কখনো মন থেকে দূর করে দেয় না। মন্দ ও নিকৃষ্টতাই তাদের লালন পালনের বিষয়। ইহুদীদের তিন নেতা সাল্লাম ইবনে আবুল হুকায়েক, কিনানা ইবনুর রবী; হায় বিন আখতাব পূর্বেই মদীনা থেকে যারা নির্বাসিত হয়ে খায়বার চলে গিয়েছিলো। এরা তিনজন একত্রিত হয়ে আরবের এক প্রভাবশালী গোত্র বনু সাদকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তুললো। তারা এমন পথ অবলম্বন করলো, বনু সা'দের লোকেরা তাদের ফাঁদে পা দিল এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার জান্য তৈরী হয়ে গেলো ----'

'খন্দক যুদ্ধের এক বছর পরের ঘটনা, খায়বার থেকে মদীনায় আগত এক ব্যবসায়ী বনু সা'দের হামলার প্রস্তুতি ও তৎপরতার সংবাদ জানালো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত এ সংবাদ গিয়ে পৌঁছলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রীতি ছিলো, তোমার বিরুদ্ধে কেউ প্রস্তুতি নিচ্ছে এ সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের প্রস্তুতি অবস্থাতেই তাদের ওপর চড়াও হও। ঘরে বসে বসে তাদের জন্য অপেক্ষা করা যাবে না। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আলী (রা)কে বনু সা'দের ওপর হামলার জন্য প্রেরণ করলেন। বনু সা'দ এভাবে হামলায়

আক্রান্ত হবে আশা করেনি। হযরত আলী (রা) এর সঙ্গে খুব বেশি সৈন্য ছিলো না। কিন্তু বনু সাদের ওপর এই হামলা এত আচানক ছিলো যে, তাদের পলায়ন ছাড়া আর কোন কিছু করার ছিলো না। আলী (রা) যখন মুজাহিদীনদের নিয়ে মদীনায় ফিরে এলেন তখন তাঁদের সাথে ছিলো বনু সা'দের পাঁচশ উট।'

ঃ 'তুমিও কি হযরত আলী (রা) এর সাথে ছিলে?'-ইবনে দাউদ জিজ্ঞেস করলো।

ঃ 'না', হাবীব ইবনে কা'ব বললো- 'আমি অন্য সৈন্যদলের সাথে গিয়েছিলাম। আর এটাই ছিলো খায়বারের আসল লড়াই। এই লড়াইয়ের সব কথা আমি তোমাদেরকে শোনাবো না। ইসলামের বিরুদ্ধে ইহুদীদের মজ্জাগত শত্রুতা সম্পর্কেই আমি তোমাদেরকে সতর্ক করছি। বিনতে ইয়ামীন! তুমি কি কাল নাগের ওপর এ বিশ্বাস বা নির্ভর করতে পারবে যে, সে তোমাকে দংশন করবে না?'

ঃ 'না!'

'কালনাগের প্রতি তবুও তুমি নির্ভর করতে পারো। এক পাশে সরে গিয়ে তুমি তাকে পথ করে দিলে সে তোমার পাশ দিয়ে চলে যাবে। কিন্তু কোন ইহুদী নারী বা পুরুষের প্রতিই কখনো নির্ভর করো না। যখনই সে টের পাবে তুমি মুসলমান, পলকেই তোমাকে সে দংশন করবে ---। বনু সা'দকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তাদের ওপর হামলার জন্য প্রস্তুত করার পরও যখন ব্যর্থ হলো তখন অন্য আরেক গোত্রকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উস্কাতে শুরু করলো। এটা ছিলো কবীলায়ে গাতফান। বনু সা'দ থেকেও যারা অধিক শক্তিশালী ছিলো। তারা মদীনায় হামলার প্রস্তুতি নিতে শুরু করলো। খুব দ্রুতই মদীনায় এ সংবাদ পৌঁছে গেলো ----'

'এখবর শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই খায়বারের উদ্দেশে রওয়ানা করলেন। হিজরীর সপ্তম বছর শুরু হয়ে গিয়েছিলো। মাত্র চৌদ্দশ ফৌজ নিয়ে তিনি রওয়ানা হয়েছিলেন। আমিও এ ফৌজে ছিলাম। আমাদের সাথে কেবল দু'শ ঘোড়সওয়ার ছিলো। ইহুদীরা অল্প সময়ের মধ্যেই দুর্গ তৈরী করে নিয়েছিলো। সেগুলোর নামও আমার কিছু কিছু মনে আছে। নায়িম, কামূছ, ছুউব, ওয়াতীহ, সালালিম----- ইত্যাদি। এর মধ্যে ওয়াতীহ ও সালালিম উভয়টাই খুব শক্ত দুর্গ ছিলো। অন্যগুলো আমরা জয় করে নিয়েছিলাম। কিন্তু ঐ দুই কেল্লা জয় করাটা মুশকিলের ব্যাপার ছিলো। তোমরা আরেক বাহাদুরের নাম মনে হয় শোননি। আমর বিন আবদুদ্দারের মতই সে বীরদর্পী ছিলো। তার নাম ছিলো মারহাব। এই দুর্গ দুটি তারই ছিলো।'

ঃ 'না'-ইবনে দাউদ জবাব দিল-'তার নাম আমরা কখনো শুনিনি। তার বীরত্বের কথা আমাদের কিছু শোনাও। তোমার কথা শুনতে আমাদের বেশ লাগছে।'

ঃ 'হ্যাঁ, আমি তো বলেই যাচ্ছি'- হাবীব বললো-'দিন হোক রাত হোক এসব আজ আমি তোমাদেরকে শুনিয়েই যাবো। যা হোক, তারপর, কি হলো শোন! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আবুবকর (রা)কে সিপাহ-সালার নির্ধারণ করে কেল্লা দুটি জয় করার জন্য পাঠালেন। তাঁর ফৌজে আমিও ছিলাম। ফৌজ আর কি!

চৌদ্দশ পদাতিক বাহিনী আর দু'শ ঘোড়-সওয়ার। এর মধ্যে কিছু আহত হয়ে তাঁবুতে ঢুকছিলো। আর কিছু শাহাদতও বরণ করে ছিলো। গাতফানের লোকেরা কেল্লার বাইরে এসে এমন শক্ত হামলা করে বসল যে, আমরা দাঁড়াতে পারলাম না। সিপাহ সালার আবুবকর (রা) ফৌজকে পিছু হঁটার নির্দেশ দিলেন.......'

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরে হযরত উমর (রা)কে আমাদের সালার নিযুক্ত করে ইসলামী ঝান্ডা তাঁর হাতে সোপর্দ করলেন। উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) আমাদেরকে পুরো দুদিন লড়াইয়ে মশগুল রাখলেন। কিন্তু বনী গাতফানের লোকদের বীরত্বের প্রশংসা না করার কৃপণতা দেখাতে পারবো না, তারা আমাদের জমে দাঁড়াতে দিল না। উমর (রা) অসফল হয়ে ফিরে আসলেন।'

ঃ 'তাহলে তো তারা যথেষ্টই বাহাদুর ছিলো'–ইবনে দাউদ বললো–'যারা মুসলমানদেরকে পিছু হটতে বাধ্য করতে পারে তাদেরকে নিশ্চয় নির্ভীক বীর বাহাদূর বলা যায়।'

ঃ তারা তো বাহাদুর ছিলোই আমরাও সংখ্যায় কিছু কম ছিলাম–হাবীব ইবনে কা'ব বললো–'আগের লড়াইগুলোর কারণেও আমরা বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। তাদের মূল শক্তি ছিলো মারহাব। সে তাদের বীরত্ব ও ত্যাগের প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত বনে গিয়ে ছিলো। আমাদের সালাররা বলতেন, মারহাবকে হত্যা করা গেলে দু'টি কেল্লাই আমাদের হাতে চলে আসবে......'

'হযরত আবুবকর ও উমর (রা) এর মতো বিখ্যাত বীর সাহাবীরা যখন ব্যর্থ হয়ে গেলেন তখন অন্য সকল সাহাবীরা তরবারির তীক্ষ্ণফলার জ্বলজ্বলতা প্রদর্শন করতে করতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে হাজির হলেন। মুচকি হাসির দীপ্তি কেয়ামত পর্যন্ত আমার মনে থাকবে, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওষ্ঠদ্বয়ে ছন্দায়িত হচ্ছিল। তাঁদের প্রত্যেকেই সিপাহ-সালার হওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর মোবারক হস্তে ঝান্ডা উত্তোলন করলেন এবং আলী (রা) এর হাতে রাখলেন ----'

'উমর (রা) সে সময় বলেছিলেন, 'আমি ঝান্ডা ধারণ ও সালারী করার আকাঙ্ক্ষা কখনো পোষণ করিনি। আল্লাহ তাআলা আলী (রা) এর ভাগ্যেই এর অহংকার লিখে রেখেছিলেন-------।' আলী (রা) কেল্লার বাইরে থেকে 'মারহাব' বলে চিৎকার করে ডাকলেন। মারহাব তখন সুখ ধারণায় আচ্ছন্ন ছিলো। সে ভাবছিলো আগের মতই সে মুসলমানদেরকে এক নিমিষেই পিছু হটতে বাধ্য করবে। নিজের প্রতি এই আস্থা তার জন্য কাল হয়ে দাঁড়াল। আলী (রা) এর হাতে সে মারা গেলো। তার ঝান্ডা পড়ে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে বনী গাতফানের রক্ষাবাঁধ ভেঙে পড়ল। তারাও রণে ভঙ্গ দিলো। ওয়াতীহ আর সালালিম কেল্লা দুটি এভাবেই মুসলমানদের কব্জায় আসলো....'

ঃ 'তারপরও ইহুদীরা এখানে আরেক ঘৃণ্য তৎপরতায় মেতে উঠল। যয়নাব বিনতে হারিস নামক এক ইহুদী মহিলা গোশতের সাথে বিষ মিশিয়ে তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে পেশ করলো। তিনি এক টুকরো গোশত মুখে পুরতেই

মুখ থেকে উগড়ে দিলেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গের এক সাহাবী বিশির ইবনুল বার (রা) টুকরোটি প্রায় গিলেই ফেলেছিলেন। সাথে সাথে তিনি ঢলে পড়লেন মৃত্যুর কোলে.....'

'ইবনে দাউদ! কথা তো অনেক আছে। কিন্তু তা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর। আর কতটুকুই বা শুনতে পারবে। তোমাকে এবং বিনতে ইয়ামীনকে আমি ইহুদীদের ব্যাপারে সতর্ক করাটা জরুরী মনে করেছি বলেই বলেছি। কোন ইহুদী যখন তোমাকে ধোঁকা দিতে আসবে তখন সে কখনো তোমার কাছে প্রকাশ করবে না যে সে ইহুদী। সে কোন দরবেশ বা পুণ্যবান মুসলমানের বেশে মাজলুম বনে বা তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধু ও সহানুভূতিশীল হয়ে আসবে। তখন সহজেই তোমরা তার জালে জড়িয়ে যাবে।'

ঃ 'রাত অনেক হয়েছে। এখন কি আমাদের ঘুমানো উচিত নয়?'

প্রতি দিনের মত সকাল হতেই হাবীব কাজে বেরিয়ে পড়লো। কয়েকদিন অনুপস্থিত থাকার পর মদীনায় সে ফিরে এসেছিলো। এজন্য ইবনে দাউদও বিনতে ইয়ামীনকে বলে গিয়েছিলো সন্ধ্যার পূর্বে সে ফিরতে পারবে না।

ঃ 'ইবনে দাউদ!'–হাবীব চলে যাওয়ার পর বিনতে ইয়ামীন ইবনে দাউদকে বললো–'এ কেমন পাথরের কাছে আমাকে নিয়ে এলে। আমি কি এই পাথরকে মোমে পরিণত করতে পারবো? না, না, এটা সম্ভব নয়।'

ঃ 'কেন নয়?'–ইবনে দাউদ বললো–'মোম তো পাথরকেই বানাতে হবে বিনতে ইয়ামীন! তাকে যদি হত্যা করার পরিকল্পনা থাকতো তবে তো খুব সহজ কাজই ছিলো। কিন্তু তুমি তো জানই, তার হাতেই অন্যকে হত্যার কাজ করতে হবে আমাদের।'

ঃ 'সবার আগে তাহলে তার হাতে আমরা দু'জন নিহত হবো'–বিনতে ইয়ামীন বললো– 'যখনই জানতে পারবে আমরা ইহুদী তখন সে আমাকে তালাক দিয়ে বের করে দেবে না বরং আমাকে হত্যা করে আমার লাশ বাইরে ছুঁড়ে ফেলবে। তারপর তোমাকে তালাশ করে ঠিকই বের করবে এবং হত্যা করবে। কেন তুমি কি দেখনি, ইহুদীদের ব্যাপারে তার মনে কেমন ঘৃণার আগুন জ্বলছে! তার এই দীর্ঘ বক্তৃতার অর্থ ছিলো একটাই, ইহুদীরা ইসলামের সর্ব নিকৃষ্ট শত্রু এবং ইহুদীদের দুনিয়ায় বেঁচে থাকার অধিকার নেই।'

ঃ 'তুমি কি তোমার সব সবক ভুলে গেছো?'– ইবনে দাউদ বললো– 'তুমি কি তোমার আসল পরিচয় লুকাতে পারবে না? তুমি কি তার মধ্যে এ বিশ্বাস জন্মাতে পারবে না যে, তুমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পাগলপারা আশেক— প্রেমিক এবং মুসলমানদের ঘৃণার উনুনে জ্বলা ছাই ভস্ম নয়।'

ঃ 'ঐ বিশ্বাস জন্মানোর কাজ তো আমি শুরুই করে দিয়েছি'– বিনতে ইয়ামীন বললো– 'আমি কি তাকে বলিনি জিহাদে যাওয়ার জন্য আমি সব সময়ই তৈরী আছি?'

'তার ঘরে তুমি অত্যন্ত বিচক্ষণতা ও হুঁশ রেখে চলো'– ইবনে দাউদ বললো– যত দিন তাকে একা পাও তাকে মায়ার ফাঁদে জড়াতে চেষ্টা করো। নির্জনতা কাজে লাগাও। খোদা তোমাকে রূপ দিয়েছেন। তোমার এই রূপ ব্যবহারের পদ্ধতি আমরা তোমাকে শিখিয়েছি। তার আরো দু'জন স্ত্রী আছে। একজন দূর গ্রামে রুগ্ন হয়ে পড়ে আছে। আর অন্য স্ত্রীকে তার রুগ্ন স্ত্রীর পরিচর্যার জন্য সেখানে সে রেখে এসেছে। এই নির্জনতা কাজে লাগাও। জাদুর মতো তার ওপর প্রভাব বিস্তার করো।'

ঃ 'আর তুমি কি করবে?'– বিনতে ইয়ামীন জিজ্ঞেস করলো–

ঃ 'তোমাকে সব কিছু বলা তো জরুরী নয় যে, আমি কি করবো বা করছি'– ইবনে দাউদ বললো– 'আমার কাজের হিসাব আমার কাছেই থাকতে দাও। সবসময় এই নীতি সামনে রেখো যে, আমরা ইহুদী এবং আমাদের প্রতিটি কথা ও কাজ ইহুদীদের জন্য ওয়াক্‌ফকৃত। ইহুদীদের জন্যই আমাদের সব। একটি কথা তোমাকে বলে দিচ্ছি, এটা তোমাকে আগেও একবার বলেছি। সেটা হলো, নতুন খলীফা উমর পারস্যে ফৌজ পাঠাতে চাচ্ছেন। কিন্তু এখানকার মুসলমানরা পারস্যদের ব্যাপারে ভীত এবং তারা সামনেও বাড়তে পারছে না।'

ঃ 'ভীত কেন?'–বিনতে ইয়ামীন জিজ্ঞেস করলো।

ঃ 'নানান লোক নানান ধরনের অজুহাত সৃষ্টি করে রেখেছে'– ইবনে দাউদ বললো–'যুদ্ধ বিষয়ে যারা মোটামুটি জ্ঞান রাখে তারা বলছে, আমরা ইরাক ও সিরিয়ার যুদ্ধ-ময়দানে লড়ে যাচ্ছি। আর সেখানে রোমকরা লড়াইয়ে এত দৃঢ়তা ও শক্তি প্রদর্শন করছে যে, মুসলমানদের তা সামলাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে। এরা মুসলমান। পিছু হটাকে বা শত্রুকর্তৃক কাবু হওয়াকে তারা বড় যিল্লতী ও অপদস্থতার কারণ বলে মনে করে। তাদের স্থলে অন্য কোন জাতি হলে এ অবস্থায় তারা পিছু হটে আগে শক্তি সঞ্চয় করে নিতো। আর দূরদর্শী মুসলমানরা বলছে ,এ অবস্থায় অন্য কোন অভিযান শুরু করা উচিত নয়। কারণ পারস্যরা রোমকদের মতই বড় শক্তিধর প্রতিদ্বন্দ্বী এবং রণাঙ্গনেও বেশ অভিজ্ঞ ----'

'দূরদর্শী ও বিচক্ষণ মুসলমানদের তো এই মতামত। আর এটাই এ মুহূর্তে সঠিক সিদ্ধান্ত। কিন্তু সাধারণ মুসলমানদেরকে বলা হয়েছে, পারস্যরা রোমকদের চেয়েও শক্তিমত্তায় অনেক এগিয়ে। মুসলমানরা পারস্যের সঙ্গে কয়েকটি লড়াইয়ে লিপ্ত হয়েছে এবং এসব লড়াইয়ে বিজয়ও অর্জন করেছে। কিন্তু এতে তাদের অনেক প্রাণের মূল্য দিতে হয়েছে। অনেক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছে। তারা যে ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে এবং এতে তারা যেভাবে ক্ষত বিক্ষত হয়েছিলো তা নাকি ভয়াবহ ছিলো.....'

'তাই আমাদের যা করতে হবে তা হলো, মদীনায় এবং মদীনার আশ পাশের শহর-উপশহরে মুসলমান বেশে মুসলমানদের মধ্যে পারস্যদের অতুলনীয় শক্তির কথা এবং তাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হলে যে মুসলমানরা ভয়ানক রক্তারক্তির সম্মুখীন হবে একথা ছড়িয়ে দিতে হবে। যাতে কোন মুসলমান এ অভিযানে যাওয়ার জন্য কোন প্রকার প্রস্তুতিরও সাহস না করে।'

ঃ 'তাদেরকে যদি জোর করে ফৌজে ভর্তি করে নেয় -------?'

ঃ 'আরে না বেওকুফ মহিলা!'– ইবনে দাউদ বিনতে ইয়ামীনকে আর বলতে দিল না–

'মুসলমানদের কোন নিয়মিত ফৌজ নেই। এসব কথা তো তোমাকে বলেছিও এবং তুমি তা ভুলতেও বসেছো। তারা ফৌজ তৈরী করে এভাবে যে, খলীফার পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়, অমুক অভিযানে এত হাজার সৈন্যের প্রয়োজন। সঙ্গে সঙ্গেই লোকেরা জমায়েত হতে শুরু করে এবং স্বল্প সময়ের মধ্যেই সুশৃংখলিত ফৌজে রূপান্তরিত হয়। তাদের প্রতি এমন·কোন বাধ্যবাধকতা নেই যে, তারা রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে বেতনভুক্ত, এ জন্য অভিযানে না যাওয়ার কারণে এবং অভিযান থেকে পলায়নের কারণে সাজাপ্রাপ্ত হবে।'

ঃ 'ঠিক আছে আমি এখানে প্রথমে মহিলাদেরকে ভীত করে তুলবো। বিনতে ইয়ামীন বললো।

ঃ 'তোমার সাথে আমার যোগাযোগ থাকবে'-ইবনে দাউদ বললো-' দু'তিন দিন তো আমি এখানেই থাকবো। এখানে আমাদের তিন চারজনের সাথে দেখা করতে হবে। তুমি তো জানো, এ গুরুত্বপূর্ণ মিশনে আমরা দু'জনেই কেবল জড়িত নই। জড়িত আছে আরো অনেকে। রূপসী যৌবনবতী মেয়েদেরকে কালনাগিনী রূপে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে এবং তাদেরকে সরদার গোছের মুসলমানদের স্ত্রীও বানানো হচ্ছে।'

এই মদীনারই আরেক দিকে বনী ইসরাঈলরা ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করছিলো। অন্যদিকে দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রা) এর ওপর পাহাড়সম এমন বিশাল বোঝা চেপে বসেছিলো, যা বরদাশ্‌ত করার মত অসীম ধৈর্য কেবল তার মতো ব্যক্তিত্বেরই ছিলো। যে বোঝাটা তার চিন্তাশক্তি ও শরীরিক অস্তিত্বকেই কুড়ে কুড়ে খাচ্ছিল। তার অশুভতা এতই ভয়ানক ছিলো যে, তা মুসলিম উম্মাহর তিলে তিলে গড়া ঐক্যের সুমহান প্রাসাদটিকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিতে পারতো। পরিবেষ্টিত এই সংকটেও তিনি অবিচল থাকলেন। সবচেয়ে বড় মাথাব্যথার কারণ ছিলো এই যে, সর্বসাধারণ কি উমর (রা) এর এই খেলাফতের দায়িত্বগ্রহণকে মেনে নিয়েছে? যদি মেনে নিয়েও থাকে তবে তা কি সরল মনে নিয়েছে না কেবল লোক দেখানো ছিলো।

এই প্রশ্নের জবাব তিনি পেয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর বিরোধিতাকারী লোকের সংখ্যা কম ছিলো না। কিন্তু তাঁর প্রথম ভাষণটি তাদের ওপর খুবই সুপ্রভাব ফেলে ছিলো। সে ভাষণের মাধ্যমে তাদের মনের পুঞ্জীভূত বিরোধীতা ও অসন্তুষ্টি দূর হয়ে গিয়েছিলো। দূর থেকে যারা এই ভাষণ শুনেছিলো তাদের কারো মনে কোন অসন্তোষ থেকে থাকলে তা দূর হয়ে গিয়ে তাদের চিন্তাভাবনা তো একেবারে নির্মলই হয়ে গিয়ে ছিলো। আর যারা তার একেবারে নিকটে বসে শুনছিলো তাদের কান আরো অন্যকিছু শুনেছিলো, তাদের চোখ আরো অন্যরকম দৃশ্য অবলোকন করেছিলো।

'আল্লাহর কসম!' মসজিদ থেকে বের হয়ে একে অপরকে বলছিলো।

'আমি খলীফাতুল মুসলিমমীনকে দেখছি- তাঁর চোখ অশ্রুপূর্ণ ছিলো।'

'হ্যাঁ, খলীফা আকাশ পানে হাত উঠিয়ে রেখেছিলেন।'

'আর হ্যাঁ, তাঁর দৃষ্টিও ছিলো আকাশের দিকে উন্মেলিত।'

উমর (রা) তখন আবেগে নীল হয়ে আপন প্রভুর দরবারে দুআ করছিলেন। যারা তা শুনেছিলো তারা এটা অন্যের কাছে বলতেও বিলম্ব করেনি। এই দুআ তিনি খুতবার পরপরই করেছিলেন, দু' হাত উঠিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে কম্পিত কণ্ঠে বলছিলেন-

'হে আল্লাহ! আমি তো কঠিন পাষাণ হৃদয়ের। আমাকে কোমল করে দিন। হে আল্লাহ! আমি শক্তিহীন। আমাকে শক্তিমান করুন। হে আল্লাহ! আমি অনুদার- কৃপণ। আমাকে উদার প্রাণ করে দিন।'

এরপর খলীফাতুল মুসলিমীন নীরব হয়ে গেলেন এবং উভয় হাত দিয়ে তাঁর চেহারা ঢেকে ফেললেন, মাথাও আনত করে দিলেন। ভাষণ তিনি দাঁড়িয়ে দিচ্ছিলেন। পরে তিনি বসে পড়লেন। এসময় লোকদের মধ্যে সামান্য গুঞ্জন উঠলো, তখন উমর (রা) এটাও বলেছিলেন-

'আমার মহান দুই সঙ্গীর পরই মহীয়ান গরীয়ান আল্লাহ আমাকে এই দায়িত্ব সোপর্দ করেছেন। আর তা করে তিনি আমার সাথে আপনাদেরকেও পরীক্ষায় ফেলেছেন। আল্লাহর কসম! আপনাদের যে কেউ যে কোন ব্যাপার নিয়ে যে কোন সময়ই আমার কাছে উপস্থিত হবে, আমি তার প্রতিকারের অবশ্যই ব্যবস্থা করবো। আর যারা দূরত্বের কারণে বা অন্য কোনো কারণে আমার পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না তাদের কাছেও আমি আমার সহযোগিতার হাত নিয়ে পৌঁছে যাবো। এটা করা আমার জন্য ফরজ করে নিচ্ছি। আমার প্রতি এটা তাদের রক্ষিত আমানত। এই আমানত রক্ষা ও সহমর্মীতা প্রদর্শনের এ সুযোগ আমার হাত থেকে কখনো আমি বিচ্যুত হতে দেবো না......'

'আক্রান্তরা আমার কাছ থেকে যত দূরেই অবস্থান করুক না কেন আমি সে পর্যন্ত অবশ্যই পৌঁছে যাবো। লোকেরা যদি আমার সঙ্গে কল্যাণমূলক আচরণ করে তবে আমিও তাদের সঠিক কল্যাণে নিজেকে বিলীন করে দেবো। কিন্তু কেউ যদি অসৎ পথ অবলম্বন করে, তা থেকে বিরত না থাকে তবে আমি তাদেরকে সমুচিত শাস্তি দেবো।'

খলীফা নির্বাচনের পর যে একটা সংকট ঘণীভূত হয়েছিলো তার অনেকাংশই উমর (রা) এর ভাষণের পর মেঘমুক্ত হয়ে গিয়ে ছিলো। যারা খলীফার পূর্ণ ভাষণ শুনতে পারেনি মসজিদ থেকে বের হয়ে আসা লোকদের মুখে তারাও তা শুনতে পেলো। যাদের মনে তখনো বিরোধ আর অসন্তোষ ছিলো অন্যের মুখে খলীফার বক্তব্য শুনার পর তাদের মনের কালিমা দূর হয়ে গেলো। উমর (রা) এর খেলাফতকে তারাও একান্ত মনে গ্রহণ করে নিলো।

দ্বিতীয় সংকট ছিলো আবূবকর (রা) এর সর্বশেষ অভিযান প্রেরণ নিয়ে। সিরিয়ায় যে যুদ্ধাভিযান চলছিলো সেখানে মুসলমানদের অবস্থান নড়বড়ে হয়ে পড়ে ছিলো। আর রোমকরা মজবুত কদমে সামনে অগ্রসর হচ্ছিল। যে বিপদটা সবচেয়ে বড় দুশ্চিন্তার

কারণ ছিলো তা হলো রোমকদের মোকাবেলায় মুসলিম সৈন্যসংখ্যা নেহায়েতই কম ছিলো। রোমকদের বিখ্যাত জেনারেল হেরাকল অসংখ্য সেনা জমা করেছিলেন। অন্যদিকে ইতিহাসখ্যাত সিপাহসালার– আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা), উমর ইবনুল আস (রা), ইয়াযীদ ইবনে আবু সুফিয়ান (রা), মুসান্না ইবনে হারিসা এবং খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা)ও রণাঙ্গনে উপস্থিত ছিলেন। কয়েকটি অভিযানে তাঁরা রোমকদের নাস্তানাবুদ করে ছেড়ে দিলেন। কিন্তু এই স্বল্প সৈন্য নিয়ে তাদের কিছুই করার ছিলো না। বরং এই নগণ্য সৈন্যসংখ্যা তাদের ঘুম কেড়ে নিয়েছিলো। তাই প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর (রা) জীবিত থাকাকালীনই মুসান্না ইবনে হারিসা রণাঙ্গন থেকে সোজা মদীনায় চলে এসেছিলেন এবং খলীফাকে মুসলমানদের নাজুক অবস্থার কথা জানিয়ে আবেদন করেছিলেন- এ অবস্থায় রসদ ও অতিরিক্ত সেনা-সাহায্য এতই জরুরী হয়ে পড়েছে যে, এছাড়া বিজয় আদৌ সম্ভব নয়। আবু বকর (রা) অন্তিম শয্যা নেয়ার পরই মুসান্না তাঁর কাছে এসেছিলেন। তিনি তখন উমর (রা)-কে ডাকলেন।

ঃ 'ইবনুল খাত্তাব!'–আবু বকর (রা) ক্ষীণকণ্ঠে বলেছিলেন–' ইবনে হারিসা সাহায্যের জন্য এসেছে। তার কথামতো শীঘ্রই সেনা-সাহায্য দিয়ে ময়দানে পাঠিয়ে দিন। আর আমি যদি ইতিমধ্যে ইন্তিকাল করি তবে এটা আমার অন্তিম অসিয়ত বলে জানবেন যে, ময়দানে সাহায্য প্রেরণে যেন কোন বাধার সৃষ্টি না হয়।'

সেদিন সন্ধ্যায় কিংবা এর দু' একদিন পরই আবুবকর (রা) এর ইন্তিকাল হয়েছিলো। তাঁর অন্তিম অসিয়ত বুকে নিয়েই উমর (রা) খলীফা নির্বাচিত হয়েছিলেন। প্রথম ভাষণ প্রদানের পর উমর (রা) সমবেত লোকদের উদ্দেশে বলেছিলেন, ইরাক ও সিরিয়ায় মুসলমানদের এখন সেনা সাহায্যের ভীষণ প্রয়োজন। তাই সুশৃংখলিত সৈন্যবাহিনী মুসান্নার সঙ্গে রওয়ানা হয়ে যাওয়া উচিত। কিন্তু উমর (রা) এর জবাবে যা পেলেন তাতে খুবই বিস্মিত হলেন। তিনি লক্ষ্য করলেন যুদ্ধের ময়দানে যেতে লোকেরা স্বতঃস্ফূর্ত নয়। অবশ্য এর কারণও ছিলো। রোমক এবং পারস্যরা ভয়ানক যুদ্ধবাজ, তাদের অস্ত্রশস্ত্র অফুরন্ত, সঙ্গে সঙ্গে সৈন্য বলেও তারা অতুলনীয়– এই ধারণাটাই মুসলমানদের অভিযানে যাওয়ার ব্যাপারে অনুৎসাহিত করেছিলো।

মদীনা ও এর আশ পাশের লোকেরা অভিযানে যেতে একারণেও অনুৎসাহিত ছিলো যে, হযরত উমরের (রা) দৃষ্টি রোমকদের চেয়ে পারস্যদের ওপর অধিক আগ্রহী ছিলো। পারস্যে সৈন্যাভিযানের ব্যাপারে তাঁর আগ্রহটাও ছিলো বেশ খোলাখুলি। তাঁর ইচ্ছার কথাটা তিনি খলীফা হওয়ার পূর্ব থেকেই বলে আসছিলেন।

বহুপূর্বের রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি ফরমান বাস্তবায়নের অদম্য ইচ্ছাই সম্ভবতঃ এই আগ্রহপোষণের কারণ ছিলো। ইসলাম প্রচারকালে ইসলাম গ্রহণের আহবান জানিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন দেশের বাদশা ও রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে পত্র প্রেরণ করেছিলেন।

সে সব পত্রের জবাবে অধিকাংশ রাষ্ট্রপ্রধানই নীরবতা অবলম্বন করেছিলেন। কেউ কেউ প্রত্যাখ্যানমূলক জবাবও দিয়েছিলেন। কিন্তু পারস্যের বাদশাহ খসরু পারভেজের

প্রতিক্রিয়া ছিলো খুবই অপমানজনক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের দূত যখন পত্র নিয়ে খসরু পারভেজের দরবার কক্ষে উপস্থিত হলেন পারভেজ তখন রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে দূতের হাত থেকে নিয়ে পত্রখানি পড়লো এবং দূতকেও অপদস্থ করলো। তারপর পত্রখানি চরম আক্রোশে টুকরো টুকরো করে ছিড়ে হাওয়ায় এমন তাচ্ছিল্য ভরে উড়িয়ে দিলো যে, দরবার কক্ষে তা ছড়িয়ে পড়লো। দূত ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খসরু পারভেজের এই দুঃসাহসের কথা জানালেন। এটা শুনে তিনি বলেছিলেন,

'তার রাজত্বও একদিন এভাবেই টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়বে'- এতটুকু বলেই তিনি নীরব হয়ে গিয়েছিলেন।

সেই দুঃসহ স্মৃতির বেদনা আর ক্ষোভ মাথায় নিয়েই উমর (রা) খলীফা হয়েছিলেন। সেই বেদনার স্মৃতি যেন আবার তাজা হয়ে সবার মধ্যে ফিরে এসেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ থেকে যখন সেই ফরমানটি বেরিয়ে ছিলো উমর (রা) তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। পারস্য সম্রাটের এই ঘৃণ্যকর্মে উমর (রা) এর মধ্যে যে ক্ষোভ সঞ্চার হয়েছিলো তা তার রক্তবর্ণ চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছিলো। উমর (রা) যখন খলীফা হন তখন যদিও পারস্যের সম্রাট খসরু পারভেজ ছিলো না তবুও পারসিকদের শক্তি মত্তায় অজেয় সালতানাতের টুকরো টুকরো বিক্ষিপ্ত অংশগুলো স্বচক্ষে দেখার জন্য তিনি অমিত ইচ্ছা আর দৃঢ় সংকল্প নিয়ে ফেলেছিলেন।

মুসলমানদের মধ্যে পারস্যদের ব্যাপারে কিছু ভীতিও ছেয়ে গিয়েছিলো। এর একটি কারণ এও ছিলো যে, পারস্য সৈন্যবাহিনীতে হস্তিবাহিনীও ছিলো। যুদ্ধের জন্য যেগুলো বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছিলো। সিন্ধু রাজা দাহির এই হাতিগুলো সিন্ধু থেকে পাঠায়। এমনিতে বিভিন্ন ময়দানে পারসিকদের সঙ্গে মুসলমানদের খণ্ড খণ্ড লড়াই সংঘটিত হয়। প্রতিটি ময়দানেই মুসলমানরা তাদের পরাজয় ঘটায়। কিন্তু এজন্য মুসলমানদেরকে অনেক কঠিন সংকটের মুখোমুখি হতে হয়েছিলো এবং দিতে হয়েছিলো বেশ চড়া মূল্য।

সেসব যুদ্ধে ময়দান থেকে মুমূর্ষু অবস্থায় যেসব আহত সৈন্যরা ফেরত আসতো বিশেষ করে যাদের অঙ্গহানি ঘটতো তাদেরকে দেখে মুসলমানরা কেঁপে উঠতো। কাপুরুষতা বা এ ধরনের কোন কারণে তাদের ভীতি ছিলো না। না আহত মুজাহিদরা এসে তাদেরকে ভীত করে তুলতো। তারা এমন ভীত হলে তো আর এসব মরণপণ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তো না। একটি অভিযোগকে কেন্দ্র করেই তাদের মধ্যে ভয়টা সঞ্চারিত হচ্ছিলো। অভিযোগ যেটা ছিলো সেটা হলো- এমনিতেই আমাদের সৈন্যসংখ্যা একেবারেই হাতে গোনা। এমন ক্ষুদ্র বাহিনীকে নিয়ে বিশাল শক্তিধর ও শতগুণ সৈন্যবল দুই সম্রাটের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামা তো আত্মহত্যারই শামিল। তারা বলতো, আগে তো একটাকে খতম করে নিই তারপর অন্যটার শক্তি পরীক্ষা করা যাবে।

প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ হুসাইন হায়কাল লিখেছেন, খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পর ওমর (রা) সেদিন যোহর নামাজের পর যখন মসজিদ থেকে বেরিয়ে আসেন তখন লোকেরা বাইরে ঠাসাঠাসি ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিলো। উমর (রা) তাদের উদ্দেশে পুনরায়

আহবান জানিয়ে বলেছিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরম সঙ্গী এবং তাঁর প্রথম খলীফার অসিয়তের প্রতি যেন সম্মান প্রদর্শন করা হয় এবং মুসান্না ইবনে হারিসা যেন হতাশ হয়ে ফিরে না যায়। কারণ ক্রমেই মুসলমানরা ময়দানে ভয়াবহ সংকটে আক্রান্ত হচ্ছে।

একথা শোনার পর সমবেত লোকের মধ্যে নিস্তব্ধতা নেমে এলো এবং একে অপরের মুখের দিকে তাকাতে লাগলো। তারপর তা আবার ফিসফিসানির রূপ নিলো। অনুচ্চ শব্দে এই আওয়াজও উঠলো–

'যে বিপদে আমাদের ভাইয়েরা আক্রান্ত তাতে আমাদের ফেঁসে যাওয়াটাও কি জরুরী?'

হযরত উমর (রা) এর মনে তখন পূর্বের সেই স্মৃতি ফিরে এলো, যখন আবুবকর (রা) সিরিয়ায় সৈন্যাভিযানের প্রস্তুতি গ্রহণের কথা ঘোষণা করেছিলেন। তখন গোত্রপতিদের ওপর এমনই নিস্তব্ধতা নেমে এসেছিলো।

'শোন মুসলমানগণ!'–হযরত উমর (রা) তখন তাদের সেই নীরবতা দেখে বজ্র কণ্ঠে বলে উঠেছিলেন–'তোমাদের কী হলো? তোমরা খলীফাতুর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথার জবাব দিচ্ছো না কেন? তিনি তোমাদেরকে জিহাদের দিকে ডাকছেন– যে জিহাদ মুসলমানদের জীবন, যে জিহাদের মৃত্যু অনন্ত জীবনে পৌঁছে দেয়।'

মুসলমানরা তখন তা শুনে সামনে অগ্রসর হয় এবং লাব্বাইক বলে জিহাদের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়।

আর আজ তার খেলাফতের সূচনা মুহূর্তে মুসলমানদের মধ্যে সেই নির্জীব অবস্থা আবার ফিরে এসেছে। দিনের সূর্যও সন্ধ্যাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছিলো, উমর (রা) পেরেশানীর বোঝা নিয়েই ঘরে ফিরে গেলেন।

সে রাতটিও তিনি বিনিদ্র কাটালেন। চিন্তা আর পেরেশানী কুড়ে কুড়ে খাওয়া থেকে মুক্তির পথ ভেবে গেলেন। যে বিষয়টা তাঁকে ভাবিয়ে তুলেছিলো তা হলো, নেতৃস্থানীয় লোকেরাও সাধারণদের সঙ্গে ফিসফিসানিতে লিপ্ত ছিলো। অথচ এটা কে না জানে যে, গোত্র বা সমাজের নেতৃস্থানীয়রা যদি কোন ব্যাপারে দ্বিধান্বিত থাকে তবে সাধারণরা অগ্রসর হওয়ার বদলে দশ কদম পেছনে হটে যায়।

ভোরে উমর (রা) মসজিদে গেলেন। নামাযের ইমামতি করলেন। তারপর বায়াত গ্রহণের কাজ শুরু হয়ে গেলো, বায়আতপ্রার্থী লোকদের আগমন ভীড়ে রূপান্তরিত হতে লাগলো। সেই ভীড় কমার পরিবর্তে ক্রমেই বাড়তে লাগলো, খাবার খেলেন মসজিদেই। এ অবস্থাতেই যোহরের ওয়াক্ত হলো।

উমর (রাঃ) নামাযের ইমামতি করলেন। নামায শেষ হলে উপস্থিত লোকদের উদ্দেশে দাঁড়িয়ে গেলেন।

‘হে লোকসকল!’–সুউচ্চ কণ্ঠে তিনি বলে উঠলেন–‘মহান আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি সদয় হোন। খলীফা হিসেবে আজ আমি প্রথম হুকুম জারী করছি। যেসব মুরতাদ আর ধর্মদ্রোহীদেরকে তোমরা দাস-দাসীরূপে নিজেদের কাছে রেখেছো, তাদেরকে আযাদ করে স্বীয় পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দাও। মুসলমানরা নিজেদের মধ্যে দাসপ্রথার চর্চা করবে এটা আমার কাছে খুবই অপছন্দের। আল্লাহ তাআলা প্রতিটি মানুষকেই স্বাধীনরূপে সৃষ্টি করেছেন।’

এধরনের হুকুম সবার কাছেই অপ্রত্যাশিত ছিলো। লোকেরা এ নির্দেশ বাড়াবাড়িই মনে করছিলো। কারণ মুরতাদদেরকে কেউ স্বেচ্ছায় গোলাম বানাইনি। বরং এ হুকুমটা ছিলো প্রথম খলীফা আবুবকর (রা) এর। মুরতাদদের সঙ্গে লড়াইয়ের পূর্বেই তিনি এ হুকুম জারী করেছিলেন যে, কোন মুরতাদ যদি সত্যমনে পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করে তবে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে। আর যে তা অস্বীকার করবে তাকে বন্দী করা হবে। এবং যে লড়াইয়ে লিপ্ত হবে তাকে হত্যা করা হবে। তার ঘর আগুনে পুড়িয়ে দেয়া হবে। আর তার মুরতাদ স্ত্রী সন্তানদেরকে গোলাম বানানো হবে।

এমনিতে এ ধরনের নির্দেশ অতি কঠোর ও জবরদস্তিমূলক মনে হতে পারে। এবং ইসলামে এ ধরনের বিধান একেবারেই পাওয়া যায় না। কিন্তু মুরতাদ আর ধর্মদ্রোহীদের ভয়ানক অপরাধের দিকে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে তাকালে এমনটি আর মনে হবে না। মনে হবে এর চেয়ে আরো কঠিন শাস্তির উপযুক্ত তারা। বেশ কয়েকটি কবীলার লোকেরা মুরতাদ হয়ে ছিলো। যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় ইসলাম গ্রহণ করেছিলো। মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবনে যে সব সুযোগ সুবিধা ও জাগতিক অগ্রগতি অর্জিত হয়ে ছিলো তাদের জীবনেও তারা তা প্রাপ্ত হয়েছিলো। সবচেয়ে বড় মর্যাদার প্রাপ্তি তাদের যেটা ছিলো তা হলো তারা রাসূলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আস্থা অর্জন করেছিলো, কিন্তু এসবই তারা ধুলোয় লুটালো।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালের সঙ্গে সঙ্গেই বেশ কয়েকটি গোত্রের নেতৃস্থানীয় লোকেরা ইসলাম ধর্ম পরিত্যাগ করে। শুধু তাই নয়, তারা ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচার ও নানান কু রটনায় লিপ্ত হয়ে পড়ে। প্রথম তারা যাকাত প্রদানকে সরাসরি অস্বীকার করে বসে। অন্যদিকে তাদের মধ্য থেকেই কেউ কেউ নিজেদেরকে নবী বলে ঘোষণা করে বসে।

প্রথম খলীফা আবুবকর (রা) যাকাতের ব্যাপারে খুবই কঠোর ছিলেন। তাঁর এই উক্তিটি ইতিহাসের পাতায় সমুজ্জ্বল হয়ে আছে–

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে
তারা যাকাতস্বরূপ উটের সঙ্গে উট বাধার যে রশিটি
দিতো তাও যদি দিতে অস্বীকার করে তবুও আমি তাদের
সঙ্গে লড়াইয়ে লিপ্ত হবো।”

তাদের দ্বিতীয় অপরাধটি আরো ভয়াবহ ছিলো। খাতামুন্নাবিয়্যীন (শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) পর তারা মিথ্যা নবী দাঁড় করায়। ইসলামকে বিকৃত করে সমূলে ধ্বংস করাই এদের উদ্দেশ্য ছিলো। মুসলমানদেরকে ধোঁকা দেয়ার জন্যই তারা নামমাত্র মুসলমান হয়েছিলো। মুরতাদকর্ম-ধর্মদ্রোহ আর বিশৃংখলা সৃষ্টির জন্য তারা মোক্ষম একটা সময়ই বেছে নিয়ে ছিলো। সেটা ছিলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের সময়। মুরতাদরা এটা জানতো যে, মদীনা তখন মাতম আর শোকের নগরীতে পরিণত হবে। শোকে বিহ্বল মুসলমানদের সেই পূর্ব উদ্দীপ্ত মনোবল পুরোপুরি ভেঙে না পড়লেও এতখানি দুর্বল তো অবশ্যই হবে যে, তাদের মধ্যে আর তখন প্রতিরোধমূলক লড়াইয়ের হিম্মত ও মনোবল থাকবে না।

কিন্তু আবুবকর (রা) এত বড় ক্ষতির সম্মুখীন হওয়ার পর তাদেরকে ছেড়ে দেয়ার পাত্র ছিলেন না। তিনি তখন ইতিহাস বিখ্যাত সিপাহসালার খালেদ ইবনুল ওয়ালীদ এবং উমর ইবনুল আস (রা) এর নেতৃত্বে এক সৈন্যবাহিনী তাদের বিরুদ্ধে পাঠালেন। চরম রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে তাদেরকে লিপ্ত হতে হয়েছিলো। খুব অল্প সময়েই বনু আসাদ, বনু কুযাআ ও বনু তামীমের মতো অপ্রতিরোধ্য ও অবাধ্য গোত্রগুলোকে তারা কাবু করে ফেলেছিলেন।

মুরতাদদের সমূলে উৎপাটনের জন্য আবু বকর (রা) খুবই কঠিন নির্দেশ দিয়েছিলেন। তারই নির্দেশে মুসলমানরা তখন তাদের মুরতাদ মহিলা ও সন্তানদেরকে গোলাম রূপে নির্ধারণ করেছিলো। উমর (রা) এখানে মুসলমানদের সেসব গোলাম বাঁদীদেরকেই তাদের স্বজনদের কাছে ফিরিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিলেন।

কিন্তু মদীনাবাসী এ হুকুম পছন্দ করতে পারলো না। সমাবেশ থেকে বিভিন্ন আওয়াজ উঠতে লাগলো। কেউ বলছিলো আমরা তো খলীফায়ে আউয়ালের হুকুমেই তাদেরকে গোলাম বানিয়েছিলাম। কেউ বলছিলো প্রথম খলীফার ইন্তেকালের পর তার হুকুমের বিরোধিতা করাটা শোভনীয় হবে না।

ঐতিহাসিকরা অনেক নিরীক্ষার পর অনেক প্রামাণ্য বর্ণনা আর সূত্র অনুযায়ী এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, মুরতাদরা যখন নিজেদের পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করতে গিয়ে শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করলো তখন তাদের অনেকেই ভুল বুঝতে পেরে তাওবা করে সত্য মনেই মুসলমান হয়ে গিয়েছিলো। আর যাদেরকে গোলাম বানানো হয়েছিলো তারা মুসলমানদের সহজাত মার্জিত আচরণ ও বিনম্র ব্যবহারে মুসলমানদের প্রতি অনেকটা কৃতজ্ঞ হয়ে পড়েছিলো। উমর (রাঃ) যখন দেখলেন, লোকেরা মুসান্না ইবনে হারিসার সঙ্গে অভিযানে যেতে স্বতঃস্ফূর্ত নয় তখন তিনি এ আশায় গোলামরূপে মুরতাদদেরকে আযাদ করার হুকুম দিলেন যে, এতে তারা খুশী হয়ে যাবে এবং নতুন করে ইসলাম গ্রহণকারীরা জিহাদের আহবানে সাড়া দেবে। পরন্তু সিরিয়া ও ইরাক অভিযানে স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে অংশগ্রহণ করবে।

বিশেষজ্ঞ ঐতিহাসিকরা লিখেছেন, উমর (রা) বলেছিলেন, মুসলমানদের মধ্যে দাস প্রথার প্রচলন হওয়া উচিত নয়। তিনি এটাও বলেছিলেন, মহান আল্লাহ মানব জাতিকে স্বাধীনতা দিয়ে সৃষ্টি করেছিলেন। সুতরাং মানুষ মানুষের গোলাম হতে পারে না।

কেউ কেউ উমর (রা) এর এই নির্দেশকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছিলো, কিন্তু কঠিন প্রাণ ও আপোসহীন বলে উমর (রা) এর যে প্রসিদ্ধি ছিলো সেটা যেন আবার দ্বিগুণ হয়ে ফিরে এসেছিলো। তিনি বললেন,

'আরবের উদাহরণ হলো একটি উটের মতো। যার লাগাম পড়ে আছে আর সে তার চালকের পেছনে পেছনে চলছে। তার চালকের এটা দেখা অবশ্যই কর্তব্য যে, উটের গন্তব্য কোথায়। কাবার রবের শপথ! আরব জাতিকে আমি সঠিক পথে এনেই ছাড়বো।'

মুসান্না ইবনে হারিসা অনুভব করলেন, লোকেরা পারসিকদের ব্যাপারে ভীত প্রাণ। কোন এক গোত্রের সরদার সেই ভীতির কথা প্রকাশও করে বসলো।

'আমরা এত শক্তির অধিকারী নই যে পারসিকদের ওপর হামলা করবো।'

আরেক সরদার বললো−'আগে তো পারসিকদের রণশক্তি কোন ময়দানে পরখ করে নাও। তারপর কথা বলো।'

মুসান্না ইবনে হারিসা আর বিলম্ব করলেন না। তিনি সমবেতদের উদ্দেশে উঠে দাঁড়ালেন। তিনি এটাও দেখলেন না, খলীফাও লোকদের কিছু বলতে যাচ্ছেন।

'হে লোকসকল!'−বুলন্দ আওয়াজে মুসান্না বললেন−

'পারসিকরা কে? যাদের ভয়ে তোমাদের দেহমন কম্পিত? তোমরা কি জানো না আমরা পারসিকদের রণশক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করেছি? পারস্যের অঙ্গরাজ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ এখন আমাদের কব্জায়। কয়েকটি সম্মুখ যুদ্ধে তাদেরকে আমরা পরাস্ত করেছি। বাবেলের তৃণশূন্য ভূমিতে পারস্যদের আমরা নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছি। কিন্তু সংকট আমাদের অন্যখানে, পারস্য সম্রাট তার পরাজিত সৈন্যদের শক্তি বৃদ্ধিতে এক জবরদস্ত সেনা সাহায্য পাঠিয়েছে। কিন্তু আমরা সেনা-সাহায্য থেকে বঞ্চিত। আমরা কি এতটুকুও করতে পারি না যে, যেসব মুজাহিদগণ শহীদ হয়েছেন তাদের শূন্যস্থান তো আমরা পূরণ করতে পারি। আজ তোমরা এত পাষাণ পাথর মনের কি করে হলে? অথচ তোমরাই আল্লাহর পথে কুফরীর বিনাশ সাধনে লড়তে লড়তে, যখমী আর শহীদ ভাইদের রক্তের প্রতিশোধ নিতে ব্যাকুল হয়ে যেতে! আজ তাদের শূন্যস্থানও পূরণ করতে তোমরা অগ্রসর হচ্ছো না! আল্লাহর কসম! মুসলমান তো কখনো কাউকে ভয় পায়নি। আমি সরাসরি যুদ্ধের ময়দান থেকেই এসেছি। সৈন্যসংখ্যা কম বলে আমরা কেল্লায় অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছি। আমরা কেল্লার ভেতর থেকে এখন দুশমনদের কেবল প্রতিরোধই করতে পারছি। আমরা কেল্লার বাইরে বের হয়ে দু'কদমও অগ্রসর হতে পারছি না। তোমরা কি সেদিনের অপেক্ষায় আছো যেদিন তোমাদের ভাই কিংবা সন্তানরা রণাঙ্গন থেকে পালিয়ে এসে তোমাদেরকে বলবে, সে তার সঙ্গীদের লাশের সারি ও যখমীদের ছটফটে তাজা দেহগুলো ময়দানে রেখে এসেছে আর তারা পারসিকদের ঘোড়ার পদাঘাতে পিষ্ট হচ্ছে?'

সারা মজমায় নিস্তব্ধতা নেমে এলো। হযরত উমর (রা) লোকদের চেহারা থেকে তাদের প্রতিক্রিয়া অনুধাবনের চেষ্টা করছিলেন। মুসান্না উষ্ণ কণ্ঠে বলেই যাচ্ছিলেন। আর লোকদের চেহারা থেকে ক্রমেই প্রত্যাখ্যানের ভাব বদলে যাচ্ছিলো। ধীরে ধীরে তা

ব্যাকুলতার রূপ নিলো। উমর (রা) বুঝতে পারলেন লোকদের মধ্যে চৈতন্য ফিরে আসছে। জযবায় তাদের মধ্যে জাগরণ ঘটছে। তারা মুসান্নার এই বক্তব্য সাদরেই গ্রহণ করে নিয়েছে। উমর (রা) তখন উঠে দাঁড়ালেন। মুসান্না বসে গেলেন।

'হে মুমিমনগণ!–উমর (রা) বলে চললেন–

'তোমরা কি হেজায দীপেই বন্দী হয়ে বসে থাকতে চাও? সে সব লোকরা কি তোমাদের মধ্যকার নয় যারা নিজেদের ঘরবাড়ি আপনজন ছেড়ে দূরদূরান্ত থেকে বিজয় ছিনিয়ে এনেছে? ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করতে সেই দূরাঞ্চলে চলে গিয়েছে যার ওয়াদা মহান আল্লাহ তাঁর পবিত্র গ্রন্থে করেছেন যে, তিনি তোমাদেরকে সেসব ভূপৃষ্ঠের অধিকারী বানাবেন। তোমাদের এই দ্বীনকে বিধর্মীদের ওপর বিজয়ী করবেন। মহান আল্লাহ তাঁর দ্বীনের পূর্ণ অনুসরণকারীকে অন্য সকল জাতির ওপর রাজত্ব প্রদানের ওয়াদা করেছেন। আল্লাহর কসম! তোমরা মহান আল্লাহর কৃত অঙ্গীকারের ব্যাপারে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করতে যাচ্ছো। অথবা পারস্যদের কাল্পনিক ভয় তোমাদেরকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। আল্লাহর একত্ববাদ ও তাঁর মাবুদ হওয়ার ব্যাপারে তোমাদের মধ্যে কি কেউ সাক্ষ্য দেয়ার নেই? তোমরা কি বাতিলকে ভয় পাও? অবিশ্বাসীদের শক্তিকে তোমরা সমীহ করতে চাও? এজন্যই কি তোমরা সত্যের তরবারিকে আজ কোষমুক্ত করছো না?'

লোকদের মধ্যে ফিসফিসানী শুরু হয়ে গেলো। আস্তে আস্তে তা বুলন্দ আওয়াজের রূপ নিলো। তারপর এই আওয়াজের সর্বসম্মিলিতরূপ একজনের কণ্ঠে কেন্দ্রীভূত হলো–

'আল্লাহর কসম! আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশিত পথে চলে দ্বীনের পতাকাকে সমুন্নত করেছি। আরবের বাইরে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এই দ্বীনের বাণীকে প্রতিষ্ঠিত করেছি। এমন কোন জাতি আছে কি যারা আমাদেরকে আঘাত করেছে আর আমরা তাদেরকে ধুলোয় মিশাইনি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। আমরা তখন খলীফা আবুবকর (রা) এর নেতৃত্বকে নিজেদের ওপর আবশ্যক করে নিয়েছি এবং সর্বাবস্থায় আমরা তাঁর সঙ্গ দিয়েছি। মহান আল্লাহও আমাদেরকে সাহায্য করেছেন। আজ যে আচ্ছন্নতা আমাদের ওপর বিস্তার করেছিলো এমনটি আর কখনই আমাদের কারো ওপর বিস্তার করেনি। আজ আমাদের কি হলো যে, আমারা খলীফা উমর (রা) এর জিহাদের আহবান শুনেও নিশ্চুপ বসে আছি?'

এই কণ্ঠ ছিলো আবু উবাঈদ ইবনে মাসউদ ইবনে উমর আস্‌সাকাফীর ।

'আমি মুসান্না ইবনে হারিসার সঙ্গে যাচ্ছি'- আবু উবাঈদ ইবনে মাসউদ বললেন।

'আমি'- সালীত ইবনে কায়েস (রা) নামক এক সাহাবী দাঁড়িয়ে বললেন।

তারপর লাব্বাইক লাব্বাইক এর আওয়াজ বাড়তেই লাগলো। দেখতে দেখতে অভিযানে যাওয়ার প্রার্থীদের সংখ্যা এক হাজারে পৌছে গেলো। হযরত উমর (রা)-এর চেহারা তখন খুশী আর চোখ আনন্দের আঁসুতে ঝলমল করতে লাগলো।

ঐতিহাসিকরা লিখেছেন, জিহাদে অংশগ্রহণকারী এই নতুন দলের অধিকাংশই মদীনাবাসী ছিলো। তাই বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন উঠলো–

'খলীফাতুর রাসূল'–মদীনার এক সরদার বলে উঠলো–

'আপনি কি লক্ষ্য করেননি বর্তমান অভিযানে অংশ গ্রহণকারীর অধিকাংশই মদীনার আনসার এবং মুহাজির'?

ঃ 'হ্যাঁ, আমি লক্ষ্য করেছি, কিন্তু তুমি একথা বলছো কেন?–উমর (রা) জিজ্ঞেস করলেন।

ঃ 'আমি এজন্যই বলছি যে, এই সেনাদলের সালার কোন মদীনাবসীরই হওয়া উচিত। তাই এমন কোন মুহাজির বা আনসারকে এই সেনাদলের আমীর নির্বাচন করুন, যিনি কোন রণাঙ্গনে বীরত্ব দেখিয়েছেন এবং তিনি একজন সাহাবীও। সেই মদীনাবাসী বললো।

ঃ 'না! আল্লাহর কসম! আমি কোন মদীনাবাসী বা কোন সাহাবীকে সালার নির্বাচন করবো না। আল্লাহ তাআলা তোমাদের মাথা সমুন্নত করেছিলেন এজন্য যে, তোমরা দ্বীনের দুশমনদের কচুকাটা করার জন্য পাহাড়সম দৃঢ়তা ও বীরত্বের ঝলক দেখিয়েছিলে। শুধু কোন সালারের বদৌলতেই নয়। কিন্তু আমি এই তিন দিন ধরেই দেখছি তোমাদের চেহারায় যেন ভীরুতার কালিমা লিখে দেয়া হয়েছিলো। তোমরা দুশমনের মুখোমুখি হতে ভয় পাচ্ছিলে। তাই এখন বলো– যে স্বীয় দ্বীনের হেফাজতের জন্য তাকে প্রতিষ্ঠার জন্য নিজেকে সর্বাগ্রে পেশ করেছে সে কি এই সালারী আর নেতৃত্ব লাভের উপযুক্ততা প্রমাণ করেনি? আল্লাহর কসম! সে-ই এই দলের আমীর হবে। আবু উবায়দা উঠো। আমি তোমাকে মুসান্না ইবনে হারিসার সঙ্গে অংশগ্রহণকারী নতুন সেনাদলের আমীর নির্বাচন করছি'– উমর (রা) দৃঢ় কণ্ঠে কথাগুলো বললেন।

তার পর উমর (রা) সাদ ইবনে উবাইদ ও সালীত ইবনে কায়েস (রা)কে ডাকলেন। তাঁরা উঠে দাঁড়াতেই উমর (রা) বললেন–

'তোমরা আবু উবাইদের পরে অভিযানে যাওয়ার কথা বলেছো। আবু উবাইদের পূর্বে যদি তোমরা উঠতে তবে লশকরের আমীর তোমাদেরই একজন হতো।'

ঃ 'ইবনুল খাত্তাব!'–সালীত ইবনে কায়েস (রা) বললেন–'নিশ্চয় অন্তরের সবকিছু আল্লাহই অধিক জানেন। সুতরাং তিনি এটাও জানেন যে, নেতৃত্ব লাভের আশায় নয়। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই আমি জিহাদে যাচ্ছি।'

ইতিমধ্যে সেনাদলের সংখ্যা আরো বাড়লো এবং তা দ্বিগুণে পরিণত হলো। উমর (রা) মুসান্নার মদীনায় অবস্থান করা আর সমীচীন মনে করলেন না। কারণ ময়দানে মুসলিম বাহিনীর অবস্থা খুবই ভয়াবহ।

ঃ 'ইবনে হারিসা!–উমর (রা) বললেন–'তোমরা এখনই ইরাকের উদ্দেশে রওয়ানা হয়ে যাও এবং গিয়ে ময়দানের হাল ধরো। এই সাহায্যকারী সেনাদল দু'একদিনের মধ্যেই লড়াইয়ের প্রস্তুতি গ্রহণ করে রওয়ানা হয়ে যাবে। প্রতিটি ঘন্টা প্রতিটি মুহূর্তই এখন বড় মূল্যবান। এখানে অপেক্ষা করো না। আর অবশ্যই সতর্ক থেকো, যে পর্যন্ত প্রেরণকৃত এই সেনাদল পৌঁছে না যাবে সে পর্যন্ত সম্মুখযুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে না। যে কোন ধরনের ঝুঁকি নেয়া থেকে এখন বিরত থাকবে।'

মুসান্না ইবনে হারিসা প্রশান্তি মনে রণাঙ্গনে ফিরে গেলেন।

দু'দিন পরের কথা। সাহায্যকারী সেনাদল রওয়ানার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। তাদের সঠিক সংখ্যার কথা কোন ইতিহাস গ্রন্থেই উল্লেখ হয়নি। তবে এটুকু নিশ্চিত করে বলা যায়, সংখ্যায় তারা দু'হাজারের কাছাকাছি ছিলো।

'আবু উবাইদা! সেনাদলের মদীনা ত্যাগের মুহূর্তে উমর (রা) আখেরী হেদায়েতমালা দিচ্ছিলেন–

'ময়দানে তোমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মানিত কয়েকজন সাহাবীকে পাবে। তারা যা বলবেন তা মেনে চলবে। তুমি এই সাহায্যকারী লশকরের আমীর। ময়দানে গিয়ে তুমিই তাদের আমীর থাকবে। যে কোন ধরনের কার্যক্রম যে কোন ফয়সালা সাহাবায়ে কেরামের পরামর্শ ছাড়া করবে না। তাড়াহুড়া করে কোন কিছু করবে না। জাগতিক শক্তিমত্তায় সমৃদ্ধ বিশাল এক বাহিনীর মোকাবেলা করতে যাচ্ছো তোমরা। তাই যুদ্ধে সফলতার জন্য প্রতিটি অবস্থাকেই ঠাণ্ডা মাথায় শান্তমনে পর্যবেক্ষণ করবে। তীক্ষ্ণবুদ্ধি দিয়ে যাচাই করবে। প্রতিটি সুযোগ থেকেই ফায়দা উঠানো যুদ্ধ জয়ের জন্য জরুরী হয়ে পড়ে। এটা মনে রাখবে। আল বিদা আবু উবাইদ! আল্লাহ তোমাদের সঙ্গী হোন।'

উমর (রা) অনেক দূর পর্যন্ত সৈন্যদলের পেছনে পেছনে গেলেন। অনেক দূরে গিয়ে আমীর আবু উবাইদ পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখলেন, মদীনার বাইরে এবং বিভিন্ন দালানের ছাদে নারী-পুরুষের ভীড়। সেখান থেকে তারা বিদায়ী সেনাযাত্রীকে হাত নেড়ে আশীর্বাদ করছে।

সেনা-সাহায্যের বিষয়টি মিটে গেলে উমর (রা) মনোযোগ দিলেন তাঁর পূর্ব জারীকৃত মুরতাদ গোলাম সংক্রান্ত নির্দেশের ওপর। তাদেরকে আযাদ করে দেয়ার হুকুমটি তিনি বলবৎ রাখলেন। তবে এসব গোলামদের মুনীবরা এই হুকুমকে স্বাগত জানাতে পারলো না। কিন্তু উমর (রা) ন্যায়ের যে কোন বিধানই প্রতিষ্ঠা করতে বদ্ধপরিকর ছিলেন এবং তিনি এর পন্থাটাও জানতেন। তিনি প্রশাসনিক ব্যবস্থায় ঘরে ঘরে তাঁর এই পয়গাম পৌছে দিলেন যে, মুরতাদ গোলামদেরকে আযাদ করে দেয়া হোক। কারণ, আবু বকর (রা) এর আরোপিত শাস্তির অনেকখানিই প্রয়োগ হয়েছে।

সবাই এ হুকুম মেনে নিলো এবং গোলাম আযাদ করতে লাগলো।

মদীনার অদূরে ছোট একটি জনবসতি ছিলো। সেখানকার এক লোকের উট ও ঘোড়ার যৌথ ব্যবসা ছিলো। নাম ছিলো তার আবু যুবায়ের। নানা জায়গা থেকে তিনি ঘোড়া সংগ্রহ করে এর ব্যবসা করতেন। সে সুবাদে তিনি সম্পদশালীও ছিলেন। ঘোড়া ও উটের ব্যবসায়ী হলেও সাধারণ ব্যবসায়ী থেকে তিনি উন্নতর ছিলেন। ঘোড়াকে প্রশিক্ষণ দিয়ে যুদ্ধের জন্য উপযোগী করে তুলতেন। তার এই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ঘোড়াগুলো যুদ্ধের মাঠে বেশ কার্যকরী বলে প্রমাণিত ছিলো।

আবু যুবায়ের স্বীয় গোত্রের একজন সরদার লোকও ছিলেন। রণাঙ্গনের একজন শাহসওয়ারও ছিলেন এবং তীর চালনায় ছিলেন অতি দক্ষ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিদায়ের পর ধর্মদ্রোহীদের দৌরাত্ম শুরু হলে আবু বকর (রা) যখন তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করলেন তাতে আবু যুবায়েরও ছিলেন। তার বয়স তখন ষাটোর্ধ্ব। মুজাহিদবাহিনীতে তার বিশেষ কোন পদাধিকার ছিলো না। সাধারণ সিপাহী হিসেবেই তিনি ছিলেন। দুটি যুদ্ধে তিনি লড়াই করেছিলেন। আর মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে শেষপর্যন্ত লড়ার দৃঢ় সংকল্প করে নিয়েছিলেন। লড়াইরত অবস্থায় একদিন তার ঘোড়ার চোখে একটি তীর ছুটে এসে লাগলে ঘোড়া এত জোরে লাফিয়ে উঠে যে, আবু যুবায়ের আর ঘোড়ায় স্থির থাকতে পারলেন না। পড়ে গেলেন। তুমুল যুদ্ধ চলছিলো তখন। তার দিকে কারো তাকাবার ফুরসত ছিলো না। হঠাৎ অন্য একটি ঘোড়া তার উরু ও পা মাড়িয়ে দিলো। তার আর দাঁড়াবার শক্তি রইলো না। বড় কষ্টে হামাগুড়ি দিয়ে ময়দানের বাইরে আসতে পেরেছিলেন। পরে অনেক চিকিৎসা করা হলো, কিন্তু পায়ের জোড়ায় এমন ক্ষতের সৃষ্টি হলো যে, তা নিয়ে শুধু কোন ক্রমে নড়াচড়ারই শক্তি অবশিষ্ট ছিলো।

আবু যুবায়ের মদীনার পার্শ্ববর্তী তার গাঁয়ে ফিরে এলেন। খালি হাতে তিনি আসেননি। তার সঙ্গে মুরতাদদের এক অর্ধবয়স্কা মহিলা ও সতের আঠারো বছর বয়সের তার কন্যাও ছিলো। আবু যুবায়েরের গোত্রের কয়েকজন নৌজোয়ানও তার সঙ্গে জিহাদে শরীক হয়েছিলো। আবু যুবায়ের যখমী হওয়ার পর মদীনায় ফিরে আসার সময় তার কবীলারই এক নৌজোয়ান সেই বন্দীনী মহিলা ও যুবতী মেয়ের সঙ্গী হয়ে আবু যুবায়েরের কাছে আসলো। আবু যুবায়ের সেই নৌজোয়ানকে ইচ্ছে হলে এদেরকে নিয়ে যেতে বললেন।

ঃ 'এটা মালে গনীমত আবু যুবায়ের!'–সেই লোকটি বললো–'এর অধিকারী তুমিই, এই মা মেয়ে এখন দাসী। আমি এদেরকে নিয়ে কি করবো? তোমার মতো ধনবান সরদারের ঘরেই এদেরকে মানাবে।'

আবু যুবায়েরের ক্ষত অনেকটাই সেরে উঠেছিলো। টুকটাক কাজ করার উপযুক্ত হয়ে উঠেছিলেন। তবে যুদ্ধের ময়দানে ফিরে যাওয়ার মতো সুস্থ তখনো হননি। ঘরে তার স্ত্রী ছিলো তিনজন এবং ছেলে ছিলো সাতজন। বড় ছেলের বয়স ত্রিশের কাছাকাছি। অন্যান্য ছেলেদের কেউ পূর্ণ যুবক, কেউ কেউ প্রায় যুবা বয়সের ছিলো। ছেলেদেরকে তিনি তার কাছে ডাকলেন–

ঃ 'বেটারা আমার!'–আবু যুবায়ের বললেন–

'মুরতাদদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আমি গিয়ে ছিলাম। আমার জন্য এটা ছিলো ফরয করা কাজ। এই দুই দাসীকে আমার সঙ্গে নিয়ে এসেছি। এরা আমার হক। কিন্তু আমার ও তোমাদের এমন কোন হক নেই যে, আমাদের কেউ তাদেরকে আনুষ্ঠানিক বিয়ে ছাড়া স্ত্রীরূপে ব্যবহার করতে পারবো। আর আমি তোমাদের কাউকেই এই যুবতী মেয়েটিকে বিয়ের এজাযত দেবো না, অবশ্য সে ইসলাম গ্রহণ করলে ভিন্ন কথা। এরা ঘরের কাজকর্ম করবে। তবে তাদের সাধ্যের বাইরে তাদেরকে দিয়ে কোন কাজ করানো যাবে না।'

আবু যুবায়ের কেবল একবারই বলেছিলেন– তারা মা ও মেয়ে যদি ইসলাম গ্রহণ করে তবে মেয়ের মাকে তার সমবয়সী কারো সঙ্গে বিয়ের ব্যবস্থা করে দিবেন এবং তার মেয়েকে তার ছেলের বৌ করে নেবেন। আবু যুবায়েরের ইচ্ছা ছিলো এই মেয়ের সঙ্গে তার বড় ছেলের বিয়ে দেয়া।

'আবু যুবায়ের!–আবু যুবায়েরের প্রস্তাবে সেই মহিলা দৃঢ় স্বরে জবাব দিয়েছিলো–

'আমার জবাব এককথায় শুনে নাও। আমি ইসলাম গ্রহণ করবো না। তুমি হয়তো ভেবেছো আমি তোমার হাতে বন্দী বলে অক্ষম হয়ে গিয়েছি এবং তোমার মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েছি। এজন্য তোমার সব কথাই মানবো? কখনো নয় আবু যুবায়ের! তুমি নিশ্চয় জানো আমি কোন অসহায় দরিদ্রের বেটি নই, না আমার স্বামী কোন সহায়হীন লোক ছিলো। সে কবীলার খুবই গুরুত্বপূর্ণ লোক ছিলো।

ঃ আমি তোমাকে হুকুম দিচ্ছিনা আসিমা!' 'আবু যুবায়ের বললেন–আর জোরও করছিনা। তোমার ভালো চেয়েই একথা বলেছি।"

'হুকুম দিয়ে দেখোই না। আর জোর করেও দেখো না'–আসিমা বললো–মুসলমানদের হাতে আমার স্বামী নিহত হয়েছে। আমার দু'ভাইও নিহত হয়েছে। আমার ঘর জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে। তুমিও তো লড়াইয়ে শামিল ছিলে। কি এমন হতে পারে না যে, আমার স্বামী কিংবা ভাইদের হত্যাকারী তুমিই?'

ঃ 'তা তো হতেই পারে' আবু যুবায়ের বললেন–'কিন্তু এটাওতো ঘটেছে যে, তোমার স্বামী আর ভাইয়ের হাতে আমার কতো সঙ্গী-সাথী নিহত হয়েছে এবং যখমী হয়েছে। এটা স্রেফ লড়াই ছিলো আসিমা! লড়াইয়ে উভয় পক্ষের লোকেরাই যখমী হবে এবং নিহত হবে। তোমার স্বামী এবং কবীলার লোকেরা যদি আমাদেরকে ধোঁকা না দিতো তবে তো আজ তুমি আমার ঘরে দাসীরূপে বন্দী হতে না।'

ঃ 'তোমরা যাকে ধোঁকা বলছো তা তো আমাদের সরদার লোকদের এক কৌশল ছিলো' আসিমা বললো–'আমরা ইসলামের ক্ষতি বৃদ্ধি করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার মতো শক্তি আমাদের ছিলো না। আমাদের সরদাররা এই চাল চেলেছিলো যে, তারা প্রকাশ্যে মুসলমান হয়ে গিয়েছিলো। এতে যে লাভটা হলো তাহলো, তোমরা আমাদেরকে নিজেদের লোক বলে ভাবতে লাগলে। আর আমরা পর্দার অন্তরালে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে লাগলাম। আমাদের সরদাররা তা কাজে লাগানোর মোক্ষম সময়ের অপেক্ষায় ছিলো।'

'আর তোমাদের সরদারদের সেই সুযোগ মিলে গেলো'– আবু যুবায়ের আসিমার কথায় বিদ্রূপ করে বললেন–'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইন্তিকাল করলেন। তোমাদের সরদার আর নেতারা এই ভেবে বেশ আনন্দিত হলো যে, এখন মুসলমান..... ।

ঃ 'আবু যুবায়ের! হ্যাঁ'– আসিমা কথার মাঝখানে বলে উঠলো–

'তুমি ঠিকই বলছো কিন্তু পরিণামে তোমরা জিতে গেলে। কিন্তু আমি কখনো ইসলাম গ্রহণ করবো না। নিজের দুশমনের ধর্ম আমি গ্রহণ করবো না। আমি তোমার দাসী। আমার মেয়েও তোমার দাসী, ব্যস এটুকুই। আমাদের পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি কোন অভিযোগ উঠবে না। এবং তোমার স্ত্রীদের প্রতিও কোন নালিশ করবো না।

ঃ 'আর এই ঘরের কারো পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি কোন অভিযোগ দায়ের করা হবে না'- আবু যুবায়ের বললেন-'আমার কোন ছেলে তোমার এই রূপসী মেয়ের প্রতি কখনো অশালীন দৃষ্টি দেবে না। তোমার এখন শাদীর ব্যবস্থা না হলে তোমার কোন অসুবিধা হবে না কিন্তু তোমার বেটির তো শাদী হওয়া উচিত।'

ঃ 'তার শাদীর জন্য আমি কখনো তাকে মুসলমান হওয়ার সুযোগ দেবো না' আসিমা বললো-'আমার মেয়ের পিতৃ হত্যাকারীর ঘরে আমার মেয়েকে কখনো আমি ঘর করতে দেবো না।'

আবু যুবায়ের দ্বীনদার মুসলমান ছিলেন। তিনি এই মা ও মেয়ের সঙ্গে ইসলামী রীতিনীতি বজায় রেখেই আচরণ করছিলেন। আসিমার উস্কানীমূলক ও অসৌজন্যমূলক কথার কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখালেন না। আসিমা ও তার মেয়ে আবু যুবায়েরের ঘরে আসার দু' একদিন পরের কথা এটা। তখনই তাদের মধ্যে এসব কথা হয়েছিলো। আবু যুবায়ের এরপর আর তাকে ইসলাম কবুলের কথা বলেন নি।

আসিমা আবু যুবায়েরের ঘরে আসার দু'তিন মাস পরের কথা। কোন এক কাজে আসিমা ঘোড়ার আস্তাবলে গিয়েছিলো। সেখানে আবু যুবায়ের এক লোককে ঘোড়া দেখাচ্ছিলেন। লোকটি আসিমার দিকে পিঠ ফিরে ছিলো। ঘোড়া খরীদের জন্যই সে এসেছিলো, লোকটি ফিরতেই আসিমা তার চেহারা দেখতে পেলো। সঙ্গে সঙ্গেই চমকে উঠলো। লোকটিরও একই প্রতিক্রিয়া হলো। তার চেহারায় স্পষ্ট পেরেশানী ফুটে উঠলো।

আসিমা যে কাজের জন্য এসেছিলো তা করে চলে গেলো। লোকটি একটি ঘোড়া খরীদ করে আস্তাবল থেকে বের হয়ে গেলো। তার ঘোড়া বাঁধা ছিলো। সে তার ঘোড়ার রশির সঙ্গে নতুন ক্রয় করা ঘোড়াটি বাধলো। তারপর সওয়ার হয়ে চলা শুরু করলো। মাথা ঘুরিয়ে এদিক সেদিক তাকাতে তাকাতে সে পথ চলছিলো। যেন সে কাউকে তালাশ করছে। ঘোড়ার গতি ছিলো খুবই ধীরলয়ের।

এভাবেই সে শহর থেকে বের হয়ে গেলো। বার বার সে পেছন ফিরে দেখছিলো।

'ইবনে দাউদ!' এক নারী কণ্ঠের আওয়াজ সে শুনতে পেলো।

সে এদিক সেদিক আওয়াজের উৎস খুঁজতে লাগলো। একদিকে দু'তিনটি খেজুর বৃক্ষ পরস্পরের সঙ্গে জটলা করে দাঁড়ানো ছিলো। এগুলোর পাশে বালির একটি টিবি। সেখানে একটি নারীমূর্তি দাঁড়িয়ে ছিলো।

'আসিমা!'-ইবনে দাউদ একলাফে ঘোড়া থেকে নেমে আসিমার কাছে গিয়ে বলতে লাগলো-'আমি তোমাকে খুঁজতে খুঁজতেই যাচ্ছিলাম। তুমি এখানে কি করে এলে? মুসলমান হয়ে গিয়েছো? ঘোড়ার এই সওদাগরের বিবি বনে গেছো?'

ঃ 'বিবি না, দাসী'- আসিমা নির্বিকার কণ্ঠে জবাব দিলো-'গোলামীর যিন্দেগী গুজরান করছি। মুসলমান? না হইনি। কখনো হবোও না।'

'তাহলে আমার সঙ্গে চলো'- ইবনে দাউদ বললো- 'তোমার মুনীব টের পাওয়ার পূর্বেই এতদূর পর্যন্ত পৌঁছে দেবো সে পর্যন্ত আর সে পৌঁছতে পারবে না।'

ঃ 'মেয়েকে ছেড়ে আমি কি করে যাবো?'-আসিমা বললো- 'সে তো আমার সঙ্গেই আছে। তুমি কি জানো না আমার স্বামী আর দুই ভাই লড়াইয়ে মারা গেয়েছে। ইবনে দাউদ! আমরা খুব বাজেভাবে হেরে গিয়েছি। যে উদ্দেশ্য আমাদের ছিলো তা সফল করতে পারলাম না। আমি শুনেছিলাম বনী ইসরাঈলের নীতি নির্ধারকরা যে পরিকল্পনা করে তা কখনো ব্যর্থ হয় না। কিন্তু তোমাদের এই পরিকল্পনা এমনভাবে ব্যর্থ হলো যে, আমরা সারা জীবনেও আর পিঠ সোজা করে দাঁড়াতে পারবো না।'

ঃ এই ব্যর্থতার দায় আমার ওপরও বর্তায় না তোমার ওপরও বর্তায় না'- ইবনে দাউদ বললো-'আমাদের পরিকল্পনা সর্বদিক দিয়েই পরিপূর্ণ ও কার্যকর হওয়ার মতো ছিলো। কিন্তু যাদেরকে লড়াই করতে পাঠালাম তারা সাহস হারিয়ে কাপুরুষ বনে গিয়ে এত চমৎকার একটা প্রস্তুতি মাটি করে দিলো। লোকবলের ক্ষতি তো হলোই। কিন্তু সবচেয়ে বড় ক্ষতি যেটা হলো, ইসলামের শিকড় এখন পূর্ব থেকে আরো মজবুত- দৃঢ় হয়ে গেলো।'

ঃ 'আমি এখনো হেরে যাইনি'- আসিমা বললো-'আমি আমার ভাই ও স্বামীর খুনের বদলা নেবোই। কখনো কখনো ইচ্ছে হয় আমার মুনীব বেটা আবু যুবায়েরকেই কতল করে দেই। সেও তো আমাদের বিরুদ্ধে লড়েছিলো। কিন্তু তোমাদের একথাটাও মনে পড়ে যে, শুধু একজনকে হত্যার মাধ্যমেই আমাদের মিশন সফল হবে না। বরং এতে ক্ষতিবৃদ্ধি হবে।'

ঃ 'আমার দ্বিতীয় কথাটিও তুমি সবসময় মনে রাখবে যা আমি তোমাকে সব সময়ই বলে থাকি'- ইবনে দাউদ বললো-'তোমাকে এখানে পেয়ে কতইনা ভালো হলো, তোমার কাছ থেকে আমার অনেক কাজ নেয়ার আছে। তোমার মেয়েটি যুবতী লাস্যময়ী হয়ে উঠেছে। তাকেও কাজে লাগাতে হবে।'

ঃ আমার নিজের চিন্তাধারা আর পরিকল্পনা মতোই আমি তাকে গড়ে তুলছি। আমি তার মনে এত দিনে ইসলামের ঘৃণা বদ্ধমূল করে দিয়েছি।'

'আমাদের আসল উপদেশটা তোমাকে দেইনি'- ইবনে দাউদ উৎসাহের সঙ্গে বললো।

ঃ 'আমি জানি তুমি কোন উপদেশের কথা বলছো'- আসিমা বললো-'আমি তাকে ভালো করেই বুঝিয়ে দিয়েছি যে, কবীল্যার নেতৃস্থানীয়দের ছেলেদের সঙ্গে প্রেমের ছল করে তাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি করতে এবং তাদের মধ্যে খুনোখুনির সম্পর্ক সৃষ্টি করতে। প্রত্যেকের সঙ্গেই প্রেমের অভিনয় করবে। ভালোবাসার প্রতিশ্রুতি দেবে। কিন্তু কাউকেই মন দেবে না। ভালোবাসার বদলে সবাইকে ঘৃণাই দেবে।'

আসিমার সেখানে বিলম্ব করার সুযোগ ছিলো না, ইবনে দাউদ পুনরায় সাক্ষাতের প্রতিশ্রুতি দিয়ে চলে গেলো।

সত্যের যে নিশ্চয়তা নিয়ে ইতিহাস আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে তা এই সত্যের পর্দাই উন্মোচন করেছে যে, মুরতাদদের উত্থানের পেছনে আসল কলকাঠি নাড়িয়ে ছিলো ইহুদীরাই। আর মুরতাদদের মধ্যে যে মিথ্যা নবীর দাবী করে ছিলো সে ইহুদীদেরই রক্ষিত এক প্রতারক ছিলো।

হাবীব ইবনে কাব বিনতে ইয়ামীনকে বিয়ে করে মদীনায় নিয়ে আসার এক বছর পূর্বেই আসিমার সঙ্গে ইবনে দাউদের এই সাক্ষাত হয়েছিলো। এ এক বছরে ইবনে দাউদ আর আসিমার মধ্যে অনেকবার সাক্ষাৎ হয়েছে। অনেক কথা হয়েছে। আসিমা বিনতে ইয়ামীনের সঙ্গেই সাক্ষাতে মিলিত হয়েছে। কিন্তু তাদের মধ্যে দীর্ঘ কোন কথা হয়নি।

এ এক বছর আসিমা আবু যুবায়েরের ওপর এমন প্রভাব বিস্তার করেছিলো যে, আবু যুবায়েরের দৃষ্টিতে আসিমা মামুলি কোন দাসী বাঁদী ছিলোনা। আবু যুবায়েরের স্ত্রীরাও আসিমাকে দাসী-বাঁদী মনে করতো না।

আসিমার মেয়ে রূপসী শারিয়া বিনতে আকীল। তার এই রূপের ব্যবহার কি করে করতে হবে আসিমা তা তাকে ভালো করেই শিখিয়ে পড়িয়ে দিয়েছিলো। এই শিক্ষাটাও তাকে দিয়েছিলো যে, নিজের শরীর পুরুষের হাতের খেলনা হতে দেবে না। প্রেম আর ভালোবাসার আঁচলে যাকে জড়াবে তার সামনে নিজেকে বড়ই মোহনীয় আর মধুর ভঙ্গিতে উপস্থাপন করবে। কিন্তু তার নাগালের বাইরে থাকবে। যেন হিমবাহ রাতের নির্জীব প্রান্তর। যখন সে হতাশ হয়ে ক্লান্তিতে ভেঙে পড়তে যাবে তখনই কোমল বাহুতে তাকে বন্দী করবে। কোমল রেশম চুল আর ফুলের পাপড়ির মতো মসৃণ গালের স্পর্শে প্রেমের মায়াজালে নতুন উদ্যমের সৃষ্টি করে তাকে তরতাজা করে তুলবে।

শারিয়ার চুল রেশমের মতোই মোলায়েম ছিলো আর গোলাপ রাঙ্গা গালও ছিলো ফুলের পাপড়ির মতো মাখন-নরম। আরব্য সুন্দরী ললনাদের সে শাহজাদী হওয়ার যোগ্যতা রাখতো। কোন উপমাই তার রূপ বর্ণনার জন্য যথেষ্ট ছিলো না। তার এই রূপের মায়াজালে যে প্রথম ধরা দিলো সে ছিলো তারই মুনীব আবু যুবায়েরের পূর্ণ যুবক ছেলে সালমান। আবূ যুবায়ের তার ছেলেদের কঠিন স্বরেই বলে আসছিলেন, আসিমা ও তার যৌবনবতী মেয়ে শারিয়ার সঙ্গে যেন কেউ আপত্তিকর সম্পর্ক গড়ে না তোলে। আবু যুবায়ের শারিয়ার যৌবনের সুতীব্র আকর্ষণ ও তার নজরমুগ্ধ রূপের কথা ভেবে আশংকা করতেন। না জানি তার কোন ছেলে এখানে এসে কোন ভুল করে বসে। তার এই আশংকা কেবল তখনই দূর হতো, যদি আসিমা ও তার মেয়ে শারিয়া ইসলাম গ্রহণ করে নিতো এবং আবু যুবায়ের তার কোন এক ছেলের সঙ্গে শারিয়াকে পরিণয়ে আবদ্ধ করতেন। কিন্তু আসিমা ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে সোজা সাপ্টা জবাবে তার অস্বীকৃতি জানিয়ে দিয়েছে।

আবু যুবায়েরের এটা জানা ছিলো না যে, গভীর রাতে যখন তিনি ঘুমিয়ে থাকেন তখন তার বেটা সালমান আস্তাবল সংলগ্ন দাসী বাঁদীদের মহলে শারিয়ার ঘরে নিশিগল্পে আচ্ছন্ন থাকে। আসিমা তখন তাদেরকে নির্জন ঘরে ফেলে বাইরে চলে যায়।

আসিমা শারিয়াকে প্রায়ই বলছিলো, শারিয়া যেন এখন আবু যুবায়েরেরই কোন ছেলেকে বা গোত্রের অন্যকোন সরদারের ছেলেকে প্রেমে সালমানের প্রতিদ্বন্দ্বী করে তোলে। আর তাদের পরস্পরের মধ্যে এমন শত্রুতা উস্কিয়ে দেয় যাতে গোত্রে গোত্রে না হোক খান্দানে খান্দানে যেন পরস্পরে লড়াইয়ে লিপ্ত হয়ে পড়ে। তারপর এই কলহ আর লড়াই এক গোত্র থেকে অন্য গোত্রে এমনকি সারা আরবে ছড়িয়ে পড়তে বেশি সময় লাগবে না। জবাবে শারিয়া তার মাকে এই নিশ্চয়তা দিচ্ছিলো যে, সে আবু যুবায়েরের খান্দানের বাইরে অন্য আরেক খান্দানের কোন নৌজোয়ানকে প্রেমের জালে ফেলার চেষ্টা করছে।

হযরত উমর (রা) খলীফা হওয়ার পর যে হুকুম দিয়েছিলেন, মুরতাদদের পরিবারের যারা গোলাম-বাঁদী হিসেবে মুসলমানদের ঘরে আছে তাদেরকে আযাদ করে দিতে হবে- এতে অনেকেই প্রথম খলীফা আবু বকর (রা) এর দোহাই দিয়ে এ হুকুম স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিতে চায়নি। আবু বকর (রা)ই তাদেরকে গোলামবাদী করে রাখার এজাযত দিয়েছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় খলীফা উমর (রা) এর মানবিক ও রাজনৈতিক চিন্তাধারা ভিন্ন ছিলো। মুসলিম সেনার অন্যতম সালার মুসান্না ইবনে হারিসাও উমর (রা)কে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, মুরতাদদের অনেকেই অনুতপ্ত হয়ে তাওবা করেছে। উত্তম কাজটি হবে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে তাদের সঙ্গে বন্ধুসুলভ আচরণ করা এবং তাদেরকে আপনজনের কাছে ফিরিয়ে দেয়া। উমর (রা)ও এমনই চিন্তা করেছিলেন। অনেক মুরতাদই তখন খাঁটি মনে মুসলমান হয়ে গিয়েছিলো। এটা ছিলো মুসলিম লশকরে শক্তিবৃদ্ধির একটি মাধ্যম।

উমর (রা) এসব গোলাম বাঁদীদেরকে আযাদ করার সরকারী হুকুম জারী করে দিলেন। এ সংবাদ পৌছতেই আবু যুবায়ের আসিমা ও শারিয়াকে তার কাছে ডেকে পাঠালেন।

ঃ 'আজ থেকে তোমরা এই ঘরের দাসী বাঁদী নও'-আবু যুবায়ের তাদেরকে বললেন- 'তোমরা নিশ্চয় খলীফার হুকুম শুনেছো, কিন্তু আমি তোমাদেরকে ঘর থেকে বের করে দিতে পারি না। তোমরা এখন বলো কার কাছে আমি তোমাদেরকে সোপর্দ করবো? এমন কোন নিকট আত্মীয়ের সন্ধান দাও যেখানে আমি তোমাদেরকে রেখে আসতে পারি।'

ঃ 'দু'এক দিন পর এটা বলতে পারবো' আসিমা বললো-'আমার এক দূর সম্পর্কের আত্মীয় মদীনায় আছে। সে ইসলাম গ্রহণ করেছে। কিছুদিন পূর্বে সে এখানে এসে একটি ঘোড়াও খরীদ করে নিয়েছে।'

আসিমা সেদিনই ইবনে দাউদের সঙ্গে মিলিত হলো। ইবনে দাউদও মদীনায় ছিলো। অবশ্য হাবীব ইবনে কাবের ঘরে ছিলো না তখন। তার এক ইহুদী বন্ধুর বাড়িতে ছিলো। তার এই বন্ধু আসলে ইহুদী ছিলো। কিন্তু নিজেকে মুসলমান বলে

পরিচয় দিতো, সে শিক্ষকতার কাজ করতো, মদীনার অধিবাসী ছিলো না। দূরের কোন গ্রামের অধিবাসী পরিচয়ে সে মদীনায় রুটি রুজির জন্য এসেছিলো এবং এখানেই বসতি গড়ে তুলে।

আসিমা ইবনে দাউদের কাছে শারিয়াকেও নিয়ে গিয়েছিলো। ইবনে দাউদ শারিয়াকে বলেছিলো, শারিয়ার বাবা ও দুই মামার খুনের বদলা সে মুসলমানদের কাছ থেকে অবশ্যই নেবে এবং ইসলামকে নৃশংসভাবে ধ্বংস করে দেবে। ইবনে দাউদ সেই যুবতীকে ষড়যন্ত্রের অনেক পথ পদ্ধতির কথা বলেছিলো। এটাও বলেছিলো যে, বিনতে ইয়ামীন মুসলমান নয়, ইহুদী।

ঃ 'আবু যুবায়েরের বেটা সালমানের সঙ্গে ইশক ও মুহাব্বতের নাগীনা ঠিক বিস্তার করে চলছ তো?'–ইবনে দাউদ জিজ্ঞেস করেছিলো।

ঃ 'সে তো আমার প্রেমে উন্মত্ত হয়ে পড়েছে'–শারিয়া হাসতে হাসতে জবাব দিয়েছিলো–'কিন্তু তার বাবা হুকুম জারী করে রেখেছে, আমার সঙ্গে তার সাদী হতে পারে না। সালমান বলে, তার আব্বাজান শাদীর এজাযত না দিলে সে আমাকে নিয়ে চিরদিনের জন্য মদীনা থেকে বের হয়ে যাবে। আমি বুঝিয়ে বলতে পারবো না, তার এখন কি অবস্থা যাচ্ছে।'

ঃ 'এখন এমনই আরেক নৌজোয়ানকে পাগল করে দাও'– ইবনে দাউদ বললো–

'আমি তোমাকে তার নাম বলে দিচ্ছি যে, সে কে হবে?'–ইবনে দাউদ আরেক যুবকের নাম বললো এবং তার খান্দানেরও পরিচয় দিলো।

ঃ একে সালমানের প্রতিদ্বন্দ্বী করে তোল এবং সালমানের বাবার কানে এটা ঢেলে দাও যে, এই ছেলেটি তোমার প্রতি হাত বাড়িয়েছে'– ইবনে দাউদ এর পর শারিয়াকে আরো কিছু উপদেশ দিয়েছিলো।

ঃ 'ইবনে দাউদ! তুমি দেখে যাও'– শারিয়া বলেছিলো–'আমি ঘরের চার দেয়ালের ভেতরে থেকে মদীনার মধ্যে খুনের দরিয়া বইয়ে দেবো।

ঃ 'একটি চিন্তা আর উদ্দেশ্যকে মাথায় রেখো'– ইবনে দাউদ বলেছিলো-'উদ্দেশ্য হলো, মুসলমানদেরকে মূর্খতার সে অন্ধকারে আবার নিক্ষেপ করতে হবে যেখান থেকে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে উদ্ধার করেছিলেন। তাদের পরস্পরের মধ্যে যথেষ্ট বিরোধ আর মতানৈক্য রয়েছে। আমাদের কাজ হবে এই মত বিরোধে দুশমনীর রং ছড়ানো এবং তাদেরকে পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে লিপ্ত করা। যাতে একে অপরে রক্ত পান করে করে এক সময় তাদের অস্তিত্বই বিনাশ হয়ে যায়। এছাড়া আরো কয়েকটি কূটমন্ত্র আমরা ব্যবহার করছি।'

ঃ 'আমি জানি!–শারিয়া বলেছিলো–'আম্মীজান আমাকে সব বলেছেন।'

এরপর শারিয়া আর বিনতে ইয়ামীনের সাক্ষাত হয়। বিনতে ইয়ামীন শারিয়াকে বলেছিলো সে হাবীব ইবনে কাবকে তার মুষ্টিতে নিয়ে নিয়েছে এবং তার মাথা খারাপ করতে শুরু করে দিয়েছে।

❖ ❖ ❖

ইহুদীরা ইসলামকে বিশ্বাসগত, আদর্শগত এবং অন্যান্য অঙ্গন থেকে ধ্বংসের জন্য সবসময়ই তৎপর ছিলো। খায়বারের পরাজয় তাদেরকে ফানুসভাঙ্গা সাপ আর কাটাবিহীন বিচ্ছুতে পরিণত করে ছিলো। তাদের প্রধান তিনটি গোত্র– বনূ কুরায়যা, বনু নাযীর এবং বনু কায়নুকা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে পরাস্ত হয়ে নানাদিকে বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু আড়ালে আবডালে তারা আবার একত্রিত হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে তৎপর হয়ে উঠে, বরং এবার পূর্ব থেকে আরো ভয়ানক ও তীব্র বিনাশী হয়ে আত্মপ্রকাশ করে। খায়বার যুদ্ধের তাজা ক্ষত নিয়েই তো তারা এক ইহুদী নারীর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করতে চেয়ে ছিলো। ইবনে দাউদ, আবু সালমা ইবনে এসহাক ও তার সঙ্গীদের কর্মতৎপরতা ইহুদীদের দ্বারা পরিচালিত ইসলাম ধ্বংসের মিশনের সামান্য অংশ ছিলো মাত্র।

আবূ যুবায়ের আসিমা ও শারিয়াকে আযাদ করে ইবনে দাউদের হাতে তুলে দেয়। ইবনে দাউদ তাদেরকে তার ইহুদী বন্ধুর ঘরে নিয়ে উঠায়। আবু যুবায়েরের ছেলে সালমান তিন-চার দিন সেখানে গিয়ে শারিয়ার সঙ্গে সাক্ষাত করে।

এই তিন-চার দিনে ইবনে দাউদ আসিমা ও শারিয়াকে আবু সালমা ইসহাক ও তার অন্যান্য সঙ্গীদের কথাও খুলে বলে এবং তারা যে ইসলাম ও মুসলমানদের ধ্বংসের কি চমৎকার নীল নকশা তৈরী করেছে তাও বলে। মরুর যে খেজুর উদ্যানে তাদের আস্তানা গড়ে তুলেছে তার ঠিকানাও সে তাদেরকে বলে দেয়। দু'একদিনের মধ্যে আসিমা ও শারিয়াকে ইবনে দাউদ সেখানে নিয়ে যেতে চাচ্ছিলো।

এদিকে বিনতে ইয়ামীন হাবীব ইবনে কাবকে বলে আসছিলো যে, সে কয়েকদিনের জন্য তার বাবা ইবনে দাউদের সঙ্গে তার গ্রামের বাড়িতে গিয়ে ঘুরে আসতে চায়। সে বলেছিলো তার বাবার সঙ্গে যাবে এবং তার সঙ্গে চলে আসবে। ইবনে দাউদ ও হাবীবকে বলে অনুরোধ করে, সে দু-তিন দিনের জন্য বিনতে ইয়ামীনকে গ্রামের বাড়িতে নিয়ে যেতে চায়। হাবীব যাওয়ার এজাযত দিলো।

পরদিন সকালে ইবনে দাউদ ঘোড়া নিয়ে আসলো। একটার ওপর নিজে সওয়ার হলো। অন্যটার ওপর বিনতে ইয়ামীন। তারা রওয়ানা হয়ে গেলো।

"আগুনে তো পুড়ছে গুটি কয়েক কাফেরের লাশ। কুফরীর পুরো অস্তিত্বটাই ছাই-ভস্মে পরিণত করতে হলে কুরবানী আর ত্যাগের অনন্ত ইতিহাস রচনা করতে হবে। রণাঙ্গনের বিজয় অর্জনেই কুফরীর বিনাশ সাধন হবে না।"

ঃ ঘোড়ার গায়ে সামান্য খোঁচা লাগাও'-শহর থেকে কিছু দূর গিয়ে ইবনে দাউদ বিনতে ইয়ামীনকে বললো-'তারা আরো অনেক আগেই বেরিয়ে গেছে। দ্রুত চললে আমরা তাদেরকে ধরতে পারবো।' তাদের দু'জনের ঘোড়া ছুটতে লাগলো।

তারা যখন এক দেড় মাইল অগ্রসর হয়ে আরো তিন ঘোড় সাওয়ারের সাক্ষাত পেলো তখন সকালের সূর্য দিগন্ত রেখা থেকে উত্তপ্ত হতে শুরু করেছে। তিন সওয়ারীর সঙ্গে একটি উটও ছিলো। তার লাগামটি পেছন থেকে একটি ঘোড়ার সঙ্গে বাঁধা ছিলো। তিন ঘোড়ার একটির ওপর সওয়ার ছিলো আসিমা। দ্বিতীয়টির ওপর শারিয়া, তৃতীয়টির ওপর ইবনে দাউদের বন্ধু। উটের ওপর খাবার দাবারসহ অন্যান্য আসবাবপত্র ছিলো। ইবনে দাউদ বিনতে ইয়ামীন ঘোড়া হাকিয়ে খুব অল্প সময়েই তাদের কাছে পৌঁছে যায়। এদের সবাই যাচ্ছিলো আবু সালমার কাছে। পথ বাকী ছিলো আরো দুদিনের।

সন্ধ্যায় তারা এক বালির টিবির কাছে ছাউনি ফেললো। সকালের সূর্য দেখা দিতেই তারা আবার পথে নেমে পড়লো।

পরদিন বিকালে সেখানে আরেক কাফেলা ছাউনি ফেলে শিবির স্থাপন করছিলো। ইবনে দাউদের কাফেলা তখন তার গন্তব্যে পৌঁছে গিয়েছিলো। গন্তব্য মরুর সেই আচমকা খেজুর বাগান। যার চার দিক দিনের অগ্নিবর্ষক সূর্য তাপের নৃত্য প্রদর্শন করে। কোন দূরাগত মুসাফির এই দৃশ্য দেখে কল্পনাও করতে পারেনা যে, এই অঙ্গারেই ফুল শয্যায় আবৃত খেজুর বাগান রয়েছে। ইহুদী সরদার আবু সালমা তাঁবুর বেষ্টনে এক মায়াবী মুগ্ধতার দুনিয়া তৈরি করেছিলো।

ইবনে দাউদ যে রাতে তার সংক্ষিপ্ত কাফেলা নিয়ে এখানে পৌঁছে সে রাতে সবাই ঘুমিয়ে রাত কাটিয়ে দিলো। পরের রাতে আবু সালমা তাদের সম্মানে আনন্দ মাহফিলের আয়োজন করলো। শরাবের পাত্রগুলো উন্মুক্ত করা হলো। সুরাভরা পানপাত্রগুলো সবার হাতে ঘুরতে লাগলো। ষোড়ষী গায়িকা গান আর নৃত্যের মোহনীয় তালে প্রায় সবাইকেই উন্মাদ করে তুললো।

পথে ইবনে দাউদের ছাউনীর স্থলে যে কাফেলা তাঁবু ফেলেছিলো পরদিন সকালেই তারা তাঁবু গুটিয়ে ইবনে দাউদের কাফেলার পদচিহ্ন অনুসরণ করে রওয়ানা হয়ে গিয়েছিলো।

আবু সালমার তাঁবুর মহলে যখন শরাবপায়ী উন্মাদদের ও গায়িকাদের উচ্চ কোলাহলে মুখর, গানবাদ্যের আওয়াজ রাতের নিস্তব্ধতাকে খান খান করে দিচ্ছিলো তখন এক অর্ধ মাতাল বলে উঠলো,

'মনে হচ্ছে আমি যেন ঘোড়ার খুরের আওয়াজ শুনেছি!

'আরে ভাই আরো পিয়ে নাও'- আবু সালমার ইহুদী সঙ্গী ইসহাক বললো-'তোমার কানের বাদ্যযন্ত্র এখনিই বন্ধ হয়ে যাবে।'

'কে কে?' বাইরে কারো ভীত গলা শোনা গেলো।

'খামুশ' একদম চুপ, আরেক গম্ভীর পুরুষালী কণ্ঠের আওয়াজ এলো, সঙ্গে সঙ্গে আরেকজন হুঙ্কার ছাড়লো।

'যে যেখানে আছো সেখানেই থাকো। নড়বে না একচুলও। তোমাদেরকে এখন আমরা ঘেরাও করে ফেলেছি।'

ভেতরের গানবাদ্য সব থেমে গেলো। গায়িকা মেয়েটি যেখানে ছিলো সেখানেই বাজপড়া ভূতের মতো দাঁড়িয়ে রইলো। তাঁবুর মহলে যেন নিঃশব্দের প্রেতাত্মা নেমে এসেছে।

'মরু দস্যু!' আবু সালমা ফিসফিস করে বললো।

তাঁবুর মহলে যে দুটি দরজা ছিলো উভয় দরজা খুলেই কয়েকজন লোক ভেতরে ঢুকলো, প্রত্যেকের হাতেই নাঙ্গা তরবারি, তাদের মধ্যে আবূ যুবায়ের তার ছেলে সালমানসহ আরো তিন ছেলে এবং হাবীব ইবনে কাবও ছিলো। আর ছিলো হাবীবের চার বন্ধুও।

'বিনতে ইয়ামীন!–হাবীব তার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলো–'তুমি তো তোমার গ্রামের বাড়িতে যেতে চেয়েছিলে এখানে কি করে এলে? ইবনে দাউদ নাকি তোমার পিতা? তুমি মুসলমান?'

বিনতে ইয়ামীনের চেহারা পেরেশানী আর ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেলো। সে কিছুই বলতে পারলো না। নির্বাক চোখে সে তাকিয়ে রইলো, হাবীবের হাতে উন্মুক্ত তরবারি ছিলো। সে ধীরে ধীরে বিনতে ইয়ামীনের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো ঝুলন্ত ঝাড় বাতির আলোতে হাবীবের তরবারি থেকে আকাশের বিদ্যুৎ চমকের মতো একবার বিদ্যুৎ চমকালো। একটি মুহূর্তমাত্র। পরমুহূর্তেই বিনতে ইয়ামীনের ধড় আর শরীর বিচ্ছিন্ন হয়ে মেঝেতে পড়ে থাকতে দেখা গেলো। ভয়ে গায়িকা আর তার সঙ্গী মেয়েটির গলা থেকে আচমকা চিৎকার বেরিয়ে এলো।

ঃ 'শারিয়া!–আবু যুবায়ের মোলায়েম গলায় বললেন–'তুমি ওদের কাছ থেকে সরে এসো, এখানে চলে এসো।'

শারিয়া দ্রুত সেখান থেকে সরে এসে আবু যুবায়েরের পাশে দাঁড়ালো।

ঃ 'নিমক হারাম মেয়ে!'–দাঁতে দাঁত পিষে ইবনে দাউদ শারিয়াকে বললো–'তুমিই তাহলে তাদেরকে এখানে এনেছো? তোমারই চাল এসব?'

ঃ 'সে কি সত্যি বলছে?–আসিমা শারিয়াকে জিজ্ঞেস করলো–'তুমিই তাদেরকে সব বলে দিয়েছো? তোমার মাকেও তুমি ধোঁকা দিতে পারলে.......? হিংস্র জানোয়ারের মতো, পাঞ্জা তুলে নখদন্ত বের করে শারিয়ার দিকে অগ্রসর হলো– 'তোর গলা টিপে মারবো আজ।'

শারিয়ার ওপর আসিমা প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছিলো। আবু যুবায়ের তরবারির ফলা দিয়ে হালকা আঘাত করলো। আসিমার মাথা ও শরীরের সংযোগী রগটি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো। রক্তাক্ত দেহ নিয়ে মেঝে আসিমা কাত হয়ে পড়ে গেলো।

ঃ 'আর সবাই শুনে নাও'– শারিয়া বললো–'এঁদের সবাইকে আমিই এখানে নিয়ে এসেছি। তোমাদের সব ষড়যন্ত্র ইবনে দাউদই ফাস করে দিয়েছিলো।'

'হায় হতভাগী মেয়ে!' ইবনে দাউদ বললো–'যে অর্থ সম্পদ তুমি আমাদের কাছ থেকে পেতে এর সিকিভাগও তো এদের কাছ থেকে পাবে না।'

ঃ 'যে সম্পদ যে ঐশ্বর্য তাদের কাছ থেকে পেয়েছি তোমরা তা দেয়ার কল্পনাও করতে পারতে না'– শারিয়া বললো–'তোমরা তাদের দাসী ছিলে, আমি ও তাদের দাসী ছিলাম। আবু যুবায়ের ও তাঁর ছেলেরা আমাদের সঙ্গে যা ইচ্ছে তাই করতে পারতেন। কিন্তু তারা আমাদেরকে নগণ্য মনে করেননি। পরিবারের লোকদের মতোই তারা আমাদেরকে মর্যাদা দিতেন। আবু দাউদ! তুমি কি জানো না তোমরা মুনীবরা গোলাম বাঁদীদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করো?'

'আমার মতো যৌবনবতী রূপসী মেয়ের প্রতি না আবু যুবায়ের না তার কোন ছেলে আপত্তিকর নজরে দেখেছেন। তোমাদের সামনেই দাঁড়িয়ে আছে সালমান। সে নয় আমিই তাকে প্রথমে মন দিয়েছি। নির্জন রাতে আমরা গল্প করতাম। আমার শরীরটা প্রকৃতই গোলাম ছিলো। আমার মনও তার গোলাম বাদী হয়ে গেলো। কিন্তু সে আমার শরীরের প্রতি কখনো আকর্ষণবোধ করেনি। আমার একটি কেশও সে স্পর্শ করেনি। সে শুধু বলতো মুসলমান হয়ে যাও। আব্বাজান থেকে তখন এজাযত নিয়ে তোমায় শাদী করবো।'

শারিয়া আবেগে উত্তেজনায় কাঁপছিলো। সে বলেই যাচ্ছিলো। নীরব-নির্বাক হয়ে সবাই শুনছিলো। মরুর হিমশীতল রাতকে একটি নারীর আবেগময় কণ্ঠে উষ্ণ করে তুলছিলো।

'আরেকজন তুমি ইবনে দাউদ! আমার রূপ যৌবন আর নিষ্পাপ দেহটা নিয়ে তোমার ও তোমাদের নোংরা উদ্দেশ্যে চরিতার্থ করতে চেয়েছিলে'– শারিয়া বলতে লাগলো অবিরত–

'ইবনে দাউদ! তোমাকে আমি বাবার মতো মনে করতাম। আপনারা কি জানেন, সে দু'বার আমাকে নিয়ে তার দেহ-ক্ষুধা মেটাতে চেয়েছিলো। আমি তাকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছি। অনেক আগেই আমি মুসলমান হয়ে যেতাম। কিন্তু আমার মা আমাকে ভিন্ন পথে নিয়ে যেতে চাইলো। আর ইবনে দাউদ আমাকে নানান অসভ্যতার সবক দিতে শুরু করলো। আগেই আমি মনে মনে ঠিক করে নিয়ে ছিলাম তার কাছ থেকে সব ষড়যন্ত্রের কথা জেনে নিয়ে একদিন কিছু একটা করে দেখাবো। তারপর মুসলমান হয়ে সালমানের সঙ্গে পরিণয়ে আবদ্ধ হবো। কৌশলে আমি সব জেনে নিলাম। মদীনা থেকে এখানকার দূরত্বও জেনে নিলাম। পথ ও দিকও জানা হয়ে গেলো। তারপর সালমানকে বললাম। সালমান তার বাবাকে বললো এবং হাবীব ইবনে কাবকেও জানালো যে, সে ইহুদীদের ফাঁদে জড়িয়ে পড়েছে'– শারিয়া আবূ যুবায়েরের দিকে তাকিয়ে বললো– 'আপনাদের প্রতি যে আমি কৃতজ্ঞ এটা এখন বিশ্বাস হলো তো .....। আমি মুসলমান, আমার দিল ইসলাম কবুল করে নিয়েছে।'

'এদের সব কটাকে খতম করে দাও'–আবু যুবায়ের আদেশের সুরে হুংকার ছাড়লেন–'দ্বীনের দুশমনদের জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই-ভস্মে পরিণত করো।'

মরুর রাতে কিছু শোরগোল কিছু আর্ত চিৎকার উঠলো, দু'তিনটি নারী কণ্ঠের চিৎকার কিছুক্ষণের জন্য রাতের নিঃশব্দকে এলোমেলো করে দিলো। তারপর সব চুপচাপ হয়ে গেলো।

তাঁবুর মহলে যারাই ছিলো সবকটাকেই হত্যা করা হলো। তারপর তাবুর একস্থানে লাশগুলো স্তূপ করে মদের পাত্র আর মটকাগুলো সেগুলোর ওপর উপুড় করে ঢেলে আগুন লাগিয়ে দেয়া হলো। তাদের পরিত্যক্ত উট আর ঘোড়াগুলো নিয়ে আবু যুবায়েরের কাফেলা মদীনার উদ্দেশে পথে নেমে পড়লো। শারিয়া তাদের সঙ্গেই রইলো। কাফেলার মধ্যে শারিয়াই তখন সবার গর্বের পাত্রী ছিলো।

দেড় দু'মাইল দূরে গিয়ে আবু যুবায়ের ঘোড়া থামিয়ে পেছন দিকে তাকালেন। খেজুর বাগান বরাবর আকাশটি যেন কবরের মৃত রং ধারণ করছিলো। অনেক দূর পর্যন্ত মরুর নিকষ আঁধারময় রাতকে আলোকিত করছিলো। সেই আলোতে ধোয়ার শুভ্র আচ্ছাদন দেখা যাচ্ছিলো।

ঃ 'কুফর জ্বলছে'–পাশ থেকে হাবীব ইবনে কাব বললো।

ঃ 'না ইবনে কাব!'–আবু যুবায়ের বললেন– 'আগুনে তো পুড়ছে গুটি কয়েক কাফেরের লাশ। কুফুরীর পুরো অস্তিত্বটাই ছাই-ভস্ম পরিণত করতে হলে কুরবানী আর ত্যাগের অনন্ত ইতিহাস রচনা করতে হবে। শুধু রণাঙ্গনের বিজয় অর্জনেই কুফরীর বিনাশ সাধন হবে না। বহু রণাঙ্গনে জীবনের বহু ময়দানে হাজারো অঙ্গনে জিহাদ প্রয়োজন। এই সমাজও জিহাদের একটি অঙ্গন। প্রতিটি ঘরই জিহাদের অঙ্গন। পৃথক পৃথকভাবে প্রতিটি ব্যক্তিই জিহাদের অঙ্গন। সবখান থেকে কুফরকে ধ্বংস করতে হবে। কুফরীর পরাজয় সকল ময়দানেই নিশ্চিত করতে হবে। যেমন এই মেয়েটি করে দেখিয়েছে। তার মাকে সে ত্যা করেছে। দুনিয়ার সব মোহকে পায়ে ঠেলেছে।'

ঃ 'এখানে তো আপনারা আবার তাঁবু ফেলার চিন্তা করছেন না?'–আবু যুবায়ের ও হাবীবকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কেউ একজন বললো।

ঃ 'না ভাই না'– আবু যুবায়ের উচুঁ আওয়াজে জবাব দিলেন–'জাহান্নামের সেই আগুনের দৃশ্য দেখছি শারিয়া যা উস্কিয়ে দিয়ে জান্নাতে তার ঘরটি বানিয়ে নিয়েছে। তোমরা চলতে থাকো। আমরা আসছি। জাহান্নামের এই ভয়াবহ এলাকা থেকে বের হয়ে কোথাও যাত্রাবিরতি করে আরাম করে নেবো খন।'

অর্ধরাত অতিক্রম করেছিলো। পছন্দ মতো এক স্থানে কাফেলা যাত্রাবিরতি করলো এবং সবাই গা এলিয়ে দিলো।

❖ ❖ ❖

পরদিন এই কাফেলা বিজয় বেশে মদীনার পথে চললো। সন্ধ্যা পর্যন্ত তারা মদীনায় পৌছে যেতো। সূর্য মাথার ওপর এসে গিয়েছিলো। সামনেই একটি খেজুর বাগান। সবাই জানতো এখানে ছোট একটি উদ্যান রয়েছে। খাবার দাবারের জন্য কাফেলা বাগানটিকে বেছে নিলো। সালমান হাবীব ইবনে কাবের পাশে বসতে বসতে বললো–

'ইবনে কাব! পথে শারিয়া আমাকে প্রায় তিনবার বলেছে, সে মদিনায় পৌছেই আনুষ্ঠানিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করবে। সে জিজ্ঞেস করছিলো ইসলাম গ্রহণের কোন বিশেষ তরীকা আছে কিনা না এতটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, সে আজ থেকে মুসলমান?

ঃ 'কেন ইসলাম গ্রহণের পদ্ধতি তুমি জানো না?'–হাবীব বললো–'সে যদি এতই ব্যাকুল হয় তবে একাজ এখানেই হতে পারে।' হাবীব উঠে দাঁড়ালো এবং এদিক সেদিক বিক্ষিপ্ত হয়ে বসে থাকা কাফেলার সকলকে উদ্দেশ করে জিজ্ঞেস করলো।

ঃ 'এই কাফেলার আমীর কে?'

ঃ 'এতক্ষণ পর এর কি প্রয়োজন পড়লো?'–কেউ একজন জিজ্ঞেস করলো।

ঃ 'ইসলাম কবুলের জন্য শারিয়া এখন আকুল হয়ে আছে'– হাবীব জবাব দিলো–'আর এই মহৎ কাজ আমীরে কাফেলার মাধ্যমে হলে আরো কল্যাণকর হবে।'

প্রায় সবার নজরই তখন আবু যুবায়েরের ওপর গিয়ে পড়লো।

'খোদার কসম!–হাবীবের এক বন্ধু বললো– 'যে কাফেলায় আবু যুবায়ের আছেন তাতে কেইবা আমীরি আর নেতৃত্বের দাবী করতে পারবে?'

ঃ 'আর সম্ভবত এখানে এমন কেউ নেই যে মান্যবর আবু যুবায়েরের নেতৃত্বে বিরোধিতা করবে'– অন্য আরো কজন বললো।

পৃথক পৃথকভাবে কাফেলার সবাই এ প্রস্তাবে সম্মতি জানালো। হাবীব ইবনে কাব শারিয়াকে আবু যুবায়েরের সামনে বসিয়ে বললো–

'একে ইসলামে দীক্ষিত করুন। আমীর ইমামও হয়ে থাকেন। যিনি ফরয নামাযের ইমামতিও করান।'

ঃ 'শারিয়া'!– আবু যুবায়ের জিজ্ঞেস করলেন- 'স্বইচ্ছায় কি তুমি ইসলাম গ্রহণ করছো?'

'স্বইচ্ছায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে এবং অন্তরের টানে।' শারিয়া জবাব দিলো।

ঃ 'মহান আল্লাহ ছাড়া আর কারো ভয় কি তোমার ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে?'– আবূ যুবায়ের জিজ্ঞেস করলেন–'কোন মুসলমান তোমাকে বাধ্য করেনি তো? কেউ তো কোন লোভ দেখায়নি?

ঃ 'না! দৃঢ় কণ্ঠে জবাব দিলো শারিয়া।

আবু যুবায়ের নিয়ম মতো তাকে ইসলামে দীক্ষিত করলেন।

ঃ 'আমীর তো বিয়েও পড়াতে পারেন?– আবু যুবায়ের বললেন।

শারিয়ার মুখ লাল হয়ে গেলো।

ঃ 'নিশ্চয়! নিশ্চয়'– পুরো কাফেলা উচ্চ কণ্ঠে বলে উঠলো।

আবু যুবায়ের তার ছেলে সালমানকে শারিয়ার পাশে বসালেন, তারপর স্মিত হাস্যে তাদের বিয়ে পড়ালেন।

দুই ঘোড় সওয়ার তখন মদীনা থেকে ইরাক রণাঙ্গনে যাচ্ছিলো, মুহায়মিয়া ইবনে যানীম ও শাদ্দাদ ইবনে আওস-দুই ঘোড় সওয়ারের নাম। খলীফা হযরত উমর (রা) এর অতিগুরুত্বপূর্ণ একটি পয়গাম আবু উবায়দা (রা) এর কাছে নিয়ে যাচ্ছিলো। আবু উবায়দা (রা) সিরিয়ার রণাঙ্গনের সালার ছিলেন। সিপাহসালার ছিলেন খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা)। ইতিহাসের পাতায় তাঁর এই পয়গাম আজো লেখা আছে। তাতে লেখা ছিলো–

'খলিফা উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) এর পক্ষ থেকে

আবু উবায়দা (রা)- কে–

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

'আমি তোমাকে আল্লাহর ভয়ে ভীত-কম্পিত থাকার নসীহত করছি। আল্লাহর অস্তিত্ব চিরন্তন। তিনিই আমাদেরকে পথভ্রষ্টতা থেকে রক্ষা করেন এবং অন্ধকারে আলোর পথ দেখান। আমি তোমাকে খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা) এর স্থানে সেখানকার পুরো লশকরের সিপাহসালার নিযুক্ত করছি। ব্যক্তিগত উপকারের জন্য কোন মুসলমানকেই সংকটে ফেলবে না। এমন কোন সৈন্যশিবিরে বা সৈন্য ছাউনিতে বা কোন এলাকায় তাঁবু ফেলবে না যে স্থান সম্পর্কে তুমি পূর্ব থেকে অবগত নও। যেকোন লড়াইয়ে সৈন্যদল তখনই পাঠাবে যখন সকলেই সুশৃংখলিত হবে। এমন কোন ফয়সালা করবে না যাতে কোন মুসলমানের প্রাণের আশংকা থাকে। আল্লাহ তাআলা তোমাকে আমার পরীক্ষার এবং আমাকে তোমার পরীক্ষার মাধ্যম বানিয়েছেন। দুনিয়ার মোহ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবে। পার্থিব মোহ থেকে চোখ বন্ধ রাখবে। অন্যথায় এটা তোমাকে এমনভাবে ধ্বংস করবে যেমন তোমার পূর্ববর্তী লোকদের ধ্বংস করেছে। তুমি তো জানো তারা তাদের স্থান থেকে কোন অতলে গিয়ে পৌছেছিলো।'

পত্র মারফত এই পয়গামের অর্থ পরিষ্কার ছিলো। হযরত উমর (রা) খিলাফতের দায়িত্ব নেয়ার পরই খালিদ (রা)কে সিপাহসালারের পদ থেকে অব্যাহতি দিয়েছিলেন। খালিদ (রা)কে সালার আর আবু উবায়দা (রা) কে সিপাহসালার নিযুক্ত করেছিলেন। যিনি খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা)-এরই অধীনস্থ সালার ছিলেন।

এই পয়গাম প্রেরণের চার-পাঁচ দিন আগে উমর (রা) এর আরেকটি পয়গাম ইরাক রণাঙ্গনে যাচ্ছিলো। তাতে প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর (রা) এর মৃত্যুর শোকসংবাদ ছিলো। ইয়ারফা নামক এক হাবশী মুসলমান সেই পয়গামের বাহক ছিলো। ইয়ারফা উমর (রা) এর গোলাম ছিলো। উমর (রা) গোলামী পছন্দ করতেন না বলে ইয়ারফাকে আযাদ করে দিয়েছিলেন।

খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা) অব্যাহতিদানের পয়গামবাহক দুই ঘোড় সওয়ার খুব কম স্থানেই তাঁবু ফেলে সফর করছিলো। তাই তারা চারপাঁচ দিন পর রওয়ানা করে। সেদিন তারা ইরাক রণাঙ্গনে পৌছে যে দিন ইয়ারফা পৌছেছিলো। এভাবেই আবু বকর (রা) এর মৃত্যুসংবাদ ও খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা) এর সেনাপতির পদ থেকে অব্যাহতি দানের সংবাদ একই দিনে পৌছে। আবু উবায়দা (রা) এর নামেই যেহেতু এই পয়গাম পাঠানো হয়েছিলো তাই তা তাঁর হাতে দেয়া হলো। তিনি উভয় পয়গামই পড়লেন। তারপর তা পকেটে রেখে পয়গামবাহকদেরকে বিদায় করে দিলেন। তখন খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা) রোমকদের বিরুদ্ধে লড়ছিলেন এবং দামেশককে অবরুদ্ধ করে রেখেছিলেন।

৬৩৪ খ্রিঃ এর অক্টোবরের প্রথমদিকে খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা) অত্যন্ত রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ের পর দামেশক জয় করেন। রোমকরা অস্ত্র সমর্পণ করে এবং মুসলমানরা স্থায়ীভাবে দামেশক কব্জা করে নেয়। দামেশক বিজয়ের পর প্রথমে হযরত খালিদ (রা) প্রথম খলীফা আবুবকর (রা) এর নামে পত্র লেখালেন। দামেশক বিজয় ও যে অসাধারণ বীরত্বের পর এ বিজয় অর্জিত হয় তার বিস্তারিত বিবরণ এবং গনীমতের মাল তথা যুদ্ধলব্ধ সম্পদের বিস্তারিত তালিকাও তাতে লিপিবদ্ধ করান। তিনি এও লেখান যে, যুদ্ধলব্ধ সম্পদের এক পঞ্চমাংশ বায়তুলমালের জন্য খুব শীঘ্রই পাঠাবেন। পত্র লেখা শেষ হলে খালিদ (রা) তা বাহকের হাতে দিয়ে তাকে বিদায় করে দিলেন।

৬৩৪ খ্রিঃ এর পহেলা অক্টোবর (১৩ হিঃ ২২ শাবান) এই পয়গাম পাঠানো হয়েছিলো। আর এর এক মাস আট দিন পূর্বে ৬৩৪ এর ২২শে আগস্ট (২২ জমাদিউসসানী) এর সন্ধ্যায় আবুবকর (রা) এর ইন্তিকাল হয়েছিলো।

আবু উবায়দা (রা) খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা) এর তাঁবুতে প্রবেশ করলেন। খালিদ (রা) বিজয় আর সেনা সাহায্য পাওয়ার যুগপৎ উচ্ছ্বাসে 'দামেশক বিজয় মোবারক হো' বলে আবু উবায়দা (রা) এর গলা জড়িয়ে ধরলেন। কিন্তু আবু উবায়দা (রা) এই উচ্ছ্বাসে যোগ দিতে পারলেন না। বেদনায় ভরাক্রান্তে তিনি যেন একেবারে নুয়ে পড়ছিলেন। খালিদ (রা) পেছনে সরে গেলেন। হযরত আবু উবায়দা (রা) এর চোখে তখন বেদনার অশ্রু।

ঃ 'আল্লাহর কসম! এ অশ্রু নিশ্চয় খুশীর অশ্রু'–খালিদ (রা) আগের মতো উচ্ছ্বসিত গলায় বললেন।

ঃ 'না ইবনুল ওয়ালীদ!'–আবু উবায়দা (রা) ভারী গলায় বললেন–'খলীফাতুর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু বকর (রা) চলে গেছেন। এখন উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) খলীফা।

ঃ 'কবে তিনি চলে গেলেন?'–খালিদ (রা) থতমত খেয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

ঃ '২২ জমাদিউসসানী সন্ধ্যায়!'

ঃ 'এত দিন পর আমাকে জানানো হলো?'–খালিদ (রা) থমথমে গলায় জিজ্ঞেস করলেন–'দূতের এখানে পৌঁছতে কি এক মাসেরও অধিক সময় লাগে ....?'

ঃ 'দূত তো তাড়াতাড়িই এসে গিয়েছিলো'– আবু উবায়দা (রা) খালিদ (রা) কে বাঁধা দিয়ে বললেন–'দূত এসে দেখলো দামেশক অবরোধ নিয়ে আমরা ব্যস্ত। সে এই চিন্তায় আমাদেরকে পয়গাম দেয়নি যাতে খলীফা আবুবকর (রা) এর মৃত্যুসংবাদ এই অবরোধে মন্দ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না করে। সে আমাকে শুধু এ সংবাদটুকুই দিয়েছিলো যে মদীনার খবর ভালো এবং সেনা সাহায্য আসছে। এর দুদিন পর আমাকে সে এই পত্র দিয়েছে। তারপরও আমি এই ভেবে সংবাদ দেইনি যে, দামেশকের ফয়সালা হয়ে যাওয়ার পর তোমাকে ও মুসলিম লশকরকে এই সংবাদ জানাবো।'

খালিদ (রা) এমন মূক– শব্দহীন হয়ে পড়েছিলেন যেন পুরো দুনিয়ার সাথেই তাঁর সমস্ত সম্পর্ক চুকে গেছে।

ঃ 'খলীফায়ে ছানী উমর (রা) এর আরেকটি হুকুমনামাও এসেছে'–আবু উবায়দা (রা) ভারী গলায় বললেন–'এটাও আমি দামেশকের যুদ্ধ খতম হওয়ার পরই তোমাকে দেয়া সমীচীন মনে করেছি।'

আবু উবায়দা (রা) পয়গামনামা খালিদ (রা) এর হাতে দিলেন। খালিদ (রা) সেটি পড়লেন। তাঁর ঠোঁটে সামান্য হাসি ফুটে উঠলো। সে হাসিতে ছিলো বেদনার আভাস।

ঃ 'আল্লাহর রহমত নাযিল হোক আবুবকর (রা) এর ওপর'– বিষাদ ভরা গলায় বললেন খালিদ (রা)–'আবুবকর (রা) জীবিত থাকলে হয়তো আমার পরিণাম এমন হতো না।'

হযরত খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা) এর অব্যাহতিদান উমর (রা) এর একটি সাহসী পদক্ষেপ ছিলো। এর পূর্বে তিনি মুরতাদদের আত্মীয়দের মধ্যে যারা গোলাম বাদী ছিলো তাদেরকে আযাদ করে দেয়ার হুকুম জারী করে আরেকটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। হযরত আবুবকর (রা) এর হুকুমে বা অনুমতিতেই তাদেরকে মুসলমানরা গোলাম বাদীরূপে গ্রহণ করেছিলো। তাই অনেকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন তুলেছিলো। কিন্তু উমর (রা) কঠিন যুক্তি-প্রমাণ পেশ করেছিলেন এবং তাঁর সিদ্ধান্তেই অটল ছিলেন। তাই মুসলমানরা তার এই ফয়সালা মেনে নিয়েছিলো।

কিছু দিন যাওয়ার পরই লোকেরা দেখলো, উমর (রা) এর এই ফয়সালা কত সময় সাপেক্ষ ও চমৎকার ছিলো। তখন ইরাক রণাঙ্গন থেকে সেনা সাহায্যের জন্য মুসান্না ইবনে হারিসা মদীনায় এসেছিলেন। কিন্তু ইরাক অভিযানে যেতে কেউ স্বতঃস্ফূর্ত ছিলো না। পরে যখন আবু উবায়েদ সমবেত জনতার মধ্য থেকে উঠলেন এবং অভিযানে যাওয়ার ঘোষণা দিলেন তখন অনেকেই যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলো। দেখতে দেখতে সংখ্যায় প্রায় হাজারখানেক হয়ে গেলো। কিন্তু এই সামান্য সংখ্যা যথেষ্ট ছিলো না। যেসব মুরতাদদের আত্মীয়াদেরকে গোলামী থেকে মুক্তি দেয়া হয়েছিলো তারা এতই প্রভাবান্বিত হয়েছিলো যে, সত্য মনে তারা মুসলমান হয়ে সাহায্যকারী সেনাদলে যোগদান করেছিলো। তখনই মুসলমানরা বুঝতে পেরেছিলো যে, উমর (রা) এর ফয়সালা কতখানি কার্যকরী ও দূর-দৃষ্টিসম্পন্ন।

খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা) এর ব্যাপারে যে ফয়সালা করা হয়েছিলো তাও এধরনেরই ছিলো। অনেকেই এতে খুশী হতে পারেনি। সবাই জানতো খালিদ (রা)কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'সায়ফুল্লাহ'-'আল্লাহর তরবারি' উপাধি দিয়েছিলেন। এটাও জানতো যে, তিনি তাঁকে এমনিতেই এ উপাধি দেননি। সত্যিই তিনি সাক্ষাত আল্লাহর তরবারি ছিলেন। রোমকদেরকে প্রতিটি ময়দানেই যিনি পরাজয় বরণে বাধ্য করেছিলেন তিনি খালিদ (রা)ই ছিলেন। হযরত উমর (রা)ও অকপটে স্বীকার করতেন যে, আল্লাহর তরবারি খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা) যদি না থাকতেন তবে শক্তিধর রোমকদের থেকে বিজয় ছিনিয়ে আনা যেতো না। আর তখন আরো সংকটের সময় ছিলো। মুসলমানদের অবস্থান ময়দানে বেশ নাজুক হয়ে গিয়েছিলো। আল্লাহর রহমতে তা সামলানো সম্ভব ছিলো একমাত্র খালিদ (রা) এর মাধ্যমেই। তারপরও খালিদ (রা) এর মতো এমন ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ সিপাহসালারকে বাদ দিয়ে তাঁরই অধীনস্থ এক সালার আবু উবায়দা (রা)কে সিপাহসালার নিযুক্ত করেন এবং খালিদ (রা) কে তার অধীনস্থ সালার নিযুক্ত করেন।

কেউ কেউ বলে থাকে, খালিদ (রা) এর এই অসাধারণ বিজয় ও সফলতার মধ্যে তার ঈর্ষণীয় গ্রহণযোগ্যতা দেখে উমর (রা) হয়তো এ আশংকা করছিলেন যে, খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা) বিজিত এলাকার শাসকও হয়ে যেতে পারেন।

কেউ কেউ তো এটাও বলে, উমর (রা) ও খালিদ (রা) এর মধ্যে পুরনো বিরোধ ছিলো। একটা ঘটনার কারণেই তারা এ অনুমান করে থাকে। মুরতাদদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে খালিদ (রা) অসাধারণ সফলতা অর্জন করে ছিলেন। তাঁর একটি লড়াই মুরতাদদের এক সরদার মালিক ইবনে নুওয়াইরার সঙ্গেও হয়েছিলো। মুরতাদরা বেশ জমিয়েই লড়াই করছিলো। কিন্তু খালিদ (রা) এর সৈন্য পরিচালনার অভিনব নৈপুণ্য আর মুজাহিদদের আত্মত্যাগী হামলার সামনে তারা আর দাঁড়াতে পারেনি। সরদার মালিক ইবনে নুওয়াইর গ্রেফতার হলে তাকে খালিদ (রা) হত্যা করেন এবং তার লায়লা নামক রূপসী স্ত্রীকে বিয়ে করেন।

এই বিয়ের খবর মদীনায় পৌঁছলে উমর (রা) বেশ ক্ষুব্ধ হন। আবুবকর (রা) তখন খলীফা। মদীনায় খবরটা একটু অন্যরকমভাবে পৌঁছেছিলো। তা হলো, মালিকের সুন্দরী স্ত্রীকে বিয়ের জন্য খালিদ (রা) মালিককে হত্যা করেছেন। উমর (রা) আবুবকর (রা) কে বললেন, তাঁকে যেন এজন্য শাস্তি দেয়া হয়। আবুবকর (রা) বলেছিলেন, এখন যেটা দেখার বিষয় সেটা হলো, খালিদ (রা) কেমন এক যুদ্ধে এবং কেমন এক পরিস্থিতে যুদ্ধ করে কি অভাবনীয় সাফল্য পেয়েছেন। তিনি যদি একটি বিয়ে করে থাকেন এবং তা যদি বৈধ পন্থায় হয় তবে সেদিকে আমরা তাকাবো কেন?

উমর (রা) হয়তো তা মেনে নিতে মন থেকে সমর্থন পাননি। একারণে খালিদ (রা) এর প্রতি তাঁর অসন্তুষ্টি রয়ে গিয়ে থাকবে। প্রকৃত ঘটনাছিলো এরকম- মালিক ইবনে নুওয়াইরা প্রথমে মুসলমানই ছিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালের পর তার গোত্র থেকে যাকাত আদায় করতে গেলে মালিক আদায়কৃত

যাকাতের সকল অর্থ-কড়ি সবাইকে ফেরত দিয়ে দেয়। তারপর কবীলার সবাইকে ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করে তোলে। এর পরপরই সাব্বাহ্ নামক এক মহিলা নবুওয়তের দাবী করে বসে। মালিক ইবনে নুওয়াইর তখন শুধু সাব্বাহকে সমর্থনই করেনি বরং তার নিজ গোত্র ও সহযোগী গোত্রের লোকদেরকে বললো যে, সে সাব্বাহকে নবী হিসেবে মেনে নিয়েছে। সাব্বাহ ইরাকের অধিবাসী আলহারিসের মেয়ে ছিলো। তার আরেকটি নাম ছিলো উম্মে সাদারাহ।

সবচেয়ে বড় অপরাধ তার যেটি ছিলো তা হলো, সে এলাকায় মুসলমানদের যতগুলো বসতি ছিলো সবগুলোকেই সে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মুসলমানদেরকে নির্বিচারে হত্যা করে। পরে খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা) তাকে পরাজিত করে গ্রেফতার করেন। এবং তার সমস্ত অপরাধের কথা তাকে জিজ্ঞেস করলে সে সব স্বীকার করে। খালিদ (রা) তাকে জানিয়ে দেন তার মতো লোককে ক্ষমা করা যায় না, যে মুসলমানদেরকে বিনা অপরাধে হত্যা করেছে এবং তাদের বসতিগুলো জ্বালিয়ে দিয়েছে।

মালিক ইবনে নুওয়াইরকে খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা) হত্যা করেন এবং তার স্ত্রী লায়লাকে দাসী না বানিয়ে বিয়ে করে স্ত্রীর মর্যাদা দেন। ৬৩২ খ্রিঃ এর ডিসেম্বরে এই বিয়ে হয়েছিলো। আর এখন ৬৩৪ খ্রিঃ এর আগষ্টে উমর (রা) তাঁকে অব্যাহতি দিলেন। অনেক ঐতিহাসিকরাই উমর (রা) এর এই ঘটনাকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার চেষ্টা করেছেন। এর দ্বারা ঐসব ঐতিহাসিকরা ইসলামের ইতিহাসের কোন কল্যাণ সাধন করেননি।

খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা) স্বীয় গোত্র-সরদারের পুত্র ছিলেন। তাঁর খান্দান বড় অভিজাত ছিলো। ব্যক্তিগতভাবে তিনি খুবই বন্ধু বৎসল, অমায়িক, সদাহাস্যময় এবং প্রাণ প্রাচূর্যময় লোক ছিলেন। স্বাচ্ছন্দ থাকতে তিনি পছন্দ করতেন, কিন্তু দারিদ্রতাকে ভয় পেতেন না। উপহার-উপঢৌকন দিতে খুব পছন্দ করতেন এবং দানশীলতায় তাঁর ভিন্ন প্রসিদ্ধি ছিলো। কারো কোন কিছুতে খুশী হলেই তিনি উপহার দিতেন তাকে। খালিদ (রা) এর অতিমাত্রায় উপহার উপঢৌকন প্রদানের ব্যাপারে উমর (রা)-এর অভিযোগ ছিলো। উমর (রা) তাকে সিপাহসালার থেকে অব্যাহতি দিলে অনেকেই তাঁর এই ফয়সালাকে প্রশ্ন বিদ্ধ করেছিলো। অবশেষে তিনি তাঁর এক খুতবায় এর ব্যাখ্যা প্রদান করেন এভাবে–

'আমি মহান আল্লাহ ও উম্মতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে আমার কর্মকাণ্ডের জবাবদিহিতা পেশ করছি। আমি খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা) কে ব্যক্তিগত কোন আক্রোশে বা ভিত্তিহীন কোন অভিযোগের কারণে সিপাহসালারের পদ থেকে অব্যাহতি দেইনি। খালিদ (রা) আমীর বংশের সম্ভ্রান্ত এক ব্যক্তি, আমীরি পরিবেশে তিনি বড় হয়েছেন। এজন্য তাঁর সহজাত স্বভাব চরিত্রই আমীরি প্রাচুর্যে ভরা। তিনি কবিদেরকে বখ্‌শীশ দেন। খরচের বেলায় তিনি মিতব্যয়ী নন। অথচ তাঁর এসব অর্থ সাহায্যস্বরূপ বায়তুল মালে আসা উচিত ছিলো বা কোন অভাবী লোকের ঘরে যাওয়া উচিত ছিলো। তীর চালনায় দক্ষ ও পাহলোয়ানদেরকেও তিনি পুরস্কৃত করে থাকেন। আবুবকর (রা) এর খেলাফতকালে আমাকে বলা হয়েছিলো, তিনি আশআম

ইবনে কায়েস নামক এক কবিকে দশ হাজার দিরহাম পুরস্কার দিয়েছেন। তিনি যদি এটা তাঁর প্রাপ্য গনীমতের মালের অংশ থেকেও দিয়ে থাকেন তবুও এটা বেহিসেবী খরচ। এ ধরনের খরচ কি ইসলাম অনুমোদন করে? আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খলীফা আবুবকর (রা)কে যে পরামর্শ দিয়েছিলাম নিজে আমি তা কেন কার্যকরী করবো না?'

হযরত উমর (রা) এর এই ফয়সালার মাধ্যমে তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তা ও নৈতিকতার প্রতি কঠোর যত্নশীলতাই প্রমাণ করে। তিনি খুবই নাজুক পরিস্থিতিতে এই দুঃসাহসিক ফয়সালা নিয়েছিলেন। রণাঙ্গনে লড়াইরত মুজাহিদদের মধ্যে এজন্য অসন্তোষ দেখা দিতে পারতো। কোন কোন অংশে সামান্য অসন্তোষ দেখা দিয়েও ছিলো, কিন্তু তা বিদ্রোহের প্রকাশ ছিলো না; বরং খালিদ (রা) এর প্রতি সমবেদনার প্রকাশ ছিলো। কারণ মুসলমানরা তখন খলীফা ও আমীরের যেকোন ফয়সালার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকতো। হযরত উমর (রা) এর কোন ফয়সালার প্রতি কেউ অসৌজন্যতা দেখাবে এমন চরিত্রের কোন মুসলমান তখন ছিলো না। অথচ ইসলামী ফৌজে খালিদ (রা)-এর গ্রহণযোগ্যতা ছিলো পীর-মুরশিদ বা ভক্ত-শিষ্যের মতো। এজন্য মুজাহিদগণের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হওয়ার কথা ছিলো। কিন্তু এতে খুব বড় প্রভাব মুজাহিদগণের মধ্যে পড়েনি। সকলেই প্রতীক্ষায় ছিলো খালিদ (রা) এর প্রতিক্রিয়া কি হয় তা দেখার জন্য।

সবচেয়ে বেশি পেরেশান ছিলেন খালিদ ইবনুল ওয়ালীদের (রা) স্থানে নতুন সিপাহসালার আবু উবায়দাহ ইবনুল জাররাহ (রা)। রোমকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিস্থিতির অনেকটাই তো সালারদের কব্জায় ছিলো, প্রতিটি ময়দানেই এবং প্রতিটি অভিযানেই রোমকদরকে পরাজিত করেছিলো। দামেশকও বিজয় হয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু রোমকরা মামুলি কোন যুদ্ধবাজ ছিলো না যে, কয়েকটি ছোট খাটো পরাজয়েই তারা হতাশার গ্লানি নিয়ে নিজেদেরকে মুসলমানদের কাছে হাওলা করে ময়দান থেকে ভেগে যাবে। তারা তাদের কালের এক ভয়ানক যুদ্ধশক্তি ছিলো। মুসলমানদেরকে পূর্ণ ধ্বংসের জন্য তাদের ফৌজদের সমবেত করার জন্য তৈরী ছিলো।

সবাই জানতো রোমকদের পা টলানোর জন্য খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা) এর মধ্যে যে যোগ্যতা ছিলো অন্যকোন সালারের মধ্যে তা ছিলো না। এটা সাধারণ কোন যুদ্ধ ছিলো না। মুসলমানরা তো তাদের প্রবল জোশ আর জযবা বুকে নিয়ে লড়ছিলো। কিন্তু তাদের বিপক্ষ শক্তির হাতিয়ার আরো উন্নত ছিলো। কয়েকগুণ বেশি তাদের তাজাদম ঘোরা ছিলো। সৈন্যসংখ্যা কোথাও পাঁচগুণ কোথাও আট গুণ বেশি ছিলো। প্রবল জযবা আর মর্যাদার লড়াই ছিলো এটা। সামান্য সৈন্যসংখ্যা নিয়ে বিপুল সংখ্যক দুশমনের বিরুদ্ধে লড়াই করা এবং তাদের পা টলানোর যোগ্যতা খালিদ (রা) এর মধ্যেই ছিলো। সমস্ত সালার আর মুজাহিদরা এটা ভেবে পেরেশান হচ্ছিলো যে, খালিদ (রা) যদি এই বরখাস্তের প্রতিবাদে ময়দান ছেড়ে চলে যান তবে মুসলমানদের অবস্থা না জানি কি হবে। এ ছাড়াও সেনা সাহায্যের প্রয়োজনীয়তাও প্রকটভাবে অনুভূত হচ্ছিল।

আবু উবায়দা (রা) অভিজ্ঞতায় উত্তীর্ণ এক সালার ছিলেন। অত্যন্ত খোদাভীরু ও আমলী লোক ছিলেন। তাঁকে 'আমীনুল উম্মত' বলা হতো। ময়দানে তাঁর বীরত্বপূর্ণ লড়াই ও নিপুণ নেতৃত্ব সত্যিই অসাধারণ ছিলো। দুশমনদের জন্য অতর্কিত বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াতেন তিনি। কিন্তু সিপাহসালার হিসেবে খালিদ (রা) এর মধ্যে সৈন্য পরিচালনার যে সহজাত প্রতিভা, ক্ষিপ্রতা ও অভিনবত্ব ছিলো এর সমতুল্য প্রতিভা অন্য কারো মধ্যে ছিলো না। নেতৃত্বদানে তার বিস্ময়কর প্রতিভা পরবর্তী একটি ঘটনা থেকেই স্পষ্ট বুঝা যায়।

দামেশক বিজয়ের পর নতুন সালারে আলা আবু উবায়দা (রা) মুজাহিদদেরকে কিছু দিন বিশ্রামের সুযোগ দিতে চেয়েছিলেন। জবাবী হামলার জন্য রোমকরা তৈরী নিচ্ছিলো। খালিদ (রা) সিপাহসালার থেকে সালার হয়েছেন মাত্র ছয় সাতদিন হলো। একদিন আবু উবায়দা (রা) এর কাছে অপরিচিত এক লোক এসে বললো, সে এক খ্রিস্টান। একটি গোপন সংবাদ দিতে এসেছে। আবু উবায়দা (রা) তাকে বসালেন।

ঃ 'এখান থেকে কিছু দূর ছোট একটি শহর আছে, নাম কসবা'–আগন্তুক খ্রিস্টান বললো–'প্রতি বছরই সেখানে মেলা বসে। দু' তিন দিন পর এ মেলা শুরু হবে। দূরদূরান্ত থেকে ব্যবসায়ী ও সওদাগররা হরেক রকমের মালপত্র নিয়ে আসবে। স্বর্ণ-রূপার অলংকার ও হীরা-জহরতসহ অতি মূল্যবান পাথরও তারা সেখানে নিয়ে আসবে। এছাড়াও মূল্যবান সব জিনিসপত্রের দোকান খোলা হবে। এই আশায় যেসব ক্রেতারা আসে তারাও থাকে বেশ সম্পদশালী ও ধনবান। মেলাটি রোমীয়দের, আর রোমীয়দের সাথেই আপনার দুশমনী ও যুদ্ধ। তিন চার দিন পর মেলা শুরু হলে আপনি যদি সেখানে আচানক হামলা করতে পারেন তবে এই বিশাল ধন-দৌলত আপনি গনীমত হিসেবে পাবেন। দশটি কেল্লা ও কয়েক শহর জয় করেও আপনি এই পরিমাণ গনীমত পাবেন না।'

আবু উবায়দা (রা) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, সে নিজে একজন খ্রিষ্টান ও রোমীয় হওয়া সত্ত্বেও কেন এভাবে মেলায় হামলার কথা বলতে এসেছে। কারণ মেলায় তো সব খ্রিষ্টান ও ইহুদী ব্যবসাদারীরাই থাকবে।

ঃ 'আমি কট্টর খ্রিষ্টান'–খ্রিষ্টান লোকটি বললো-'আপনি কি জানেন না রোমীয়দের কেউ খ্রিষ্টান হলে তাদের এক বাদশাহ তাকে জীবন্ত ধরে কোন চিতার সামনে ফেলে দিতো। আর চিতাটি জীবন্ত লোকটিকে চিড়ে ফেরে খেয়ে ফেলতো? আপনি এটাও নিশ্চয় জানেন হযরত ঈসা (আ) কে শূলিতে চড়িয়ে ছিলো এই রোমকরাই। এর কিছুদিন পরই তারা খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ করে। প্রজাদেরকে এরা মানুষের মর্যাদা দেয় না। আপনাদের বিজিত এলাকাগুলোতে আমি গিয়েছি। দেখেছি মুসলমানদেরকে তো বটেই অন্যান্য ধর্মালম্বীদেরকেও নীচু চোখে দেখে না কেউ বরং নিজেদের মতোই মানুষ মনে করে। রোমীয়দের জুলুম অত্যাচারে আমার প্রাণ কণ্ঠলগ্ন হয়ে এসেছে। আমি মুসলমান নই ঠিক। কিন্তু আমি যে একজন আরব। রোমীয়দের চাপিয়ে দেয়া এই গোলামী আমার স্বাধীন রক্ত সইবে কেন?'

সেই ঈসায়ীর কথায় আবু উবায়দা (রা) সে মেলায় ঝটিকা হামলার জন্য রাজী হয়ে গেলেন।

ঃ 'আমি আপনাকে এটাও বলে দিচ্ছি'–ঈসায়ী বললো–'আবুল কুদুসের আশে পাশে রোমক ফৌজের নাম নিশানাও থাকবে না। এজন্য আপনার কোন ভয়েরও কিছু নেই। রোমক ফৌজ এখন তারালাম্বাসে আছে। সেখান থেকে তারা তৎক্ষণাৎ আবুলকুদুসে পৌছতে পারবে না। আর তাদেরকে সংবাদ দেয়ারও কেউ নেই।'

আগন্তুক খ্রিষ্টান লোকটি চলে যাওয়ার পর আবু উবায়দা (রা) তাঁর সালারদের ডেকে বললেন, এক আরব্য খ্রিষ্টান এসে তাকে একটি মোটা আর সহজ শিকারের খবর দিয়ে গেছে।

ঃ 'আবুলকুদুস রোমীয়দের এলাকায় পড়েছে'–আবু উবায়দা বলে চললেন–'রোমীয়দের সঙ্গে এখন আমরা যুদ্ধে লিপ্ত। তাই এই মেলায় যেকোন হামলার অধিকার আমাদের আছে। আমাদের আক্রান্ত হওয়ারও ভয় নেই। রোমী ফৌজরা সেখান থেকে অনেক দূরে রয়েছে। আমি কাউকে আদেশমূলক অভিযানে সেখানে পাঠাচ্ছি না। যে কেউ এই ঝটিকা হামলার কমান্ড নিতে চাও সে যেন এখানে চলে আসে এবং পাঁচশ সওয়ার বেছে নেয়।'

আবু উবায়দা (রা) একে একে সব সালারের দিকে তাকালেন। অবশেষে তাঁর নজর খালিদ (রা) এর মুখের ওপর গিয়ে আটকে গেলো। তাঁর আশা ছিলো খালিদ (রা) একথা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই এই ঝটিকা হামলার জন্য তৈরী হয়ে যাবেন। কিন্তু খালিদ (রা) এর চেহারা নির্বিকার ছিলো। তিনি চুপচাপ বসে রইলেন। আবু উবায়দার নজর তার চেহারার ওপরই আটকে রইলো, খালিদ (রা) মুখ অন্য দিকে ঘুরিয়ে নিলেন।

খালিদ (রা) এর সেই ঝটিকায় যাওয়া না যাওয়া ভিন্ন ব্যাপার ছিলো। তাঁকে আবু উবায়দা (রা) এতটুকুও বলেননি যে, তাকেই এই মেলায় ফৌজ নিয়ে যেতে হবে।

সব সালাররাই নীরব রইলেন।

ঃ 'আমি যাবো'–একটি আওয়াজ উঠলো।

সবাই সেদিকে তাকালেন। তিনি এক নৌজোয়ান সালার ছিলেন। তাঁর চেহারায় মাত্র দাড়ি গোফের চিকন আভা দেখা যাচ্ছিলো।

ঃ 'তুমি এখনো অপরিণত বয়সের এবং অনভিজ্ঞ ইবনে জাফর!'–আবু উবায়দা (রা) বললেন।

আবু উবায়দা (রা) আরেকবার খালিদ (রা) এর দিকে তাকালেন। আগের মতোই তিনি চুপচাপ বসে রইলেন। যেন এসবের সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক নেই।

ঃ 'ঘর থেকে তো আমি এখানে আনন্দ ভ্রমণের জন্য আসিনি'–সেই নৌজোয়ান বললেন–'আমার ওপর আমার শহীদ পিতার ঋণ রয়েছে। আপনারা সবাই জানেন কোন লড়াইয়ে আমার বাবা শহীদ হয়েছেন। তাঁর খুনের বদলা আমাকেই নিতে হবে। আমি বয়সে নবীন ঠিক, কিন্তু কসম আল্লাহর, আমি বুযদিল কাপুরুষ নই। আমি অভিজ্ঞ নই তবে আনাড়ীও নই। আমার সাহস বা বীরত্ব পরীক্ষা করার থাকলে করে নিন। কিছু না শিখে আমি আসিনি। আপনি বলছেন সেখানে রোমী ফৌজই নেই, তাহলে আমার জন্য তো আপনার পেরেশান হওয়া উচিত নয়।'

ঃ 'হ্যা, ইবনে জাফর'–আবু উবায়দা (রা) বললেন–'আমি তোমার সাহস ভেঙে দিচ্ছি না। পাঁচশ সওয়ার নির্বাচন করে আমি তোমাকে দিচ্ছি। তাদের নেতৃত্বের ভার তোমার হাতে।'

এক নৌজোয়ানকে পাঁচশ ঘোড় সওয়ারের নেতৃত্ব দেয়া খুব বুদ্ধিমানের কাজ নয়। কিন্তু এই নৌজোয়ান কোন সাধারণ নৌজোয়ান ছিলেন না। তাঁর নাম ছিলো আবদুল্লাহ ইবনে জাফর। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচাত ভাই বিখ্যাত বীর সাহাবী জাফর (রা) এর ছেলে ছিলেন। জাফর (রা) মূতার যুদ্ধে মরণপণ লড়াই করে শহীদ হয়েছিলেন।

আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রা) আবুলকুদুস যাওয়ার প্রস্তুতি নেয়া শুরু করলেন। অভিযানের তখনো তিন চারদিন বাকী ছিলো।

তিন চার দিন পর আব্দুল্লাহ বাছা বাছা পাঁচশ ঘোড় সওয়ার নিয়ে আবুলকুদুস অভিমুখে রওয়ানা হলেন। তাঁর সঙ্গে প্রখ্যাত জানবায মুজাহিদ এবং নববী আদর্শের প্রতীক হযরত আবুযর গিফারী (রা)ও ছিলেন।

এই ফৌজ ১৪ অক্টোবর ৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দে রাতে রওয়ানা হয়েছিলো। শাবানের পনের তারিখের চাঁদনী রাত ছিলো। চাঁদের আলোয় রাতের মরু বড়ই স্বচ্ছ দেখাচ্ছিলো। এই খণ্ড ফৌছ রাতেই তাদের সফর শেষ করে। সূর্যোদয়ের সময় তারা আবুলকুদুসের উপকণ্ঠে গিয়ে পৌঁছলো। আবদুল্লাহ ও আবুযর গিফারী (রা) মেলার দোকানগুলো খোলার অপেক্ষায় একটু দূরেই ফৌজদের থামিয়ে দিলেন। তাবু শামিয়ানা আর রঙবেরঙের কাপড়ে বেষ্টিত সুদৃশ্য দোকানগুলো দ্বারা মেলা অঙ্গন বিশাল এক শহরের রূপ নিয়েছিলো। দোকান খোলার পর বোঝা গেলো কত দামী ও দুর্লভ বস্তুতে দোকানগুলো ঠাসা। সূর্য একটু উঁচু হওয়ার পরই মেলা লোকে পূর্ণ হয়ে গেলো।

আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রা) সওয়ারদের হুকুম দিলেন মেলা ঘেরাও করে নিতে। পাঁচশ ঘোড়সওয়ার ঘোড়ার পেটে খোঁচা দিয়ে নিমেষেই মেলা নিজেদের বেষ্টনীতে নিয়ে নিলো। আচানক প্রায় পাঁচ হাজার রোমী ঘোড়সওয়ার বেরিয়ে এলো। মরু তুফানের মতোই তারা আচমকা উদয় হলো এবং ক্ষিপ্রতার সঙ্গে মুসলিম সওয়ারদের ঘিরে ফেললো। কোথায় পাঁচ হাজার আর কোথায় পাঁচশ। তাও তারা এখন শত্রুবেষ্টিত।

মুজাহিদরা বেষ্টনী থেকে বের হওয়ার জন্য ঘোড়া এদিক সেদিক ছুটাতে লাগলো। কিন্তু সব দিকেই রোমী সওয়াররা গায়ে গায়ে লেগে দেয়াল তুলে দাঁড়ালো। মুসলমানদের বের হওয়ার আর কোন পথ রইলো না। প্রতিটি ময়দানেই দুশমনের চেয়ে মুসলমানদের সৈন্যসংখ্যা কম ছিলো। মাত্র দশ হাজার মুজাহিদ এক লক্ষ দুশমনের বিরুদ্ধে লড়াই করে সফল হয়েছে। কিন্তু সেটা ছিলো পরিকল্পিত আর সালারদের সুশৃংখল নেতৃত্বে গড়া মুজাহিদ বাহিনীর লড়াই। কিন্তু এখানে তারা আচমকা আর অপ্রত্যাশিতভাবে দশগুণ সৈন্যের হামলার মুখে পড়েছে। মুজাহিদরা সবাই পালানোর চিন্তা বাদ দিয়ে মুখোমুখি লড়াইয়ে নেমে পড়লো।

পৃথক পৃথকভাবে মুজাহিদরা লড়ছিলো। জীবন মৃত্যুর ফয়সালাকৃত লড়াই ছিলো সেটা। নির্ভীক মনে মুজাহিদরা লড়ছিলো। কিন্তু এমন আচমকা লড়াইয়ে এক এক সওয়ার দশজন সওয়ারের মোকাবেলা করে জীবিত ফিরে আসবে এমনটা ভাববার অবকাশ ছিলো না। লড়াই তো তারা চালিয়েই গেলো এবং খুব ভালো লড়াই করলো কিন্তু রোমকদের তরবারি আর বর্শার আঘাতে তারা কচুকাটা হতে লাগলো। মুজাহিদরা চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো এবং প্রত্যেকেই নিজেকে বাঁচাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো।

লড়াই শুরু হওয়ার আগেই এক মুজাহিদ কিভাবে যেন সেখান থেকে বের হয়ে গিয়েছিলো। মুজাহিদদের ঘাঁটি সেখান থেকে খুব বেশি দূরে ছিলো না। প্রাণপণ ঘোড়া ছুটিয়ে এই মুজাহিদ মূল ফৌজী চৌকিতে এসে পৌঁছলো এবং সিপাহসালার আবু উবায়দা (রা)কে জানালো যে, আবুল কুদুসে কি হচ্ছে এখন।

ঃ 'আমি এটা অবশ্য দেখে আসিনি যে, রোমকদের ঘেরাও পূর্ণ হওয়ার পূর্বে আমাদের সওয়াররা সেখান থেকে বের হতে পেরেছে কিনা'– আগত সেই সওয়ার বললো– 'যদি বের হতে না পারে তবে কেউ সেখান থেকে জীবিত ফিরবে না।'

আবু উবায়দা (রা) এর ফর্সা চেহারা কালো হয়ে গেলো। এতক্ষণে তিনি বুঝতে পারলেন এটা রোমীয়দের ষড়যন্ত্রের জাল ছিলো। সেই খ্রিষ্টানকে পাঠানো হয়েছিলো মুসলমানদেরকে এই জালে ফাসাতে। মেলাটাকে সে জালের টোপ হিসেবে ব্যবহার করেছে। খুব সহজেই তিনি সেই জালে পা দিয়েছেন।

সেই খ্রিষ্টানকে তো তিনি বিশ্বাস করেছেনই-সঙ্গে সঙ্গে আরেকটি ভয়ানক ভুল করেছেন এই যে, অপরিণত বয়স্ক এবং অনভিজ্ঞ এক সালারের হাতে পাঁচশ সওয়ারের নেতৃত্ব দিয়েছেন। তাও সন্দেহমূলক এক অভিযানে। তাছাড়া আবুলকুদুস রোমকদের এলাকা হওয়াতে এ ধরনের আশংকাও অমূলক ছিলো না।

আবু উবায়দা (রা) কে যখন এখবর দেয়া হলো তখন প্রায় সকল সালাররাই তাঁর কাছে বসা ছিলেন। নিস্তব্ধতা যেন সবাইকে গ্রাস করছিলো। সবার নজর আবু উবায়দা (রা) এর চেহারার ওপর গিয়ে আটকে গেলো। আর আবু উবায়দা (রা) এর দৃষ্টি খালিদ (রা) এর মুখের ওপর নিবন্ধ হলো। তিনি জানতেন বিপদের মুখে ঠেলে দেয়া এসব ফৌজকে খালিদ (রা)ই বাঁচাতে পারবেন। কিন্তু তিনি নিঃসাড় হয়ে বসেছিলেন। তবে তাঁর চেহারায় পেরেশানীর স্পষ্ট ছাপ তিনি দেখতে পেয়েছিলেন।

আবু উবায়দা (রা) এবং অন্যান্য সালারদের ধারণা ছিলো খালিদ (রা) কে যে বরখাস্ত করা হয়েছে তাই এই লড়াইতে তার কোন আগ্রহ নেই। 'আবু সুলায়মান!' আবু উবায়দা (রা) খালিদ (রা) এর ডাকনাম ধরে ডেকে উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন–

'আল্লাহর নামে আবু সুলায়মান। তুমিই তাদেরকে সাহায্য করতে পারবে। তুমিই তাদেরকে শত্রু বেষ্টনী থেকে বের করতে পারবে। এক মুহূর্তও নষ্ট করো না।'

ঃ 'আল্লাহর অপার মদদে আমিই তাদেরকে শত্রু ঘেরাও থেকে মুক্ত করবো'– খালিদ (রা) উঠতে উঠতে বললেন– 'আর আমি তোমার হুকুমেরই প্রতীক্ষায় ছিলাম আমীনুল উম্মত।'

ঃ 'জানিনা কি ভেবে আমি তোমাকে সরাসরি বলিনি'ভআবু উবায়দা বললেন। 'তবে এটা তো জানতাম যে, সেই ঘটনা তোমার মনকে ভালো কিছু উপহার দেয়নি।' 'আল্লাহর কসম আমীনুল উম্মত'–খালিদ (রা) বললেন–'আমার ওপর যদি কোন বাচ্চাকেও সিপাহসালার নিযুক্ত করা হয় তবুও আমি তার প্রতিটি হুকুম মানবো। আমি কি এমন দুঃসাহস দেখাতে পারি যাকে প্রিয় নবীজী 'আমীনুল উম্মত' বলেছেন আমি তাঁর হুকুম অমান্য করবো? আর সবাইকে বলে দাও- আবু সুলায়মান ইবনুল ওয়ালীদ তার যিন্দেগী ইসলামের জন্য ওয়াক্‌ফ করে দিয়েছে।'

আবু উবায়দা (রা) আর চোখের পানি ধরে রাখতে পারলেন না। অশ্রু প্লাবিত চোখে তিনি চেয়ে দেখলেন, সব সালাররাই তাদের চোখের পানি লুকোতে চেষ্টা করছেন।

ঃ 'তোমার ওপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক'– আবু উবায়দা আবেগাপ্লুত কান্নাভেজা কণ্ঠে বললেন–

'যাও ভাই যাও! তোমার ভাইদের দুশমনের কবল থেকে মুক্ত করো গিয়ে'।

খালিদ (রা) কিছু ঘোড়সওয়ার নিয়ে দ্রুতবেগে আবুলকুদুস ছুটলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন যারারা বিন আযুর (রা)। যিনি 'নাঙ্গা মুজাহিদ' নামে প্রসিদ্ধি পেয়েছিলেন। এই উপাধির কারণ হলো, তিনি যখন লড়াই করতেন শরীর থেকে জামা খুলে খালি গায়ে লড়াই করতেন।

খালিদ (রা) তাঁর বাহিনী নিয়ে তীরবেগে ছুটলেন। কিন্তু এদিকে আবু উবায়দা (রা) এর প্রাণবন্ত সজীবতা কোথায় যেন হারিয়ে গেলো। আল্লাহর দরবারে তিনি সিজদায় ভেঙে পড়লেন। খলীফা উমর (রা) তাকে পয়গাম পাঠিয়েছিলেন, গনীমতের আশায় মুজাহিদদেরকে প্রাণের আশংকা আছে এমন কোন অভিযানে পাঠাবে না। আর প্রত্যেক ফয়সালাই খুব ভেবে চিন্তে সকলের সঙ্গে পরামর্শ করে দিতে হবে এবং সরেজমিনে গিয়ে অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

আবু উবায়দা (রা) কাঁদতে কাঁদতে তাঁর ভুলের জন্য আল্লাহর কাছে মাফ চাচ্ছিলেন। খলীফার কথা উপেক্ষা করে এক খ্রিস্টানের কথায় অনভিজ্ঞ এক সালার হাতে তিনি পাঁচশ সওয়ারের জীবন বিপন্ন করে তুলেছেন একথা বলতে বলতে তিনি ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগলেন।

খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ ও যিরার বিন আযুর (রা) খণ্ড ফৌজ নিয়ে তীরবেগে ছুটে আবুলকুদুস পৌঁছলেন। রোমকদের বেষ্টনে আটকে পড়া মুজাহিদরা লড়ছিলো। কিন্তু অঘোরে তরবারি আর বর্শার আঘাতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ছিলো।

ঃ 'নারায়ে তাকবীর লাগাও'–খালিদ (রা) তাঁর ফৌজদের নির্দেশ দিলেন।

আবুল কুদুস আর তার লড়াইয়ের ময়দান 'আল্লাহু আকবার' গর্জনে কেঁপে উঠলো। এর দ্বারা খালিদ (রা) এর উদ্দেশ্য ছিলো– ঘেরাওকৃত মুজাহিদরা বুঝতে পারবে সাহায্য এসে গেছে। এছাড়া রোমকরাও ভয় পেয়ে যাবে। এই নারায়ে তাকবীরের গর্জনে খালিদ (রা)ও তাঁর নিজস্ব রণ হুংকারটি ছাড়লেন।

'আনা ফারিসুদদাদীদ-আনা খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ' (অগ্নিপূজকদের আমি মহাগর্জন আমি খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ)।

রোমকরা এই গর্জন আগেও শুনেছিলো, খালিদ (রা) হামলা করার সময় এই নারা লাগাতেন। রোমকরা বহু ময়দানেই মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে। তারা জানতো, খালিদ (রা) এই গর্জন আর রণহুংকার দিলেই তাদের ওপর কেয়ামত ভেঙে পড়তো। এই গর্জন শুনে মুজাহিদরাও যেন নতুন প্রাণ পেলো।

আবুল কুদুসের পুরো এলাকায় যখন খালিদ (রা) এর এই গর্জন পৌঁছলো রোমকদের মনোযোগ তখন মুজাহিদদের দিকে আর রইলো না। খালিদ (রা) তাঁর সওয়ারদেরকে ময়দানের এদিক সেদিক ছড়িয়ে দিয়ে এমন অতর্কিতে হামলা করলেন যে, রোমকদের তা সামলে নিজেদের সৈন্য পরিকল্পনা বদলানোর আর সুযোগ মিললো না। এখন তারা নিজেরাই ঘেরাওকৃত। সে পর্যন্ত তারা অনেক মুজাহিদকে শহীদ আর যখমী করে তুলেছিলো। অবশিষ্ট মুজাহিদরা খালিদ (রা) এর মদদ পেয়ে তাজাদম হয়ে লড়াইয়ে ঝাপিয়ে পড়লো।

রোমকরা ময়দান থেকে পালাতে লাগলো এবং তারা ময়দান খালি করে দিলো। তাদের নিহত আর মারাত্মক আহত সঙ্গীদের ময়দানে ফেলেই চলে গেলো। এদের আহতের চেয়ে নিহতের সংখ্যাই বেশি ছিলো। তবে মুসলমানদের ক্ষতিও কম ছিলো না। খুন ঝরানো লড়াই ছিলো এটা। খালিদ (রা)ও বেশ যখমী হয়ে পড়ছিলেন। শহীদানের লাশ একত্রিত করার ও যখমীদের উঠানোর নির্দেশ দিলেন। তারপর মালেগনীমত হিসেবে সমস্ত দোকানের মালপত্র উঠানোর নির্দেশ দিলেন।

খালিদ (রা) যখন দামেশকে ফিরে এলেন তখন তাঁর সঙ্গে প্রচুর ও বহুমূল্যবান মালেগনীমত ছিলো। রোমকদের হাজার হাজার ঘোড়া ও হাতিয়ার- ও মালেগনীমতের মধ্যে ছিলো।

খালিদ (রা) তাঁর শরীরের যখম দিয়ে প্রমাণ করে দিলেন সিপাহসালারের পদ থেকে তাকে হটালেও স্বীয় দায়িত্ব থেকে তাকে হটানো যাবে না।

সিপাহসালার আবু উবায়দা (রা) গনীমতে মালের একপঞ্চমাংশ বায়তুল মালের জন্য মদীনায় পাঠিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে উমর (রা) এর নামে দীর্ঘ একটি পত্র লেখালেন। ছোট একটি ভুলের কারণে মুসলমানদের কি অবস্থা হয়েছিলো এবং সেখান থেকে কি বিস্ময়করভাবে খালিদ (রা) পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পাল্টে দিলেন তার বিবরণও সেই চিঠিতে ছিলো।

আবু উবায়দা (রা) তাঁর এই পত্রে খালিদ (রা) এর আল্লাহপ্রদত্ত বীরত্ব, যুদ্ধ নৈপুণ্য ও তাঁর অপার দায়িত্বজ্ঞানের কথা অন্তর খুলে উচ্ছ্বসিত ভাষায় লিখেছিলেন।

উমর (রা) এর কাছে প্রেরিত সেই পত্রে আবু উবায়দা (রা) এর নিজের ভুলের স্বীকার ও খালিদ (রা) এর আবুল কুদুসে প্রদর্শিত অসাধারণ বীরত্বের বর্ণনার উদ্দেশ্য ছিলো, খলীফা উমর (রা) যেন খালিদ (রা)কে সিপাহসালার পদে বহাল করেন। কিন্তু উমর (রা) এর যেকোন ফয়সালাই অটল-দৃঢ় হতো। তাঁর কোন ফয়সালাই আবেগের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে হতো না। তীক্ষ্নবুদ্ধি, পূর্ণ সচেতনতা ও দূরদর্শিতার নিরিখেই তার ফয়সালা হতো। তিনি আগের মতোই খোলাকণ্ঠে-অকপটে স্বীকার করলেন, খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা) এক মহান সিপাহসালার এবং শ্রেষ্ঠতম এক মর্দে মুমিন। যিনি তাঁর অর্পিত দায়িত্ব পালনকে জীবনের অংশই মনে করেন।

উমর (রা) কঠিন মেজাযী এক পিতার সন্তান ছিলেন। তিনি কৈশরে পৌঁছার পরপরই তাঁর বাবা তাঁকে উটের রাখালী করার দায়িত্ব দেন। আরবে তখন এ ধরনের কাজকে হেয় দৃষ্টিতে দেখা হতো না, কিন্তু উমর (রা) এর বাবা তাঁর সঙ্গে কঠোর আচরণই করতেন। ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে উমর (রা)কে কোথাও শুয়ে বা বসে থাকতে দেখলে তাঁকে প্রহারও করতেন।

যেখানে তিনি উট চড়াতেন সে স্থানটির নাম ছিলো 'দাজনান'। মক্কার কাছেই ছিলো সেটা। তিনি খলীফা হওয়ার পর একদিন সেখান দিয়ে যাওয়ার সময় দাঁড়িয়ে গেলেন। কয়েক মুহূর্ত স্থানটির দিকে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর দু'চোখ অশ্রুপূর্ণ হয়ে উঠলো।

'আল্লাহু আকবার' 'আল্লাহু আকবার' উমর (রা) উভয় হাত প্রসারিত করে বললেন– 'রাখালের সাধারণ পোষাক পরে আমি এখানে উট চড়াতাম। ক্লান্ত হয়ে আমি কোথাও শুলে বা বসলে আমার বাবা আমাকে প্রহার করতেন। আর মহান আল্লাহ ছাড়া আমার ওপর এখন আর কোন হাকিম নেই।'

হযরত উমর (রা) এর এই কথায় অহংকার বা গর্বের প্রকাশ ছিলো না বরং আল্লাহর প্রতি ভয়ের প্রকাশ ছিলো। খেলাফতের এত বড় দায়িত্বে যদি কোন অবহেলা বা বিচ্যুতি ঘটে তবে আল্লাহর কাছে কি জবাব দেবেন। তাঁর কথা ও কাজে চুল পরিমাণও ব্যবধান ঘটতো না। খেলাফতের প্রথম দিকে তিনি যে খুতবা দেন তাতেই তাঁর স্বভাবের দৃঢ়চিত্ততা সবার সামনে উজ্জ্বল হয়ে উঠে। তিনি এক খুতবায় বলেন–

'আমি মুসলমান এবং আল্লাহর এক দুর্বল বান্দা। আল্লাহর সাহায্য ও পথ নির্দেশনার প্রার্থনা করছি। খেলাফত আমার স্বভাব-চরিত্রে কোন পরিবর্তন আনতে পারবে না। বড়ত্ব-মহত্ত্ব আল্লাহরই জন্যই। কোন বান্দাই এর উপযুক্ত নয়। তোমাদের কেউ একথা বলতে পারবে না– উমর খলীফা হয়ে বদলে গেছে। আমার মনের সব কথাই তোমাদের সামনে প্রকাশ করছি। কারো কোন প্রয়োজন সমাধা না হলে বা কারো প্রতি জুলুম অত্যাচার হলে কিংবা আমার আচরণে কেউ দুঃখ পেয়ে থাকলে সে যেন আমাকে পাকড়াও করে। আমি তোমাদের মতোই তো একজন মানুষ মাত্র।'

তিনি অন্য এক খুতবায় বলেছেন, 'আমার প্রতি যে আমানত ও দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে তার পুরোপুরি উপলব্ধিই আমার মধ্যে আছে। আমার সামনে যে সমস্যাই আসবে ইনশাআল্লাহ তা নিজেই আমি সমাধা করবো, অন্য কারো ওপর তা চাপিয়ে দেবো না। আমার শুধু আস্থাভাজন, বিশ্বস্ত ও আন্তরিক সহকর্মী বন্ধুর প্রয়োজন।'

মুরতাদ গোলাম-বাঁদীদের ব্যাপার উমর (রা) যে আযাদীর নির্দেশ দিয়েছিলেন তা একান্তই দুঃসাহসিক ফয়সালা ছিলো। তখন রাষ্ট্রীয় যেকোন বিধি নিষেধের ওপর প্রশ্ন তোলা যেতো, জনাকীর্ণ সেই সমাবেশে অনেকেই নানান প্রশ্ন করেছিলো এবং খলীফা উমর (রা) স্পষ্টভাষায় সেগুলোর জবাব দিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর কোন হুকুম অমান্য করার মতো দুঃসাহস কারো মধ্যে ছিলো না। এর কারণ এটা ছিলো না যে, লোকেরা তাঁর শাস্তির ভয়ে মুখ খুলতো না, বরং সাধারণ জনগণের ঈমান ও নৈতিক চরিত্র খুবই দৃঢ় ছিলো। ব্যক্তিত্ববোধ তাদের মধ্যে প্রচণ্ড রকমের ছিলো। আমীরের আনুগত্য করা তারা ফরয মনে করতো।

যে কেউ তো আর গোলাম-বাঁদী রাখতে পারতো না। যারা সচ্ছল, ব্যবসায়ী বা সরদার গোছের ছিলো তারা গোলাম বাঁদী রাখতো। বিশেষ করে মুরতাদের বিরুদ্ধে যারা লড়াইয়ে অংশ নিয়েছিলো লড়াইয়ের সুবাদে তারাও মুরতাদদের গোলাম করে রেখেছিলো। তাই উমর (রা) এর সেই হুকুমের পর স্বাভাবিকভাবেই আপত্তি উঠেছিলো। তাছাড়া কেউ কেউ এসব গোলামবাঁদীদেরকে ক্রয়ও করেছিলো।

'আল্লাহ তাআলা প্রতিটি মানুষকেই স্বাধীন-প্রাণ করে সৃষ্টি করেছেন'– উমর (রা) তখন জবাব দিয়েছিলেন– 'আল্লাহর কোন বান্দাই কারো গোলাম হতে পারে না।'

যুক্তিস্বরূপ এসব কথা উমর (রা) পেশ করলেও তাঁর ও সালার মুসান্না ইবনে হারিসার চিন্তাধারাও ছিলো ভিন্ন। তাদের সেই চিন্তার ফসল খুব শীঘ্রই প্রকাশ পেয়েছিলো।

নাসিরা বিনতে জাব্বার এমন কোন বৃদ্ধ মহিলা ছিলো না যে, তার কোমর বেঁকে যাবে এবং মাথার চুল এত সাদা হয়ে যাবে। এক বছরেই তার অবস্থা এমন হয়ে গিয়েছিলো। পঁয়তাল্লিশেই তাকে সত্তর বছরের বুড়ি মনে হতো। ছেলে হারানোর শোকের কারণেই এমন হয়েছিলো তার। তবুও একটি নয়-দুটি ছেলে। দু' ছেলেই

মুসলমানদের বিরুদ্ধে মুরতাদদের পক্ষে লড়াই করে যখমী হয়ে পড়ে এবং তাদেরকে পাকরাও করে নিয়ে যাওয়া হয়। যুদ্ধে এদের বাবা নিহত হয়। খলীফা আবুবকর (রা) এর হুকুমে দুই ভাইকে মদীনায় নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর তাদের বাড়ি-ঘরে আগুন দেয়া হয়। এরা ছিলো বনু ফারাযার একটি পরিবার। 'বাতাহ' নামক বসতিতে এরা থাকতো। এরা ইসলাম গ্রহণ করেছিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালের পর তুলায়হা নামক আরেক লোক নবী দাবী করে বসে। তখন এই গোত্রের লোকেরা তাকে নবী মেনে নেয়। আশ পাশের আরো দুই তিন গোত্রও তাকে নবী মেনে নেয়। মদীনায় খবর পৌঁছলে মুরতাদদের এই ধর্মদ্রোহ কর্ম বন্ধ করার জন্য মুজাহিদ লশকর বের হয়ে পড়লো। এক লশকরের সালার ছিলেন খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা)।

খালিদ (রা) এই আশায় মুরতাদদের এলাকায় গিয়েছিলেন যে, অল্প কয়েকদিনেই তাদেরকে অনুগত করে নেবেন। কিন্তু সেখানে পৌঁছে দেখলেন তাদের জন্য অপেক্ষা করছে এক দৃঢ়চেতা সুশৃংখল ফৌজ। যারা সহজে হাতিয়ার ফেলবে না।

ঃ 'আমি এই মুরতাদদের শুধু খতমই করবো না'- খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা) বললেন- 'আমি তাদেরকে আরেকবার ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করে এমন পাক্কা মুসলমান বানাবো যে, আর কখনো ইসলাম ত্যাগ করার নামও নেবে না তারা।'

খালিদ (রা) তাঁর এই অঙ্গীকার পালন করেও দেখালেন; কিন্তু অনেক মূল্যবান প্রাণ আর অকাতরে রক্ত ঝরানোর মাধ্যমে। মুরতাদ মহিলারাও লড়াইয়ে অংশ গ্রহণ করেছিলো। অনেক মুরতাদ মহিলার নেতৃত্বও মহিলাদের হাতে ছিলো।

তুলায়হা বনু ফারাযারই লোক ছিলো। সে নবী দাবী করে ভবিষ্যদ্বাণীও করতো। মুসলিম ফৌজ সেখানে এসে পৌঁছলে লোকেরা তাকে জিজ্ঞেস করলো- 'এখন কি হবে'? সে বললো- 'ওহী নাযিল হবে এখন।'

খালিদ (রা) এই কবীলার লশকরের ওপর একের পর এক হামলা করে গেলেন। প্রচণ্ড রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হলো। মুরতাদরা বেশি সময় দাঁড়াতে পারলো না। তাদের এতো লোক মারা গেলো যে, তারা প্রায় ধ্বংসই হয়ে গেলো। জীবিত লোকেরা ভয়ে অস্থির হয়ে তুলায়হাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করতো ওহী কবে নাযিল হবে? আর খোদার মমদ কবে আসবে?

তুলায়হা তখন তার তাঁবুতে ডুব মেরেছিলো। এত লোক মারা পড়েছিলো যে, তুলায়হাকে যারা নবী মেনেছিলো তাদের চোখ খুলে গেলো। তাদের মধ্যে অসন্তোষজনক ক্ষেপাটে আওয়াজ উঠতে লাগলো-

'তুলায়হা কাযযাব- মিথ্যাবাদী।'

'শোন সবাই! এই মিথ্যাবাদীকে কেউ যেতে দিয়ো না।'

'পালাও আগে, নিজের জান বাঁচাও।'

'আমরা ধোঁকায় পড়ে মারা পড়ছি।'

বনু ফারাযার যারা বেঁচে গিয়েছিলো তারা পালাতে লাগলো।

নাসিরা বিনতে জাব্বার ময়দানে তার স্বামী ও দুই ছেলেকে নাম ধরে ডাকছিলো আর পাগলের মতো দৌড়ে বেড়াচ্ছিলো। হঠাৎ তার স্বামীর লাশ তার নজরে পড়লো। রক্তে একেবারে গোসল হয়ে গিয়েছিলো। স্বামীর লাশের পাশে বসে সে তার বুক চাপড়াতে লাগলো।

ঃ 'তুমি যদি সত্যের পথে থেকে জান দিতে, আজ আমি আমার মাথা কুটতাম না'— নাসিরা হাউ মাউ করে বলছিলো—'এক মিথ্যাবাদীর ধোঁকায় পড়ে নিজের প্রাণ দিয়ে আমাকে শোকের সাগরে ভাসিয়ে গেলে। নিজের ছেলে দুটিকেও সঙ্গে করে নিয়ে গেলে। হায়! আমি শুধু কান্নাকাটি আর চিৎকার চেচামেচির জন্য এই দুনিয়ায় একলা রয়ে গেলাম।'

সে তার ছেলেদের আর তালাশ করলো না। নিজের স্বামীর লাশ আর এদিক ওদিক শত লাশের সারি দেখে নিশ্চিত হয়ে গেলো যে, তার ছেলেরাও শেষ হয়ে গেছে। সে অনেক সময় ধরে বুক চাপড়ে মাথা কুটে হাউ মাউ করে কেঁদে টেদে হঠাৎ চুপ হয়ে গেলো। তারপর এলো মেলো পায়ে ময়দানময় ঘুরে বেড়ালো। আর দাঁতে দাঁত পিষতে লাগলো। তারপর তুলায়হার তাঁবুর দিকে ছুটতে লাগলো।

'তুলায়হা মিথ্যা নবী!— সে চিৎকার করতে করতে যাচ্ছিলো— 'তুলায়হা নবী নয়! কোথায় সে মিথ্যাবাদী! আমি তার মুখ ভেঙে দেবো। তার চামড়া উঠিয়ে নেবো। আমার দুই ছেলে আর স্বামীর খুনের প্রতিশোধ নেবো।'

তুলায়হা তার তাঁবুতেই ছিলো। তার সঙ্গে তার স্ত্রী নুরও ছিলো। তাঁবুর বাইরে একটি ঘোড়া ও একটি উট বাঁধা ছিলো। সওয়ারীর জন্য উভয়েই তৈরী ছিলো। মুসলমানদের হাত থেকে যারা বেঁচে গিয়েছিলো তারা আশে পাশে জমা হয়ে শোরগোল করছিলো।

'তুলায়হা বাইরে বেরিয়ে এসো। সত্যি নবী হলে মুজিযা দেখাও।'

'আমাদেরকে বলে দাও আমরা কি করবো?'

'সত্যি নবী হলে ভয় পাচ্ছো কেন? বেরিয়ে এসো।'

এদের চিৎকার চেচামেচিতে ক্রমেই শোরগোল বাড়ছিলো।

তুলায়হা তার স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো। সে উটকে বসালো। তাতে তার স্ত্রীকে সওয়ার করিয়ে উট দাঁড় করালো। সে নিজে ঘোড়ার ওপর সওয়ার হলো।

ঃ 'এখন জিজ্ঞেস করছো তোমরা কি করবে?' তুলায়হা লোকদেরকে বললো—'আমি বলছি ---তোমাদের যাদের কাছে উট বা ঘোড়া আছে তারা আমার মতো সওয়ার হয়ে নিজের স্ত্রীকেও সওয়ার করাও এবং পালিয়ে যাও।'

ঃ 'দাঁড়া মিথ্যা নবী!' —এটা ছিলো নাসিরার আওয়াজ। সে দৌড়ে আসছিলো— 'আমি তোর গলাটিপে তোকে শেষ করবো।'

তুলায়হা তার ঘোড়া পা দিয়ে খোঁচা লাগালো এবং তার স্ত্রীও উট নিয়ে দৌড় শুরু করলো। ঘোড়া আর উট লোকদের ভীড় চিড়ে বেরিয়ে গেলো। কিছু দূর গিয়ে তারা দৃষ্টি থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলো। এরপর আর তুলায়হাকে কেউ দেখেনি। এটা ছিলো খলীফা আবুবকর (রা) এর খেলাফতকালীন ঘটনা।

❖ ❖ ❖

আরো কয়েকটি মুরতাদ গোত্রকে খালিদ (রা) প্রাণপণে একথা বুঝিয়ে তাদের মধ্যে বদ্ধমূল করে দিলেন যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর নবুওয়াত ও রিসালাতের ধারা শেষ হয়ে গিয়েছে। এখন যেই নবুওয়াত দাবী করবে সে মিথ্যাবাদী ও ধোঁকাবাজ হবে।

ঃ 'তোমরা তো দেখেছো নবুওয়াতের দাবীদারদের অবস্থা কি হয়েছে।' খালিদ (রা) প্রত্যেক গোত্রে গোত্রে এই পয়গাম পৌঁছাতে লাগলেন– 'কোথায় সে ধোঁকাবাজরা? মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর নবী ছিলেন। কোন ময়দানে তিনি পরাজয় বরণ করেছিলেন? তাঁর হাতে গোনা কয়েকজন অনুসারী হাজার হাজার ফৌজকে ময়দান থেকে নাস্তানাবুদ করে পালাতে বাধ্য করেছে। এখন আমাদের প্রিয় নবীজী আমাদের সঙ্গে নেই, কিন্তু তাঁর পবিত্র রুহ মোবারক আমাদের সঙ্গে রয়েছে। প্রতিটি ময়দানেই আমরা বিজয় লাভ করছি।'

এর ফলে মুরতাদরা পুনরায় ইসলামে দীক্ষিত হতে লাগলো। খালিদ (রা) তুলায়হার নবুয়তের নাম নিশানা মুছে দিলেন এবং শক্তিশালী বনু ফারাযাকে দুর্বল করে দিলেন। তখন মনে হয়েছিলো, আর কিছু দিনের মধ্যেই ধর্ম্যদ্রোহীদের তৎপরতা বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু এক মহিলা কালনাগিনীর মতো বিষধর হয়ে আত্মপ্রকাশ করলো। তার নাম ছিলো উম্মে যুমাল সালমা বিনতে মালিক। সালমা নামে তাকে ডাকা হতো।

আরো কিছু দিন আগের ঘটনা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন জীবিত ছিলেন। প্রসিদ্ধ সাহাবী ও সালার উসামা (রা) এর পিতা যায়েদ ইবনে হারিসা (রা) বনু ফারাযার এলাকা দিয়ে পথ অতিক্রম করছিলেন। তাঁর সঙ্গে আরো কয়েকজন মুসলমান ছিলেন।

বনু ফারাযা মুসলমানদের শত্রু গোত্র ছিলো। এর সরদাররা তো মুসলমানদের শত্রু ছিলোই। উম্মে কুরফা ফাতিমা বিনতে বদর নামক সরদার খান্দানের এক মহিলা ছিলো। মুসলমানদের বিরুদ্ধে কেন জানি তার মনে এত বিষ ছিলো যে, অন্যান্য গোত্রেও সে মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিষ ছড়াতো। সে যেমন সুন্দরী রূপসী ছিলো তেমনি চতুর চালবাজ ছিলো। তার মুখে এত জাদু ছিলো যে, তার প্রতিটি কথা নিকৃষ্ট দুশমনের মনে গিয়েও জায়গা করে নিতো।

সেই মহিলাকে কেউ জানালো, কিছু মুসলমান এই কবীলার ওপর দিয়ে 'ওয়াদিউল কুরা' যাচ্ছে। ফাতিমা বিনতে বদর তার আশে পাশের কবীলাগুলোতে প্রায় ঘূর্ণির মতোই ঘুরে আসলো এবং সবাইকে সশস্ত্র থাকতে বললো। বনু ফারাযার সকলেই সশস্ত্র হয়ে ওয়াদিউল কুরায় পৌঁছলো এবং যায়েদ (রা)ও তাঁর সঙ্গীদের উস্কানি দিলো। জবাবে মুসলমানরা লড়াই করলো এবং মরণপণ হামলাই করলো। কিন্তু বিপক্ষের দল কয়েকগুণ বেশি থাকায় মুসলমানরা সবাই শহীদ হয়ে গেলো।

বনু ফারাযার লোকেরা শহীদদের জামা কাপড় ঘাটাঘাটি করে যা পেলো সব নিয়ে গেলো। তারা চলে যাওয়ার পর একটি লাশ নড়ে উঠলো। সেটা ছিলো যায়েদ ইবনে

হারিসার লাশ। তিনি মারাত্মক যখমী ছিলেন। যখম এত গভীরে পৌঁছে গিয়েছিলো যে তিনি আর নড়তে পারছিলেন না। তারা তাকে মৃত মনে করে ছেড়ে দিয়েছিলো। যায়েদ (রা) কোনক্রমে উঠে এই যখম নিয়েও প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে পথে পথে রক্তের চিহ্ন রেখে শুধু মনের জোরে মদীনায় পৌঁছে গিয়েছিলেন। মদীনার যে কারো জন্য সেটা ছিলো হয়রান আর বিস্ময়কর উদাহরণ।

যায়েদ (রা) পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের কথা জানালেন। তিনি কোন জবাবী হামলার কথা না বলে শুধু এতটুকু বললেন, যায়েদের ক্ষত শুকিয়ে গেলে সে নিজেই এর বদলা নেবে।

খুব দ্রুতই যায়েদ (রা) এর ক্ষত শুকিয়ে গেলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে একদল মুজাহিদ সঙ্গে দিয়ে জবাবী হামলার জন্য পাঠালেন। যায়েদ (রা) বনু ফারাযার ওপর প্রচণ্ড হামলা চালালেন। এরাই তো যায়েদ (রা) এর নীরিহ সঙ্গীদেরকে অমানুষিক নির্যাতনে হত্যা করেছে– প্রচণ্ড ক্ষোভে যায়েদ (রা) এর এ দৃশ্য মনে ভাসতেই আকাশের বিদ্যুৎ গর্জনের মতো তিনি বনু ফারাযার ওপর ভেঙে পড়লেন। বনু ফারাযাও বেশ জমেই মোকাবেলা করছিলো। কিন্তু প্রতিশোধের আগুনে জ্বলতে থাকা মুজাহিদদের সামনে তারা আর দাঁড়াতে পারলো না। কবীলার অসংখ্য লোক যমদূতের কবলে মারা পড়লো। যারা বেঁচে গেলো তবে পালাতে পারলো না, তাদেরকে গ্রেফতার করা হলো। কয়েদীদের মধ্যে উম্মে কুরফা ফাতিমাও ছিলো। আর তার সঙ্গে ছিলো তার মেয়ে সালমা।

বনু ফারাযার যুদ্ধবন্দীরা বললো, যায়েদ (রা) ও তাঁর সঙ্গীদেরকে এই ফাতিমাই হত্যা করিয়েছিলো। তারা এটাও বললো, এই মহিলা মানবী বেশী এক শয়তান। তার চলাফেরার মধ্যেই ফেতনা ফাসাদ ছড়িয়ে পড়ে। এটাও বলা হলো, মুসলমানদের বিরুদ্ধে তার মনে এত ঘৃণা জমে আছে যে, সে বলে বেড়াতো, 'আমি শুধু সেই মুসলমানকেই পছন্দ করি যে মৃত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই মহিলা সম্পর্কে যা শুনলেন তা তার গোত্রের লোকদের কাছ থেকেই শুনলেন। তিনি যখন দেখলেন একটিমাত্র মহিলার কারণে অসংখ্য লোকের মৃত্যু ঘটেছে তখন বাধ্য হয়েই তার প্রতি মৃত্যুর আদেশ জারী করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হলো।

ফাতিমা বিনতে বদরের তো এ ব্যবস্থা করা হলো। কিন্তু তার নব যৌবনবতী কন্যা সালমা রয়ে গেলো। একেবারেই মাসুম-নিষ্পাপ চেহারা ছিলো তার। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একে দেখার পর তাঁর মনে দয়া হলো– আহা! মায়ের পাপের বেদনা তাকে না জানি কত কাঁদাবে। তাই তিনি একে উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা) এর কাছে সোপার্দ করলেন। আয়েশা (রা) এমন নির্দোষ-নিষ্পাপ চেহারার মেয়েকে পেয়ে মায়ের আদরে তার যত্ন আত্তি করতে লাগলেন। কিন্তু এই মেয়ে সামান্য সময়ের জন্যও খুশি হতে পারেনি। সবসময়ই তার মুখ ভার হয়ে থাকতো। কোন কাজে বা কোন কথাই সে গা করতো না। নির্বিকার নির্জীব থাকতো। আয়েশা (রা) তাকে আযাদ করে তার কবীলায় পাঠিয়ে দিলেন।

সালমার যৌবনের পাপড়ি তখন খুলতে শুরু করে ছিলো, সে কবীলার কোন সাধারণ ঘরের মেয়ে ছিলো না। খুবই অভিজাত ও সরদার বংশের মেয়ে ছিলো। সে যখন তার কবীলায় ফিরে আসলো তখন কবীলার ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা তাকে স্বাগত জানিয়ে বরণ করতে এলো।

ঃ 'এমন রূপসী আর যৌবনবতী মেয়েকে মুসলমানরা কি মনে করে আযাদ করে দিলো?'–স্বাগত-দলের কেউ আওয়াজ তুললো। 'এটা মনে হয় মুসলমানদের একটা চাল'– আরেকজন বললো– 'এই মেয়েকে বিশ্বাস করা যাবে না।'

ঃ 'আরে এর মা কোথায়?'

সালমা পৌঁছতে পৌঁছতে সারা কবীলায় এটা ছড়িয়ে গেলো যে, ফাতিমা মুসলমানদের দলে ভীড়ে গেছে এবং তার মেয়ে সালমাকে উল্টা পাল্টা কোন কিছু বুঝিয়ে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছে। এভাবে সালমার ফিরে আসাটা তারা মুসলমানদের একটা ধোঁকা বলে মনে করলো।

স্বাগত দল যখন সালমাকে তার ঘরে নিয়ে যেতে চাইলো সে সটান দাঁড়িয়ে গেলো।

'আমি আমার ঘরে এখন পা রাখবো না'– সালমা তার আত্মীয়দের বললো– 'আজ আমি বনু ফারাযার আত্মমর্যাদাবোধ জাগিয়ে তুলতে চাই।'

সে দৌড়ে গিয়ে এক উঁচুস্থানে গিয়ে দাঁড়ালো এবং হাতের ইশারায় সবাইকে তার কাছে ডাকলো। পুরুষরা তো আগেই বাইরে বের হয়ে এসেছিলো। ঘর থেকে এবার মহিলারাও বেরিয়ে এলো। তার আশে পাশে লোকদের ভীড় জমে গেলো।

ঃ 'হে বনু ফারাযা!'– সালমা চিৎকার করে বললো– 'তোমাদের কি আত্মমর্যাদাবোধ মরে গেছে? জবাব দাও .....। চুপ চাপ দাঁড়িয়ে আছো কেন জবাব দাও।'

ঃ 'না উম্মে যুমাল!'– ভীড় থেকে অসংখ্য আওয়াজ উঠলো– 'আমরা জীবিত এবং আমাদের আত্মমর্যাদাবোধ মরেনি।'

ঃ 'তুমি শুধু তোমার বাবার নয় পুরো কবীলারই তুমি মেয়ে'– উচ্চ আওয়াজে একজন বললো–'সত্যি করে বলো তো মুসলমানরা কি তোমাকে দাসী-বাঁদী করে রেখেছিলো?'

ঃ 'আর এটাও বলো'–আরেকটি আওয়াজ উঠলো–'তোমার মা কোথায়?'

ঃ 'মুসলমানরা তো আমাকে দাসী করে রাখেনি' –সালমা উঁচু আওয়াজে বললো–' তারা আমাকে মেয়ের মতো যত্ন করেই রেখেছিলো। কিন্তু আমার মাকে তারা হত্যা করেছে।'

ঃ 'হত্যা করেছে? ফাতিমা বিনতে বদর নিহত হয়েছে? সে তো বনু ফারাযার আত্মা ছিলো।' এ ধরনের আরো অনেক আওয়াজ উঠতে লাগলো। আওয়াজ উঠতে উঠতে এক সময় তা হাঙ্গামার রূপ নিলো। সালমা যে আগুন উস্কাতে চেয়েছিলো তা ভালো করেই উস্কালো। সে কিছুক্ষণ নীরব রইলো। লোকদের শোরগোল যখন কমে এলো সে আবার বলে উঠলো–

'আমার মা কি তোমাদেরকে বলেননি, মুসলমানরা শুধুই ঘৃণার যোগ্য?'–উঁচু আওয়াজে সালমা বললো– 'তারা তাদের কয়েকজন লোকের হত্যার বদলা নেয়ার জন্য পুরো বাহিনীই আমাদের ওপর চড়াও হয়েছে। আমাদের কত লোককে তারা হত্যা করলো! লুটপাট করে আমাদেরকে নিঃস্ব করে দিলো। তোমাদের মা বোনদের ধরে নিয়ে গিয়ে দাসী-বাঁদীতে পরিণত করলো। একটু ভেবে দেখো তো ফাতিমা বিনতে বদর শুধু আমারই মা ছিলেন না, তিনি সবারই মা ছিলেন। তার প্রখর ব্যক্তিত্ববোধ ছিলো। তিনি শুধু বনু ফারাযার আত্মমর্যাদার জন্যই নয় আশপাশের সকল গোত্রের মর্যাদা রক্ষার জন্য নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন।'

ঃ 'সোজা কথা বলতো বাছা-উম্মে যুমাল' –কেউ একজন বললো! 'তুমি কিই বা চাচ্ছো এখন?'

ঃ 'মদীনার ওপর হামলা!'–সালমা তার দুই বাহু উত্তেজনায় ওপরে উঠালো– 'আমি মদীনার ওপর হামলা করে এই মুসলমানদের শহরের প্রতিটি ইটই ধ্বংস করে দিতে চাই। তোমাদের মধ্যে সামান্যতম যদি লজ্জাবোধ থাকে, আত্মমর্যাদাবোধ থাকে, এই শহরের শিকড় উপরে ফেলো। এর নাম নিশানা মুছে দাও।'

সালমা লোকদেরকে এমনভাবে উস্কে দিলো যে, সেখানে দাঁড়িয়েই সবাই শপথ করলো, তারা সালমাকে নিজেদের নেতা বলে মান্য করবে এবং পূর্ণ একটি ফৌজ হিসেবে তার সঙ্গে থাকবে। বনু ফারাযা মদীনা হামলার জন্য লশকর প্রস্তুত করলো। কিনতু মদীনায় হামলা করা তো মামুলি ব্যাপার ছিলো না। মুসলমানরা তখন এমন যুদ্ধশক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে যে, তাদের সঙ্গে যুদ্ধ বাধাতে হলে এর চেয়ে আরো কয়েকগুণ শক্তি ও লোকবলের দরকার ছিলো। সালমা নিজেও এক উস্তাদের কাছে লড়াই ও সম্মুখ যুদ্ধের কলাকৌশল শিখে নিয়েছিলো।

ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। এর পরপরই অন্যান্য এলাকার মতো এখানেও ধর্মদ্রোহীদের আওয়াজ উঠলো। তুলায়হা নবুয়ত দাবী করলে তাকে খালিদ (রা) পরাজিত করেন এবং বনু ফারাযার অনেকেই মারা পড়ে। বেঁচে যাওয়ারা অন্য এলাকায় প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যায়। তাদের মিত্র গোত্র ছিলো কিছু। গাতফান তায়, বনু সালিম ও বনু হাওয়াযিনও ছিলো এদের মিত্র গোত্র। খালিদ (রা) এসকল গোত্রকেও পরাজিত করেন এবং তারাও পালিয়ে বাঁচলো। কিন্তু তারা এই পরাজয় মানতে রাজী ছিলো না। তারা তাদের সরদার সালমার কাছে গিয়ে একত্রিত হলো। তারা বললো সালমার ফৌজে তারাও শামিল হতে চায়। সালমা চাচ্ছিলোও এটাই। তার নিজের লশকর তো প্রস্তুত ছিলোই। এসব গোত্রের লোকদেরকে যখন তার লশকরে শামিল করলো তখন এটা বিরাট সেনাদলের রূপ নিলো। যারা মুসলমানদের মোকাবেলা করার মতোই সংগঠিত ছিলো।

একদিন সালমা তার এই লশকর নিয়ে 'বাযাখার' দিকে কোচ করলো। তুলায়হাকে পরাজিত করে খালিদ (রা) তখন বাযাখাতেই ছিলেন। খালিদ (রা) যেখানেই থাকতেন

চারদিকে গুপ্তচর নিয়োজিত রাখতেন। খালিদ (রা) খবর পেয়ে গেলেন শত্রু সেনার একটি দল এদিকেই আসছে। খালিদ (রা) আর অপেক্ষা করলেন না। তিনি তার ফৌজ নিয়ে সেদিকে কোচ করলেন যেদিক থেকে সালমার ফৌজ আসছিলো।

খালিদ (রা) এর সঙ্গে সৈন্যবল কম ছিলো। এই স্বল্পতাকে তিনি নিপুণ নেতৃত্বদানের মাধ্যমে পূর্ণ করতেন। তিনি চিন্তা করে রেখেছিলেন বনু ফারাযার লশকর সফরের কারণে কিছুটা হলেও ক্লান্ত থাকবে। তাই তারা খানিক বিশ্রাম করে নেবে। কিন্তু তাদেরকে এই বিশ্রামের পর আর সৈন্য শৃংখলার সুযোগ দেয়া যাবে না। আচমকা হামলা করতে হবে।

সালমার অঙ্গভঙ্গি সবই তার মার মতো। সালমার মা ফাতিমা যুদ্ধে যাওয়ার সময় সুসজ্জিত আর অলংকারবহুল উটের ওপর সওয়ার হয়ে সবার আগে আগে চলতো। নিজ গোত্র ও অন্যান্য গোত্রের আত্মমর্যাদাবোধের প্রতীক মনে করতো সে নিজেকে। গোত্রের সকলের মনে সে এটা বদ্ধমূল করে রেখেছিলো যে, এটাই আত্মমর্যাদাবোধের প্রতীক। সালমা বিশাল একটি মোটা তাজা বিকট দর্শন উটের ওপর সওয়ার ছিলো। সেটি যুদ্ধের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছিলো, আর তাকে পরিবেষ্টিত করে রেখেছিলো এধরনের আরো একশটি উট সওয়ার। সেগুলোও অসম্ভব মোটা ছিলো। মদ্যপানে সেগুলোকে উন্মাদ-মাতাল করে রেখেছিলো। এর ওপরের সওয়াররা ছিলো তরবারি আর লম্বা লম্বা বর্শা দ্বারা সশস্ত্র সৈন্যরা। সবাই ভীষণ চিৎকার চেচামেচি করে-জয়ধ্বনি করতে করতে অগ্রসর হচ্ছিলো।

খালিদ (রা) সাধারণ চালেই চলছিলেন। যখন সালমার ফৌজ নজরে পড়লো এক মুহূর্তও নষ্ট করলেন না। হামলার হুকুম দিয়ে দিলেন। দুর্বলতা ছিলো এতটুকুই যে, দুশমনের তুলনায় মুসলমানদের সৈন্যসংখ্যা ছিলো অনেক কম। সালমার বিশাল লশকর এমনভাবে জয়ধ্বনি করছিলো, মনে হচ্ছিলো তারা আজ মুসলমানদের একটি পশমও আস্ত রাখবে না।

সালমা তার উটের হাওদার ওপর দাঁড়িয়ে উঁচু আওয়াজে তার লশকরের উৎসাহ-উদ্দীপনা বাড়িয়ে যাচ্ছিলো। উভয় লশকরই সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হলো। খালিদ (রা) যুদ্ধের কৌশল নিয়ে ভাবছিলেন। বরাবরের মতো তিনি ফৌজের দুটি অংশ সামনে থেকে বা পেছন থেকে হামলার জন্য সংরক্ষিত রেখেছিলেন। সালমার ফৌজ ক্লান্ত হওয়া সত্ত্বেও খালেদ (রা) এর জন্য ভাল বিপদই হয়ে দাঁড়ালো। শেষ পর্যন্ত খালিদ (রা) তাঁর সংরক্ষিত দুই খণ্ড ফৌজের এক অংশকে হামলায় লাগিয়ে দিলেন। তবুও ময়দান দুশমনের হাতেই মনে হচ্ছিলো।

'এই মহিলার বেষ্টনী ভেঙে দাও'– খালিদ (রা) বললেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই তার কয়েকজন বাছাই করা জানবায সঙ্গীর নাম ধরে ডাকতে শুরু করলেন– 'তোমরা যদি এই মহিলাকে উটের পিঠ থেকে ফেলে দিতে পারো তবে দুশমনের জযবা মাটিতে মিশে যাবে।'

জানবাযরা সালমার আশ পাশের উটের বেষ্টনী ভাঙ্গতে শুরু করলো, কিন্তু প্রত্যেকটি উট সওয়ারই তাদের জান দিয়ে দিতে তৈরী ছিলো। তাই জানবাযরা সামান্য পিছনে হটে উট বেষ্টনীতে একের পর এক হামলা করে যেতে লাগলো। কিন্তু উট সওয়ারীদের দীর্ঘ বর্শাগুলো মুসলিম উট সওয়ারদের কাছে ঘেঁষতে দিচ্ছিলো না।

এবার জানবাযরা খালিদ (রা) এর হুকুমে কৌশল পরিবর্তন করলো। পাঁচ ছয়জনের ছোট ছোট দল হয়ে প্রত্যেক উট সওয়ারীর ওপর এমনভাবে হামলা শুরু করলো যে, এক এক করে উট সওয়ারীরা বেষ্টনী দেয়াল থেকে বিচ্ছিন্ন হতে শুরু করলো। ক্রমেই উটের বেষ্টনী ভেঙে গেলো। অধিকাংশ সওয়ারীই মারা গেলো। কিন্তু জানবাযদেরও অনেক রক্ত আর প্রাণ ঝরাতে হলো।

তিন চার জানবায সালমার উট পর্যন্ত পৌঁছে গেলো এবং হাওদার রশি কেটে দিলো। উটের পিঠ থেকে হাওদা সোজা মাটিতে গড়িয়ে পড়লো। সালমা বালিতে গড়াগড়ি গেলো। তারপর কোনক্রমে উঠে দাঁড়ালো। খালিদ (রা) কাছেই একটি ঘোড়ার ওপর সওয়ার ছিলেন। জানবাযরা তাকে মাটিতে হেঁচকাতে হেঁচকাতে তাঁর কাছে নিয়ে এলো।

কেউ কেউ ভেবেছিলো এমন সদ্য যুবতী রূপসী আর সরদার খান্দানের মেয়েকে খালিদ (রা) হয়তো দাসী বা নিজের স্ত্রী করে নেবেন। খালিদ (রা) আর সালমার মধ্যে পরস্পরের দৃষ্টি বিনিময় হলো। খালিদ (রা) জানবাযদের দিকে তাকিয়ে ডানহাত দ্বারা হালকা ইশারা করলেন। এই ইশারার অর্থ তারা খুব ভালোই বুঝতো। সালমার পেছনে দাঁড়ানো এক বিশাল দেহধারি জানবাযকে সবাই তার তরবারিতে বিদ্যুৎ খেলে যেতে দেখলো, তারপর দেখলো সালমার মাথাটি তার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।

খালিদ (রা)-এর হুকুমে এক জানবায সালমার ছিন্ন মস্তকটি তার বর্শার মাথায় গেথে নিলো এবং ঘোড়ায় চড়ে সৈন্যদের মাঝে ঢুকে পড়লো। সালমার লশকর দ্বিগুণ উৎসাহে লড়ছিলো। মুসলমানরাও বীরবিক্রমে মোকাবেলা করছিলো। সালমার মস্তকধারী জানবায সৈন্যটি ময়দানের চারদিক ঘুরতে ঘুরতে ঘোষণার সুরে বলতে লাগলো– 'বনু ফারাযার লোকেরা দেখো, তোমাদের রানী সালমা বিনতে মালিকের অবস্থা'।

বনু ফারাযা এবং তার মিত্রগোত্রের লোকেরা যখন এ দৃশ্য দেখলো তখন তাদের জযবা ঠাণ্ডা হয়ে গেলো এবং তাদের হাত থেকে হাতিয়ার পড়ে গেলো। অল্প সময়ের মধ্যেই সঙ্গীদের লাশ আর যখমীদের ফেলে তারা পালিয়ে গেলো।

বুতাহ গ্রামের এদিক সেদিক নাসিরা বিনতে জাব্বার যেখানে যাকেই পেতো তাকেই জিজ্ঞেস করতো, 'ভাই তুমি আমার সন্তান দুটোকে কি দেখেছো?' কেউ তাকে করুণার দৃষ্টিতে দেখতো। কেউ বিরক্ত হতো। আবার কেউ কেউ একই ঘেন ঘেনানি রোজই শুনতো বলে রেগে যেতো। এক পর্যায়ে সবাই এক মত হয়েছিলো যে, স্বামী ও দুই ছেলেকে হারিয়ে এই মহিলা পাগল হয়ে গেছে। তার দুই ছেলের লাশ পাওয়া যায়নি। শুধু তার স্বামীর লাশই পাওয়া গিয়েছিলো। কেউ কেউ নাসিরার এই শোক প্রকাশ ও পাগলাটে ভাব দেখে চূড়ান্ত রকমের বিরক্ত হয়ে পড়েছিলো।

ঃ 'তোমার কোন আত্মসম্মান নেই নাসিরা!'–একদিন এক লোক রাগত স্বরে বললো– 'সবারই তো কেউ না কেউ মারা গেছে বা এমন আহত হয়েছে যে, সারা জীবনের জন্য পঙ্গু হয়ে গেছে। কিন্তু কারো অভিভাবক বা আপনজনই তো তোমার মতো এমন পাগল হয়ে যায়নি।'

'বাছা! আমি পাগল নই'– নাসিরা বললো– 'আমার ভালই হুঁশ আছে, তোমাদের চেয়ে আমি অনেক সচেতন। আমার স্বামী আর দুই বেটা মিথ্যা নবীর ফাঁদে পা দিয়ে মারা গেছে। যদি সে সত্য আর প্রকৃত নবীর পক্ষে থেকে জান দিতো তবে আমি অনেক খুশি হতাম।'

ঃ 'প্রকৃত নবী কে?'

ঃ 'কুরাইশ গোত্রের মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। জয় তারই হয় যার অন্তরে সত্যের আলো থাকে। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সত্য নবী না হলে আমরা এভাবে ধ্বংস হতাম না।'

নাসিরা একদিন তার ঘরের দরজায় উদাস মুখে বসেছিলো। তার চোখ মুখ ছিলো শুকনো। যেন তার চোখ থেকে অশ্রুভাণ্ডার শুকিয়ে গেছে।

'নাসিরা!' তার কানে একটি আওয়াজ ভেসে এলো, ঐ যে দেখো তোমার বেটা আসছে।'

দূর থেকে কোন এক মহিলার কণ্ঠ থেকে এ আওয়াজ এলো। মহিলাটি এসে নাসিরাকে ধরে উঠাতে উঠাতে পেরেশান হয়ে বলতে লাগলো, তোমার হারিয়ে যাওয়া দুই ছেলে আসছে। নাসিরা নীরব-নির্বিকার হয়ে বসে রইলো। যেন এটা স্বপ্ন থেকে ভেসে আসা আওয়াজ। আরো কয়েকটি কণ্ঠের আওয়াজ উঠলো-নাসিরার ছেলেরা এসেছে।

যখন ছেলে দুটি তার সামনে এসে দাঁড়ালো তখনও তার বিশ্বাস হচ্ছিলো না। অবশেষে তার মরু-শুষ্ক চোখে যখন অশ্রুর বান ডাকলো তখন সবাই বুঝলো নাসিরার চেতনা ফিরেছে।

ঃ 'আমি আমার এক ছেলেকে মদীনার সত্যনবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নামে উৎসর্গ করলাম'–নাসিরা ঘোষণা করলো।

হযরত উমর (রা) এর গোলাম আযাদীর ঘোষণার পরই নাসিরার দুই ছেলেকে আযাদ করা হয়েছিলো। নাসিরার এই ছেলেরা মুরতাদদের পক্ষে যুদ্ধের সময় মুজাহিদদের হাতে বন্দী হয়ে মদীনায় কয়েদী হয়েছিলো। পরে মদীনার এক ব্যবসায়ী এদেরকে খরীদ করে নেয়া।

শুধু নাসিরার ছেলেরাই নয়, মুরতাদদের মধ্যে আরো যারা গোলাম-বাঁদী হয়েছিলো তারাও ফিরে এসেছিলো। কবীলাগুলোর জন্য বিস্ময়কর ঘটনা ছিলো, সদ্যযুবতী এবং সুশ্রী-সুন্দরী ও অভিজাত বংশের মেয়েদেরকে মুসলমানরা বিনা ভোগে কি করে আযাদ করলো! তাদের মুনীবরা তাদেরকে যদি বিয়ে করে নিতো তবুও এর চেয়ে আরো ভালো মানাতো। তাদেরকে যেমন নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো তেমনি অক্ষত অবস্থায় ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে।

মুরতাদদের তৎপরতা প্রায় শেষই হয়ে এসেছিলো। ভুল বুঝতে পেরে অনেকেই ইসলামগ্রহণ করছিলো। শুধু তাদের মনে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ছিলো যাদের আত্মীয়দেরকে মুসলমানরা গোলাম-বাঁদী বানিয়ে ছিলো। উমর (রা) এর হুকুমে এদেরকেও যখন আযাদ করে দেয়া হলো, তখন তাদের এত দিনের সঞ্চিত ক্ষোভও ঝরে গেলো। আর তারা তাদের অনুসরণীয় মিথ্যা নবীর কারিশমাও উপলব্ধি করতে পারলো– যারা লড়াইয়ের চূড়ান্ত মুহূর্তে পালিয়ে গিয়েছিলো বা মুসলমানদের হাতে কচুকাটা হয়েছিলো- মুজিযা দেখাবে তো দূরের কথা।

সেই এলাকার অসংখ্য পরিবারেই নাসিরা বিনতে জাব্বারের মতো তাদের আপনজন মুক্ত হয়ে আসায় উৎসব-উদযাপনে মেতে উঠলো। আযাদ হয়ে আসা লোকেরা যখন বললো, মুসলমানরা তাদেরকে সর্বদা তাদের মতো মানুষেরই মর্যাদা দিয়েছে, আপনজনের মতো যত্ন করেছে তখন তাদের এতদিনের লালিত ভাবনাটাই আমূল বদলে গেলো। ইসলামকে মেনে নিতে তাদের মনে আর কোন বাঁধা রইলো না।

উমর (রা) একদিন মজলিসে বসা ছিলেন। এ সময় এক অপরিচিত আগন্তুক আসলো এবং সোজা উমর (রা) এর সামনে গিয়ে বসলো। উমর (রা) এর ডানহাত তার হাতে নিয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলো।

ঃ 'কে তুমি তা তো আগে বলবে নাকি?'–উমর (রা) জিজ্ঞেস করলেন–'তুমি কোত্থেকে এসেছো? তুমি তো মদীনার অধিবাসী নও?'

'দূর থেকে এসেছি'–আগন্তুক জবাব দিলো-'আমার নাম তুলায়হা।'

'কোন্ তুলায়হা?–তুলায়হা নামে তো এক লোক মিথ্যা নবীর দাবী করেছিলো' মজলিস থেকে কেউ জিজ্ঞেস করলো।

ঃ 'আমি সেই তুলায়হা, ইসলাম গ্রহণের জন্য এসেছি এবং খলীফা উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) এর বায়আত গ্রহণের জন্যও'

তার চোখে অশ্রু ছিলো। অশ্রুর ভাষাই বলে দিচ্ছিলো তার মনে কোন পাপ নেই। সে তো অবশ্যই হত্যার যোগ্য ছিলো। ইসলাম পরিত্যাগ করে সে শুধু নবুয়তেরই দাবী করেনি বরং অনেক গোত্রকেই ইসলাম পরিত্যাগে বাধ্য করেছে। নিজের নবুওয়াতের স্বীকারোক্তি আদায় করেছে। এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে এক বিশাল যুদ্ধের আয়োজন করে হাজারো মানুষের মৃত্যুর কারণ হয়েছে। কিন্তু উমর (রা) তাকে মাফ করে দিলেন। সে বিশুদ্ধ অন্তরে ইসলাম গ্রহণ করে নিলো এবং ইসলামের সমৃদ্ধির জন্য একটি উদাহরণ হয়ে রইলো।

উমর (রা) যে আশায় গোলাম আযাদীর নির্দেশ দিয়েছিলেন তা পূরণ হওয়ার পথে ছিলো। আবু উবাইদ ইবনে মাসউদ সাকাফীর সঙ্গে যে সাহায্য-সেনাদল যাচ্ছিলো তা যথেষ্ট ছিলো না। সংখ্যায় প্রায় দুই হাজারের মতো ছিলো তারা। দূরদূরান্তের এলাকাগুলোতে খলীফার হুকুমে ঘোষণা করে দেয়া হলো যুদ্ধের জন্য সেনা সাহায্য প্রয়োজন। অন্যথায় মুজাহিদদের পিছনে হটা ছাড়া উপায় থাকবে না।

এই ঘোষণা যখন মুরতাদ এলাকায় পৌঁছলো তখন দলে দলে স্বেচ্ছাবক মদীনায় এসে গেলো। এতে নাসিরার এক ছেলেও ছিলো।

আবু উবাইদ যে দুই হাজার লশকর নিয়ে রণাঙ্গণে রওয়ানা হয়েছিলেন তাদের সংগ্রহ করতে প্রায় এক মাস লেগেছিলো। তারা রওয়ানা হওয়ার সময় উমর (রা) মসজিদে নববীতে ছিলেন। উমর (রা) কে তো তখন লোকেরা পরস্পরে ডাকার সময় খলীফাই বলতো। কিন্তু তাঁর সামনে সম্বোধন করার সময় 'খলীফায়ে খলীফাতুররাসূল (স) অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খলীফা আবুবকর (রা) এর খলীফা বলা হতো।

আবু উবাইদ রওয়ানা হওয়ার সময় উমর (রা) থেকে বিদায় নিতে আসলে এক লোক বললো– 'হে আমীরুল মুমিনীন।–আপনার প্রতি আল্লাহর শান্তি বর্ষিত হোক। আবু উবাইদ আপনার কাছে এজাযত নিতে এসেছেন।'

হযরত উমর (রা) এর ঠোঁটে মৃদু হাসি দেখা দিলো।

ঃ 'আল্লাহর কসম!'–উমর (রা) বললেন– 'খলীফায়ে খলীফাতুররাসূলুল্লাহ' শুনতে কেমন অদ্ভুত লাগে। 'আমীরুল মুমিনীন' কত সুন্দর সম্বোধন!'

আবু উবাইদ সেনা সাহায্য নিয়ে যখন সেসব মুরতাদদের এলাকায় প্রবেশ করলেন যারা নওমুসলিম হয়েছিলো তখন লশকরের সংখ্যা চার হাজার হয়ে গেলো। যখন সে এলাকা থেকে তিনি বের হলেন তখন তার সঙ্গে দশ হাজার সৈন্য ছিলো। এই লশকরে সেসব মুসলমানরা ছিলো যারা মুসায়লামাতুল কাযযাব, তুলায়হা ও সাব্বাহ এর মত মিথ্যানবীদের কবলে পড়ে মুরতাদ হয়ে গিয়েছিলো।

এটা হযরত উমর (রা) এর খলীফা হিসেবে প্রথম হুকুমনামার সফল পরিণাম বলে অকপটে স্বীকার করলো লোকেরা।

সে চিৎকার করে বলছিলো–'পরস্পরে তোমরা লড়াই করো না। তোমরা তো ভাই ভাই। একে অপরের রক্ত ঝরিয়ো না। হত্যা করো তাদেরকে যারা তোমাদেরকে লড়তে উস্কানি দিয়েছে। কথা না শুনলে তো তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে।'

পারস্য জয় করে যরথ্রুষ্ট এর পূজারীদের রাজত্বে আল্লাহর হুকুম প্রতিষ্ঠা করা-উমর (রা) এর অনেক আগেরই অঙ্গীকার ছিলো। সে অঙ্গীকার ক্রমেই ব্যাকুলতায় পরিণত হলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে ইসলাম গ্রহণের জন্য লিখিত পত্র প্রেরণ করেছিলেন– সেই পত্রবাহকদের খুব কমই একেবারে নির্বিঘ্নে ফিরে আসতে পেরেছিলো। সাহাবী হযরত দাহিয়া কালবী (রা)কে কায়সারে রোমের কাছে পয়গাম দিয়ে পাঠানো হয়। রোম সম্রাট কায়সার তা প্রত্যাখ্যান করে। কায়সার তখন সিরিয়ায় ছিলো। দাহিয়া কালবী (রা) তাঁর সংক্ষিপ্ত কাফেলা নিয়ে ফিরে আসছিলেন। হঠাৎ কয়েকজন সিরিয়ান দস্যু আরবদের ওপর হামলা করে বসে এবং তাদের সফরের সকল সরঞ্জামাদি, খাবার ও পানীয় লুট করে নেয়। এমনকি সফরের বাহন ও উটগুলোও নিয়ে যায়।

বসরার গভর্নরের কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক পয়গাম পাঠালেন। হারিস ইবনে উমায়ের (রা) তা নিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু পথে আমর ইবনে শুরাহবীল নামক এক আরব খ্রিষ্টান তাঁকে মূতা নামক স্থানে বাঁধা দিয়ে হত্যা করে। হারিস ইবনে উমায়েরের সঙ্গে তিন রক্ষী ছিলো, তাদেরকে সে ছেড়ে দেয়।

তিন হাজারের এক ফৌজ তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মূতায় প্রেরণ করেন। এই ফৌজের সালার যায়েদ ইবনে হারিসা (রা)কে তিনি হুকুম দিলেন, সর্বপ্রথম আমাদের দূত হারিস ইবনে উমায়েরের হত্যাকারী শুরাহবীলকে যেন হত্যা করা হয়। তারপর মূতা ও এর আশপাশের লোকদেরকে ইসলাম কবুল করতে আহবান জানাবে। ইসলাম কী তাও তাদেরকে বলবে।

মূতায় বড় রক্তক্ষয়ী লড়াই হলো এবং তিনহাজার সৈন্য একলাখ সৈন্যকে পরাজিত করে দূত হত্যার প্রতিশোধ নিলো।

তদানীন্তন বিশ্বের পরাশক্তি পারস্য সম্রাট কিসরা পারভেজের কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পত্র প্রেরণ করেছিলেন। পুরো ইরাকসহ আরব সীমান্ত পর্যন্ত তার রাজত্বের বিস্তৃতি ছিলো, আরবকেও সে প্রজা-রাজ্য মনে করতো।

কিসরা পারভেজ একদিন তার ময়ূর সিংহাসনে বসা ছিলো। তাকে জানানো হলো মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এক দূত এসেছে মদীনা থেকে।

ঃ 'কি চায় সে?'–পারভেজ জিজ্ঞেস করলো।

ঃ 'রাজাধিরাজ কিসরায়ে আযম!'–দারোয়ান জবাব দিলো- 'সম্ভবত কোন পয়গাম নিয়ে এসেছে।'

ঃ 'মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে কেন এলো না'– পারভেজ ঔদ্ধত স্বরে বললো-'সে কি নিজেকে কোন সম্রাট মনে করে যে সে এলো না? মনে হয় সে এ

ধারণা করে বসে আছে যে, আমরা তাকে আল্লাহর পয়গম্বর মেনে নিয়েছি। সে তো জানে না মদীনা আমাদের পদতলেই রয়েছে। ডাকো দূতকে।'

দূত কিসরার দরবারে প্রবেশ করলেন। দরবারের বিশাল শান শওকত ও চোখ ধাঁধানো জাকজমকে তিনি মোটেও ভীত হলেন না।

ঃ 'হে শাহেনশাহে ফারেস! আপনার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক'– দূত বললেন– 'এবং রহমত হোক আপনার প্রতি আল্লাহর, যিনি এক-লা-শরীক, যাকে ছাড়া কোন মাবুদ নেই। আমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পয়গাম নিয়ে এসেছি।'

ঃ 'আজ তোমাকে এজন্য মাফ করে দিচ্ছি যে, তুমি কিসরার দরবারের আদব সম্পর্কে অবগত নও। যে মস্তক এখানে এসে নত না হয় তা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়। কি এনেছো দাও।'

এক দরবারী আগে বেড়ে দূতের হাত থেকে পত্রটি নিলো এবং কিসরার হাতে দিলো। কিসরা পত্রটি পড়লো, তার ঠোঁটে বিদ্রুপের হাসি ফুটে উঠলো।

ঃ 'সবাই শুনে নাও'– কিসরা বড় আওয়াজে দরবারীদের উদ্দেশে বললো–'দেখো আরবের এই বেকুব আমাকে লিখেছে, ইসলাম কবুল করে নাও। এহ! তারপর লিখেছে ইসলাম কী!'

দরবারীরা শাহেনশার তোষামোদের জন্য অট্ট হাসিতে ফেটে পড়লো।

কিসরা পত্রটি ছিঁড়ে কুচি কুচি করলো এবং টুকরোগুলো তার হাতের তালুতে রাখলো। তারপর সেগুলো এক ফুঁকে উড়িয়ে দিলো। দরবারের মেঝেতে সেগুলো এলোমেলো হয়ে ঝরে পড়তে লাগলো।

ঃ 'তুমি যেতে পারো'– পারভেজ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়া সাল্লামের দূতকে বললো– 'আমরা পত্রের জবাব দিয়ে দিয়েছি।'

ঃ 'কিসরা যদি আরেকটু ভেবে জবাব দিতেন তবে খুব ভালো হতো–' দূত বললেন–'আল্লাহ আপনার মুহাফিজ হোন।' দূত চলে আসলেন।

ঃ 'তাড়াতাড়ি এক দ্রুতগতির কাসেদকে (পত্রবাহক) ডাকো'– কিসরা ব্যস্ত হয়ে বললো– 'সে আসার আগ পর্যন্ত একটি পয়গাম লিখে ফেলো।'

সঙ্গে সঙ্গেই মুনশী এসে পয়গাম লিখতে বসে গেলো। ইয়ামানের গভর্নর বাযানকে এই পয়গাম লেখা হলো। ইয়ামন পারস্যেরই অন্তর্ভুক্ত রাজ্য ছিলো। কিসরা বাযানকে লিখলো,

'মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের গোলাম। সে আমাদের অপমান করেছে। আমাকে ইসলাম গ্রহণের হুকুম করেছে। তাকে এখনই গ্রেফতার করে আমার দরবারে হাজির করো।'

কয়েক দিনের মধ্যেই পত্রটি ইয়ামানের গভর্নর বাযানের কাছে পৌছলো। বাযান চিঠিটি পড়লেন। তার চেহারায় দুশ্চিন্তার গভীর ছাপ পড়লো। গভীর চিন্তায় তিনি ডুবে গেলেন। তার সামনে এক জেনারেল বসা ছিলো। সে বাযানের হাত থেকে নিয়ে পত্রটি পড়লো।

ঃ 'কিসরার তো হুকুম দেয়া উচিত ছিলো মদীনায় হামলা করার!'-জেনারেল বললো- 'মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আমরা গ্রেফতার করবো কিভাবে?'

এদিকে মদীনায় সেই দূত পৌঁছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জানালেন কিসরা পারভেজ পত্র নিয়ে কি আচরণ করেছে।

ঃ 'এই রাজত্ব এভাবেই টুকরো টুকরো হয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে'- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন তখন।

পত্রটি যখন কিসরা পারভেজকে দেয়া হয়েছিলো দরবারে তখন তার পুত্র শিরওয়াও ছিলো। কিসরার সিংহাসনে তারই পাশে একটি মেয়ে বসেছিলো। শিরওয়ার চোখ বারবারই দৃষ্টি মুগ্ধ করা সেই রূপবতী মেয়েটির ওপর গিয়ে পড়ছিলো এবং খানিক পরপরই তার ভুবনমুগ্ধ করা চেহারায় গিয়ে আটকে যাচ্ছিলো। রূপ যৌবনের এক অনবদ্য সৃষ্টি ছিলো সে। শাহযাদা শিরওয়াও কম রূপবান ছিলো না। মেয়েটি চোরা চোখে বারবার শিরওয়াকে দেখে নিচ্ছিলো আর তার যৌবন-পুরুষ্ট ঠোঁটে হাসির ঝলক উঠছিলো। কিসরা যখন তার হাত নিয়ে মর্দন করতো বা তার কোমল বাদামী আভার নগ্ন বাহুতে পারভেজ তার হাত ছুয়ে দিতো তখন তার ভুবন মোহিনী হাসির ঝিলিক দরবারময় এমনভাবে ছড়িয়ে পড়তো যেমন কলি চিড়ে ফুল তার হাসি ছড়িয়ে দেয়।

মেয়েটির নাম ইযদীবা। কিসরা তাকে আদর করে ইযদী বলতো। রাজদরবার শুরু হলে কিসরা তাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসতো এবং তার পাশেই সিংহাসনে বসাতো। আর দরবারীদের সঙ্গে কথা বলার সময় কিসরা ইযদীবার হাত বা চুল নিয়ে খেলা করতো। দরবারে যখন কারো মৃত্যুদন্ড দিতো তখন ইযদীবার কোমর তার বাহুতে জড়িয়ে ধরে তার দিকে টেনি নিতো আর এমনভাবে কিসরা হাসতো যেন ইযদীবার হুকুম পালন করছে। ইযদীবাও শরীর দুলিয়ে হাসতো। যেন মৃত্যুদণ্ড শুনে সে পরম আনন্দ পেয়েছে! শাহযাদা শিরওয়ার চোখে হঠাৎই এক মাস পূর্বের এক স্মৃতি নড়ে উঠলো।

শিরওয়া সেদিন হরিণ শিকারে গিয়েছিলো। তার সঙ্গে বিশ বাইশ জনের একটা দল ছিলো। কিছু ছিলো তার দেহরক্ষী। কিছু ভৃত্য-চাকর। তিন চার জন তোষামোদে হাকিম। আর এক সালার। এক স্থানে ছয় সাতটি হরিণ কি যেন খাচ্ছিলো। শিরওয়া ঘোড়া থেকে নেমে আলতো পায়ে গা ঢাকা দিয়ে আগে বাড়লো। হঠাৎ একটি হরিণের ওপর তীর ছুঁড়লো। হরিণটি বিদ্ধ তীর নিয়েই দৌড় শুরু করলো। আশ পাশের হরিণগুলো অনেক আগেই লাপাত্তা হয়ে গেছে। শিরওয়া দৌড়ে পিছনে এসে ঘোড়ায় চড়লো এবং তীব্রগতিতে হরিণের পিছনে পিছনে ছুটলো।

যখমী হয়েও হরিণটি বেশ দৌড়াচ্ছিলো। শিরওয়ার ঘোড়া হরণটির পাশেই চলে এলো। শিরওয়া হৈ হৈ করে হরিণটির ওপর ঘোড়াটি চড়িয়ে দিলো। হরিণটি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলো না। পড়ে গেলো। দেহরক্ষী কাছেই ছিলো। সে হরিণটি উঠিয়ে নিলো। শিরওয়া আর সেখানে দাঁড়ালো না। সঙ্গীদের উদ্দেশে পা বাড়ালো। শিরওয়া তাদের কাছাকাছি আসতেই তারা শিরওয়ার হরিণ শিকারের কৃতিত্বের ব্যাপারে শ্লোগান দিতে লাগলো। যেন সে হরিণ নয় খালি হাতে বাঘ শিকার করে নিয়ে এসেছে।

শিরওয়া এসব তোষামোদে হাঙ্গামার দিকে মোটেও ভ্রূক্ষেপ করলো না। তার দৃষ্টি আটকে গেলো উপচে পড়া রূপযৌবনে পুষ্ট এক কিন্নরী নারীর অবয়বে। পরিণত যৌবনে পড়েছে মাত্র মেয়েটি। তার পাশেই অভিভাবক গোছের একটি লোক দাঁড়িয়েছিলো। তার পিছনে মেয়েটি লুকোতে ব্যর্থ চেষ্টা করছিলো। লোকটি শিরওয়ার কাছে অপরিচিতই মনে হলো। এমন অপরিচিত আরো দুটি লোক ছিলো তার সঙ্গে। শিরওয়ার চোখ তখনও স্বপ্নের আবেশে জড়ানো ছিলো। লোক তিনটি সম্ভ্রমে সামনে অগ্রসর হয়ে শিরওয়াকে সালাম করলো।

ঃ 'কে এরা?'–শিরওয়া তার এক অফিসারকে জিজ্ঞেস করলো।

'আমরা মুসাফির' তিনজনের একজন বললো- 'বাগদাদ যাচ্ছি। আমরা বাগদাদেরই বণিক দল।'

ঃ 'আমরা আপনারই প্রজা'– দ্বিতীয় আরেকজন বললো–'এখান দিয়ে যাওয়ার সময় লোকেরা বললো, শাহজাদা শিরওয়া শিকার করতে এসেছেন। আপনাকে দেখার এতো সাধ জাগলো যে আমরা এখানে দাঁড়িয়ে পড়লাম।'

ঃ 'শুনেছিলাম শাহজাদা শিরওয়া এত রূপবান যে, তার প্রতি একবার দৃষ্টি পড়লে তা আর সরাবার উপায় থাকে না'– তৃতীয় জন বললো– 'আর আমরা লোকদেরকে এও বলতে শুনেছি যে এই সালতানাতের শাহানশাহ শিরওয়ারই হওয়া উচিত'।

'তোমাদের মধ্যে কার কন্যা এই মেয়েটি?' শিরওয়া জিজ্ঞেস করলো।

বণিক দলের তিনজনই একে অপরের দিকে তাকাতে লাগলো এবং ফিসফিসানি শুরু করলো। শিরওয়ার সঙ্গে যে জেনারেলটি এসেছিলো সে শিরওয়াকে হালকা ইশারা করলো। শিরওয়া জেনারেলের সঙ্গে একটু আড়ালে চলে গেলো।

ঃ 'মেয়েটি এদের কারোই কন্যা নয়'– জেনারেল শিরওয়াকে বললো- 'মেয়েটি তার সতাল বাবার জুলুম নির্যাতনের শিকার। তাই অনেকটা পালিয়ে এসেছে। তাদেরকে জিজ্ঞেস করলে তারা বললো, মেয়েটির বাবা মারা গেলে মা আরেকটি শাদী করে। মেয়েটিকে তো আপনি দেখেছেন। এমন রূপবতী সুন্দরী মেয়ে আপনি কি আগে কখনো দেখেছেন? এমন মেয়ে আশপাশে থাকলে নিজেকে সামলানো কঠিন, তাই এর সতাল বাপটির কু দৃষ্টিও মেয়েটির ওপর গিয়ে পড়লো। মা তাকে সব সময়ই আগলে রাখতে চেষ্টা করতো। মা এই বণিকদের মাধ্যমে জানতে পারলো, বাগদাদের এক শীর্ষস্থানীয় হাকিম এক রূপসী যৌবনবতী মেয়ের খোঁজে আছে। এই বণিকদলকে চিনতো এমন কয়েকটি অভিজাত পরিবার মধ্যস্থতা করে নিশ্চয়তা দিলো যে, এরা সত্যি কথাটিই বলছে এবং এরা লোকও মন্দ নয়। তাদেরকে যামানত রেখে কিছু পয়সার বিনিময়ে মা একে তাদের কাছে সোপর্দ করে দিলো। এখন মেয়েটিকে বাগদাদ নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।'

ঃ 'এদেরকে জিজ্ঞেস করো এ ধরনের মেয়ের বেলায় এরা কেমন দাম নেয়– শিরওয়া হুকুম করলো– 'তারপর এদেরকে সঙ্গে নিয়ে চলো, দাম পরিশোধ করে দেবো'।

বণিকদল এত বেশি দাম চাইলো শিরওয়ার মতো যে শাহজাদাও চমকে গেলো।

ঃ 'আমি চাইলে একে কোন দাম ছাড়াই এখানে রেখে দিতে পারি'–শিরওয়া হুমকির সুরে বললো–'আর তোমরাও বাগদাদ কখনো পৌঁছতে পারবে না।'

'ভবিষ্যত কিসরার কাছে এমন বে-ইনসাফী আমরা আশা করিনি'–এক ব্যবসায়ী বললো।

ঃ 'ইশক আর প্রেম ইনসাফ আর বেইনসাফীর মধ্যে কোন ফরক করে না'–শিরওয়া বললো-'আমার তো প্রেম হয়ে গেছে এর সঙ্গে।

ঃ 'আমরা এর যে দাম পরিশোধ করেছি তা তো আমরা দাবী করতে পারি!' –আরেকজন বললো–

এসব কথাবার্তা মেয়েটিও শুনছিলো, হঠাৎ সে দৌড়ে শিরওয়ার কাছে চলে এলো।

ঃ 'এদের সঙ্গে আমি কখনো যাবো না'– মেয়েটি শিরওয়ার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে তার দু' হাতে নিয়ে হাতজোড় করে কাঁদতে কাঁদতে বললো– 'এরা আমাকে নর্তকী বানিয়ে পয়সা কামাবে। আমার ইজ্জত বিক্রি করবে। আমি তো তাদের কেনা দাসী নই। কিসরার শাহাজাদার কাছে আমার সতীত্ব রক্ষার জন্য আর ইনসাফের জন্য কড়জোড়ে মিনতি করছি। শাহজাদা কি আমাকে এতটুকুন আশ্রয় দিতে পারবেন না?'–সে ফুঁপাতে লাগলো।

ঃ 'কেন পারবো না?'–শিরওয়া আবেগভেজা কণ্ঠে বললো–'তোমাকে তো আমার এই হৃদয়েই আশ্রয় দিয়ে দিয়েছি'– শিরওয়া একথা বলে মেয়েটির দু'হাত ধরে টেনে তুললো। তারপর নিজের বাহু বেষ্টনে নিয়ে তার দেহের সঙ্গে একাকার করে নিলো– 'আর এই যে তোমরা তিনজন!'–শিরওয়া মেয়েটিকে বাহুবেষ্টন থেকে মুক্ত করে বললো'– নিজেদের ঘোড়ায় চড়ো এবং বাড়ির পথ ধরো, হুকুম অমান্যের সাজা কি তা তো নিশ্চয় জানো!'

তিন বণিকদল পড়িমড়ি করে ঘোড়ায় সরওয়ার হয়ে ঘোড়ার পিঠে চাবুক কষালো। মুহূর্তেই সেখান থেকে বের হয়ে গেলো।

সেটা ছিলো রাতের প্রথম প্রহর। শিরওয়ার সঙ্গে শিকারে যাওয়া সেই হাকিম আর জেনারেলরা। কিসরার কাছে বসে কিসরারই প্রশংসা-কীর্তনের সুর বাজছিলো।

ঃ 'আজ আমাদের শাহজাদা শিরওয়া শিকারে গিয়েছিলেন–' পারভেজ অলস কণ্ঠে বললো– 'আর না কি তোমরা সবাই তার সাথেই ছিলে?'

ঃ 'হ্যাঁ কিসরা আজম!' জেনারেল বললো– 'শাহজাদা এখন রূপবান যুবা পুরুষ। আমরা তাকে একলা কোথাও যেতে দিতে পারি না।'

ঃ 'কী শিকার করেছে?'

'একটি হরিণ কিসরা আজম'– এক হাকিম জবাব দিলো।

ঃ 'আমরা আপনাকে শাহজাদার শিকারের কথাই বলতে যাচ্ছিলাম'–জেনারেল বললো- 'শাহজাদা হরিণের সঙ্গে এক যুবতী মেয়েকেও শিকার করে নিয়ে এসেছে'– মেয়েটি কিভাবে সেখানে এলো শাহজাদা তাকে কিভাবে নিয়ে এলো আদ্যোপান্ত সব

বললো জেনারেল। তারপর বললো– 'মেয়েটি এতই সুন্দরী যে, শাহজাদা এখন তাকে নিয়েই পড়ে থাকবে। অথচ পারস্য সালতানাত এখন প্রায় শত্রুবেষ্টিত হয়ে আছে। এ অবস্থায় এক শাহজাদা কখনো এ অনুমতি পেতে পারে না যে, অবাধে মহলে কোন হেরেমের বাইরের একটি মেয়েকে নিয়ে আসবে।'

ঃ 'তোমরা সবাই তাকে বাঁধা দাওনি?'– কিসরা জিজ্ঞেস করলো।

অনেক বারণ করেছিলাম কিসরা আযম'–জেনারেল বললো- 'কিন্তু আমরা তো তাকে হুকুম দিতে পারি না এবং জোরজবরদস্তিও করতে পারি না। আমরা শুধু এতটুকুই জানি, এক শাহজাদার এধরনের আচরণ কিসরার মতো মহান ব্যক্তিত্বের পক্ষে মেনে নেয়া সম্ভব নয়। কিন্তু আমরা আপনার নেমক খাই। আপনার বিশাল সাম্রাজ্য পারস্যের ভাবমূর্তি বজায় রাখার জন্য আমাদের জান মাল উৎসর্গিত।'

এই জেনারেল ও উচ্চপদস্থ আরেক হাকিম পারভেজকে তার পুত্র নওশিরওয়ার বিরুদ্ধে উস্কে দিচ্ছিলো। এরাই শিকার ক্ষেত্রে শিরওয়ার সঙ্গে ছিলো। তারাই সেই তিন বণিক দল থেকে সে মেয়েকে ছিনিয়ে নেয়ার জন্য শিরওয়াকে উৎসাহ জুগিয়েছিলো। শিরওয়া এই মেয়েকে নিয়ে ফেরার সময় এরাই পথে শিরওয়ার এমন প্রশংসা শুরু করলো যেন শিরওয়াই দেশের বাদশাহ।

'পারস্যের পবিত্র সিংহাসনে শিরওয়াকেই সুন্দর মানাবে।'

'আর শাহজাদার সঙ্গে এ যেন বিশ্বরানী! যরথ্রুষ্টের কসম! এমন স্বর্গীয় জুটি.........।'

'প্রজারা শিরওয়াকে যখন দেখে তখন শ্রদ্ধার আর নির্ভরতায় তাদের মাথা নত হয়ে পড়ে।'

শিরওয়া এমনিতেই এই আনত যৌবনা মেয়েটির রূপে মোহাবিষ্ট ছিলো, আর যখন এ সব উচ্চপদস্থ অফিসাররা গদগদে কণ্ঠে তার মহীমা কীর্তন গাওয়া শুরু করলো তখন শিরওয়া যেন স্বপ্নের পংখিরাজে উড়ে বেড়াতে লাগলো। গর্ব আর অহংকারে তার বুকটি ফুলে ফুলে উঠলো। মাথা যেন উঁচুতে উঠতে উঠতে আকাশ ফুরে যাচ্ছিলো। আর তার স্বপ্নের রঙিন পরীরা ফিসফিসিয়ে বলে যাচ্ছিলো, তুমিই তো পারস্যের শাহেনশাহে আজম।

এই জেনারেল ও হাকিমরা শিরওয়াকে অবশেষে তার পিতা কিসরা পারভেজের বিরুদ্ধেও ক্ষুব্ধ করে তুললো। এরা তাকে এই নিশ্চয়তাও দিলো যে, সে যে একটি মেয়েকেও শিকার করেছে তা তার পিতা মোটেও জানতে পারবেনা। সুসজ্জিত এবং বড়সড় একটি ঘরে তারা মেয়েটিকে লুকিয়ে ফেললো। আর নওশিরওয়াকে বললো, রাতে অমুক বাগানে তার সঙ্গে মেয়েটির নির্জন প্রণয় ঘটবে। রাতে শিরওয়ার পিতাকে শিরওয়ার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলছিলো।

কিসরা পারভেজ রাগে কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়িয়ে বললো- 'আমি এখনই তার ওখানে যাচ্ছি, তার সঙ্গেই তো মেয়েটিকে পাওয়া যাবে।'

ঃ 'না কিসরায়ে আযম?'–এক হাকিম বললো– 'মেয়েটিকে তো তিনি তার সঙ্গে রাখেননি। এখন মনে হয় তারা অমুক বাগানে অভিসার করছে'–এই বলে সে পারভেজকে বাগানের নাম বললো।

কিসরা পারভেজ একাই হাঁটা দিলো।

ঃ 'শিরওয়া কি এখন তার পিতাকে হত্যার মতো দুঃসাহস দেখাবে?'– পারভেজ চলে যাওয়ার পর জেনারেল শহরের হাকিমকে বললো– 'হত্যা না করলেও পিতা-পুত্রের মধ্যে তো দুশমনী দেখা দিবে'–এক হাকিম বললো– 'আর আমরা এই দুশনমীকে মজবুত করে দেবো'–অন্য আরেক হাকিম বললো– 'মেয়েটিকেও কিন্তু মজবুত থাকতে হবে' জোনারেল বললো– 'তার সামান্য অসতর্কতাই কিন্তু সব ফাঁস হয়ে যেতে পারে। আমরাই যে তাকে লুকিয়ে ছিলাম তা না আবার সে বলে দেয়।'

ঃ আমি ওকে ভালো করেই বুঝিয়েছি'–এক বৃদ্ধ হাকিম বললো- 'আর অনেক ভয়ও দেখিয়েছি। এখন কি হয় তাই দেখে যাও' জেনারেল বললো- 'সবকিছু যদি ফাঁস হয়ে যায় তবে কিন্তু পারভেজ আমাদের ছাড়বে না। তাই তাকে কোন ক্রমেই জীবিত রাখা যাবে না।'

মহল সংলগ্ন সেই বাগানটি একেবারেই বেহেশতের উপমা ছিলো। জোৎস্নাভাঙ্গা চাঁদের আলো যেন এর সৌন্দর্য প্লাবনকে দিগুণ করে তুলছিলো। বাগানের মাঝখানেই ছিলো কাঁচ স্বচ্ছ পানির একটি ঝর্ণা। ঝর্ণার রিনিঝিনি শব্দ, ঝর্ণার কুলকুলে পানিতে চাঁদের কাঁপা কাঁপা প্রতিবিম্ব, চন্দ্রালোক- সব মিলিয়ে স্বর্গলোকের এক মায়াবী দৃশ্যায়ন যেন। আর ফুলের মাতাল করা সৌরভ কোন নারী বা পুরুষের যৌবনবৃক্ষটি যেন পত্র-পল্লবিত করে তুলছিল। স্বপ্নপুরীর সেই বাগানেই ঝর্ণার জল-স্নিগ্ধ ঘামে রূপবান–রূপবতী দুই মানব মানবী এমন ঘনিষ্ঠ হয়ে বসা ছিলো যেন দুটি মানব অস্তিত্বেরই একটি দেহ।

সে ছিলো শিরওয়া আর জঙ্গল থেকে তুলে আনা তার নতুন মানবী। সে তার নাম বলছিলো ইযদীবা। তারা একে অপরের গভীর গহীনে আবিষ্ট হয়ে গিয়েছিলো, প্রেম যৌবনের আবৃত উড়নী তাদেরকে পার্থিব কোলাহল থেকে অনেক দূর দরিয়ায় জলমগ্ন করে রেখেছিলো।

ঃ 'আর কত দিন আমাকে লুকিয়ে রাখবে'– প্রায় কানে কানে বললো ইযদীবা।

ঃ 'কয়েক দিন মাত্র',–শিরওয়া বললো–'তারপরই আমাদের শাদী হয়ে যাবে।

ঃ 'শাহী খান্দানে কি আমাকে কেউ গ্রহণ করে নেবে?'–ইযদীবা শিরওয়া থেকে একটু সরে গিয়ে বললো- 'আমি তো প্রজাদের একজন। আর আমার কোন অভিভাবকও নেই।'

ঃ 'এক লোককে তোমার পিতা বানানো হবে'–শিরওয়া বললো- 'তাকে ইরাক বা শিরিয়ার কোন গোত্রের সরদার বলে পরিচয় দেয়া হবে। শিকারের সময় যে অফিসার আমার সঙ্গে ছিলো, সেই এসবের ব্যবস্থা করবে। তার সঙ্গে তুমি মহলে আসবে, তারপর এই অফিসার আমার বাবাকে বলবে- শিরওয়ার শাদী এই মেয়ের সঙ্গেই হওয়া উচিত। সে আমার বাবাকে রাজী করিয়ে নেবে। বাবাকে বলবে সে- অনেক প্রভাবশালী আমীর ও বিত্তবান এক ঘরের মেয়ে এটি। তার এলাকায় সে পারস্য সালতানাতের একটি মজবুত স্তম্ভ।'

হঠাৎই তাদের ওপর একটি ছায়া উড়লো। কোন মেঘখণ্ড হয়তো চাঁদকে ঢেকে দিয়েছে- এটা মনে করেই তারা সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করলো না। কিন্তু ছায়া তাদেরকে অতিক্রম করে গেলো না। স্থায়ী হয়ে রইলো।

ঃ 'কিসরার সালতানাতের স্তম্ভ অনেক মজবুত শাহজাদা!'–ছায়া থেকে এক গুরুগম্ভীর আওয়াজ ভেসে এলো।

শিরওয়া আর ইযদীবা চমকে উঠে একে অপর থেকে প্রায় ছিটকে পড়লো। বেহাল চোখে তাকিয়ে দেখলো, কিসরা পারভেজ এক মেঘগর্জনের মতোই তাদের মাথার ওপর দাঁড়িয়ে আছে। ইযদীবাকে কিসরা হাত ধরে দাঁড় করালো। শিরওয়া তার পিতা আর ইযদীবার মাঝখানে এসে দাঁড়ালো।

ঃ 'আমার সঙ্গে কথা বলুন'- শিরওয়া উত্তেজিত গলায় বললো– 'আমিই তাকে এখানে এনেছি। সে আমাকে আনেনি।'

পারভেজ এক দেড় কদম পিছনে হটে গেলো, তারপর ঘুরেই শিরওয়ার মুখে থাপ্পর কষলো। 'তুমি কি কখনো কিসরার পথ মাড়াতে কাউকে দেখেছো?'– কিসরা পারভেজ বললো– 'আহমক শাহজাদা! এখান থেকে হটো। আজ থেকে তোমার মহলের বাইরে যাওয়া বন্ধ।'

কিসরা ইযদীবাকে নিয়ে থপথপ পায়ে চলে গেলো। শিরওয়া সেখানে দাঁড়িয়েই তার গালে হাত বুলাতে লাগলো।

কিছুক্ষণ পর। কিসরা পারভেজের শয়নকক্ষে ইযদীবা তার সঙ্গে কথা বলছিলো খোলামেলা– সপ্রতিভ কণ্ঠে।

ঃ 'আচ্ছা! আমার ছেলেটাকেই কি তোমার চাই?'–পারভেজ জিজ্ঞেস করলো।

ঃ 'আপনার ছেলের খেলাফ কিছু বললে যে আপনি নারাজ হয়ে যাবেন'– ইযদীবা বললো।

ঃ 'আরে! তোমার প্রতি আমি এমন হুট করে নারাজ হলে তো এই সোনার পালঙ্কে তোমায় বসাতাম না'– পারভেজ আদুরে গলায় বললো- 'যা বলার বলে যাও।'

ঃ 'আপনার ছেলেটি আস্ত আহমক'- ইযদীবা বললো -'এই বয়সেই কেমন নারী লিপ্সু আর বিলাস ব্যসনে পড়ে আছে। আমাকে আমার বাবা থেকে জোর করে ছিনিয়ে নিয়েছে। তার সঙ্গে আপনার মতো পিতৃ বয়সের দু তিনজন লোক ছিলো। কোন তোয়াক্কাই করলো না। তারা সবাই তো তাকে অনেক বারণ করেছে। কত করে বাধা দিয়েছে। কে শোনে কার কথা, বুক ফুলিয়ে বলেছে, আমি কিসরার পুত্র। এই প্রজাদের প্রতিটি মেয়েই তো আমার মালিকানায় রয়েছে। যাকে ইচ্ছে তাকেই ভোগ করবো। আরো কী বললো জানেন! যে আমাকে বাধা দেবে সে একেবারেই মারা পড়বে।'

ঃ 'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছো তুমি'–পারভেজ বললো- 'আমাদের এই শাহজাদা বড়ই আহমক।–'আচ্ছা তোমার পছন্দটা শুনি। তুমি কি আমার কাছে থাকতে পছন্দ করবে না মা বাবার কাছে ফিরে যাবে?

ঃ 'পারস্যের মহাশক্তিধর শাহেনশাহ কি আমাকে তাঁর সঙ্গে রাখার যোগ্য মনে করেন'?–ইযদীবা গলায় পেরেশানী আর বিস্ময় ফুটিয়ে তুলে বললো।

ঃ 'তোমার মতো এমন নিষ্পাপ কোমল ফুলকে কে তার বুকে জড়িয়ে রাখতে চাইবে না?' পারভেজ তাকে কাছে কাছে টানতে বললো।

ঃ 'শাহেনশার মন যদি আমার মতো এই নগণ্যের জন্য এতো করুণাময় আর উদার হয় তবে তা আমার জন্য পরম সৌভাগ্যের'– ইযদীবা বললো– তারপর কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললো- 'কিন্তু শাহজাদাকে আমার ভয় হয় সে যদি আমাকে কতল করে দেয়'– গলায় তার আতংকের ভাব।

ঃ 'তাকে আমি মহলে নজর বন্দী করে রেখেছি'- পারভেজ বললো- 'সে মহলের সীমানার বাইরে যেতে পারবে না, অবশ্য বাগানে বাগানে ঘুরে বেড়াতে পারবে। তুমি তো আমার সঙ্গেই থাকবে।'

ইযদীবার সে রাত কিসরা পারভেজের পালঙ্কেই কাটলো। পরদিন পারভেজ শিরওয়াকে ডেকে হুকুম করলো, সে মহলের বাইরে এক পাও ফেলতে পারবে না, আর মহলের ভেতর হেরেমের কামরাগুলোর কাছে ধারেও ঘেঁষতে পারবে না। শিরওয়াও তার পিতাকে ছেড়ে দিলো না, মুখের ওপর অনেক কিছুই বললো। পিতা পুত্রে অনেক তর্ক হলো।

'আমি তোমার এই দুঃসাহস কখনো ক্ষমা করতে পারবো না'– কিসরা রাগে গড়গড় করতে করতে বললো।

ঃ 'আর ক্ষমা করার মতো পাত্রও তো নয়'– শিরওয়া বিদ্রূপ করে বললো।

সে দিনই শিরওয়ার শিকার সঙ্গীদের এক হাকিম শিরওয়ার সাথে সাক্ষাত করতে এলো।

ঃ 'কোন পিতাই তার ছেলের সঙ্গে এমন ব্যবহার করতে পারে না'–হাকিম শিরওয়াকে বললো- 'কিসরার তো উচিত ছিলো সেই মেয়েকে মহলের বাইরে বের করে দেয়া। অথচ আপনার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে তার শয্যা পাশে রাখতে শুরু করেছেন।'

ঃ 'কিসরাকে আমি এখন পিতা মনে করার দায় ছেড়ে দিয়েছি'– শিরওয়া বললো।

ঃ 'আমরা দেখতে পাচ্ছি কিসরা এখন বিলাস আসক্তিতে ডুবে আছে' হাকিম উস্কে দিলো– 'ও দিকে মুসলমানরা বড় এক যুদ্ধশক্তি বনে যাচ্ছে। অন্য দিকে রোমকরা দিন দিন আরো আশংকাজনক হয়ে উঠছে। আর কিসরার কিনা এ হাল। আমরা শুধু এখন আপনার দিকেই তাকিয়েছি। আপনিই কেবল সেই ব্যক্তি যিনি ধ্বংসের হাত থেকে এখন পারস্যকে বাঁচাতে পারেন।'

অন্যান্য হাকিমরাও একে একে শিরওয়ার সঙ্গে এসে সাক্ষাত করলো। কিসরার বিরুদ্ধে শিরওয়াকে উত্তেজিত করে তুললো। জেনারেলরা এসে তো কূটনামীতে সবাইকে ছাড়িয়ে গেলো। পিতার বিরুদ্ধে পুত্রকে ক্ষেপিয়ে তোলার ষোলকলা পূর্ণ করলো। সবাই তাকে বলতে লাগলো তার বাপ এখন সালতানাতকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে।

শিরওয়া সদ্য যুবক ছিলো। যৌবনের উষ্ণ রক্তধারা তার শরীরে টগবগ করছে তখন। ইযদীবার মতো এমন রূপসী মেয়ের ব্যাপারে তীব্র আবেগ সংবরণ করা শিরওয়ার পক্ষে সম্ভব ছিলো না। শিরওয়ার মনে শুধু ইযদীবার মূর্তিই হামেশা ঘুরছে। সে এখন কিসরা পারভেজকে তার পিতা নয়– প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবতে শুরু করলো।

কিছু দিন পর পারভেজ জরুরী কোন কাজে কোথাও গিয়েছিলো। এ সময় শিরওয়া আর ইযদীবা এক রাতে বাগানের এক নিভৃত কোণে সাক্ষাত করলো।

ঃ 'আমাকে তোমার বুড়ো বাপের জুলম থেকে বাঁচাও' – ইযদীবা কাঁদতে কাঁদতে বার বার শিরওয়াকে বলছিলো 'আমি তোমার সঙ্গে এসেছি, আমি তোমারই। তোমার বাপ যদি আমায় মুক্তি না দেয়, আমি বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করবো।'

ঃ 'না - তোমাকে আমি তা করতে দেবো না'– শিরওয়া দৃঢ় গলায় বললো– 'কিসরা পারভেজই মরবে, আর সে আমার হাতেই মরবে।'

ইযদীবা যখন পারভেজের সঙ্গ সুখে মত্ত থাকতো তখন তাকে শিরওয়ার বিরুদ্ধে উস্কিয়ে তুলতো। আর পারভেজ এ কারণে নানান অজুহাত ধরে শিরওয়াকে উত্তম-মাধ্যম বলতো আর তার মহলের জীবনকে আরো সংকুচিত করে তুলতো।

কিসরা চার পাঁচ দিন পর তার সংক্ষিপ্ত সফর থেকে ফিরে এলো। এই কয়েকদিন শিরওয়া আর ইযদীবার বেশ কয়েকবারই মিলন হয়েছে। নিজের মন ভোলানো শরীর আর প্রলয়ংকরী যৌবনের উত্তাপ এবং মুখের জাদুতে শিরওয়াকে তার পিতার জানী দুশমনে পরিণত করে তুললো সে।

এ কয়দিন সেই জেনারেল আর চার পাঁচজন উচ্চপদস্থ অফিসার শিরওয়ার সঙ্গে সময় অসময়ে সাক্ষাত করে তার মন মগজে এটা প্রায় নকশা করে দেয় যে, 'কিসরা ফারেস' এখন সেই। তার বাপ সালতানাতকে বরবাদ করে দিচ্ছে শুধু।

কিসরা ফিরে আসার দু'একদিন পরেই তার দরবার মহলে সে প্রবেশ করলো। সঙ্গে ইযদীবাকেও নিয়ে এলো এবং তাকে সিংহাসনে নিজের পাশে বসালো। সকল দরবারীরাই উপস্থিত ছিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই পত্রবাহক দূত তখনই কিসরা পারভেজের দরবারে আসেন। শিরওয়া তখন ইযদীবার সঙ্গে কিসরা পারভেজের সংঘনিষ্ঠ নড়াচড়া - ইযদীবার চুল হাতে নিয়ে ঘ্রাণ নেয়া, গালে গালে ছুইয়ে দেয়া, হাতে হাত রাখা এসব দেখে শুধু তুষের আগুনে জ্বলছিলোই না, মনে মনে ভয়ানক এক সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলো।

পরদিনই কিসরা ঘটা করে শিকারে চলে গেলো এক জঙ্গলে। আগের সন্ধ্যায়ই হুকুম দিয়ে রেখেছিলো যে, কাল শিকারে যাবে। সব ব্যবস্থা করে রাখতে হবে। রাতে শাহীমহল থেকে শিকারে যাওয়ার রাজকীয় ব্যবস্থা সম্পন্ন করা হলো। পারস্যের ফৌজে যে হিন্দুস্তানের হাতি ছিলো- যা রাজা দাহিরের পিতা উপঢৌকনস্বরূপ পাঠিয়েছিলো- তেমন একটি হাতি কিসরার শিকারের জন্যও তৈরী করা হলো। দুটি হাতি অফিসার আর সহযোগী বাহিনীর জন্যও ছিলো, আর রক্ষী হিসাবে ছিলো তের-চৌদ্দজন ঘোড়সওয়ার।

সঙ্গে শিরওয়াও ছিলো। ঘোড়ায় সওয়ার ছিলো সে। তার কাছে ধনুক ছিলো আর তীর ভর্তি তুনীর তার কাঁধের পেছনে আড়াআড়িভাবে বাধা ছিলো। কিসরা তো শিরওয়াকে নিতে মোটেও রাজী ছিলো না। কিন্তু কিসরার বাল্যবন্ধু জেনারেল এবং দুই উচ্চপদস্থ অফিসার কিসরাকে এই বলে রাজী করিয়েছিলো যে, শিরওয়ার হাবভাবে বেশ পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে।

এই অফিসাররা রাতে শিরওয়ার সঙ্গে সাক্ষাত করলো এবং অনেক সময় ধরে তার কানে ফিসফিসিয়ে গেলো। পরদিন কিসরা পারভেজ হরিণ শিকারে গভীর জঙ্গলের দিকে রওয়ানা দিলো। শিকারের নেশা ছিলো তার বহু পুরোনো। তাকে নেশায় পেয়ে বসলো। এক সময় তার হাতি রক্ষী দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো। যখমী একটি হরিণের পিছনে কিসরা ছুটছিলো। জঙ্গলের পথ খুব ঘন আর অসমতল ছিলো না। তবে বড় বড় লতানো বৃক্ষপত্র দ্বারা আবৃত পথগুলো অসমতল ছিলো। উচুনিচু খাদ, ছোট বালির ঢিবিও সেখানে ছিলো। কোথাও কোথাও টিলার আকারের অনেকগুলো বালির ঢিবি ছিলো। যেগুলো ঘন আড়ালের সৃষ্টি করেছিলো। শিরওয়া এসব আড়ালের কোন একটার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলো। কিসরা হাতির হাওদায় বসা ছিলো। হাতি যখমী হরিণের পিছনে সাধ্যমতো ছুটছিলো। কিন্তু হরিণের সঙ্গে হাতি কেন পেরে উঠবে। কিসরা হাতি থামিয়ে হাতি থেকে লাফিয়ে নেমে পড়লো। জোরে হাঁক দিয়ে কাউকে একটি ঘোড়া আনার নির্দেশ দিলো। শিরওয়া তখন একটি টিলার ওপর আড়াল নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো। কিসরাকে সে হাতির হাওদা থেকে নামতে দেখেই তুনীর থেকে একটি তীর নিয়ে ধনুকে নিশানা করলো। কিসরা তীরের আওতার মধ্যেই ছিলো। শিরওয়াও কারো নজরে পড়ছিলো না। শিরওয়া তার পিতা কিসরা পারভেজকে লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়ে দিলো। খুব সামান্য দূরত্ব ছিলো আর তীর নিক্ষেপকারী ছিলো অভীষ্ট লক্ষ্যভেদী শাহজাদা। তাই তা আর লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো না। কিসরার ঘাড় দিয়ে ঢুকে তীরের ফলাটি তার গলা দিয়ে বের হয়ে এলো, কণ্ঠনালীর রগটি ছিঁড়ে গেলো। কিসরা যন্ত্রনায় কয়েকবার কেঁপে কেঁপে উঠলো। তারপর পড়ে গিয়ে ছট ফট করতে লাগলো।

ধীরে ধীরে কিসরার ছটফটানি থেমে গেলো। নিঃসাড় পড়ে রইলো শাহেনশাহে ফারিস। শিরওয়া এক দৌড়ে কিসরার দেহের পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। দেখতে দেখতে দলের লোকেরাও সেখানে এসে গেলো। শিরওয়া সবাইকে স্পষ্ট করে বললো, গাছের একটি ঝুলন্ত শাখায় সে একটি পাখি বসে থাকতে দেখে তীর চালিয়েছিলো। আর সে ছিলো একটি টিলার ওপর। পাখি ছিলো নিচে। গাছের ঝুলন্ত ডাল বরাবর যে কিসরা দাঁড়িয়ে ছিলো তা শিরওয়া দেখবে কি করে। পাখি টের পেয়ে উড়ে চলে গেলো এবং পাখির বদলে তীরের লক্ষ্যস্থল হয়ে গেলো কিসরা পারভেজ।

শুধু একজনই নয়। দু'চারজন জেনারেল আর চার পাঁচজন উচ্চপদস্থ উমারা এবং অফিসারদের সম্মিলিত ষড়যন্ত্রের ফল ছিলো এটা। এই ষড়যন্ত্রের কালো মেঘ অনেক দিন থেকেই কিসরার সিংহাসন ঘিরে পুঞ্জিভূত হচ্ছিলো।

কেউ টের পেলো না যে, কিসরা পারভেজ তারই পুত্রের হাতে খুন হয়েছে। কিন্তু পরবর্তী সম্রাট সিংহাসনের উত্তরাধিকার কে হবে এ নিয়ে এমন অসহিষ্ণুতা আর মতবিরোধ দেখা দিলো যে, শেষ পর্যন্ত অবস্থা গৃহযুদ্ধের রূপ নিলো। পারভেজ এমনিতেই উদ্ধত ও ফেরআউন চরিত্রের এক সম্রাট ছিলো। তার মন্ত্রী পরিষদও তার হাতে নিরাপদ ছিলো না। অবশেষে সবার সম্মতিক্রমে শিরওয়াকে মসনদে বসানো হলো।

শিরওয়ার মসনদ কয়েক মাসও স্থায়ী ছিলো না। সে তার পিতার মতোই ইযদীবাকে সব সময় তার সঙ্গেই রাখতো। দরবারের অতি গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর বিষয়গুলোর ফয়সালাও ইযদীবাকে জিজ্ঞেস করেই প্রদান করতো। কারো যুবতী সুন্দরী মেয়ে তার চোখে পড়লে রক্ষা ছিলো না। তার ইযযত সে লুটেই ছাড়তো। তার ভাই ছিলো পনের জন। তাদের সবাইকেই সে হত্যা করিয়েছিলো, যাতে তার সিংহাসনের কোন কাঁটা আর অবশিষ্ট না থাকে।

শিরওয়া তার তোষামোদে জেনারেল আর হাকিমদেরকে সালতানাতের নেতৃত্বের জন্য নির্বাচন করে। তারা তার কাছ থেকে কৌশলে বড় বড় পদ আর জায়গীর হাসিল করে নেয় এবং প্রজাসাধারণের জন্য অথর্ব শুভ্র হস্তিতে পরিণত হয়। ওদিকে ইযদীবা নিজেকে আলাদা হুকুমদার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে।

এক রাতে শিরওয়া মহল থেকে বের হয়ে কোথায় জানি যাচ্ছিলো। তার পেছন থেকে একটি লোক উদয় হলো। একটি খঞ্জর শিরওয়ার দেহের এক পাশ দিয়ে ঢুকে অন্য পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেলো। শিরওয়া গুপ্তঘাতককে শনাক্তও করতে পারলো না। খঞ্জর তার কলজে ছিড়ে বের হয়ে গিয়েছিলো। লম্বা হয়ে সে সটান পড়ে গেলো, আর উঠলো না।

এই হত্যাকাণ্ড তাদের নির্দেশে সংঘটিত হয়েছিলো যারা পারস্যকে এখনো বাঁচাতে উদগ্রীব ছিলো। তারা সবাই শাহী খান্দানেরই ঘনিষ্ঠ ছিলো এবং শাহী মহলই তাদের আবাস ছিলো। তারা ইযদীবাকে পাকড়াও-করলো। যে জেনারেল ও হাকিমরা শিরওয়াকে সিংহাসনে আরোহণ করিয়েছিলো ইযদীবা তাদের নাম বলে দিলো।

ঃ 'শিরওয়াকে তারা স্বীয় পিতার শত্রুতে পরিণত করার জন্যই ষড়যন্ত্র শুরু করে'– ইযদীবা বললো– 'আমি তাদের ষড়যন্ত্রের একটি গুরত্বপূর্ণ গুটি ছিলাম। তারা তিন ব্যক্তিকে বণিকদল সাজালো। এই বানোওয়াট বণিকদল আমাকে জঙ্গলের সেখানে নিয়ে গেলো যেখানে শিরওয়া শিকারে গিয়ে ছিলো। তারা আমার পরিচয় দিলো যে, আমার সতাল পিতা আমার প্রতি জুলুম করতো বলে আমার মা তাদের এই আশায় আমাকে তাদের কাছে সোর্পদ করে দিয়েছে যে, বাগদাদের কোন আমীরের সঙ্গে বিয়ে দেবে। শিরওয়া আমাকে দেখে তাদের প্রত্যাশা মতোই আমার প্রেমে দিওয়ানা হয়ে গেলো।'

শিরওয়া কি করে সেই তিন ব্যক্তিকে সেখান থেকে ভাগিয়ে দিয়েছিলো তারপর ইযদীবাকে মহলে এনে উঠিয়ে ছিলো এই পুরোঘটনাই ইযদীবা বলে গেলো।

ঃ 'আমাকে যে নাটকে অভিনয় করতে বলা হয়েছিলো আমি করেছি'–প্রথমেই আমাকে সবকিছু জানিয়ে দিয়েছিলো। এক জেনারেল আর তিন চার হাকিম একটি ঘরের মধ্যে আমাকে কি করতে হবে তা শিখিয়ে পরিয়ে নেয়। আমি নিয়মিতই কিসরা পারভেজকে শিরওয়ার বিরুদ্ধে উস্কে দিতাম। পরে শিরওয়াকে তার পিতার এমন দুশমন বানালাম যে, সে তার পিতাকে হত্যার জন্য তৈরী হয়ে গেলো। শিরওয়ার যে তীরের আঘাতে কিসরা নিহত হয়েছে সেটা কোন দুর্ঘটনা ছিলো না। শিরওয়া স্বীয় পিতাকে হত্যার উদ্দেশেই তীর চালিয়েছিলো।'

ইযদীবার কথা মতো সেই জেনারেল ও হাকীমসহ বানোয়াট সেই বণিকদলকে গ্রেফতার করা হলো এবং তাদেরকে জল্লাদের হাতে ছেড়ে দেয়া হলো। কিন্তু ইযদীবার পরে কি পরিণতি হয়েছিলো তা আর কেউ জানতে পারেনি। ইতিহাসের আঁধারে সে হারিয়ে যায়।

শিরওয়ার হত্যাকারীর একজনকে পরে সিংহাসনে বসানো হলো। তিন মাস পর সেও খুন হয়ে গেলো।

এই খুনের ধারাই চললো চার বছর। খুন করো আর বাদশাহ বনে যাও। এভাবে নয় জন এই চার বছরে বাদশাহরূপে সিংহাসনে বসেছে আর নিহত হয়েছে। এসব প্রাসাদ ষড়যন্ত্র, আভ্যন্তরীণ কোন্দল তো ছিলোই অন্য দিকে তখন রোমের সঙ্গে পারস্যের দীর্ঘ যুদ্ধের কারণে পারস্য সম্রাট ভেতর ভেতর অন্তঃসারশূন্য হয়ে পড়েছিলো, যেন এক উচু অট্টালিকার স্তম্ভগুলো চূর্ণ হয়ে গেছে। এখন শুধু অট্টালিকার অবকাঠামোটাই অবশিষ্ট রয়েছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পারস্য সম্পর্কে যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তা খুব দ্রুতই ফলতে শুরু করে। তিনি বলেছিলেন, পারস্য টুকরো টুকরো হয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে। সম্ভবত এরই পরিণতিতে পারস্যের সেই কিসরার মহল এক ভয়াবহ মৃত্যুফাঁদে পরিণত হয়েছিলো। শাহী খান্দানের নয় নয়টি দেহের ছিন্ন ভিন্ন বিক্ষিপ্ত লাশের টুকরোগুলো যেন মহল জুড়ে শিরদাড় কাঁপানো প্রেত নৃত্যে লিপ্ত হয়েছিলো।

এদিকে মুসলিম ফৌজ ইরাকে ঢুকে পড়েছিলো। পারসিকদের সৈন্যের তুলনায় মুজাহিদদের সংখ্যা অর্ধেকও ছিলো না। এছাড়াও পারসিকদের প্রতিটি সৈন্যই মজবুত লৌহ বর্মে সুসজ্জিত থাকতো। এরপরও মুজাহিদরা প্রতিটি ময়দানেই পারসিকদের পিছনে হটিয়েছে এবং তাদের প্রতিটি কেল্লাতেই ইসলামের উজ্জ্বল– কান্তিময় ঝান্ডা উড়িয়েছে। আর পারসিকরা নিজেদের লাশের সারি আর আহত ছটফট করা দেহগুলো ফেলে পিঠ দেখাতে বাধ্য হয়েছে। মুজাহিদদের সিপাহসালার ছিলেন খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা) এবং প্রধান স্তম্ভ ছিলেন মুসান্না ইবনে হারিসা।

মুসলিম ফৌজ ফোরাত (ইউফ্রেতিস) বিধৌত অঞ্চলের অধিকাংশ শহর আর গ্রামগুলো পদানত করে পারসিকদের কেন্দ্রীয় রাজধানী মাদায়ানের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলো।

মাদায়েন ছিলো অসংখ্য অট্টালিকা আর প্রাসাদের শহর। পারসিকদের রাজদরবার এখানেই ছিলো। সদা হাস্যোজ্জ্বল আর বিপুল আলোয় প্রাণবন্ত এক শহর। সেই উজ্জ্বলতা আর প্রাণবন্ততা অদৃশ্য হয়ে গেলো। সারা শহরের ওপর ভয় আর বিহ্বলতা আচ্ছন্ন করে নিলো। মুসলমানরা যে শহরেই প্রবেশ করছিলো সেখানকার হাজার হাজার লোক মাদায়েনের দিকে পা বাড়াচ্ছিলো। এদের মধ্যে যরথুস্ট্রের পূজারী আর খ্রিষ্টান ব্যবসায়ীরাও ছিলো। প্রচুর সোনাদানা আর অর্থ সম্পদ নিয়ে তারা পালাচ্ছিলো। মুসলমানদের হাত থেকে সেগুলো বাঁচানোর জন্য ঘুরে ঘুরে আশ্রয়ের সন্ধান করছিলো তারা। বিভিন্ন কেল্লা ও ময়দান থেকে পালিয়ে যাওয়া অফিসার, উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা আর সাধারণ সিপাহীরাও মাদায়েনে এসে আশ্রয় নিচ্ছিলো। এসব নতুন আগন্তুকরা সারা মাদায়ানে মুসলিম ভীতি ছড়িয়ে দিচ্ছিলো।

একদিন পারসিকদের কয়েকজন উমারা, মন্ত্রি পরিষদের ব্যক্তিবর্গ এবং রাষ্ট্রের বড় বড় উপদেষ্টারা একস্থানে জড়ো হলো।

ঃ 'তোমরা কি পারস্যের এই অপমান-অপদস্থতা বরদাশত করে নিচ্ছো?— তাদের মধ্যে সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ আমীর জিজ্ঞেস করলো।

ঃ 'অপমান অপদস্থতা নয় শুধু, ধ্বংস বলুন'—অন্য এক আমীর বললো— 'ইরাকের অর্ধেকেরও অধিক এলাকা মুসলমানরা কব্জা করে নিয়েছে। আমাদের যে ফৌজ রোমের হেরাক্লিয়াসের মতো বৃহৎ শক্তিকে পরাজিত করেছে সেই তারাই এখন আরবের পশ্চাদপদ বুদ্ধদের সামনে থেকে পশ্চাতে হটছে এবং হাতিয়ার সমর্পণ করে নির্লজ্জের মতো ফিরে আসছে। যরথুস্টের লানত হোক আমাদের ওপর— আমরা মাদায়েনকেও মুসলমানদের পায়ে ঠেলতে যাচ্ছি ----- মান্যবর। আপনি বলে যান।'

ঃ 'আমি যা বলতে চেয়েছিলাম তা তুমিই বলে দিয়েছো' — বয়োজ্যাষ্ঠ আমীর বললো— 'তোমরা সবাই তো জানো এই ধ্বংসের কারণ হলো গৃহযুদ্ধ। কোন দল যদি এক ব্যক্তিকে মসনদে বসায়, অন্যদল এসে তাকে হত্যা করে নিজেদের পছন্দ মতো ব্যক্তিকে মসনদে বসায়। এটাও এক ধরনের গৃহযুদ্ধ। অবশ্য এসব বাদশাহরা কতল হওয়ারই উপযুক্ত ছিলো। একেরপর এক খুনের এই খেল তামাশা যদি আমরা নির্বিকার হয়ে দেখে যাই তবে সালতানাতের নাম নিশানাও মুছে যাবে। এই যে আমরা এখানে বসে আছি। পরস্পরের প্রতি আমাদের অনেকেই আন্তরিক নয়। ভেতরে ভেতরে আমরা একে অপরের বিরুদ্ধে কম যাই না। একবার ভেবে দেখো তো, সালতানাতে ফারিসই যদি না থাকে তোমরা যে গর্বের পাহাড় নির্মাণ করে ছিলে, যে প্রতিপত্তি আর মর্যাদা অর্জন করেছিলে তা কি মুসলমান বা রোমকরা তোমাদের জন্য বয়ে আনবে? আমরা গোলাম হয়ে যাবো। আমাদের মেয়েদেরকে দাসী বাঁদীতে রূপান্তরিত করা হবে। না কি তোমাদেরকে অন্য কিছু বানানো হবে বলে তোমরা জানতে পেরেছো? এসব যে হবে তা তো আমরা জানিই'— কেউ একজন বললো— 'এখন বলুন আমাদের কি করা উচিত। দীর্ঘ কথা বলার সময় আমাদের হাতে নেই।'

ঃ 'আমি প্রথম ভেবেছিলাম মুসলমানদেরকে ধন-দৌলত, মদ এবং অসাধারণ সুন্দরী ললনাদের মায়াজাল বিস্তার করে কমজোর করে দেয়া হবে'— তাদের বর্ষীয়ান একজন আমীর বললো—'ইহুদীরা আমাদের সঙ্গে আছে, খ্রিষ্টানরা আমাদের সঙ্গে আছে, খোদ পারস্যেই তো কতো পরমা সুন্দরীদের ভীড়। সম্পদও আমাদের কাছে কম নেই। কিন্তু আমরা এ কৌশল প্রয়োগ করেও দেখেছি। মুসলমানরা এমন মোটা দাগের জালে ফাসবার মতো জাতি নয়। ইহুদীদের অগ্নিঝরা কন্যাদেরকে মুসলমান সাজিয়ে মুসলমানদের বিভিন্ন গোত্র প্রধানের স্ত্রী করা হয়েছিলো। এসব মেয়েদের অনেকেই মুসলমানদের অসাধারণ চরিত্রগুণে মুগ্ধ হয়ে মন থেকেই ইসলাম গ্রহণ করে নিলো। আর বাকীরা ধরা পড়ে যাওয়ায় নিহত হয়ে গেলো।

ঃ 'এ কৌশল কিভাবে প্রয়োগ করা হয়েছিলো'?

ঃ 'এ সব মেয়েদেরকে বলা হয়েছিলো মুসলিম নারী সমাজে পারস্য ফৌজের ভীতি ছড়িয়ে দেবে। আর তাদের স্বামীদের মধ্যে এই বলে ভীতি সঞ্চার করবে যে, দুশমনের

ফৌজে এমন বিশাল বিশাল হাতি আছে যা মুসলমানদেরকে নির্ঘাত পিষে ফেলবে। তাদেরকে আরো বলা হয়েছিলো–তাদের এসব কৃত্রিম স্বামীদের সঙ্গে প্রেম ভালোবাসার এমন হৃদয়গ্রাহী অভিনয় করবে যাতে তারা শুধু পাগলই হয়ে যায়। কিন্তু আমরা দেখলাম, মুসলমান শুধু জিহাদের উন্মাদনাতেই পাগল হতে পারে। এভাবেই এ সব মেয়েদের আসল পরিচয় ফাঁস হয়ে যায় এবং তাদেরকে হত্যা করা হয়.......'

'আর ধন দৌলতের কথা বলবে? যে সব কেল্লা মুসলমানরা জয় করলো সেগুলো সোনা রুপায় ভর্তি ছিলো। তাদের সিপাহসালার এসব মালে গনীমত হিসেবে স্বীয় ফৌজে বন্টন করে দিলেন। আর অবশিষ্ট যা ছিলো তা তাদের খলীফার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। তবুও আমার শেষ ভরসা ছিলো এসব সালাররা এত ধন দৌলত দেখে নিজেদেরকে আর সামলাতে পারবে না। নিজেরাই এগুলোর মালিক বনে যাবে এবং বিজিত এলাকায় নিজের বাদশাহী কায়েম করবে। কিন্তু এরা নিজেদের খলীফা আর কেন্দ্রকে কখনো ধোঁকা দিতে জানে না। তাদের বিজয়ের কারণও এটাই'– এক ওযীর বললো।

ঃ 'এর চেয়ে বড় কারণ আরেকটি আছে'–বর্ষীয়ান আমীর বললো–'এই মুসলমানদের মধ্যে তোষামোদ চর্চার অভিশাপ নেই। আমি বিভিন্নভাবে জেনেছি কেউ তাদের খলীফা আমীর বা সালারের তোষামোদে কখনো লিপ্ত হয় না, চাটুকারিতার স্বভাব তারা ঘৃণ্য মনে করে। তাদের সালতানাতে শাহী দরবার নামে কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই, খলীফা মসজিদে বসেই হুকুম জারী করেন। কারো অভিযোগ–আপত্তি থাকলে নির্ভয়ে তা সে পেশ করে। পারস্যের সিংহাসনকে আজ তোষামোদের ঘুন পোকাই খেয়ে নিঃশেষ করে দিচ্ছে। সিংহাসনকে কেন্দ্র করে সব কতল আর গুপ্তহত্যা এসব চাটুকাররাই করিয়েছে। তোষামোদ আর চাটুকারিতা এমন মধুর বিষ যা পাথরকেও ক্ষয় করে ফেলে......'

'এখন আমি আসল কথায় আসছি। সবাই অঙ্গীকার করো, কেউ কারো চাটুকারীতা আর তোষামোদকারী হবে না, এবং কারো থেকে এ ধরনের কিছু আশাও করবে না। তোষামোদকে অপরাধ বলে সাব্যস্ত করা হবে। এখন আমাদের বাদশাহ হবে ইরদশীর। ইরদশীরের মধ্যে এ গুণটা আছে যে, সে রণাঙ্গনের এক বীর বাহাদুর আর যুদ্ধে নেতৃত্বদানে অতি দক্ষ। আমাদের এখন কোন বাদশাহ বা সম্রাটের নয় বরং লড়াই আর লড়াইয়ে নেতৃত্বদানের নেতা প্রয়োজন। কারো কোন প্রশ্ন থাকলে বলে ফেলো।'

সবাই এতেই জোর সম্মতি দিলো। ইরদশীরকে ডাকা হলো। ন্যায়বিচারক বলে খ্যাত নওশিরওয়ার পৌত্র ছিলো ইরদশীর। তাকে এসব উমারারা সহযোগিতা করার প্রতিশ্রুতি দিলো এবং বললো, সেই এখন এই সালতানাতকে রক্ষা করবে।

'আপনি এত বড় যিম্মাদারী আমাকে সোপর্দ করছেন' –ইরদশীর বললো– 'আমি কি তা কবুল না করার দুঃসাহস দেখাতে পারি? আমাদের ফৌজের পরাজয় আর পিছু হটার কারণ হলো পরস্পরের দুশমনী এবং খুন খারাবী। এ সবের যিম্মাদারী আপনারা সবাই নেবেন। আমি এখনই মসনদে বসছি না। আমি সেখানে যাবে যেখানে মুসলমানরা বিজয়ের পর বিজয় অর্জন করছে। খালিদ ইবনুল ওয়ালীদকে মুসলমানরা আকাশ থেকে অবতরণ করা ফিরিশতা বানিয়ে রেখেছে। আমি তাকে জীবিত পাকড়াও করে নিয়ে আসবো।' এরপরই ইরদশীর ময়দানে কোচ করলো।

❖ ❖ ❖

ইরদশীর পারস্যের শুধু জেনারেলই ছিলো না পারস্যের শাহেনশাহও ছিলো। তীব্র ঘূর্ণির মতো ইরদশীর রণাঙ্গনে উপস্থিত ছিলো। ফৌজের অফিসারদের ভালো মন্দ অনেক কিছুই বললো। ছোট কমান্ডারদের গাল মন্দ করতেও ছাড়লো না। ফৌজের উদ্দেশে অনুপ্রেরণামূলক কথাও বললো। সাধারণ সিপাহীদেরকে পরাজিত মনোভাব পোষণের জন্য লজ্জা দিলো এবং ঘোষণা করে দিলো, কাপুরুষের মতো পলায়নরতদেরকে ঘোড়া আর হাতির পায়ের তলায় পিষে ফেলা হবে। যে সব সালার আর উচ্চপদস্থ অফিসাররা পিছু হটবে তাদেরকে সেসব হ্রদে ফেলে দেয়া হবে যেগুলোতে রক্তের স্বাদ নেবার জন্য হাঙ্গররা আকুলি বিকুলি করছে।

'আরবের এসব গ্রাম্য মূর্খদের ইরাক থেকে বের করে দাও।'

'খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ কে জীবিত বা মৃত আমার সামনে হাজির' করো।

'তার সালারদেরকে জীবিত পাকড়াও করো।'

'অবশেষে আমি তোমাদেরকে মদীনায় দেখতে চাই।'

ধমকের সুরে সে এসব বলছিলো। তার কণ্ঠে দৃঢ়তার উত্তাপ ছিলো। সর্বশক্তি দিয়ে সে হাঁক দিচ্ছিলো। পারস্যের ফৌজ তখনো কয়েকটি সাম্রাজ্যকে ধূলিস্যাৎ করে দেয়ার মতো শক্তির অধিকারী ছিলো। এর তুলনায় মুসলিম লস্করের অবস্থান নেহায়তই হাস্যকর ছিলো। আরো ছিলো ইরদশীরের মতো দক্ষ নেতৃত্বদানকারী ও অনুপ্রেরণাদাতা জেনারেল। ইরদশীরের মতো শাহবাজের নেতৃত্বে পারসিকরা জানবাযের মতোই লড়ছিলো। তবুও পারস্যের ফৌজ ক্রমাগতই পিছু হটছিলো এবং ইরদশীরও তাদের পিছু হটা রুখতে পারছিলো না।

পারসিকদের একটাই প্রশ্ন ছিলো, কোন শক্তিবলে তাদের মতো এমন দক্ষ সেনাশক্তিও মুসলমানদের মোকাবেলায় পিছু হটতে বাধ্য হচ্ছে? এই প্রশ্নের জবাব তারা মুসলমানদেরই এক অভিযান থেকে পেয়ে গেলো।

খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা) এর নেতৃত্বে মুসলিম লশকর আমিনিশিয়া পর্যন্ত পৌঁছলো। পারস্য সালতানাতের এই শহরকে বিখ্যাত সব ধনবানদের শহর বলতো। বড় বড় আমীর, প্রসিদ্ধ সব ব্যবসায়ী, জায়গীরদার এবং শাহী খান্দানের প্রতিপালিত লোকেরা সে শহরে বাস করতো।

খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা) তার লশকর নিয়ে কেল্লা ঘেরা এই শহর যখন অবরোধ করতে গেলেন তখন দেখলেন, শহরের সবগুলো ফটকই খোলা। শহরের চৌকিগুলোর মধ্যেও কোন সিপাহীর হদিস মিললো না। সবাই এটাকে ধোঁকা মনে করলো। খালিদ (রা) মোটেও ভয় পেলেন না। সেনাদলকে কয়েক দলে বিভক্ত হয়ে শহরের মধ্যে ঢুকতে বললেন। কিছুই হলো না তিনি সব পদাতিকবাহিনী ও ঘোড় সওয়ারদের নিয়ে ভেতরে ঢুকলেন।

নির্জীব নিশ্চুপ ছিলো শহরের অবস্থা। প্রতিটি ঘরের দরজাই খোলা ছিলো। কুকুর, বিড়াল আর পাখ-পাখালী ছাড়া কোন প্রাণীই নজরে পড়ছিলো না। খালিদ (রা) হুকুম

দিলেন ঘরে ঘরে গিয়ে তল্লাশী চালাও। কোন ঘরেই জনমানবের চিহ্ন ছিলো না। ঘরের অধিবাসীরা তাদের আসবাবপত্র, মূল্যবান বস্তুসমূহ রেখে পালিয়ে গিয়েছিলো। ভয়ে তারা এতই ঘাবড়িয়ে গিয়েছিলো যে, টাকা পয়সার শত শত থলে ও অসংখ্য স্বর্ণের অলংকারগুলোও নিয়ে যেতে পারলো না।

একটি ঘরে জীর্ণ শীর্ণ এক বৃদ্ধ লোককে পাওয়া গেলো, বসে বসে ঝিমোচ্ছিলো। তার কাছ থেকে জানা গেলো, এই শহরে মুসলমানদের ব্যাপারে এত বেশি ভয়-ভীতি ছড়িয়ে পড়েছিলো যে, যখন খবর পৌঁছলো এদিকেই মুসলিম সেনারা আসছে তখন প্রথমে আমাদের ফৌজি অফিসাররা পালিয়ে গেলো, তারপর ফৌজও পালালো। ফৌজের ওপরেই লোকদের ভরসা ছিলো। তারা যখন পালালো তখন সবাই চোখে অন্ধকার দেখলো। পড়ি মড়ি করে বাকিরাও পালালো।

খালিদ (রা) হুকুম দিলেন, ঘরের মূল্যবান যত জিনিস আছে সব যেন একস্থানে জমা করা হয়। দেখতে দেখতে রেশমী কাপড়সহ অন্যান্য মূল্যবান জিনিসের এক বিরাট স্তূপ পড়ে গেলো। মুজাহিদরা এসব বিলাসবহুল জিনিস দেখে এই ভেবে হয়রান হচ্ছিলো যে, মানুষের সুখ শান্তির জন্য এতো মূল্যবান জিনিসেরও প্রয়োজন হয়। খালিদ (রা) দেখলেন অধিকাংশ মুজাহিদের মধ্যে প্রাপ্তির কিছুটা আনন্দ বিরাজ করছে যে, এগুলো হয়তো তাদের মধ্যে বন্টিত হবে।

ঃ 'আগুন লাগিয়ে দাও এসবে'– খালিদ (রা) কঠোর কণ্ঠে হুকুম দিলেন–'এগুলো সুখ-আহ্লাদ ও বিলাসী জীবন যাপনের এমন আসবাবপত্র যা পারসিকদের এমন চরম বুযদিল কাপুরুষ বানিয়ে দিয়েছে যে, আমাদের আগমনের সংবাদেই তারা পালিয়ে গেলো। তাদের কারুকার্যময় অট্টালিকা আর সুদৃশ্য ঘরগুলো দেখে নাও, আল্লাহ যাদেরকে ধ্বংস করতে চান তাদেরকে এমন ভোগমত্ত আর বিলাসী জীবনে লিপ্ত করে দেন।'

পুরো স্তূপেই আগুন লাগিয়ে দেয়া হলো, সোনা, হীরা, জওহার ও টাকার থলেগুলো পৃথক করে রাখা হয়েছিলো। এর এক পঞ্চমাংশ মদীনায় খলীফা আবু বকর (রা) এর কাছে পাঠিয়ে দেয়া হলো, অবশিষ্টগুলো ফৌজে বন্টন করে দেয়া হলো।

পারসিকদের পন্ডিত লোকরা এ থেকে বুঝে নিয়েছিলো মুসলমানরা এসব কীর্তিতে নিজেদেরকে এমন উচ্চতায় নিয়ে গেছে যেখানে পৌছা দুঃসাধ্যই।

ইরদশীর যখন তার ঝড়ো গতিতে রণাঙ্গনে ছাউনি ফেলছিলো এবং তার সৈন্যদেরকে অনুপ্রেরণা যুগিয়ে এক উদ্যমী সেনাদলে রূপান্তরিত করছিলো তখন সে চরম আশাবাদী ছিলো, কিন্তু খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা) ও মুসান্না ইবনে হারিসা যখন তুফান গতিতে অগ্রসর হলো তখন ইরদশীরের সব উদ্যোগই মরু প্রান্তর দৌড়ে জয় করার মতোই হাস্যকর ঠেকছিলো। তার কানে শুধু একটি আওয়াজই আসছিলো, 'মুসলমানরা অমুক অমুক শহর জয় করে নিয়েছে।' পারসিকদের সাহস, উদ্দীপনা, তাদের জগৎজোড়া বিখ্যাত সব বীরত্বগাঁথা পালানোর মাধ্যমেই প্রকাশ পাচ্ছিলো।

যখন তাকে এই সংবাদ দেয়া হলো যে, হীরা শহরেও মুসলমানরা ঢুকে পড়েছে তখন সে অসুস্থ হয়ে পড়লো। হীরা এতো বিশাল ও কারুকার্যময় শহর ছিলো যে, তাকে প্রকৃতির হীরাই বলা হতো। মুসলমানরা এই শহর শত্রুর কোন বাঁধার সম্মুখীন না হয়েই দখলে নিয়েছিলো।

ফুরাত প্রান্তের শহরগুলোতে যে লড়াই হয় সেগুলোর সমাপ্তি ঘটে পারসিকদের পিছু হটার মাধ্যমে। এসব বিজয় অর্জনের পর খালিদ (রা) তাঁর সালারদের সলাপরামর্শের জন্য ডাকলেন।

ঃ 'তোমরা কি এটা লক্ষ্য করেছো, পারসিকরা আমাদেরকে ক্লান্ত করে দিচ্ছে?–খালিদ (রা) বললেন - 'এরা এক ময়দান থেকে পালিয়ে অন্য শহর বা এলাকার ফৌজে গিয়ে শামিল হয়। সেখানে আমাদের পরে পূর্বের তুলনায় আরো অধিক লড়াই ও ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। শেষ পর্যন্ত দেখা যাবে এসব সৈন্যরা কোন কেল্লা বা ময়দানে একত্রিত হয়ে পা জমিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেমেছে। আমরা ক্লান্তিতে দুর্বল হয়ে থাকবো তখন এরা আমাদেরকে শুধু পরাজিতই করবে না বরং গণহত্যা করবে। আমি যদি এ হুকুম করি যে, পরবর্তী লড়াই থেকে পারসিকদের কোন সৈন্যকেই জীবিত ছাড়া হবে না, হোক না সে যুদ্ধবন্দী– আমার এই হুকুম কি অমূলক হবে?'

ঃ 'না ইবনুল ওয়ালীদ'! দু'-তিন সালার বলে উঠলো। তাদের একজন বললো - 'তারা আমাদেরকে গণহত্যা করার আগে আমরা কেন তাদেরকে গণহত্যা করবেন না? তারা তো আগের লড়াইগুলোতে আমাদের হাজারো সঙ্গীকে হত্যা করেছে।'

সব সালাররাই খালিদ (রা) এর এই ফয়সালার প্রতি জোর সমর্থন জানালো। পরবর্তী লড়াইগুলো আরো অধিক রক্তক্ষয়ী ছিলো। সেসব লড়াইয়ে পারসিকদের ফৌজ মুসলমানদের তুলনায় প্রায় পাঁচগুণ বেশি ছিলো। তবুও তারা মুজাহিদদের তীব্র হামলায় পিছু হটতে লাগলো। খালিদ (রা) হুকুম দিলেন–তাদেরকে যেন পিছু হটার সুযোগ দেয়া না হয়। জীবিত যেন পাকড়াও করা হয়।

ঘোড় সওয়ার মুজাহিদরা পলায়নরত পারসিকদের পিছু নিলো এবং তাদেরকে ঘেরাওয়ের মধ্যে ফেলে পেছনে সরিয়ে আনতে লাগলো। খালিদ (রা) এর হুকুমে মুসলিম সৈন্যরা তাদেরকে 'দরিয়ায়ে খাসীফের' তীরে নিয়ে এসে এমনভাবে হত্যা করা শুরু করলো যে, তাদের মাথাগুলো নদীতে গিয়ে পড়তে লাগলো আর তাদের দেহগুলো নদীর তীরে। এদের সৈন্য প্রায় অর্ধেকই খ্রিষ্টান ছিলো। একাধারে তিনদিন ধরে পারসিক অগ্নিপূজক আর খ্রিষ্টানদের হত্যা করা হলো। এতে পারসিকদের সত্তর হাজার ফৌজ নিহত হলো। তাদের রক্তে পুরো নদীর পানিই লাল হয়ে গিয়ে ছিলো। এ কারণেই ইতিহাসে এই নদীকে 'দরিয়ায়ে খুন' লেখা হয়েছে।

এই যুদ্ধের পর খালিদ (রা) বলেছিলেন, 'মহান আল্লাহর দরবারে আমি অঙ্গীকার করেছিলাম, ইসলামের দুশমন এসব কাফেরদের রক্তের নদী বইয়ে দেবো। সেই অঙ্গীকারই আমি পূরণ করেছি।'

ইরদশীর যখন এ খবর পেলো তখন তার অবস্থার আরো অবনতি হলো। একেবারেই স্তব্ধ হয়ে পড়লো সে। মৃত্যুরোগ যেন তাকে চারদিক থেকে গ্রাস করলো। তার খিদে চলে গেলো। ঘুম যেন তার কাছ থেকে চির বিদায় নিলো। শাহী ডাক্তাররা তাকে সুস্থ করে তোলার সব রকম চেষ্টাই করলো। কিন্তু তার শরীরের অবনতি ঠেকাতে পারলো না। কি হতে যাচ্ছে ডাক্তাররা তা বুঝতে পারলো। মহলের সবাইকে ডাক্তার কঠোরভাবে বারণ করে দিলো, ইরদশীরকে ফৌজের কোন পরাজয় বা পিছু হটার সংবাদ দেয়া যাবে না।

ডাক্তাররা শেষ একটি পদ্ধতি পরীক্ষা করলো যে, ইরদশীরকে পারস্যের ছোট ছোট কিছু বিজয়ের সংবাদ শোনানো হোক। কিন্তু ইরদশীর বাস্তবকে পছন্দ করতো। এসব খবরকে সত্য বলে মানতে রাজী ছিলো না সে। অবশেষে ইরদশীর একদিন মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লো।

ইরদশীরের মৃত্যুর পর শাহী খান্দানের সবাই প্রচণ্ড এক কম্পন উপলব্ধি করলো। তারা শংকিত হয়ে পড়লো, শাহী খান্দানে হয়তো আরেকবার রক্তের হোলিখেলা শুরু হয়ে যাবে। তখন সালতানাতের উমারা আর ওযীররা ইরদশীরের কন্যা আযারমীদাখতকে সিংহাসনে বসিয়ে দিলো।

আযারমীদাখতের রূপ যৌবনের প্রশংসা পারসিকদের মুখে মুখে ছিলো। বীর রমণী, দক্ষ যোদ্ধা ও কুশলী তীরন্দাজ হিসেবেও তার খ্যাতি ছিলো। রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যাপারগুলোও সে খুব ভালো বুঝতো। তার মধ্যে এতগুলো গুণের ও যোগ্যতার সমাবেশ দেখেই তাকে মসনদে বসানো হয়েছিলো। কিন্তু সিংহাসনে বসে সে তার মানবেন্দ্রিয় গুণের প্রকাশ ঘটাতে থাকলো। মালিকায়ে ফারিস হওয়ার আগে সে শাহযাদী ছিলো। শাহযাদা ও শাহযাদীদের সকল পাপ অপরাধই শাহী মহলের সবাই ক্ষমার চোখে দেখতো। যেন তাদের সাতখুনও মাফ। আর এখন তো সে মালিকায়ে ফারিস, পারস্যের মহারাণী। গুরুতর সব দায়িত্ব তার ওপর অর্পিত। সালতানাতের অবস্থা ছিলো এই যে, ইরাকের অধিকাংশই মুসলমানদের দখলে চলে এসেছিলো। মুসলমানরা তাদের শক্তির অহংকার ও সালতানাতের আকাশসমান উঁচু গর্বকে পায়ে পিষে অগ্রসর হচ্ছিলো। এ অবস্থায় পারস্যের রাজ সিংহাসন ফুলের সাচে নয় কাঁটার বুননে জড়ানো ছিলো।

শাহী খান্দানের দূরবর্তী আত্মীয়তার সূত্রে মহলের আশ পাশেই থাকতো সিয়া খোশ নামক এক যুবক। মহলের সবাই জানতো সিয়া খোশের সঙ্গে আযারমীদাখত মনের যে উত্তাপ–আকর্ষণ গড়ে তুলেছে তা খুব হালকা গোছের নয়, তাদের এই হৃদয় বিনিময় খুব গভীর স্তরের। মহলে তো বটেই মহলের বাইরে জঙ্গলের নির্জন আড়ালেও তাদেরকে অভিসার করতে দেখা যেতো। কিন্তু কেউ কখনো আপত্তি তোলার সাহস পেতো না। শাহজাদী কোথাও শিকারে গেলে সিয়াখোশকে যেন কাকতালীয়ভাবেই সে পথ দিয়েই যেতে হতো। এ অবস্থায় শাহজাদী যখন সিংহাসনে বসলো তখন নিজেকে স্রেফ পুরো সাম্রাজ্যের একক মালিক ভাবতে লাগলো। তার প্রথম কাজ এই হলো যে, সে সিয়াখোশকে অসংখ্য জায়গীর দান করলো এবং তাকে হুকুমতের প্রভাবশালী এক পদে বসালো। আর সিয়াখোশের আত্মীয় মহলে উপহার উপঢৌকনের বন্যা বইয়ে দিলো।

ঃ 'মালিকায়ে আলিয়া'!–একদিন বৃদ্ধ এক ওযীর তাকে বললো–'আপনাকে শাহী তখতে এজন্যে বসানো হয়নি যে, তখত শূন্য থাকবে, না এই সিংহাসন আপনার উত্তরাধিকার সূত্রে মিলেছে। আপনার মধ্যে আমরা কিছু সুন্দর গুণাগুণ দেখেছিলাম তাই মসনদে বসিয়েছিলাম। সালতানাতের অবস্থা দেখে সে অনুযায়ী হুকুম জারী করুন। সাম্রাজ্যকে তো আজ মুসলমানদের হাত থেকে বাঁচাতে হবে। কিন্তু আপনি উপহার আর উপঢৌকনের বর্ষণে শহর ভাসিয়ে দিতে চাচ্ছেন।'

ঃ 'আমি কি ময়দানে গিয়ে লড়াইয়ে যোগদেবো?' –আযারমীদাখত শ্লেষ মিশ্রিত কণ্ঠে বললো– 'এত বড় ফৌজ আমরা কেন পরিচালনা করছি? দেশের অর্ধেক তো এই ফৌজদেরই পেটে চলে যায়। আজ থেকে এটা আমার হুকুম, কোন কেল্লা বা ময়দানে আমাদের ফৌজ যদি পরাজিত হয় তবে তার জেনারেলকে এখানে ডেকে হত্যা করা হবে। কাপুরুষের অস্তিত্ব আমি বরদাশত করতে পারি না'

ঃ 'মালিকায়ে আলিয়া'!– বৃদ্ধ ওযীর বললো - 'পরাজয়ের অপরাধে যদি আমরা জেনারেলদেরকে মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি দিতাম তবে আমরা এ পর্যন্ত অর্ধেকেরও বেশি জেনারেলের সেবা থেকে বঞ্চিত হতাম। মালিকায়ে আলিয়া! যুদ্ধ এক দলের জয় আর অন্য দলের পরাজয়ের মধ্য দিয়ে শেষ হয়ে থাকে। হেরে যাওয়া কোন জেনারেল দ্বিতীয়বার পরাজিত হয় না। আমাদের এসব জেনারেলরাই তো রোমকদেরকে পরাজিত করেছে। আপনার এ হুকুম ফৌজ পছন্দ করবে না। এক জেনারেলকে মৃত্যুদণ্ড দেয়ার কারণে সমস্ত ফৌজেই বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়তে পারে। আপনি যুদ্ধের পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করুন।'

ঃ 'আপনি ওযীর'– আযারমীদাখত বললো- 'যুদ্ধ পরিস্থিতির ওপর আপনি নজর রাখুন। যে ফয়সালা আপনার দ্বারা দেয়া সম্ভব নয় সে ফয়সালা আমাকে দিয়ে করাবেন।'

❖ ❖ ❖

ও দিকে মুসলমানরা ক্রমে আগে বেড়েই চলছিলো, আর এদিকে আযারমীদাখত সিয়াখোশের সঙ্গে তার কৃত ইশক দরিয়ার জল যেন সাম্রাজ্যব্যাপী ছড়িয়ে দিতে বদ্ধপরিকর ছিলো। যৌবনের তীব্র উন্মাদনা যেন সে আর ধরে রাখতে পারছিলো না। সিয়াখোশকে সে এমন কর্তৃত্ব দিয়েছিলো যে, সে হুকুমতের নামে উল্টাপাল্টা হুকুম জারী করতে শুরু করলো।

এক রাতে আযার একলাই মহলের বাইরে চলে গেলো। তার দেহ রক্ষীর কমান্ডার প্রধান ওযীরের ঘরে গিয়ে বললো, সে আর মালিকায়ে আলিয়ার হেফাজতের যিম্মাদারী নিতে পারবে না, কাউকে তোয়াক্কা না করে এভাবে একা বাইরে যেতে শুরু করলে কার কি করার আছে?

ওযীর ঘর থেকে বের হলো। মহল থেকে শাহী খান্দানের আরো কয়েকজন নিয়ে আযার মীদাখত যেদিকে গিয়েছিলো সেদিকে হাঁটা ধরলো। মহলের কাছেই ঘন সবুজ একটি মনোরম জঙ্গল ছিলো। জঙ্গলের ঘাসগুলো ছিলো বড় মোলায়েম – সতেজ সবুজ। চাঁদনী রাত ছিলো, সামান্য দূর থেকেই নারীকণ্ঠের কল কলে শব্দে হাসির কোলাহল শোনা গেলো।

ওযীর ও তার সঙ্গীরা পা টিপে টিপে ঝাড়পাতা আর বৃক্ষের ঘন সারির আড়ালে এসে দাঁড়ালো। সিয়াখোশ আর মালিকায়ে আলিয়াকে তারা অশ্লীল দৃশ্যে লিপ্ত দেখতে পেলো। আচমকা তারা এসে এদেরকে ঘিরে ফেললো।

ঃ 'এটা কেমন বেদতমিযী আর অসভ্যতা'?–আযার মীদাখত তাদের সকলকে ধমকে উঠে বললো– 'তোমাদের মালিকার একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়ে তোমাদের হস্তক্ষেপ করার দুঃসাহস কি করে হলো'?

ঃ 'এ মুহূর্ত থেকে তুমি মালিকা নও'– শাহী খান্দানের একজন বললো– 'ও দিকে সালতানাত বেহাত হতে যাচ্ছে আর এদিকে তুমি বদকারীতে মজে আছো? চলে এসো এখান থেকে!'

ঃ 'যদি আমি তোমার হুকুম না মানি'......

ঃ 'তবে তোমার সঙ্গের ওই একান্তের লোক সিয়াখোশকে কয়েদখানায় নিক্ষেপ করা হবে'– ওযীর বললো– 'বিনা শব্দে সিংহাসন থেকে নেমে যাও। অন্যথায় উভয়ের পরিণামই অত্যন্ত খারাপ হবে।'

সিয়াখোশ এক ফাঁকে সেখান থেকে সরে পড়ালো। আযারমীদাখত তাদের সঙ্গে হাঁটা দিলো। পরদিন শাহী খান্দানের আরেক সদস্য শাহপূরকে মসনদে বসানো হলো। শাহপূরকে এরপূর্বেও সিংহাসনে বসানো যেতো। কিন্তু সে বরাবরই ময়দানে গিয়ে লড়তে পছন্দ করতো। আযারমীদাখতের এই মনোভাব ও তার অধঃপতন দেখে শেষ পর্যন্ত শাহপূর সিংহাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করে নিলো এবং প্রথমেই সে তার অত্যন্ত বিশ্বস্ত বিচক্ষণ বন্ধু ফারাখযাদকে ওযীর বানালো।

ঃ 'আযারমীদাখত'! –একদিন শাহপূর তাকে ডেকে হুকুম করলো- 'নব নিযুক্ত ওযীর ফারাখযাদের সঙ্গে তোমার বিয়ের বন্দোবস্ত করছি। আরো অনেক পূর্বেই যদি তোমার বিয়ে হয়ে যেতো তবে সিয়াখোশের মতো এমন নগণ্য এক যুবকের সঙ্গে প্রেম ভালোবাসার এমন নির্লজ্জ খেলায় মেতে উঠতে না। এখন আর আমি তোমাকে এভাবে অবাধ স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াতে দিতে পারি না।'

ঃ 'ফারাখযাদ আমার প্রজাদের একজন ছিলো'– আযার বললো– 'সে আমার কর্মচারী ছিলো। আমার নগণ্য গোলাম ছিলো।'

ঃ 'ভালো করে শুনে নাও শাহজাদী। তোমার শাদী ফারাখযাদের সঙ্গেই হচ্ছে। হুকুম অমান্যের দুঃসাহস দেখালে তোমাকে ভয়ানক পরিণাম বহন করতে হবে।'

দুই চার দিন পর আযারমীদাখতকে ফারাযদাখের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেয়া হলো। ফারাখযাদ কোন যুবা পুরুষ ছিলো না। তার বয়স ষাটের কিছু কম ছিলো। ইতিহাসের বিখ্যাত যোদ্ধা- জেনারেল রুস্তমের পিতা ছিলো ফারাখযাদ।

বিয়ের প্রথম রাতে ফারাখযাদ ফুলশয্যার ঘরে প্রবেশ করে বধূ সাজে বসে থাকা আযারমীদাখতের দিকে অগ্রসর হলো।

'আমার কাছে আসবে না'– আযারমীদাখত তাকে বললো– 'যেখানে আছো সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকো।'

ঃ 'তুমি কি এখনো নিজেকে তখতনশীন মালিকা মনে করো'? –ফারাখযাদ বললো– নির্বোধ মেয়ে! আজ থেকে যে তুমি আমার বউ।'

এই বলে ফারাখযাদ সামনে বাড়ছিলো। কামরায় লুকিয়ে থাকা সিয়াখোশ হঠাৎ ভূতের মতো উদয় হলো। পা টিপে টিপে সে ফারখযাদের পেছন থেকে কোমর জড়িয়ে ধরলো। তারপর এভাবেই তাকে মাথার ওপর তুলে পালঙ্কের ওপর আছড়ে ফেললো, সঙ্গে সঙ্গেই সিয়াখোশ আর আযারমীদাখত পিঠের ওপর বসে একটি বালিশ দিয়ে শক্তভাবে তার মুখের নিচ দিয়ে চেপে ধরলো। ফারাখযাদ প্রায় বৃদ্ধই হয়ে পড়েছিলো। এই দুই যুবক যুবতীর তীব্র মোচড়ানিতে ফারাখযাদ শুধু ইঁদুরের কাটা লেজের মতো ছট ফট করছিলো। এভাবেই ধীরে ধীরে নিঃসাড় হয়ে পড়লো।

সিয়াখোশ সেখান থেকে দ্রুত চলে গেলো। আযারমীদাখত শাহপুরকে খবর দিলো, ফারাখযাদ বাসর রাতেই মারা গেছে। মহলে হাঙ্গামা শুরু হয়ে গেলো। শাহপুরের পেছনে পেছনে শাহী ডাক্তারও এলো। ডাক্তার ফারাযদাখের নাড়ী দেখে বললো, ফারাখযাদ হঠাৎ করে হৃদক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা গেছে। কারণ হিসেবে বললো ফারাখযাদের বৃদ্ধ বয়স।

দু দিন পরই পারস্যের সম্রাট শাহপুরও এমন রহস্যজনকভাবে মারা গেলো। সঙ্গে সঙ্গেই আযারমীদাখত সিংহাসনে আরোহণের ঘোষণা দিলো। আরো ঘোষণা দিলো সিংহাসনের উত্তরাধিকারের দাবী নিয়ে যে অগ্রসর হবে শাহপুরের মতোই তার পরিণাম হবে। তখন সবাই নিঃসন্দেহ হলো যে, ফারাখযাদ আর শাহপুরকে হত্যাই করা হয়েছে।

এবার আযারমীদাখত সিয়াখোশকে ওযীরের চেয়েও উঁচু পদে আসীন করলো। আযারমীদাখত তার প্রথম তখতনশীন হওয়ার পর সিয়াখোশের আত্মীয়দেরকে বড় বড় পদ, জায়গীর ইত্যাদি দান করেছিলো। এবার তাদের মধ্যে বড় বড় ফৌজাধিকার বন্টন করে দিলো। আযারমীদাখত আর তার এসব নতুন দল সঙ্গীরা মিলে মাদায়েনের স্থানীয় ফৌজকে নিজেদের লোকবল দ্বারা সমৃদ্ধ করে নিলো। পুরো মাদায়েনের ফৌজকে তারা বেশ মোটা বখশীশের প্রতিশ্রুতি দিলো এবং পারস্যের স্বার্থরক্ষার জন্য যে সৈন্যদলকে এতদিনে গড়ে তোলা হয়ে ছিলো তাদেরকে আযারমীদাখত ও সিয়াখোশের দলে ভিড়িয়ে নিলো। অথচ মাদায়েন তখন দারুল হুকুমত ছিলো।

কয়েকদিনের মধ্যে মাদায়েনের এসব ফৌজ শুধু মাদায়েনের জন্যই নির্ধারিত হয়ে গেলো। হাজার হাজার খ্রিষ্টানকে এই ফৌজে জোর করে ভর্তি করে ফৌজের সংখ্যাও তারা বাড়িয়ে নিলো।

পারস্যের আরেক শাহজাদী ছিলো পুরানদখ্ত। ইরদশীরের সে আরেক মেয়ে ছিলো। পারস্যের সিংহাসনকে ঘিরে শাহী খান্দানের মধ্যে মতবিরোধ এবং উমারাদের মধ্যে শত্রুতা, ষড়যন্ত্র ইত্যাদির পরিসমাপ্তির জন্য সে তার পুরোটা জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছিলো। এই সৎ ও নিঃস্বার্থ কর্মকান্ডের কারণে মহলের সবার মধ্যে তার গ্রহণযোগ্যতা ছিলো। এজন্য প্রায় সবাই তার কথা মান্য করতো। সে যখন দেখলো

মুসলমানরা একদিকে একের পর এক বিজয় অর্জন করছে অন্য দিকে মাদায়েনও অবরুদ্ধ হওয়ার আশংকা জেগেছে, এ অবস্থায় আযারমীদাখত সাম্রাজ্যকে ধ্বংসের হাত থেকে না বাঁচিয়ে হুকুমতকে নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থভাণ্ডার বানিয়েছে। তাই আযারমীদাখতের কাছে একদিন সে হাজির হলো।

শাহজাদী পুরান তাকে বুঝানোর জন্য অনেক কিছুই বললো, সেও নীরবে সব শুনে গেলো।

ঃ 'তুমি কি চাও আমি সিংহাসন ছেড়ে দেই'? –আযারমীদাখত বিদ্রূপের সুরে বললো –'এখন কি তুমিই পারস্যের মালিকা বনতে চাও? তুমি কি দেখোনি এই সিংহাসন কত প্রাণ কেড়ে নিয়েছে'?

ঃ 'না মালিকায়ে ফারিস'!–পুরান বললো– 'সিংহাসনের প্রশ্ন না। পারস্য সালতানাতের স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তা তো এখন ধ্বংসের মুখে। সিংহাসনে আপনিই থাকবেন। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর ফয়সালার দায়িত্ব অভিজ্ঞ পরামর্শদাতা ও উমারাদেরকে হাওলা করুন।'

ঃ 'আমার কথা মন দিয়ে শুনে নাও পুরান' –আযারমীদাখত বললো– 'এরপর আর সামনে আসবে না, আমিই সম্রাজ্ঞী। সালতানাতের ভালো মন্দ তোমার চেয়ে আমি অনেক ভালো বুঝি। তুমি যাদের হাতের খেলনা তাদেরকে আমি ভালো করেই চিনি। এসব উপদেশ বাণী প্রদান করা ছেড়ে দাও।'

ঃ 'আমি উপদেশ প্রদান থেকে বিরত থাকবো'–পুরান বললো– ' কিন্তু পারস্যকে বাঁচানের জন্য না জানি আমাকে আরো কতো কি করতে হবে। আমি আবারো বলছি, এই সিংহাসন কারো সঙ্গেই কৃতজ্ঞতার আচরণ করেনি। আর এটাও ভেবে দেখবেন পারস্যই যদি না থাকে তবে মুসলমানরা কি আপনাকে মসনদে বসাবে?'

ঃ 'মুসলমানরা কখনো মাদায়েন জয় করতে পারবে না'– আযার বললো– 'আর আমাকে মসনদ থেকে উঠানোর দুঃসাহসও কেউ দেখাতে পারবে না।'

ঃ 'এমন দুঃসাহস দেখানোর মতো লোকও কিন্তু আছে মালিকা'!– অবজ্ঞার সুরে বললো পুরান।

ঃ 'আমাকে একবার মসনদ থেকে উঠিয়ে শাহপুরকে বসানো হয়ে ছিলো'– আযার বললো– 'কোথায় শাহপুর..? আমাকে অক্ষম আর খেলনার পুতুল বানানোর জন্য ফারাখযাদের বিবি করা হয়েছিলো। ফারাখযাদ কিসরার খান্দানের কেউ ছিলো না। সে ছিলো শাহী খান্দানের কর্মচারী। আমি তাকে কেবল একজন গোলাম মনে করতাম। আমি আমার গোলামের বৌ হতাম কি করে? বিয়ের প্রথম রাতেই তার জীবনের শেষ রাত আমি বানিয়ে দিলাম -- যেই এই মসনদের দিকে হাত বাড়াবে তার পরিণতি এদের দুজনের পরিণতি থেকে ভিন্ন কিছু হবে না।'

পুরান প্রথমেই সন্দেহ করেছিলো ফারাখ্যাদ হৃদক্রিয়া বন্ধের কারণে মারা যায়নি, তাকে হত্যা করা হয়েছে। এখন আযারের কথায় সে সন্দেহ তার বিশ্বাসে পরিণত হলো।

পারস্যের বিখ্যাত জেনারেল রুস্তম ফারাখযাদের পুত্র ছিলো। তাকে বলা হয়েছিলো - তার পিতার মৃত্যু হৃদক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে হয়েছে। একেই সে সত্য বলে বিশ্বাস করেছিলো। রুস্তম তখন খোরাসানের সীমান্তে। একদিন মাদায়েনের এক ঘোড় সওয়ার তার কাছে খোরাসানের সীমান্তে গিয়ে পৌছলো এবং তাকে পুরানের একটি লিখিতপত্র দিলো। পুরান তাকে উদ্দেশ করে লিখেছিলো-

--- 'আপনার বাবা ফারাখযাদের মৃত্যু স্বাভাবিক ছিলো না। মহলের বিভিন্ন কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের কাছ থেকে আমি যে সত্য উদঘাটন করেছি তা হলো, আপনার বাবাকে আযারমীদাখত ও সিয়াখোশ বিয়ের প্রথম রাতেই শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করে। শাহপুরককেও তারা দুজনে মিলেই হত্যা করে। এখন আপনার সামনে দুটো কর্তব্য। এক. আপনার পিতার হত্যার প্রতিশোধ নেয়া। আর এটা আপনার একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার মনে করতে পারেন। কিন্তু দ্বিতীয়টা এই জাতির অস্তিত্ব রক্ষার প্রশ্ন। তাহলো পারস্য সালতানাতকে বাঁচানো। আমি এটাও জানিয়ে রাখছি আযারমীদাখত ও সিয়াখোশ তাদের সৈন্যও প্রস্তুত করে রেখেছে। মাদায়েন যখন রওয়ানা দেবেন আপনার অধীনস্ত পুরো ফৌজ নিয়ে রওয়ানা দেবেন। আপনাকে লড়তে হবে।

রুস্তমের শরীরে যেন কেউ আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। তার সব কিছু যেন উল্টাপাল্টা হয়ে গেলো। নিজের মধ্যে সে একটা প্রচণ্ড ঝড় অনুভব করলো। সে এ অবস্থাতেই কয়েক খন্ড সেনাদল নির্বাচন করে তাদেরকে সমবেত করে বললো।'

'বাইরের শত্রুর চেয়ে ঘরের শত্রু অনেক ভয়ানক হয়ে থাকে। ঘরে যে সাপের ফনার মতো মাথা তুলে বাইরের সব বিপদ থেকে সে অধিক ধ্বংসশীল হয়। সালতানাতের কর্তারা যদি স্বীয় কামনা বাসনা চরিতার্থ করার যন্ত্র হিসেবে সিংহাসন ব্যবহার করে তবে তো সালতানাতকে নিজ হাতেই ধ্বংস করে দিলো। আমরা আজ আমাদের সে সব ভাইয়ের সঙ্গে লড়তে যাচ্ছি যারা এতবড় সাম্রাজ্যের জন্য বড় বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাদের বিরুদ্ধেই আজ তোমাদের লড়তে হবে।'

রুস্তম তার নির্বাচিত ফৌজ নিয়ে রওয়ানা হয়ে গেলো, তার গতি ছিলো ঝড়ো হাওয়ার মতো। কারো মাধ্যমে আযারমীদাখত ও সিয়াখোশ জেনে ফেললো, রুস্তম তাদের বিরুদ্ধে ফৌজ নিয়ে আসছে। আযারমীদাখত কালবিলম্ব না করে মাদায়েনের ফৌজের ক্ষুদ্র কয়েকটি দল রুস্তমকে বাঁধা দেয়ার জন্য মাদায়েন থেকে কিছু দূরে পাঠিয়ে দিলো। রুস্তম তার পেছনে তুফান উড়িয়ে আসছিলো সে তার ফৌজকে বলে দিলো, মাদায়েনের এই কুচক্রী ফৌজের একটিও যেন ফিরে যেতে না পারে।

রুস্তম প্রথম থেকেই তার দলকে উত্তেজিত করে আসছিলো। তার দলের সওয়াররা মাদায়েনের ফৌজকে দেখতে পেয়েই আচমকা চর্কির মতো ঘিরে ফেললো। রুস্তম তো এমননিতেই পারস্যের অন্যতম খ্যাতিমান সালার ছিলো। তার সামনে এমন ক্ষুদ্র দল দাঁড়ানোর প্রশ্নই উঠে না। তাই হলো, তার রক্তক্ষয়ী নেতৃত্বের সামনে আযারমীদাখতের সিপাহীরা দিশাহারা হয়ে পড়লো। রুস্তমের ফৌজ তাদেরকে কচু কাটা করে লাশের স্তূপ বানিয়ে ফেললো।

রুস্তম এরপর মাদায়েন অবরোধ করলো। মাদায়েনের ফৌজ যথেষ্ট শক্তিশালী তো ছিলোই আবার রুস্তমের ফৌজের চেয়ে দশগুণ বেশি ছিলো। তারা অবরোধ ভাঙ্গার অনেক চেষ্টা করলো, কিন্তু অবরোধকারীদের নেতা ছিলো রুস্তম। মাদায়েনের ফৌজের হিম্মত টুটার জন্য এটাই যথেষ্ট ছিলো। শহরের ভেতর আযারমীদাখত ও সিয়াখোশের বিরোধীরা তো রুস্তমের পক্ষেই ছিলো। তারা অতি সংগোপনে শহরের একটি দরজা খুলে দিলো। রুস্তমের দলের জন্য এটাই যথেষ্ট ছিলো। সওয়াররা তীব্রগতিতে দরজা দিয়ে শহরে ঢুকে পড়লো এবং তারা গিয়ে আরেকটি দরজা খুলে দিলো।

শহরের মধ্যে লড়াই শুরু হয়ে গেলো। আর মাদায়েনের ফৌজের থেকে ভেসে আসা মরণ চিৎকারে চারদিক ভারী হয়ে উঠলো। পুরান ও তার মদদগার উমারাগণ ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে শহরময় ছোটাছুটি করতে লাগলো। ততক্ষণে রুস্তমও ভেতরে ঢুকে পড়েছে। তারা সবাই চিৎকার করে বলছিলো-

'পরস্পর তোমরা লড়াই করো না',

'তোমরা তো ভাই ভাই। একে অপরের রক্ত ঝরিয়ো না'।

'হত্যা করো তাদেরকে যারা তোমাদেরকে লড়তে উস্কানি দিয়েছে।'

'কথা না শুনলে তো তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে।'

প্রাণপণ ঘোষণা করে তারা এই গৃহযুদ্ধ নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এলো। পালানের মুখে আযারমীদাখত ও সিয়াখোশকে পাকড়াও করা হলো। রুস্তম মাদায়েনের সমস্ত ফৌজকে জমায়েত করে আযারমীদাখত ও সিয়াখোশকে শহরের উঁচু একটি ফটক স্তম্ভের ওপর দাঁড় করালো। তারপর ফৌজদের উদ্দেশে তাদের সিংহাসন নিয়ে ষড়যন্ত্র, দুই দুটি খুন, দেশের সম্পদকে কুক্ষিগতকরণ, তাদের অবৈধ সম্পর্ক ইত্যাদি সব কথাই সংক্ষেপে বলে গেলো।

রুস্তম তার বক্তব্য শেষ করে সিয়াখোশকে তার সামনে দাঁড় করালো। পরমুহূর্তে সবাই দেখলো রুস্তমের তরবারি থেকে রক্তের ধারা বইছে। আর সিয়াখোশের ধরটি তার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। এরপর জল্লাদকে ডেকে আযারমীদাখতের উভয় চোখ উপড়ে ফেলার নির্দেশ দিলো।

দুই সিপাহী আযারমীদাখতকে শক্ত করে ধরে রাখলো, জল্লাদ খঞ্জরের খোঁচায় তার চোখ দুটি নিমেষেই তুলে ফেললো। এরপর ইতিহাস থেকে সে চিরদিনের জন্য গায়েব হয়ে গেলো।

রুস্তম উমারাদের সঙ্গে সলাপরামর্শ করে ওখনই ঘোষণা করে দিলো, আজ থেকে মালিকায়ে ফারিস হলো পুরানদখত। সেখানেই খুব সংক্ষেপিত আনুষ্ঠানিকতায় পুরান সম্রাজ্ঞীর মুকুট ধারণ করলো। পুরান তখনই শাহী ফরমান জারী করলো, আজ থেকে রুস্তমই ওযীরে আলা আর রুস্তমই সমস্ত ফৌজের প্রধান সেনাপতি। আর সালতানাতের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ফয়সালা রুস্তমই করবে।

পুরান আরো ঘোষণা করে দিলো- প্রজাদের প্রতিটি ঘরে যেন এই ফরমান পৌঁছে দেয়া হয় যে, পারস্যের প্রত্যেক ব্যক্তির ওপর রুস্তমের প্রতি আনুগত্য দেখানো ফরজ করা হলো। আর প্রতিটি নাগরিকের ফরয কর্তব্য হলো মুসলমানদের হাত থেকে পারস্যকে বাঁচানোর জন্য স্বীয় জানমাল সালতানাতের জন্য উৎসর্গ করা।

❖ ❖ ❖

পুরান তখতনশীন হওয়ার পর পরই রুস্তম পারস্যের সকল আমীর এবং বড় বড় জায়গীরদারদের কাছে মুসলমানদের বিরুদ্ধে চরম উত্তেজিত ভাষায় উস্কানিমূলক পয়গাম পাঠালো। সবাইকে লিখলো নিজেদের শহর, এলাকা, জায়গীর ও মা-বোনদের ইজ্জত রক্ষা করতে হলে লড়াইয়ের উপযুক্ত যত স্বেচ্ছাসেবক জমায়েত করতে পারো তা নিয়ে মাদায়েনের ফৌজে যোগ দাও এবং মুসলমানদেরকে চিরতরে খতম করে দাও।

রুস্তমের এই পয়গামের কারণে পারস্যের দূরদূরান্তের পাহাড়ী আধিবাসী ও বেদুইনদের মধ্যেও মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের জাতীয় ও সাম্প্রদায়িক উন্মাদনা ধাও ধাও করে জ্বলে উঠলো মুসলমানদের রক্তের স্বাদ নিতে তারা একেবারেই পাগলপারা হয়ে উঠলো। ফৌজে যোগ দেয়ার জন্য হাজার হাজার যুবক পঙ্গপালের মতো মাদায়েন পৌছতে লাগলো। রুস্তমের আর তর সইছিলো না। মাদায়েন থেকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে দুটি সেনাদল পাঠালো। এক বাহিনীর কমান্ডার ছিলো জাবান। রুস্তম তাকে বললো, দরিয়ায়ে ফুরাতের প্রান্ত ধরে হীরা অঞ্চলে গিয়ে পৌছবে। এর পর জানতোড় হামলা করবে।

হীরা পারস্যের অনেক বড় এবং বিখ্যাত শহর ছিলো। মুসলমানদের মশহুর সালার মুসান্না ইবনে হারিসা তখন হীরা দখল করে নিয়েছিলেন। তাই হীরা মুসলমানদের কব্জাতেই ছিলো। মুসান্না গুপ্তচরের মাধ্যমে এটাও জানতে পেরেছিলেন যে, পারস্যের দারুল হুকুমত অনেক রক্ত ঝরানোর পর পুরানকে সাম্রাজ্ঞী বানিয়েছে।

আরেক দলের কামান্ডার ছিলো নারসী। তাকে হুকুম করা হলো দজলা ও ফুরাতের মধ্যবর্তী এলাকায় অবস্থিত 'কাসক্কার' নামক স্থানে গিয়ে পরবর্তী হুকুমের জন্য যেন সে প্রস্তুত থাকে।

সিরিয়া ও ইরাকের রণাঙ্গনের জন্য খলীফা উমর (রা) কর্তৃক প্রেরিত দশ হাজার সেনা সাহায্য নিয়ে তখন আবু উবাইদ আসছিলেন। তারা 'খাফান' পর্যন্ত পৌছে গিয়ে ছিলেন। পুরান যখন সিংহাসনে বসে, আবুবকর (রা) তখন অন্তিম শয্যায়। হীরা কব্জাকারী মুসান্না পারস্যের এই বিশৃংখল অবস্থা দেখে খলীফা আবুবকর (রা)কে সব জানালেন এবং পারস্য আক্রমণের অনুমতি চাইলেন। একই সময়ে মুসলমানরা সিরিয়ার রণাঙ্গনে বড় নাজুক অবস্থায় দিন গুজরান করছিলো। খালেদ (রা) তখন ইরাকে ছিলেন। তাঁকে খলীফা আবুবকর (রা) সিরিয়ায় পাঠাতে বাধ্য হলেন। মুসান্না তাই পারস্যসহ ইরাক ও সিরিয়ার জন্য আবুবকর (রা) এর কাছে সেনা সাহায্য চাইলেন। আবুবকর (রা) উমর (রা)কে মুসান্নার সঙ্গে বড় একটি লশকর তৈরী করে পাঠানোর নির্দেশ দিলেন। এবং এর পর পরই তাঁর ইন্তিকাল হয়ে যায়। উমর (রা) খলীফা হওয়ার পর প্রথম প্রহর থেকেই সেনা সংগ্রহের কাজ শুরু করেন এবং দীর্ঘ এক মাস ব্যয় করে এই সেনাদল আবু উবাইদের নেতৃত্বে ইরাকে পাঠান। সেই দশহাজার সৈন্য নিয়েই আবু উবাইদ খাফান পর্যন্ত পৌছে গিয়ে ছিলেন।

এ সময় আবু উবাইদকে জানানো হলো পারসিকদের একটি সেনাদল ফুরাতের প্রান্ত ধরে হীরার দিকে আসছে। আবু উবাইদ মুজাহিদ বাহিনীকে বললেন দুশমন হীরা পর্যন্ত পৌছার পূর্বেই আমরা তাদেরকে পথে আটকাবো। তারপর আবুউবাইদ অত্যন্ত আবেগময় কণ্ঠে বক্তৃতা দিলেন এবং মুজাহিদদেরকে নিয়ে ঊর্ধ্বগতিতে ছুটলেন।

হীরা এবং কাদেসিয়ার মধ্যবর্তী স্থান 'গারিক' এর সন্নিকটে মুজাহিদরা জাবানের লশকরের পথরোধ করে দাঁড়ালো। রক্ত ঝরানো এক লড়াই ছিলো এটি। আবু উবাইদের রণাঙ্গনের নেতৃত্বের ব্যাপারে এত দক্ষতা না থাকলেও তার মধ্যে সামান্যতমও বিচলিত ভাব দেখা গেলো না। তার দশ হাজার সৈন্যকে এমন চমৎকার কৌশলে ছোট ছোট দলে বিভক্ত করে হামলা চালালেন যে, পারসিকদের পায়ের তলার মাটি খুব অল্প সময়েই সরে গেলো। মুসলমান নামের কাল্পনিক ভয় তো পারসিকদের মধ্যে পূর্ব থেকেই ছিলো। তারপরও মুজাহিদরা এমন প্রাণপণ লড়াই করলো যে, দুশমন বিশৃংখল হয়ে পিছু হটতে লাগলো।

অবশেষে রুস্তমের লশকর অসংখ্য লাশ আর কাতরাতে থাকা যখমীদের ছেড়ে এমন বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়লো যে দুশমনের কমান্ডার জাবান ও তার সহ অফিসার মারদান শাহ গ্রেফতার হয়ে গেলো। মারদানশাহ পালাতে চেষ্টা করলে তার গ্রেফতারকারী তাকে হত্যা করে ফেললো।

যে মুজাহিদ জাবানকে পাকড়াও করেছিলো তার জানা ছিলো না সে পারসিকদের জেনারেল।

ঃ 'ভাই আমার! আরবীবন্ধু আমার!' –জাবান সেই মুজাহিদকে বললো–'আমাকে কয়েদ করে কি হবে? আমি তো বৃদ্ধ মানুষ। শোন আমি তোমাকে দুজন যুদ্ধবন্দী দেবো। এরা বড় দামী গোলাম। এছাড়াও মূল্যবান কিছু জিনিসও দেবো।'

ঃ 'কোথায় তোমার গোলাম আর মূল্যবান জিনিস'?–মুজাহিদ জিজ্ঞেস করলো।

ঃ 'আমাকে ছেড়ে দেবে এই আশ্বাস পেলে আমি তোমাকে এগুলো দিয়ে দেবো, তুমি ভাই ওয়াদা করো এগুলো নিয়ে আমাকে আযাদ করে দেবে।'

ঃ 'আমি একজন আরব এবং মুসলমান'–মুজাহিদ বললো– 'আমি ওয়াদার বরখেলাফ করতে জানি না। আমার সিপাহসালারের কাছে চলো, তার সামনেই তুমি তোমার এবং আমি আমার ওয়াদা পূরণ করবো।'

জাবান এতেই খুশী। সে জানতো একজন মুসলমান প্রাণের চেয়ে তার কৃত অঙ্গীকারের বেশি মূল্য দেয়। সেই মুজাহিদ তাকে আবু উবাইদের কাছে নিয়ে গেলো। তারপর জাবান তার মুক্তির বদলে কি কি দিতে চায় কিভাবে দিতে চায় সব খুলে বললো।

ঃ 'এতো কোন মামুলি সিপাহী নয়' – এক মুজাহিদ জাবানকে চিনতে পেরে বললো– 'এতো ফারসী ফৌজের সিপাহসালার। আমি তাকে হত্যা করতে গিয়েছিলাম, কিন্তু সে আমার হাত থেকে বেঁচে গিয়েছিলো। একে শেষ করে দাও।'

ঃ 'দাঁড়াও'!–আবু উবাইদ জাবানকে গ্রেফতারকারী মুজাহিদকে জিজ্ঞেস করলেন –'তুমি কি দু'জন নৌজোয়ান জঙ্গী কয়েদী আর কিছু মূল্যবান জিনিসের বিনিময়ে তাকে মুক্ত করে দেয়ার ওয়াদা করেছিলে'?

ঃ 'হ্যাঁ সিপাহসালার! আমি এই ওয়াদা করেছিলাম'।

ঃ 'তাহলে তাকে হত্যা করা যাবে না'– আবু উবাইদ বললেন– 'এক মুসলমান তাকে বাঁচিয়ে রাখার ওয়াদা করেছে। তাকে নিয়ে যাও। তার কাছ থেকে মুক্তিপণ নিয়ে তাকে মুক্তি দিয়ে দাও। মুসলমানের অবশ্যই তার কৃত ওয়াদা পূরণ করা উচিত।'

দুশমনের এক অভিজ্ঞ দক্ষ জেনারেলকে তারা এভাবে মুক্তি দিয়ে দিলো।

'আগুন ঝরা রূপবতী নারীর মাখন নরোম গাল আর রেশম কোমল চুলের স্পর্শে মুসলমানরা প্রশান্তি অনুভব করে না'– 'রুস্তম বললো –'শরাবের অগণিত পেয়ালা খালি করে তারা পরাজয়ের গ্লানি ভুলতে চায় না। জানি না তাদের ধর্ম সত্য কি না। তবে তারা তাদের বিশ্বাসে অবিচল'।

পারস্যের দারুল হুকুমত মাদায়েনের শাহী মহলের সুসজ্জিত একটি কামরায় ইতিহাসের বিখ্যাত জেনারেল রুস্তম দারুণ অস্থির পায়ে পায়চারী করছিলো। এক দেয়াল থেকে আরেক দেয়ালের দিকে তার উ ন্নত পাগুলো মাড়িয়ে যাচ্ছিলো আবার ফিরে আসছিলো। পায়চারী করতে করতে একবার থেমে পড়ছিলো। কখনো মুষ্টি পাকিয়ে উভয় হাত মোচড়াচ্ছিলো। আবার এক হাত দিয়ে আরেক হাতের ওপর ঘুষি হাঁকাচ্ছিলো। কখনো দাঁড়িয়ে পড়ে ওপর নিচ করে মাথা ঝাঁকাচ্ছিলো। আবার কখনো কখনো চিন্তিত মুখে অনড় দাঁড়িয়ে পড়ছিলো। আচমকা আবার পা বাড়াচ্ছিলো। তার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছিলো কাউকে সে ভর্ৎসনা করছে।

শাহী মহলের একটু দূরের একটি মহলে রুস্তম থাকতো। কিন্তু সম্রাজ্ঞী পুরানের অনুরোধে রুস্তম শাহী মহলে উঠে আসে। এর কারণ ছিলো, আরব ও পারস্য বড় রক্তক্ষয়ী ও দীর্ঘ যুদ্ধের দামামায় ফুসছিলো। এ যুদ্ধ চূড়ান্ত পর্যায়েরই মনে হচ্ছিলো। আর ফলাফল অনেকটা পারসিকদের প্রতিকূলে মনে হচ্ছিলো। কোন লড়াইতেই ফারসী ফৌজ মুসলমানদের মোকাবেলায় দাঁড়াতে পারছিলো না। পুরান রুস্তমকে বলেছিলো ময়দান থেকে কোন কাসেদ আসলেই প্রথমে তোমার কাছে যায়; তারপর আমার কাছে আসে।

ঃ 'তাহলে আমাদের পাশাপাশি থাকাটা কি ভালো হয় না'?–পুরান রুস্তমকে বলেছিলো– 'তোমার মতো আমিও পেরেশানীতে রাতে দু'চোখ এক করতে পারি না। যুদ্ধের পরবর্তী সংবাদের অপেক্ষায় জেগে বসে থাকতে হয়।'

ঃ 'হ্যাঁ মালিকায়ে ফারিস'–রুস্তম বলেছিলো– ' আমাদের এক সঙ্গে থাকাটাই মনে হয় ভালো হয় --। আমরা সে রাতেই নিশ্চিন্তে ঘুমাবো যে রাতে কাসেদ এসে বলবে, মুসলমানদের শেষ অংশটির খুনে পারস্যের যমীন লাল হয়ে গেছে।'

ঃ 'আমাদের পরস্পরের কাছে পরস্পরের প্রয়োজন রয়েছে'– পুরান আবেগ কম্পিত কণ্ঠে বললো - 'তুমি কি আমাকে এখনো 'মালিকায়ে ফারিস' বলাটা প্রয়োজন মনে করো? আমাকে শুধু পুরান বলবে। আমাদের উভয়ের চিন্তা চেতনাই পবিত্র, আমাদের উভয়ের ভাবনাই এক। পারস্যের যতটুকু আমার ততটুকু তোমারও।'

রুস্তম শুধু তার দিকে চোখ তুলে তাকিয়েছিলো কিছু বলছিলো না। পুরান সদ্য যৌবনা তরুণী ছিলো না। যৌবনের শেষ প্রহরগুলো তখনো তার মধ্যে গোলাপ রাঙা হয়ে প্রস্ফুটিত ছিলো। রূপের স্নিগ্ধতা তখনো তাকে সদ্য তরুণীই করে রেখেছিলো। পারস্যজুড়ে তার রূপের খ্যাতিও কম ছিলো না। তার মনে আরব মুসলমানদের প্রতি ঘৃণা আর পারস্যের প্রতি ভালোবাসা এতো অধিক ছিলো যে, সে ভুলেই যেতো– তার রূপ সৌন্দর্য আর আকর্ষণীয়া দেহ বল্লরীর কথা।

রুস্তম যখন মহলের এক কামরায় ক্ষোভ আর পেরেশানী নিয়ে পায়চারী করছিলো পুরান তখন কেল্লার চূড়ায় দাঁড়িয়ে অধীর চোখে সেদিকে তাকিয়ে ছিলো যেদিক থেকে কাসেদ আসতো।

ঃ 'মালিকায়ে ফারিস!'–পেছন থেকে আওয়াজ ভেসে এলো।

পুরান মাথা ঘুরিয়ে দেখলো তার কাছে কেল্লাদার দাঁড়িয়ে আছে।

ঃ 'মহান মালিকা যদি কাসেদের ইন্তিযারে থাকেন তবে অনুগ্রহ করে নিচে তাশরীফ আনুন'- কেল্লাদার বললো, কাসেদ এসে গেছে এবং সে প্রথমে সোজা রুস্তমের কাছেই গিয়ে ছিলো।'

ঃ 'রুস্তম আমাকে কেন বলেনি?'–পুরান বিরক্ত কণ্ঠে বললো।

ঃ 'মালিকায়ে মুআযযামা!–এ প্রশ্নের জবাব আমি কি করে দেবো? আমি তো রুস্তমের পর্যায়েরই এক জেনারেল। রণাঙ্গন থেকে আগত কাসেদকে দূর থেকে দেখেই বলতে পারি, সে ভালো খবর এনেছে না মন্দ খবর। এই কাসেদকে আমি কেল্লার দেয়ালের ওপর থেকেই দেখেছিলাম। তার চেহারা আর ঘোড়ার খুরধ্বনি যেন বলছিলো, খবর খুব ভালো আনেনি সে'

ঃ 'হায়! কোন খবরই ভালো বার্তা আনে না' পুরান বিড়বিড় করতে করতে নিচে নেমে গেলো।

নিচে তার ঘোড়া তৈরী ছিলো। পুরান ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে ঘোড়ার পেটে পা দাবিয়ে দিলো।

রুস্তম দারোয়ানকে ডেকে পাঠালো।

ঃ 'জালিয়ুনুসকে এখনি আমার কাছে আসতে বলো' রুস্তম দারোয়ানকে নির্দেশ দিলো।

দারোয়ান বেরিয়ে যাওয়ার খানিক পরই দরোজা খুব জোরে খুলে গেলো। রুস্তম জানালার সামনে দাঁড়িয়ে ছিলো। আর তার পিঠ ছিলো দরজা বরাবর।

ঃ 'জালিয়ুনুস! এসে গেছো!–রুস্তম দরজার দিক থেকে পিঠ না ঘুরিয়েই বললো– 'জাবানের খবর শুনে ফেলেছো তুমি'?

ঃ 'আমি খবর শুনতেই এসেছি রুস্তম!'

রুস্তম বিদ্যুৎ বেগে ঘুরে গেলো। জালিয়ুনুসের জায়গায় এখন পুরান তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে।'

ঃ 'তোমার চেহারা বলছে খবর খুব ভালো নয়'– পুরান বললো–'এজন্যই তুমি আমাকে এখনো বেখবর করে রেখেছো?–পুরান তার বাহু দ্বারা রুস্তমের কোমর জড়িয়ে ধরে তাকে বসাতে বসাতে বললো– 'তোমার চেহারায় আমি পরাজয়ের চিহ্ন সইতে পারি না। ---- কি খবর এসেছে'?

ঃ 'জাবান ও মারদান শাহ্ সালতানাতে ফারেসের ভিত্তিটাই টলিয়ে দিয়েছে'– রুস্তম পরাজিত কণ্ঠে নয় ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললো– 'তারা মুসলমানদের কাছে এমন নির্লজ্জভাবে পরাজিত হয়েছে যে, মারদানশাহকে মুসলমানরা পাকড়াও করেছিলো, সে পালানোর চেষ্টা করলে মুসলমানরা তাকে হত্যা করে।

ঃ 'আর জাবান'?

ঃ 'সে জীবিত আছে'– রুস্তম জবাব দিলো– 'কাসেদ বলেছে' জাবানকেও পাকড়াও করা হয়েছিলো। কিন্তু সে তাদেরকে ধোঁকা দিয়ে জীবিত ফিরেছে। --- যদি মারদানশাহ্ আর জাবানের মতো জেনারেলরা এ ভাবে পরাজয় বরণ করে তবে আমি কি ময়দানে গিয়ে হাজির হবো'?

ঃ 'না রুস্তম'–পুরান রুস্তমের গলায় জড়িয়ে ধরে তার গাল রুস্তমের গালে লাগিয়ে বললো - 'সমস্ত ফৌজের নেতৃত্ব তোমার হাতে। সালতানাতের সব বিষয়ের যিম্মাদারও তুমি। তুমি এখানে বসে জেনারেলদের লড়িয়ে যাও।'

পুরানের রেশম কোমল চুল রুস্তমের চেহারায় জড়িয়ে যাচ্ছিলো। রুস্তম উঠে দাঁড়িয়ে পাড়লো।

ঃ 'আমাকে তোমার রূপের জাদুতে পাগল করে তোল না–' রুস্তম কিছুটা উত্তেজিত ও সচেতন গলায় বললো– 'আমাকে সে অবস্থায় থাকতে দাও যা আমাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।'

'আমি তোমার ক্ষোভ কমাতে চাচ্ছি'–পুরান বললো–'আমি তোমাকে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করছি। সালতানাতে ফারেস সম্পর্কে আমার ব্যাকুলতা সম্পর্কে কি তুমি অবগত নও ---? আমি আমার জীবন যৌবন সবকিছুই সালতানাতকে ওয়াকফ করে দিয়েছি। -- এসব কথা বাদ দাও রুস্তম। এখন চিন্তা একটাই করো। মুসলমানরা অধিক শক্তিশালী, না আমাদের ফৌজে এমন কোন খুঁত বা দুর্বলতা আছে যা আমাদের জেনারেলকে মুসলমানদের সামনে দাঁড়াতে দিচ্ছে না? আমি তো নিশ্চিতভাবেই শুনেছি মুসলমানদের সংখ্যা আমাদের চেয়ে অনেক অনেক কম। তারপরও ময়দানে তাদের বিজয়ের রহস্য কি'?

ঃ 'কারণ আগুনঝরা রূপবতী নারীর মাখন নরম গাল আর রেশম কোমল চুলের স্পর্শে মুসলমানরা প্রশান্তি অনুভব করে না'– রুস্তম বললো- 'শরাবের অগণিত পেয়ালা খালি করে তারা পরাজয়ের গ্লানি ভুলতে চায় না। তারা প্রাসাদের নরম গালিচায় থাকে না। জানি না তাদের ধর্ম সত্য কিনা, তবে তারা তাদের ধর্মবিশ্বাসে অবিচল।'

ঃ 'আমি তো মনে করেছিলাম মুসলমানদের নেতৃত্ব খুবই মজবুত এবং খু'তহীন গভীর'– পুরান বললো– 'আমি শুনেছি তাদের খলীফা অত্যন্ত বিপ্লবী মনের ---- কি যেন নাম--'?

ঃ 'উমর ইবনুল খাত্তাব'–রুস্তম বললো–'মদীনায় আমাদের গুপ্তচর রয়েছে। তারা ইহুদী। আর মদীনার আশে পাশে কিছু খ্রিষ্টানও আছে। তারা নিয়মিতই খবর পাঠিয়ে থাকে।'

ঃ 'এ সব খবর থেকে তুমি কি পেলে'?–পুরান জিজ্ঞেস করলো।

ঃ 'আমি আগেই বলেছি মুসলমানরা ধর্মবিশ্বাসে খুবই দৃঢ়'– রুস্তম বললো– 'ইহুদীরা তাদের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী মেয়েদেরকেও ব্যবহার করে দেখেছে। কিন্তু তারা ব্যর্থ ছাড়া কিছুই হয়নি। আর আমাদের সাধারণ সিপাহী থেকে সালার পর্যন্ত প্রত্যেকের লক্ষ্যই তো বিলাস-নারী আর মদ। এসবের কোন সুযোগই তারা হাত ছাড়া করতে রাজী নয়...'

'মদীনা থেকে আমাকে এ খবরও দেয়া হয়েছে যে, মুসলমানদের একটা দৃঢ় বিশ্বাস আছে– কিসরা পারভেজ তাদের রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের) এর পয়গাম ছিঁড়ে কুটি কুটি করে মুখের ফুঁকে উড়িয়ে দিয়েছিলো। এজন্য সালতানাতে ফারিসও এভাবেই টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়বে......

'আমার মনে হয়, তাদের খলীফা উমর তাদের রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রেরিত পয়গামের অপদস্থতার প্রতিশোধ নিচ্ছে।'

ঃ 'আর তারা সফলও' – পুরান বললো।

ঃ 'হ্যাঁ পুরান'! –রুস্তম বললো– 'এখনো উমরের কামিয়াবীর খবর আসছে। আমাদের প্রতিটি যুদ্ধই ব্যর্থ হচ্ছে। ইহুদীরা মুসলমান ব্যবসায়ী বেশে মদীনার দূরদূরান্ত এলাকা পর্যন্ত মুসলমানদেরকে পারস্যের যুদ্ধ শক্তির ব্যাপারে এমন ভয় দেখিয়েছিলো যে, তারা ইরাকের নামও নিতো না। আমাদের ফৌজের ভীতি মদীনার লোকদেরকেও আচ্ছন্ন করে রেখেছিলো। এমনকি খলীফা তার স্বগোত্রীয় লোকদেরকেও ইরাকের রণাঙ্গনে যোগ দেয়ার ব্যাপারে রাজী করতে পারেনি। মুসলমানদের এমন নিয়মিত কোন ফৌজ নেই যে লোকদেরকে সেখানে বাধ্যতামূলক ভর্তি করাবে। তারা স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে সুশৃঙ্খল একটি সেনাবাহিনীর আকার ধারণ করে। আর তারা স্বীয় আমীর ও সালারদের হুকুম অমান্য করাকে পাপ মনে করে .....'

'তাদের খলীফা উমর ইবনুল খাত্তাব আমাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য স্বেচ্ছাসেবক চাইলে কেউ এতে যোগ দিতে প্রস্তুত ছিলো না। অবশেষে আবু উবাইদ নামক এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নিজেকে যুদ্ধের জন্য পেশ করে। এরপর থেকেই দলে দলে স্বেচ্ছাসেবকে নাম লিখতে লাগলো। ইহুদীরা মুসলমানদেরকে আমাদের যুদ্ধবাজ হাতির ব্যাপারেও ভয় দেখিয়ে ছিলো। তারা মুসলমানদেরকে হাতির ব্যাপারে এমন ভয়ানক কথা শোনালো যে, তারা প্রায় নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলো, খলীফা আমাদের বিরুদ্ধে আর কোন লশকর তৈরী করতে পারবে না। যা হোক এখন তাদের যে ফৌজ এসেছে, এর সংখ্যা হলো দশহাজার। তাদের সালার সেই আবু উবাইদ। সে এর আগের লড়াইয়ে আমাদের দুই জেনারেলকে এমন চরমভাবে পরাজিত করেছে– দু'জনই গ্রেফতার হলো। তাদের একজনকে তো হত্যাও করা হলো, ।'

ঃ 'এখন তুমি কি করতে যাচ্ছো'?–পুরান জিজ্ঞেস করলো।

ঃ 'জালিনুয়ুসকে ডেকেছি। সে এখনই এসে পড়বে'।

রুস্তম কি মনে করে ঘরের বাইরে গেলো। পারস্যের আরেক বিখ্যাত জেনারেল জালিনুয়ুস বাইরে দাঁড়িয়েছিলো। রুস্তম তাকে ভেতরে নিয়ে এলো।

ঃ 'জালিনুয়ুস! তুমি কি 'নামারিক' এর লড়াইয়ের পরিণাম শুনে ফেলেছো?'

ঃ 'হ্যাঁ শুনেছি'—জালিনুয়ুস বললো— 'কাসেদকে জিজ্ঞেস করে খানিকটা আমি জেনে নিয়েছি। বিস্তারিত এখনো জানি না।'

ঃ 'বিস্তারিত জেনে আর কি করবে?'—রুস্তম কর্কশ গলায় বললো— 'মারদান মারা গেছে আর জাবান কোন ক্রমে আরবদের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে গেছে। তাদের দু'জনের ফৌজের বেঁচে যাওয়া সৈন্যরা কাসকার গিয়ে পৌঁছেছে। সেখানে জেনারেল নারসী তার ফৌজ নিয়ে তাঁবু ফেলেছে। তুমি এখনি কয়েক দল সেনা নিয়ে তৈরী হয়ে যাও। ঘোড়সওয়ার বেশি করে নেবে।'

ঃ 'জালিনুয়ুস! — মালিকায়ে ফারিস বললো— 'রণাঙ্গন সম্পর্কে উপদেশ ও নির্দেশ যা দেয়ার তা রুস্তমই দেবে। আমি শুধু আমার পক্ষ থেকে এতটুকু বলবো— তোমার কারণে পারস্য যেন আরেকটি পরাজয়ের বোঝা বহন না করে। আমরা তো অঙ্গীকার করে ছিলাম মুসলমানদেরকে খতম করে ছাড়বো। কিন্তু এখন পারস্যকেই বাঁচানো কঠিন হয়ে পড়ছে।'

ঃ 'মালিকায়ে ফারিস!' এখন নিশ্চয় আপনি ভালো খবর শুনবেন'— জালিনুয়ুস নিশ্চিত গলায় বললো— 'যুরথ্রুষ্টের কসম! আগের পরাজয়গুলোরও প্রতিশোধ নেবো।'

জালিনুয়ুস তার সেনাদল তার মতো করে প্রস্তুত করে নিলো। মাদায়েনের ওপর তখন ভীতি আর হতাশার কালো ছায়া। পারস্যের এই কেন্দ্রীয় শহরটির লোকেরা প্রতিদিনই শুনছিলো, আজ এরা অমুক জায়গা থেকে পালিয়ে আসছে। আর মুসলমানরা অমুক শহর বা গ্রাম দখল করে নিচ্ছে। সেসব গ্রাম বা শহরের বিক্ষিপ্ত অধিবাসীরা মাদায়েন আসছিলো। শহরে এই খবরটাও ছড়িয়ে পড়েছিলো—মারদান শাহ আর জাবান পরাজিত হয়েছে। আর জালিনুয়ুস সৈন্য নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে।

পাগলের মতো বেশভূষা এক লোককে মাদায়েনের এদিক সেদিক প্রায়ই বিড় বিড় করে কি-সব বলতে দেখা যেতো। করুণা করে কেউ কিছু দিলে খেতে পেতো, না হয় অনাহারে থাকতো। জালিনুয়ুস যখন ফৌজ তৈরী করছিলো তখন একদিন পাগলটি শহরের কোন ফটক দিয়ে বের হয়ে গেলো। অভ্যাসমতো কখনো জোরে কখনো আস্তে বিড় বিড় করতে করতে যাচ্ছিলো। কেউ তাকে গুরুত্ব দিলো না।

সামান্য দূরেই নিচু জমি আর গাছের ঘন সারি ছিলো। সে টুপ করে ঝোপের মধ্যে ঢুকে গেলো এবং ঘন ঘন এদিক ওদিক তাকাতে লাগলো।

ঃ 'এসো এসো'- চাপা কণ্ঠের আওয়াজ শুনলো সে— 'আরে তাড়াতাড়ি করো'।

লোকটিকে ঘোড়ার লাগাম ধরে ঘন ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলো সে। পাগলটি একে দেখেই দৌড়ে তার কাছে চলে গেলো।

'তাড়াতাড়ি সওয়ার হয়ে যাও। আর কারো চোখে পড়ো না'— লোকটি বললো— 'আবু উবাইদ সম্ভবতঃ নামারিকে থাকবেন। তাকে এখানকার সবকিছুই জানাবে। তুমি তো সব নিজ চোখেই দেখে এসেছো'।

ঃ 'আর কিছু বলার প্রয়োজন নেই'— পাগলটি বললো– 'জালিনুয়ুসের অনেক আগেই আমাকে আবু উবাইদের কাছে পৌঁছতে হবে। আল্লাহ হাফেজ!' পাগলবেশী লোকটি ঘোড়ায় পদাঘাত করলো।

লোকটি ভালোই পাগলের বেশ ধরেছিলো। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও সূক্ষ্ম বুদ্ধির জন্য তার বিশেষ কদর ছিলো। সে ছিলো আরব্য মুসলমান আশআর ইবনে আওসামা। খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা) তাঁর যুদ্ধনীতি ও নেতৃত্বের এমন এক দৃষ্টান্ত পেশ করেছিলেন, দুশমনরাও অকপটে তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ থাকতো। যুদ্ধের ময়দানে অবতীর্ণ হওয়ার আগে তিনি শত্রুর গতিবিধি সম্পর্কে ভালো করে জেনে নিতেন। এ জন্য তিনি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারী আত্মত্যাগী প্রকৃতির বীরদেরকে নিয়োগ করতেন।

আশআর ইবনে আওসামাও এধরনের গুপ্তচর ছিলো। পাগলবেশে সে মাদায়েনে থাকতো। সারাদিন তো লোকেরা তাকে বক বক করতে দেখতো। কিন্তু রাতে যে সে কোথায় গায়েব হয়ে যেতো তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামাতো না। রাতে সে এক ইরাকী খ্রিস্টানের ঘরে গিয়ে থাকতো। এই খ্রিস্টান লোকটি আসলে আরব ছিলো। মাদায়েন গিয়ে সেখানে আবাস গেড়েছিলো। আরবদের জন্য তার বেশ সহানুভূতি ছিলো। এ ছাড়াও একজন মুসলমানকে আশ্রয় দেয়ার জন্য মদীনা থেকে সে এর বিনিময়ও পেতো।

জালিনুয়ুস তার সৈন্যদল নিয়ে তখনো মাদায়েন ছেড়ে রওয়ানা হয়নি। আশআর আবু উবাইদার কাছে পৌঁছে গেলো। আবু উবাইদ পাগলবেশী লোকটিকে দেখে হয়রান হয়ে ভাবতে লাগলেন; এমন উন্নতজাতের ঘোড়া এই পাগলটি পেলো কোত্থেকে।

ঃ 'আমার নাম আশআর ইবনে আওসামা। মাদায়েন থেকে আসছি আমি। সেখানে গুপ্তচর হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত ছিলাম।'

ঃ 'আল্লাহর কসম!' আবু উবাইদ বললেন–'তোমার মতো লোক দ্বারা এই কাজ সম্ভব এটা আমি মানতে পারছিনা– কোন সালারকে তুমি চেনো'?

ঃ 'মুসান্না ইবনে হারিসা এখানে থাকলে তিনি আমাকে চিনতে পারতেন।'

মুসান্না ইবনে হারিসা আবু উবাইদেরই অধীনস্থ সালার ছিলেন। তাকে ডাকা হলো। তিনি এসে আবু উবাইদকে বললেন, এতো আমাদেরই লোক।

ঃ 'এখন আমার কথা শুনুন'– আশআর বললো– 'আপনি নিশ্চয় জানেন দাজলা ও ফুরাতের মধ্যবর্তী এলাকায় 'কাসকার' নামক একটি জায়গা আছে। একে 'সিকাতিয়া'ও বলে। পারস্য ফৌজের বেশ কয়েকটি দল সেখানে তাঁবু ফেলেছে। আপনার কাছে পরাজিত হয়ে যারা পালিয়েছিলো তারাও সিকাতিয়া গিয়ে জড়ো হয়েছে। সেখানকার জেনারেলের নাম নারসী। রুস্তম তার জন্য সেনাসাহায্য পাঠাচ্ছে। আমার অনুমান মতে চারদিন পরই তারা সিকাতিয়া পৌঁছে যাবে।'

আবু উবাইদের জন্য এ সংবাদটি বড়ই মূল্যবান ছিলো।

ঃ 'ইবনে হারিসা!'–আবু উবাইদ মুসান্না ইবনে হারিসাকে বললেন– 'যে অভিজ্ঞতা এ পর্যন্ত তুমি হাসিল করেছো তা আমি হাসিল করতে পারিনি ঠিক, তবুও বলছি জালিয়ুনুসের পূর্বে যদি আমরা সিকাতিয়া পৌছে যাই; খোদার কসম! আমরা পারসিকদের কোমর ভেঙে দিতে পারবো'।

ঃ 'আল্লাহর নাম নাও আগে আবু উবাইদ!'– মুসান্না বললেন-' হ্যাঁ এখনই ফৌজকে কোচ করার হুকুম দাও। আমীরুল মুমিনীন যে নির্দেশ দিয়েছেন তুমি এখন তার ওপরই আমল করেছো। তুমি তোমার সালারের সঙ্গে পরামর্শ করে নিয়েছো। আর তুমি যা ভেবেছো তাই ঠিক। জালিয়ুনুসের পূর্বে যদি আমরা জেনারেল নারসী পর্যন্ত পৌছতে পারি, তাকে ও জালিয়ুনুসকে পৃথক পৃথক ভাবে পরাস্ত করা যাবে। কিন্তু তারা যদি একত্রিত হয়ে যায় তবে এটা আমাদের জন্য মুশকিল হয়ে পড়বে।'

আবু উবাইদ তখনই তার ফৌজকে কোচ করার হুকুম দিলেন। তার সালার ও নায়েবে সালারদের তিনি বলে দিলেন, কোথায় যাওয়া হচ্ছে এবং এর লক্ষ্যই বা কি! বদরের যুদ্ধ থেকেই মুসলমানদের মধ্যে এই বিশ্বাসটা বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিলো যে, দুশমন থেকে মুসলমানরা সংখ্যায় সবসময়ই অল্পছিলো এবং প্রতিটি ময়দানেই দুশমন কয়েকগুণ শক্তিশালী ছিলো। তবুও মুসলমানরা বিজয়ী হয়েছে। এই বিশ্বাসটা তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকেই পেয়েছিলো।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুজাহিদদের মধ্যে আরেকটি বৈশিষ্ট্য গড়ে তুলেছিলেন। মুজাহিদরা যখন কোচ করতো তখন এতো দ্রুত ও ক্ষিপ্রগতিতে অগ্রসর হতো, দুশমন হয়রান হয়ে যেতো এবং তাদের পূর্ব পরিকল্পনা ভেস্তে যেতো। সিপাহসালার খালিদ (রা) ও তাঁর মতো সালাররা তাদের মধ্যে আরেকটি মহৎগুণ গড়ে তুলেছিলেন। তাহলো যেকোন মূল্যেই হোক সেনাশৃংখলা দৃঢ় রাখতে হবে এবং হুকুম ছাড়া এক কদমও নড়া যাবে না। এভাবে আমীরের প্রতি অনুগত থাকাটা মুসলমানরা ফরয মনে করতো। আর তখনকার কোন সালার ও আমীরের মধ্যেই কেউ কখনো ব্যক্তিগত স্বার্থ বা পছন্দ-অপছন্দের ব্যবহার কিংবা স্বজন প্রীতির নীতি চর্চিত হতে দেখেনি।

দাজলা ও ফুরাতের মাঝামাঝি এক বিশাল ময়দানে জেনারেল নারসী তার ফৌজের ছাউনি ফেলেছিলো। মুজাহিদদের চেয়ে তার ফৌজ ছিলো আড়াইগুণ বেশি। তখনকার সর্বাধুনিক হাতিয়ারে তারা সজ্জিত ছিলো। এর মধ্যে সওয়ারীর সংখ্যাই ছিলো বেশি। প্রত্যেক সওয়ারের কাছে একটি বর্শা এবং একটি তলোয়ার ছিলো।

নারসীর ফৌজ কিসরার দুই মামাতো ভাই বান্দাবিয়া ও তীরাবিয়া- ফৌজের ডান ও বামপার্শ্বের সর্বাধিনায়ক ছিলো। এরা উভয়েই পারস্যের প্রসিদ্ধ ও আক্রমণাত্মক জেনারেল।

দুশমনকে তারা ডান ও বাম দিক থেকে ঘিরে ফেলতো এবং নৃশংসভাবে হত্যাযজ্ঞ শুরু করে দিতো। রোমের মতো এতো বড় সমর শক্তিকে তাদের মাধ্যমেই পরাজিত করা সম্ভব হয়েছিলো।

এই দুই জেনারেলসহ জেনারেল নারসী মাদায়েন থেকে আগত সেনাকাফেলার জন্য এত ব্যাকুল হয়ে প্রতীক্ষা করছিলো, প্রতিদিন সকালেই এক সওয়ারকে মাদায়েনের পথে নজর রাখার জন্য পাঠিয়ে দিতো, যাতে ফৌজী কাফেলা নজরে পড়লেই তাকে জানানো হয়।

এর কারণও ছিলো, নারসীর ফৌজের অবস্থা ছিলো বড়ই শোচনীয়। তার ফৌজের মনোবল যাই ছিলো তা জাবান আর মারদান শাহ এর সেসব ফৌজরা একেবারেই ভেঙে দিয়েছিলো, যারা নামারিকের যুদ্ধে মুজাহিদদের হাতে পরাজিত হয়ে পালিয়ে এসে নারসীর ফৌজের ক্যাম্পে আশ্রয় নিয়েছিলো। তারা তাদের পরাজয়ের লজ্জা ঢাকার জন্য মুসলমানদের বাহাদুরী ও খুনে হামলার এমন ভয়ংকর গল্প শোনাতো যেন মুসলমানরা মানুষ নয়, অশরীরী জ্বিন।

ঃ 'আমরা তো আর জ্বিন-ভূতের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যেতে পারি না'– ময়দান থেকে পলায়নকারী প্রতিটি সিপাহীর মুখেই একথা ছিলো। এসব কারণে নারসীর ফৌজে প্রচন্ড ভীতি ছড়িয়ে পড়ে।

'আর এসব কাপুরুষরা তাদের জেনারেলদের মৃত লাশ ময়দানে রেখে পালিয়ে এসেছে'– নারসী একদিন তার ফৌজকে উদ্দেশ করে বলছিলো– 'এগুলো তো ভাগুরা গাদ্দার। আমার হুকুম যদি পারস্যে চলতো, আমি এদেরকে পবিত্র যরথ্রুষ্টের আগুনে জীবিত পুড়িয়ে ফেলতাম। এদের যদি আত্মসম্মানবোধ থাকতো, এরা জীবিত ফিরে আসতো না। এরা ডরপুক মহিলাদের মতো এখন ভিত্তিহীন কথা বলছে। এদের তো উচিত ছিলো এদের সৈনিক ভাইদের মনে সাহস যোগানো এবং মুসলমানদের কাছে পরাজয়ের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য স্বীয় ধর্মীয় জযবা দৃঢ় করা।'

ঃ 'আপনার কি মনে হয় আপনার আজকের বক্তৃতার কারণে সিপাহীদের মনোবল ফিরে আসবে'?– রাতের খাবারে বসে জেনারেল বান্দাবিয়া জিজ্ঞেস করলো।

ঃ 'না'-জেনারেল নারসী বললো– 'আমি প্রতিদিনই সেনা অফিসারদের কাছ থেকে সিপাহীদের জযবা, হিম্মত এবং উৎসাহ উদ্দীপনার খবর নিচ্ছি। এদের সবার মনেই মুসলমান ভীতি ছেয়ে বসেছে। খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা) কে এরা আকাশ থেকে অবতীর্ণ ভয়াল কোন দেবতা মনে করে। আমি এজন্যই মাদায়েন থেকে সেনা চেয়ে পাঠিয়েছি। মাদায়েন থেকে আগত সিপাহীরা মুসলমানদের সম্পর্কে বিলকুল না ওয়াকিফ থাকবে এবং 'মুসলমান ভীতি' থেকে মুক্ত থাকবে।'

ঃ 'হ্যাঁ, অন্যথায় আমাদের বাড়তি ফৌজের প্রয়োজন ছিলো না'– তিরবিয়া জেনারেলকে বললো–'এতক্ষণে তো ফৌজী কাফেলার পৌছে যাওয়ার কথা ছিলো, তারা পৌছলেই আমরা রুস্তম আর মালিকায়ে ফারিসকে চমৎকার খবর শোনাবো।'

ঃ 'সিকাতিয়াকে আমরা মুসলমানদের নোংরা কবরস্থানে পরিণত করবো'– বান্দাবিয়া বললো।

❖ ❖ ❖

আবু উবাইদের নেতৃত্বে মুজাহিদরা দ্রুতই সিকাতিয়া অভিমুখে চলছিলো। কিন্তু পথে এক চওড়া নদী বাঁধা হয়ে দাঁড়ালো। দিনের আলোতে নদী পার হতে গেলে শত্রদলের তীর আর বর্শার নিশানা হওয়ার জোর আশংকা ছিলো। তখন নদীতেই শত্রুপক্ষ মুজাহিদদের সলিলসমাধি রচনা করবে।

তাই রাতের অন্ধকারে নদী পেরুনো কম ঝুঁকিপূর্ণ ছিলো। কিন্তু সেখানে পুল বানানোর মতো কোন নৌকার সারি ছিলো না। ঘটনাক্রমে স্থানীয় এক লোক সেখান দিয়ে যাচ্ছিলো। তার কাছ থেকে জানা গেলো, প্রায় দু মাইল সামনে নৌকার সারির একপুল আছে। পারস্যের সৈন্যরা তাদের রসদ সরবরাহের জন্য এটি বানায়। পুলের দু'প্রান্তে দিনে রাতে দু'জন করে সিপাহী প্রহরায় থাকে।

রাতে চার জানবায মুজাহিদকে পাঠানো হলো। পুল সামান্য দূরে থাকতেই তিন মুজাহিদ ঝোঁপের আড়ালে লুকিয়ে পড়লো। আর একজন স্থানীয় লোকের বেশে দুই প্রহরীর কাছে চলে গেলো এবং তাদের সঙ্গে এটা ওটা নিয়ে কথা বলতে শুরু করলো। কথা বলতে বলতে পুল থেকে তাদেরকে ঝোঁপের কাছে নিয়ে এলো। ভোজভাজির মতো আচমকা তিন মুজাহিদ তাদের সামনে এসে দাঁড়ালো। তারা চমকানোরও সুযোগ পেলো না। সাঁড়াশির মতো তাদের দুজনের গলায় চারটি হাত চেপে বসলো। তাদের কাপড়গুলো খুলে দুই মুজাহিদ গায়ে দিয়ে নিলো এবং পুলের অপর প্রান্তে চলে গেলো। সে প্রান্তের প্রহরীরা তাদেরকে নিজেদের লোক মনে করে কোন সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজনবোধ করলো না। দুই মুজাহিদ কাছে গিয়ে খঞ্জরের সাহায্যে এদেরকেও কতল করে দিলো।

এক মুজাহিদ পেছনে এসে আবু উবাইদকে জানালো পথ পরিষ্কার। আবুউবাইদ তখনই ফৌজকে কোচ করার হুকুম দিলেন। ফৌজ নিরাপদেই নদী পার হয়ে গেলো।

জালিনুয়ুস তার লশকর নিয়ে মাদায়েন থেকে আগেই রওয়ানা হয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু তার সামনে ছিলো দীর্ঘ সফরের পথ। কিন্তু আবু উবাইদ তো জালিনুয়ুসেরও আগে সিকাতিয়ার উদ্দেশে কোচ করেছিলেন।

পরদিন সন্ধ্যায় আবু উবাইদের ফৌজ সিকাতিয়ার কাছে গিয়ে পৌছলো। সেটা লড়াই শুরু করার সময় ছিলো না, আবার এই ফৌজকে দুশমন থেকে গোপন রাখাও সম্ভব ছিলো না। তাই কাছের একগ্রামে গিয়ে ঘোষণা করে দেয়া হলো– রাতে যেন গ্রামের বাইরে একটি শিশুও বের না হয়। এর আশে পাশে প্রহরাও নিযুক্ত করা হলো।

এই সতর্কতার পরও শত্রুপক্ষের মুজাহিদদের উপস্থিতি সম্পর্কে জেনে ফেলার আশংকা ছিলো। তাই পারসিকদের পর দিনের লড়াইয়ের তৈরীটা যেন নিখুঁত না হয় এজন্য মুজাহিদদের কিছু একটা করাও জরুরী ছিলো। ফারসী ফৌজ যখন শুয়ে পড়লো তখন বিশ বাইশজন মুজাহিদের দুটি দল সামান্য বিরতিতে ফারসী ফৌজের ওপর অতর্কিতে নৈশ হামলা চালালো। হামলার সময় দ্বিতীয় দলটি দুশমনের আস্তাবলে গিয়ে ঘোড়ার রশিগুলো কেটে দিলো এবং কোন কোন ঘোড়ার গায়ে তরবারির ডগা দিয়ে খুঁচাতে লাগলো। সারা ক্যাম্পে ঘোড়ার ভয় পাওয়া আর্তচিৎকারে যেন কেয়ামতের বিভীষিকা ছড়িয়ে দিলো।

এই নৈশ হামলায় ফারসী ফৌজের শুধু প্রাণহানিই ঘটলো না অনেক সিপাহী এমন যখমী হয়ে পড়লো যে, শুধু পরদিনের লড়াইয়ের জন্যই নয় বরং দীর্ঘ সময়ের জন্য তারা অক্ষম হয়ে পড়লো। তাদের আসল ক্ষতি যেটা হলো সেটা ছিলো তাদের ওপর আগ থেকেই মুসলমানদের যে ভীতি বসে গিয়েছিলো, তা আরো কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেলো। কয়েকজন সিপাহীকে ভীত গলায় এটাও বলতে শোনা গেলো– এই হামলাকারীরা কোন মানুষ নয় অদৃশ্য কোন শক্তি হবে।

সকালের আকাশ ফর্সা হচ্ছিলো। জেনারেল নরসী, বান্দাবিয়া ও তীরাবিয়া রাতভর জেগে থাকা সৈনিকদের সারিবদ্ধ করতে গিয়ে হিমসিম খাচ্ছিলো।

ঃ 'ঐ যে দেখো'–ঘাবড়ানো গলায় এক সিপাহী বললো। আওয়াজটাও তার বেশ উঁচু ছিলো।

সমস্ত ক্যাম্পেই এই ঘাবড়ে যাওয়া আওয়াজ পৌঁছে গেলো। প্রত্যেকেই সেদিকে তাকিয়ে রইলো। দশ হাজার মুজাহিদের লশকর যুদ্ধের নিপুণ বিন্যাসে অগ্রসর হচ্ছিলো। ফারসী লশকরে পেরেশানী ছড়িয়ে পড়লো। অথচ তাদের সৈন্য সংখ্যা ত্রিশ হাজারেরও বেশি ছিলো। যাতে সওয়ারই ছিলো অধিক। এই তিন জেনারেলের অবস্থা প্রায় বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছিলো।

ঃ 'ফৌজী কাফেলা পৌঁছলো না এখনো!'–নারসী বার বার বলছিলো।

অন্য দুই জেনারেল তাদের সৈন্যদের সারিবদ্ধ করছিলো।

ঃ 'আবু উবাইদ!'–মুসান্না আবুউবাইদকে বললেন– 'তোমরা কি দুশমনকে সুশৃংখল হয়ে হামলা করার সুযোগ দিচ্ছো? তাদের সৈন্য ও ঘোড়ার সংখ্যা দেখে নাও।'

আবু উবাইদ তার লশকরকে চারদলে ভাগ করে সারিবদ্ধ করে রেখেছিলেন। মুসান্নার চিৎকার শুনতেই অগ্রবাহিনীকে তিনি হামলার হুকুম দিয়ে দিলেন। ডান ও বামপার্শ্বস্থ সেনাদলকে তিনি পূর্বেই বলে রেখেছিলেন হামলা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তারা যেন দুশমনের ডানে ও বামে ছড়িয়ে পড়ে এবং দুশমনের পেছন দিকে যাওয়ার চেষ্টা করতে থাকে।

মুসান্না ইবনে হারিসা ফৌজের ডান বাহুতে ছিলেন। খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা) এর মতোই তিনি বীরদর্পী সালার ছিলেন। খালিদ (রা) থেকে তিনি যুদ্ধের অনেক ক্ষিপ্র কৌশল শিখেছিলেন। মুসান্না পূর্বেই এই অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছিলেন যে, পারস্যদের চূড়ান্তরূপে পরাজিত করে অগ্নিপূজারীদের মিথ্যা অহংবোধকে চিরতরে খতম করে দিতে হবে। মুসান্নার সঙ্গে পদাতিক বাহিনীর চেয়ে সওয়ারই বেশি ছিলো। তিনি জানতেন, ফারসী জেনারেল বান্দাবিয়া ও তীরবিয়া ফৌজের দুই পাশ থেকে হামলার ব্যাপারে যেমন দক্ষ তেমনি ভয়ংকর। তাই মুসান্না তার সেনাদল নিয়ে খুবই তীব্রগতিতে অনেকটা বৃত্তাকারে দূর থেকে ঘুরে এসে পারসিকদের ডান বাহুতে এসে গেলেন।

বামপার্শ্বে ছিলেন সাহাবী সালতি ইব্‌নে কায়েস (রা)। তিনিও মুসান্নার মতো তার সেনাদল নিয়ে দূর থেকে ঘুরিয়ে পারসিকদের বাম পার্শ্বকে ঘিরে ফেললেন।

চক্রাকারের এই ঘেরাওয়ের মধ্যে মুসলমানদের হামলা এতো কঠিন ও তীব্র ছিলো যে, ফারসী ফৌজ আর বেশিক্ষণ দাঁড়াতে পারলো না। ফারসীদের পেছনে ছিলো খরস্রোতা নদী। মুসান্না ও সালীত (রা) দুই পাশ থেকে ফারসীদের পরিবেষ্টন করে নিয়েছিলেন। আগেই তো ফারসী সিপাহীদের মনোবল ভেঙে গিয়েছিলো। তারপর গত রাতের চোরাগুপ্তা হামলা তাদের পাল্টা হামলার সাহস টুকুও ছিনিয়ে নিয়েছিলো। তাই তারা আত্মরক্ষামূলক প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করতে লাগলো। এর মধ্যে আবার অনেকে পালাতে গিয়ে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগলো।

খুব অল্প সময়েই পারসিকদের লাশে ময়দান ভরে গেলো। তিন জেনারেলই লাপাত্তা হয়ে গেলো। বাকীরা রণেভঙ্গ দিতে দেরী করলো না।

ছোট খাট হলেও এটি ছিলো পারসিকদের জন্য সুস্পষ্ট ব্যবধানের চূড়ান্ত পরাজয়।

এই বিজয়ের পর মুজাহিদরা পারসিকদের তাঁবুর সারি ও ময়দান থেকে মালেগনীমত এক জায়গায় স্তূপ করছিলো। এদিকে আশআর ইবনে আওসামা সিপাহসালার আবু উবাইদকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলো।

ঃ 'সিপাহসালার!'–দূর থেকে আবু উবাইদকে দেখতে পেয়ে ডাকতে লাগলো এবং তার কাছে গিয়ে ঘোড়া থেকে নেমে পড়লো।

ঃ 'কি খবর নিয়ে এলে ইবনে আওসামা?' –আবু উবাইদ আশআরকে জিজ্ঞেস করলেন।

ঃ 'মাদায়েনের ফৌজ এখান থেকে এক চৌকি দূরে রয়েছে'–আশআর বললো- 'আজ রাতে এই কাফেলা বারসিমার কাছে তাঁবু ফেলবে– আশআর রক্তাক্ত ময়দানের অবস্থা দেখে বললো–'খোদার কসম! অগ্নিপূজারীদের কোমর দেখি আপনি ভেঙে দিয়েছেন!'

ঃ 'এটা আল্লাহর অশেষ মেহেরবানী আর তোমার মেহনতের কারিশমা ইবনে আওসামা! মাদায়েন থেকে তুমি যে খবর নিয়ে এসেছিলে তা আমাদের ভীষণ কাজে লেগেছে। তোমার গুপ্তচরবৃত্তির এটা শুভ পরিণাম। সেনা কাফেলার সংখ্যা কতো?'

ঃ 'এখানে আপনি যতগুলো লাশ ফেলেছেন এবং যতগুলোকে ময়দান থেকে তাড়িয়েছেন সেনাকাফেলার সংখ্যা এর কিছু বেশি। এদের সালার জালিনুয়ূস। পারসিকরা যাকে রণাঙ্গনের দেবতা বলে। তার ফৌজে পদাতিক বাহিনীর চেয়ে সওয়ারই বেশি।'

আবু উবাউদ সিকাতিয়ায় কোচ করার সময় আশআরকে মাদায়েনের ফৌজি কাফেলার গতিবিধির ওপর নজর রাখার জন্য পাঠিয়েছিলেন। সময় মতো যেন তাকে প্রয়োজনীয় সংবাদ দেয় এই নির্দেশও দিয়ে দিয়েছিলেন।

আশআর গিয়েছিলো ইহুদী পুরোহিতদের বেশে। আর সময় মতোই খবর নিয়ে এলো যে, ফৌজি কাফেলা আজ রাতে বারসিমা তাঁবু ফেলবে।

ঃ 'তবে সালারে আলা!'– আশআর আরেকটি খবর শোনালো– 'আপনি এই ফৌজের ওপর চোরাগুপ্তা হামলা চালাতে পারবেন না। পথে আমি সিকাতিয়া থেকে পালিয়ে যাওয়া বারসিমা অভিমুখে কিছু সওয়ার দেখেছি। দুই সওয়ারকে আমি পরস্পর

কথা বলতেও শুনেছি। তখনই আমি বুঝে নিয়েছি আমার ভাইয়েরা সিকাতিয়া জয় করে নিয়েছে -- আপনার এখন সাবধানে পদক্ষেপ ফেলতে হবে। দুশমন পথে আত্মগোপন করে ওঁত পেতে থাকতে পারে। পালিয়ে যাওয়া সওয়াররা কিছুক্ষণ পরেই হয়তো বারসিমা পৌঁছে যাবে। তাদের কাছ থেকে এই লড়াইয়ের খবর শুনে দুশমন রাতেও আপনার অপেক্ষায় তৈরী থাকবে।'

'আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন ইবনে আওসামা!'– আবু উবাইদ বললেন–' 'তুমি এখন গিয়ে কিছুক্ষণ আরাম করে নাও। সূর্যাস্তের পরই আমাদের বারসিমার দিকে কোচ করতে হবে।'

আবু উবাইদ সালার মুসান্না ও সালীত ইবনে কায়েস (রা) কে ডেকে জানালেন আশআর কি খবর নিয়ে এসেছে।

ঃ 'এটা কি ভালো হয় না যে, আমরা বারসিমার দিকে এগিয়ে যাবো?'– আবু উবাইদ দুই সালারকে জিজ্ঞেস করলেন– 'নাকি জালিনুয়ুসের জন্য এখানে অপেক্ষা করাটা তোমরা ভালো মনে করছো? আমি এখনই এগিয়ে যেতে চাই।'

ঃ 'নিশ্চয়, নিশ্চয়– এটাই ভালো হবে'– মুসান্না বললেন– 'জালিনুয়সকে এখান থেকে পালিয়ে যাওয়া ফৌজ সাবধান করে দেবে এবং তারা আমাদের হামলার ধরনও তাকে জানিয়ে দেবে।'

ঃ 'এছাড়াও আমি আরেকটি আশংকা দেখতে পাচ্ছি'– আবু উবাইদ বললেন–'এখানে বসেই যদি আমরা জালিনুয়ুসের অপেক্ষা করতে থাকি তবে হয়তো সে মাদায়েন থেকে অতিরিক্ত আরো ফৌজ তলব করতে পারে। এখনই তো তারা সংখ্যায় আমাদের চেয়ে আড়াই তিন গুণ বেশি। তারপরও শহীদান আর যখমীরা আমাদের সংখ্যা অনেক কমিয়ে দিয়েছে। কমপক্ষে হাজার খানেক মুজাহিদ এখানে ছেড়ে যেতে হবে। সমস্ত মালে গণীমত ও দুশমনের ছেড়ে যাওয়া হাজার হাজার ঘোড়া আমাদের এখানে রেখে যেতে হবে এবং নদীর ওপরের সেই পুলটিও আমাদের দখলে রাখতে হবে। সবচেয়ে জরুরী হলো জালিনুয়ুসকে মাদায়েন থেকে ফৌজ তলবের সুযোগ দেয়া যাবে না। এক হাজার সিপাহী এখানে তোমরা রেখে যাবে আর যখমীদের পরিচর্যার জন্যও তাদেরকে বলে যাবে। সবাইকে কোচ করার জন্য তৈরী হতে বলো। যাত্রার পূর্বে আমি সেনাবাহিনীর সঙ্গে দু'একটি কথা বলতে চাই।'

সূর্যাস্তের কিছুক্ষণ পূর্বে জালিয়ুনুস বারসিমা পৌঁছে তার ফৌজকে তাঁবু ফেলার নির্দেশ দিলো। পুরো সৈন্যদল তাঁবু স্থাপনে লেগে গেলো। প্রথমে জালিয়ুনুসের তাঁবু দাঁড় করানো হলো। তাঁবুর ভেতর বিশাল খাট, পুরো তোষক ও নরম চাদর দিয়ে সাজানো হলো। মূল্যবান ফার্নিচার রাখা হলো। রেশমী ভারী পর্দায় চারদিকটা আবৃত করা হলো। তাঁবুর পরিধিও ছিলো বিশাল, যার কামরা ছিলো দুটি। ভেতরে ঢুকলে এ গুলোকে কোন মহলের কামরার মতো মনে হতো।

জালিয়ুনুস তার খিমায় বসা ছিলো। এ সময় তার দেহরক্ষীর ফৌজী কমান্ডার তাঁবুতে প্রবেশ করে বললো– 'যেখানে এই সেনাসাহায্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সেখান থেকে যখমী সওয়াররা আসছে।'

তার সঙ্গে একজন যখমী অফিসার আগেই বাইরে অপেক্ষা করছিলো। জালিয়ুনুস বাইরে এসে রাগে ফেটে পড়লো এবং সিকাতিয়া কি হয়েছে তা তাকে জিজ্ঞেস করলো।

সেই যখমী অফিসার সিকাতিয়ার লড়াইয়ের বিস্তারিত ঘটনা জানালো, নৈশ হামলার কথাও জানালো। এমনভাবে সে বলছিলো যে, তাদের তুলনায় মুসলমানদের সৈন্যসংখ্যা ও সমর শক্তি যেন অনেক বেশি ছিলো।

'খুব বেশি হলে তাদের সংখ্যা তো ছিলো দশ হাজার'– জালিয়ুনুস ক্ষিপ্ত গলায় বললো'- আর তোমরা কমপক্ষে ত্রিশহাজার হারামখোর ছিলে...... দেখি তোমার যখমের অবস্থা'!

ঃ 'এই সামান্য যখমেই পালিয়ে এলে'– জালিয়ুনুস তার মামুলি যখম দেখে বললো– 'তুমি তো দুইশ সিপাহীর কমান্ডার ছিলে। তুমি যখন পালালে তখন তো তোমার দেখাদেখি পেছন পেছন দুইশ সিপাহীও পালালো।'

এসময় জালিয়ুনুসের আরেক ফৌজী অফিসার এসে বললো, নামারিকের ময়দান থেকে পালিয়ে আসা সিপাহীরা সিকাতিয়া পৌছে নারসী, বান্দাবিয়া, তীবারিয়ার ফৌজকে মুসলমানদের বাহাদুরি ও খুন ঝরানো লড়াইয়ের এমন ভয়ানক গল্প শোনায় যে, সিকাতিয়ার সারা ফৌজে ভীতি ছড়িয়ে দেয়। সিকাতিয়ার পরাজয়ের কারণ এটাই।

ঃ 'সেখানকার পলাতক সেনারা আমাদের ক্যাম্পে আসছে'– অফিসার বললো– 'আমি জানতে পেরেছি এসব ভাগোড়ারাও আমাদের সিপাহীদেরকে তেমনি বানোয়াট কাহিনী শুনাচ্ছে।'

ঃ 'আমার হুকুম সবাইকে জানিয়ে দাও'– জালিয়ুনুস বললো- 'আমাদের ফৌজের কেউ যেন সিকাতিয়ার পলাতক কোন সিপাহীকে তার তাঁবুতে ঢুকতে না দেয় এবং কেউ যেন তাদের পাশে বসে তাদের কথাও না শোনে। ফৌজী কোন অফিসারকেও যেন খাতির করা না হয়। তাদেরকে আলাদা রাখা হবে। আর আমাদের সমস্ত ফৌজকে কাতারবন্দি করে দাঁড় করাও। আমি আসছি।'

ঃ 'ইসলাম ও আরবভূমির স্বাধীনতার মুহাফিজরা'! সিকাতিয়ায় সিপাহসালার আবু উবাইদ মুজাহিদদের উদ্দেশে বলছিলেন– 'তোমরা যা করো মহান আল্লাহ তা সর্বদাই দেখছেন। সত্যের পথে তোমরা জিহাদের জন্য ঘর থেকে বের হয়েছো। এটা আল্লাহর নির্দেশ। যা তোমরা পালন করছো। এর বিনিময় আল্লাহ তোমাদেরকে অবশ্যই দেবেন। আল্লাহর বিনিময় দেখে নাও। আল্লাহর দীনকে অস্বীকারকারীদের লাশগুলো দেখে নাও। তাদের মৃত্যুপথযাত্রী ছটফটে যখমীদের দেখে নাও। তোমাদের চেয়ে এরা সংখ্যায় তিনগুণ বেশি ছিলো। তাদের ওপর আল্লাহ তোমাদেরকে বিজয় ও নুসরত দান করেছেন। এটা তোমাদের পুরস্কার, যা তোমরা দুনিয়ায় পেয়েছো, আর আখিরাতে যে পুরস্কার পাবে তা হবে অফুরন্ত....

ঃ 'তোমাদের আজকের দিনটা ছিলো আরামের। এটা তোমাদের প্রাপ্য ছিলো। কিন্তু এই অগ্নিপূজারীদের এক সৈন্যবাহিনী এখান থেকে এক রাতের দূরত্বে ছাউনি ফেলেছে। এই বাহিনী এদের সাহায্যের জন্য আসছিলো, যাদের কেউ এখানে জীবিত উপস্থিত নেই। যারা জীবিত তারা পালিয়ে গিয়ে ঐই বাহিনীতে যোগ দিচ্ছে। তোমরা ক্লান্ত! তারা তাজাদম। এজন্যই আমরা তাদের অজান্তে হামলা করতে চাই। নিজেদেরকে রূহানী শক্তিতে জাগ্রত করো। আল্লাহর দরবারে নিজেদের বিনীত আর্জি পেশ করো। অনারবীদের বুঝিয়ে দাও আরবীরা আল্লাহর মাহবুব-প্রিয়পাত্র এবং আরবীদেরকে মহান আল্লাহ রিসালতের অনন্য নেয়ামতও দান করেছেন।'

ঃ ' আর যারা সিকাতিয়া থেকে পালিয়ে এসেছে তাদের কথায় কান দেবে না'– জালিয়ুনুস তার ফৌজকে বলছিলো– 'আরবের এসব বুদ্ধুদের ভয় পেয়ো না। এই ভাগোড়ারা তোমাদেরকে এই মন্ত্রণা দিচ্ছে যে, এরা সব বীরের দল। কিন্তু মনে রেখো মুসলমানদের হাতে তখন কোন জাদু ছিলো না, যা তাদের বিপক্ষের এই ফৌজদের শক্তি ছিনিয়ে নিয়েছিলো। ভাগোড়াদের আমি আলাদা দাঁড় করিয়ে রেখেছি। এরা যরথ্রুষ্টের পাপিষ্ট বান্দা। সালতানাতে ফারিসের গাদ্দার এরা। তাদের চেহারা দেখো কেমন অশুভ .... মুসলমানরা তাদের ধর্মকে সত্য বলে দাবী করে। তোমরা এদেরকে পরাজিত করে বুঝিয়ে দাও তোমাদের ধর্মই সত্য ধর্ম। তাদের নাম-নিশানা মিটিয়ে চিরতরে তাদের ধর্ম খতম করে দাও। তারপর আরব ভূখণ্ড সালতানাতে ফারিসের অন্তর্ভুক্ত হবে। তোমরা ভুলে যেয়ো না রোমের বিশাল ফৌজীশক্তিকে ঘোড়ার খুরের তলায় পিষ্ট করেছিলে। রোমের শ্রেষ্ঠ বাহাদুর হেরাক্লিয়াসকেও তো তোমরা পরাজিত করেছো যাকে রণাঙ্গনের দেবতা বলা হতো'.....

'আজ রাতে তোমাদের হুশিয়ার থাকতে হবে। ছাউনির আশে পাশে আরো অধিক পরিমাণ পাহারাদার বসাতে হবে। বিজয়ের নেশায় মুসলমানরা হয়তো রাতে চোরাগুপ্তা হামলা চালাতে পারে। তারা এলে কেউ যাতে জীবিত ফিরে যেতে না পারে। ছাউনির বাইরেই তাদেরকে ঘিরে তাদের দেহগুলো স্রেফ কিমা বানিয়ে ছাড়বে। সিকাতিয়া থেকে এদিকে আসার পথে আমি গুপ্তঘাতকের ব্যবস্থা করছি।'

জালিয়ুনুস তার ফৌজকে গরম বক্তৃতায় উত্তেজিত করে জাগিয়ে তুললো এবং সিকাতিয়া থেকে পলাতকদেরকে আসামীর মতো করে আলাদা করে রাখলো। যাতে কারো সঙ্গে তারা কথাও বলতে না পারে।

আবু উবাইদের সৈন্যবাহিনী ততক্ষণে কোচ করেছে। মুজাহিদরা ছিলো তখন মাত্র নয় হাজারেরও কম। কিছু শহীদ হয়েছিলো, অনেকে আহত হয়েছিলো। এজন্য কয়েকশ সৈন্য পেছনে ছেড়ে আসতে হয়েছে। মুজাহিদরা তখন ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ছিলো। এর একদিন আগেও তারা লম্বা সফর করেছে। রাত জেগেছে, পরদিন আবার প্রচণ্ড লড়াইয়ে যুদ্ধ করতে হয়েছে। এর পরপরই বারসিমার দিকে কোচ করার হুকুম দেয়া হলো। ঘোড়াগুলোও ছিলো ভীষণ ক্লান্ত। আবু উবাইদ সওয়ার মুজাহিদদেরকে বলে দিয়ে ছিলেন, তারা যেন পদাতিক মুজাহিদদেরকেও মাঝেমধ্যে সওয়ার হওয়ার সুযোগ দেয়। যাতে সারা সফর তাদের পায়ে হেঁটে না করতে হয়। এছাড়াও পদাতিক অনেক মুজাহিদ পারসিকদের ঘোড়া পেয়ে গিয়েছিলো।

❖ ❖ ❖

জালিয়ুনুস তার ফৌজকে রাতভর জাগিয়ে রাখে। তাদের ছাউনির কিছু দূরে যেখানে মাটির কিছু টিলা ও বড় বড় গুহা ছিলো– সেখানে দুটি গুপ্তঘাতক দল মোতায়েন করা হয়। কিন্তু রাতটা কোন হাঙ্গামা ছাড়াই পার হয়ে গেলো।

আবু উবাইদ তাঁর বিচক্ষণ সালার মুসান্না ও সালীত (রা) থেকে পরামর্শ নিয়েই সব রকম ফয়সালা করতেন এবং তাদের পরামর্শ খুবই ফলপ্রসূ হতো। বারসিমার দিকে মুজাহিদদের কোচ ছিলো বৈচিত্র্যপূর্ণ বিন্যাসে। বারসিমার কাছে এসে সৈন্যবাহিনীকে যুদ্ধের বিন্যাসে সাজানোর পরও ফৌজের সারি ছিলো প্রায় মাইল খানেক প্রলম্বিত।

জালিয়ুনুস এক স্থানে দুইশ গুপ্তঘাতক লুকিয়ে রেখেছিলো। তাদের জানা ছিলো না মুজাহিদরা কোন বিন্যাসে আসছে। আচমকা তারা মুসলমানদের নজরে পড়ে গেলো। তারা একেবারেই অপ্রস্তুত ছিলো। পালাতে চেষ্টাও করেছিলো। কিন্তু তারা সওয়ার হওয়ারও সুযোগ পেলো না। মুজাহিদরা তাদেরকে ঘেরাওয়ের মধ্যে ফেলে কাউকেই জীবিত ফিরে যেতে দিলো না। তাদের ঘোড়া ও বর্শাগুলো পদাতিক ফৌজের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হলো।

জালিয়ুনুস আগেই খবর পেয়েছিলো মুসলমানরা প্রায় এসে গেছে। সূর্য তখন কিছুটা পূর্ব আকাশে ছড়িয়ে পড়েছে। জালিয়ুনুস সঙ্গে সঙ্গেই তার ফৌজকে রণসাজে সারিবদ্ধ হওয়ার হুকুম করলো। মুসলমানরা যে ডানে বায়ে ছড়িয়ে মাইলখানেক প্রলম্বিত হয়ে আসছিলো এবং এতে তারা কি কৌশল চিন্তা করে রেখেছিলো সেটা তো জালিয়ুনুসের জানবার কথা নয়।

তবে মুসলমানরা ক্লান্ত-শ্রান্ত বলে জালিয়ুনুস তাদের মধ্যবাহিনীর ওপর হামলা করবে বলে ভেবে রেখেছিলো। আবু উবাইদ ফৌজের এই অংশেই ছিলেন। মুসলমানদের ঝান্ডা তাঁর হাতেই ছিলো। আবু উবাইদ তিনবার 'আল্লাহু আকবার' 'আল্লাহু আকবার' নারা লাগালেন। সঙ্গে সঙ্গেই মুসলমানরা হামলার জন্য তৈরী হয়ে গেলো।

'আজ এই আরবদের মরণ অনারবদের হাতে'– জালিয়ুনুসের শ্লোগান ছিলো এটা।

পারসিকরা তাজাদম ছিলো। তারা কোন যুদ্ধের ময়দান থেকে নয়-মাদায়েন থেকে প্রচুর বিশ্রামের পর এসেছিলো। গত রাতে জালিয়ুনুসের হুকুমে বারসিমার আশে পাশের গ্রামগুলো থেকে তার সৈন্যরা জোর করে ভেড়া-বকরী ছিনিয়ে এনেছিলো। সেগুলো জবাই করে সৈন্যদের জন্য বিরাট ভোজ-উৎসবের ব্যবস্থা করা হয়। তাদেরকে আরো বেশি খুশী করার জন্য শরাবও বন্টন করা হয়েছিলো তাদের মধ্যে।

ঃ 'আর এই লড়াইয়ে আরবদের অনেক মূল্য দিতে হবে'– জালিয়ুনুস তার ফৌজকে বলছিলো- 'তোমরা তো এবার বিশাল সম্পদের মালিক হয়ে যাবে। এরা প্রতিটি শহর থেকেই কাড়ি কাড়ি সোনা গয়না এনেছে। এসব তাদের সঙ্গেই আছে। সবই তোমাদের। শাহীমহলে এখান থেকে কিছুই যাবে না।'

পারসিকদের হামলা এতো প্রচণ্ড ছিলো যে, আবু উবাইদের মধ্যবাহিনী তাদের সামনে জমে দাঁড়াতে পারলো না। কিছু তো হামলার তীব্রতায় আরো অনেকখানি নতুন কৌশলের চিন্তায় পিছু হটতে লাগলো। যাতে ফারসীরা আরো আগে বাড়তে থাকে। মুসলমানরা অত্যন্ত সতর্কভাবে নির্ভীক মনে লড়তে লড়তে পিছু হটছিলো।

কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই জালিয়ুনুস সৈন্যবহরের পিছন দিকে শোরগোল শুনতে পেলো। সেদিকে তাকিয়ে দেখার পর তার হিম্মত টুটে গেলো। মুসলমানদের ওপর পাশ থেকে হামলার জন্য ফৌজের যে দুটি অংশকে পিছনে সংরক্ষিত রাখা হয়েছিলো তাদের ওপর তখন হামলা চলছিলো। তাদের অফিসাররা অসহায়ভাবে এই হামলার দৃশ্য দেখছিলো। পারসিকরা তখন ডান, বাম ও পিছন দিক থেকে হামলার শিকার ছিলো। এতো আচমকা ছিলো এই হামলা যে, তারা বুঝতেই পারেনি হামলাকারীর সংখ্যা এদের চেয়েও অনেক কম। তারা ভাবছিলো হামলাকারীরা সংখ্যায় অনেক বেশি। মাদায়েনে থাকতে তারা নিজেদের ফৌজের প্রতিটি পরাজয়ের খবরই শুনেছিলো, এটাও শুনেছিলো, মুসলমানরা এতোই হিংস্র ও নিষ্ঠুর যে, নিজেদের জানেরও পরোওয়া করে না।

জালিয়ুনুস তখন একেবারেই স্তম্ভিত-দিশেহারা। হামলা যে হবে এটা সে জানতো এবং মুসলমানদের ডান ও বাম ব্যূহের সৈন্যও যে আছে তাও সে জানতো। কিন্তু ক্লান্তিতে নুয়ে পড়া মুসলমানরা যে এমন আচমকা হামলা চালাবে এটা সে কল্পনাও করেনি। লড়াইয়ের যে পরিকল্পনা সে তৈরী করেছিলো পুরোপুরি তা ব্যর্থ হলো। তার পেছনের সৈন্যরা হামলার প্রচণ্ড চাপে ফৌজের মাঝখানে সরে যেতে বাধ্য হলো। শৃংখলা-সৈন্য বিন্যাস পুরোটাই ভেঙে গেলো। নিজেদের ঘোড়ার পায়ের তলায় নিজেরাই পিষ্ট হতে লাগলো। অবশেষে তারা ময়দান ছেড়ে পালাতে লাগলো। জালিয়ুনুসের ঝাণ্ডাও হঠাৎ গায়েব হয়ে গেলো। মুজাহিদরা শ্লোগান দিতে শুরু করলো 'তাদের ঝাণ্ডা পড়ে গেছে' ইত্যাদি বলে। এই শ্লোগান শুনতেই পারসিকরা পালাতে লাগলো ঊর্ধ্বশ্বাসে। মুজাহিদরা তাদেরকে সহজেই ছেড়ে দিলো না, বেছে বেছে মারতে লাগলো।

জালিয়ুনুস দম নিলো মাদায়েন গিয়ে।

জালিয়ুনুসের আগেই ময়দান থেকে কয়েকজন ঘোড় সওয়ার মাদায়েন পৌঁছে গিয়েছিলো। রুস্তম জানতে পেরে সবগুলোকে ডেকে পাঠালো। রুস্তমের অগ্নিশর্মা মূর্তির সামনে এরা রীতিমত কাঁপতে লাগলো। কোনক্রমে তারা লড়াইয়ের বিস্তারিত সব জানালো। রাগে এবার রুস্তমের চেহারা ভয়ংকর আকার ধারণ করলো।

ঃ 'জালিয়ুনুস কোথায়?'– রুস্তমের গর্জন- 'সেকি মারা গেছে?'

ঃ 'এখনো আমরা কিছু জানি না'–একজন বললো– 'শুধু ঝাণ্ডা গায়েব হয়ে যেতে দেখিছি।'

ঃ 'আমি শুধু এখন তার মৃত্যুসংবাদ শুনতে চাচ্ছি, সে জীবিতও যদি থাকে আমিই তাকে মেরে ফেলবো'।

রুস্তম যখন বাইরে গর্জাচ্ছিলো তার মহলে তখন এক বৃদ্ধ পণ্ডিত বসা ছিলো। সবাই জানতো রুস্তম জ্যোতিষ বিদ্যায় পারদর্শী। যে কোন ব্যাপারেই সে ভবিষ্যদ্বাণী করতো। দেরী দেখে বৃদ্ধ পণ্ডিত তাকে ভেতরে আসতে বললো।

ঃ 'ব্যাপার কি রুস্তম?'–বৃদ্ধ জিজ্ঞেস করলো।

ঃ 'মারদানশাহ, জাবান, নারসী, বান্দাবিয়া এবং তীরাবিয়ার পর শেষ পর্যন্ত জালিয়ুনুসও মুসলমানদের কাছে নির্লজ্জভাবে হেরে গেলো।'

ঃ 'আমি শুনেছি তুমি নাকি নক্ষত্র পুঞ্জের চক্র দেখে বলেছিলে, সালতানাতে ফারিসের পরিণাম শুভ হবে না?

ঃ 'হ্যাঁ আমি বলেছিলাম।'

ঃ 'এরপরও তুমি কেন সালতানাতের যিম্মাদারী নিজের মাথায় নিলে?'– বৃদ্ধ জিজ্ঞেস করলো।

ঃ 'নেতৃত্বের লোভ আর হুকুমতের লালসায়!'–রুস্তম জবাব দিলো।

সম্পদ ও জনবলের দিক দিয়ে বারসিমার বিজয় সিকাতিয়ার পর খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিলো। সেখানে প্রভাবশালী ও শক্তিশালী বড় বড় জায়গীরদারও ছিলো। তারা যেকোন সময়ই ফৌজ তৈরী করার ক্ষমতা রাখতো।

পশ্চিমাকাশে ধূসর লালিমা ছড়িয়ে পড়েছিলো। তখনো আঁধার নেমে আসেনি। বারসিমার তিন চারজন স্থানীয় লোক মুজাহিদদের কাছে এসে উপস্থিত হলো। তাদের চোখেমুখে স্পষ্ট ভীতির ছাপ। মুজাহিদদেরকে জানালো- তারা সিপাহসালারের সঙ্গে দেখা করতে চায়। কারণ জিজ্ঞেস করলে জবাব দিলো, তারা ফরিয়াদ নিয়ে এসেছে। আবু উবাইদকে খবর দেয়া হলে তখনই তাদেরকে তাঁর তাবুতে ডেকে পাঠালেন।

ঃ 'ময়দান থেকে ফারিসের পলাতক সিপাহীরা আমাদের ঘরে ঘরে গিয়ে লুকানোর নাম করে আমাদের বাড়িগুলো দখলে নিয়ে বসেছে'– তাদের একজন বললো– 'আশে পাশের গ্রামগুলোতে তারা ছড়িয়ে পড়েছে। প্রথম তো তারা আমাদের ভেড়া-বকরীসহ গৃহপালিত পশুগুলো ছিনিয়ে তাড়িয়ে তাড়িয়ে খেয়েছে। তারপর আমাদের ঘরে এসে নির্দেশ জারী করেছে, খাবার তৈরী করে খাওয়াতে হবে এবং দামী মদও পরিবেশন করতে হবে। আমরা সবই মেনে নিয়েছি। এখন তারা আমাদের ঘরের বউ বেটিদের প্রতি হাত বাড়াতে শুরু করেছে। যেকোন বস্তিতে গিয়ে দেখুন না– কারো ঘরের মেয়েরই ইয্যত এখন আর অবশিষ্ট নেই।'

ঃ 'আর এখানকার যেসব জায়গীরদার ও বাদশাহর দরবারীরা আছে তারা আমাদের বাধ্য করছে আমরা যেন তাদের ফৌজের হাতে আমাদের যুবতী মেয়েদের তুলে দেই'– আরেক ফরিয়াদী বললো।

ঃ 'আল্লাহর কসম! এ অঞ্চলের অধিবাসীদের ইয্যত আমাদেরই ইয্যত'– আবুউবাইদ উত্তেজিত গলায় বললেন-'যেখানেই ইসলামের ছায়া পৌছে গেছে সেখানকার সৎ অসৎদের যিম্মাদার মুসলমানরা। আমরা কিছু দেয়ার জন্য এসেছি নেয়ার জন্য আসিনি। আমরা এমন হলে তোমাদের পলাতক ফৌজের আগেই তোমাদের ঘরে পৌছে যেতাম। তারা যা করছে আমরাও তাই করতাম। তোমরা যাও আমরা আসছি-'।

ঃ 'দু'জন রঈসের নাম বলে যাই আমরা'– এক ফরিয়াদী বললো–'একজন হলো ফরখ-বারসিমায় সে বাদশাহর মতোই থাকে। আরেকজন ফারাওয়ান্দাদ– সে এখান থেকে সামান্য দূরের বসতি যাদাবীতে থাকে। এরা দু'জনই শাহীখান্দানের পোষ্য চাটুকার।'

আবু উবাইদ মুসান্না ও সুলায়মান ইবনে কায়েসকে ডেকে পাঠালেন।

ঃ 'আমি এখানেই থাকবো'– আবু উবাইদ তার দুই সালারকে বললেন–'মালে গনীমতের বন্টনসহ অন্যান্য কাজগুলো আমিই সেরে নিচ্ছি। তোমাদের যতজন সিপাহীর প্রয়োজন নিয়ে যাও এবং দূরদূরান্তের বসতিগুলো থেকে ফারসী ভাগোড়াদের সাফ করে দাও। নিজেদের অমায়িক ব্যবহারে তাদেরকে জানিয়ে দাও, মানবতার মর্যাদা দান ইসলামের মৌলিক নীতির একটি। হয়তো এরা তাওহীদ ও রিসালতের সত্যকে মেনে নেবে।'

মুসান্না ইবনে হারিসা তার দল নিয়ে বারসিমার বসতি ও গ্রামগুলো ঘিরে ফেললেন। চারদিকে ঘোষণা করে দিলেন ফারিসের ফৌজরা যেন বাইরে বের হয়ে আসে। লুকানো কাউকে পাওয়া গেলে সেখানেই তাকে হত্যা করা হবে। লোকদের ঘর থেকে তারা যা কিছু নিয়েছে তাদের ঘরেই যেন সেগুলো ফিরিয়ে দেয়। আরো ঘোষণা করা হলো- যে ঘরে ফৌজরা লুকিয়ে থাকবে সে ঘরের কর্তারা যেন বাইরে এসে সহযোগিতা করে।

ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই কয়েকজন ফৌজ বাইরে বেরিয়ে এলো। তাদের পিছন পিছন মধ্যবয়স্ক এক লোক দৌড়াতে দৌড়াতে এসে এক ফৌজের দিকে ইশারা করলো–

ঃ 'এই বেটা আমার নিষ্পাপ মেয়েটির ইয্যত লুটে নিয়েছে'– মুসান্নার সামনে এসে লোকটি ফরিয়াদ জানালো– 'আর সে আমাকে কতলেরও হুমকি দিচ্ছিলো।'

মুসান্নার হুকুমে সৈন্যটিকে আলাদা আরেক জায়গায় দাঁড় করানো হলো।

অল্প সময়ের মধ্যেই আরো কয়েকজন সৈন্য বের হয়ে এলো। তাদের মধ্যেও একজনকে আরেক মেয়ের ইয্যতহানির জন্য অভিযুক্ত করা হলো। তাকেও আলাদা করা হলো।

বারসিমার জায়গীরদার ফরখও বের হয়ে এলো এবং মুসান্নাকে অভিভাদন জানিয়ে তার পরিচয় জানালো।

ঃ 'আপনার সমীপে আমি দরখাস্ত করছি এবারের মতো এদেরকে মাফ করে দিন'– ফরখ বললো- 'এবং তাদেরকে মাদায়েন যেতে দিন'।

ঃ 'আরবদেরকে কি তুমি এতই মূর্খ ভেবেছো'? – মুসান্না বললেন– 'আমি কি বুঝিনি তুমি এদেরকে ছাড়িয়ে নিয়ে মালিকায়ে ফারেস ও তার সিপাহসালারকে খুশী করতে চাচ্ছো?– এখনো তুমি নিজেকে মালিকায়ে ফারিসের প্রজা মনে করছো? এই এলাকা এখন সালতানাতে ফারেস থেকে বের হয়ে গেছে। তুমি যদি এসব ঘৃণ্য অপরাধীগুলোকে সহযোগিতা করো তোমাকেও নির্দ্বিধায় হত্যা করা হবে। এই কাপুরুষ ভাগোড়ারা এসব নিরপরাধ লোকদের ঘরবাড়ি ও তাদের মেয়েদের ইযযত লুট করে বেড়াচ্ছে আর তুমি তাদের হয়ে তোষামোদি করছো?'

ঃ 'মহামান্য সালার! এটা আমার ভুল ছিলো'– ফরখ মুসান্নাকে হাবভাব সুবিধার না দেখে বললো– 'এই এলাকা যে আপনাদের রাজত্বে এখন চলে এসেছে এটা আসলে আমি বুঝতে পারিনি।'

ঃ 'আরে আমাদের রাজত্বে নয়-আমাদের রাজত্ব কিসের?'– মুসান্না বললেন– 'রাজত্ব তো একমাত্র আল্লাহরই। আল্লাহর রাজত্বে কোন মানুষ কোন মানুষের ওপর জুলুম করতে পারে না। আমরা মানুষের অধিকার ফিরিয়ে দিতে এসেছি। তাদের প্রতি সুবিচার করতে এসেছি। আমাকে বলা হয়েছে এই এলাকায় নাকি তুমি বাদশাহ বনে গেছো! যাও ফৌজরা যেখানে যেখানে লুকিয়ে আছে বের করে নিয়ে আসো আর লুট করা জিনিসগুলো ওদেরকে ফিরিয়ে দিতে বলো।'

ফরখ দৌড়ে চলে গেলো। কিছুক্ষণ পর আরো কয়েকজন সিপাহীকে ধরে নিয়ে আসলো। তাদের মধ্যে কয়েকজন জালিয়ুনুসের ফৌজের অফিসারও ছিলো। গ্রামবাসীদের ঘর থেকে তারা যা উঠিয়ে নিয়েছিলো মুসান্নার সামনে এনে সেগুলো রাখলো। বসতির লোকদের ডেকে তাদের জিনিসগুলো দেখে শুনে নিয়ে যেতে বলা হলো।

তারপর লোকদেরকে সেসব সিপাহীদেরকে শনাক্ত করতে বলা হলো যারা তাদের সম্ভ্রম নষ্ট করেছে। লোকেরা উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সিপাহীকেই এ জঘন্য কীর্তির জন্য শনাক্ত করলো।

মুসান্না তাদের একজনকে ধাক্কা দিয়ে উপুড় করে ফেলে দিলেন এবং তার মাথাটি নত করতে বললেন।

ঃ 'সে যার সম্ভ্রম লুটেছে সে যেন এখানে চলে আসে'– মুসান্না ভীড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা লোকদের উদ্দেশে বললেন।

কিছুক্ষণ পর নৌজোয়ান একটি মেয়ে তার পিতার হাত ধরে এগিয়ে এলো।

মুসান্না তার তরবারি কোষমুক্ত করে মেয়েটির হাতে দিয়ে বললেন– 'তার গর্দান উড়িয়ে দিয়ে তোমার ইয্যত হানির প্রতিশোধ নাও।'

মেয়েটির বয়স বড় জোর ষোল বছর ছিলো। লজ্জা আর ঘৃণার তীব্রতায় সুন্দর কচি মুখটি তখন রক্তিম বর্ণ ধারণ করেছিলো। তরবারিটি সে হাতে নিয়ে সিপাহটির গর্দানে রাখলো এবং উভয় হাতে তরবারিটি মাথার ওপর উঠালো। এভাবেই বেশ কিছুক্ষণ ধরে থাকলো। হঠাৎ করেই যেন তার হাত দুটি কাঁপতে শুরু করলো। অবশেষে তরবারিটি কোনক্রমে নামিয়ে মাথা নিচু করে মুসান্নার দিকে বাড়িয়ে ধরলো। তারপর ফুঁপাতে লাগলো। বিশ বাইশ বছরের এক টগবগে যুবক তখন মুজাহিদদের ভেতর থেকে দৌড়ে এলো। নাম তার সুহায়েব সাকাফী। অসাধারণ বীরত্বের জন্য মুজাহিদদের মধ্যে তার দারুণ খ্যাতি ছিলো। সিপাহসালার আবু উবাইদের গোত্র সাকীফেরই একজন ছিলো সে।

ঃ 'আমিই তার পক্ষ থেকে প্রতিশোধ নেবো'– উত্তেজিত গলায় সে বললো এবং পলকেই তার তরবারি কোষমুক্ত করে সিপাহটির ধর তার দেহ থেকে আলাদা করে ফেললো। তারপর হঠাৎই মেয়েটির মাথায় হাত রেখে বললো–'আমি তোমার ইযযতের মুহাফিজ হলাম।'

সুহায়েব যেমন ঝড়ের মতো এসেছিলো তেমনি ঝড়ের মতো তার জায়গায় মুজাহিদদের জটলার মধ্যে গিয়ে দাঁড়ালো। কিন্তু মেয়েটি সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলো। আর হয়রান হয়ে সুহায়েবের দিকে বারবার তাকাতে লাগলো। মেয়েটির এই চঞ্চল দৃষ্টি কেউ লক্ষ্য করলো না তখন।

মুসান্নার হুকুমে বাকীদেরও এভাবেই মৃত্যুদণ্ড দেয়া হলো। কোন মাজলুমা মেয়ে তার জালিম সিপাহীকে নিজ হাতে হত্যা করলো। আর কাউকে কোন মুজাহিদ এসে মস্তক দ্বিখণ্ডিত করলো। আর অন্যান্য ফারসী সৈনিকদের যুদ্ধবন্দি করা হলো।

ঃ 'আমি আপনাদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করছি'– ফারাখ অনুতপ্ত কণ্ঠে বললো।

ওদিকে যাদাবী গ্রামের দৃশ্যও প্রায় এমনই ছিলো। মুজাহিদদের একটি দল নিয়ে সেখানে গিয়েছিলেন সালার সালীত ইবনে কায়েস (রা)। সেখানকার জায়গীরদার ছিলো ফারাওয়ান্দাদ। ফারাখের চেয়েও সে শক্তিশালী ছিলো বেশি। সে জট পাকিয়ে ঝামেলা বাধাবার চেষ্টা করেছিলো। কিন্তু গ্রামের কেউ তার সঙ্গী হতে রাজী হয়নি। তাকে ধরে সালীত (রা) এর সামনে এনে দাঁড় করানো হলো।

ঃ 'তুমি কি তোমাদের সিংহদিল বীর সালারদের পরিণতির কথা শোননি?'– সালীত (রা) তাকে বললেন-'জালিয়ুনুসের চেয়েও কি বীর শ্রেষ্ঠ আর- খুনে সালার তোমাদের ফৌজে ছিলো? কোথায় এখন তোমাদের গর্ব- তোমাদের জালিয়ুনুস? আমাদের হাতে সে এমন মার খেয়েছে যে, তার পালানোর দৃশ্যটাও আমরা দেখতে পায়নি। তুমি কি জালিয়ুনুসের চেয়েও বড় বাহাদুর?'

ঃ 'আমার বসতির লোকেরা আমাকে ধোঁকা দিয়েছে?'– ফারাওয়ান্দাদ বললো- 'এরা যদি আমার সঙ্গে থাকতো আমি ঠিকই মোকাবেলা করতাম।'

ঃ 'এখন আর কেউ তোমার সঙ্গে থাকবে না'– বসতির একজন উঁচু আওয়াজে বললো– 'তোমার সাধের বাদশাহী খতম হয়ে গেছে।'

এটা যেন বসতির সবার মনের কথা ছিলো। সবাই এই আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গেই এক রোল তুললো। তাদের কাছ থেকে জানা গেলো জালিয়ুনুসের পলাতক সৈন্যদের ফারাওয়ান্দাদই এই বসতিতে আশ্রয় দেয়। আর লোকদেরকে হুকুম দেয় তারা যেন এদেরকে নিজেদের ঘরে পরম যত্নে স্থান করে দেয়। ফলে সিপাহীরা এখানেও লোকদেরকে অনেক জ্বালাতন করেছে, মেয়েদের ইয্যত লুটেছে এবং লুটপাটও করেছে।

সালীত ইবনে কায়েস (রা) ফৌজের সতের আঠারজনের গর্দান তুলে নেন। অন্যদেরকে বন্দি করেন। অবশেষে অবস্থা বেগতিক দেখে ফারাওয়ান্দাদও বশ্যতা স্বীকার করে নেয়।

মুসান্না ইবনে হারিসা ও সালীত ইবনে কায়েস (রা) অনেক দূর পর্যন্ত ঝটিকা অভিযান চালিয়ে লুকিয়ে থাকা জালিয়ুনুসর ফৌজদের পাকড়াও করেন। যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে যাওয়া এসব সৈন্যরা এই ভয়ে মাদায়েন যাচ্ছিলো না যে, তাদের প্রধান সেনাপতি রুস্তম তাদেরকে মৃত্যুর সাজা দেবে।

ছোট ছোট এসব অভিযানের কারণে আশে পাশের বিস্তীর্ণ এলাকার জায়গীরদার ও রঈসরা নিশ্চিন্ত হয়ে গিয়েছিলো যে, তাদের এলাকাগুলো সালতানাতে ফারিসের কব্জা থেকে মুসলমানদের কব্জায় এসে গেছে। তারা এটাও দেখেছিলো, মুসলমানরা তোষোমোদ ও বাদশাহী পছন্দ করে না। তারা মানুষের ইয্যত লুটার চেয়ে হেফাজত করতেই অধিক পছন্দ করে। এতে তারা এতই প্রভাবান্বিত হয় যে, আবু উবায়দা ও তার সালারদেরকে সব ধরনের সহযোগিতার নিশ্চয়তা দেয়।

আবু উবাইদ বারসিমাতেই ছিলেন তখনো। একদিন ফারাখ ও ফারাওয়ান্দাদ হরেকরকমের শাহী খাবারের বেশ কয়েকটি রেকাবি নিয়ে হাজির হয়।

আবু উবাইদ এসব শাহী খাবারের দিকে একবার তাকিয়ে তার সালারদের দিকে তাকালেন। 'এই খাবার কি আমার পুরো বাহিনীর জন্য যথেষ্ট হবে?' –আবু উবাইদ জিজ্ঞেস করলেন।

ঃ 'না'-এক জায়গীরদার বললো- 'এগুলো শুধু আপনার ও আপনার সালারদের জন্য'– সে হাসতে হাসতে বললো-'সাধারণ সিপাহীদেরকে এমন খাবার কেই বা খাওয়ায়?'

'তাহলে এগুলো নিয়ে যাও'– আবু উবাইদ বললেন- 'আমাদের সালাররা তাই খায় যা সিপাহীরা খেয়ে থাকে। এরা আমাদের সিপাহী নয়- আল্লাহর সিপাহী। পুরো ফৌজকে যদি তোমরা এমন খাবার দিতে পারো তবেই আমরা এই খাবার গ্রহণ করতে পারবো।'

খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তারা পুরো ফৌজের জন্য এ ধরনের খাবার তৈরী করে নিয়ে আসে। সালাররা তখন সাধারণ সিপাহীদের সঙ্গে যমীনে বসে খাবার গ্রহণ করেন।

মুজাহিদরা যে মালেগনীমত যে পায় এর সঙ্গে সেই এলাকার অত্যন্ত উন্নত জাতের ও দুর্লভ স্বাদের খেজুরও পায়। মালেগনীমতের এক পঞ্চমাংশ যখন মদীনায় পাঠানো হয় তখন হযরত উমর (রা)-এর জন্যও এই খেজুর পাঠানো হয়। এসব খেজুর কেবল পারস্যের শাহী খান্দানের লোকেরা ও জেনারেলরা খেতো। সাধারণ জনগণের ভাগ্যে এসব জুটতো না। আবু উবাইদ এসব খেজুর তার ফৌজের মধ্যে বন্টন না করে এলাকার গরীব-কৃষকদের মধ্যে বন্টন করেন এবং হুকুম জারী করে দেন, এখন থেকে এই খেজুর আমীর ফকীর নির্বিশেষে সবাই খেতে পারবে।

মদীনায় চলছিলো এই বিজয়ের জন্য উৎসব-আনন্দ। আর মাদায়েনে ছড়িয়ে পড়েছিলো এই পরাজয়ের লজ্জা আর গ্লানির হতাশা।

কিন্তু রুস্তম বসে থাকার পাত্র ছিলো না। মুসলমানদের বিরুদ্ধে ভয়ংকর এক যুদ্ধের নীলনকশা তৈরী করতে লাগলো।

'আর মনে রেখো এখন যদি আবার তোমরা রণাঙ্গনে পিষ্ঠ প্রদর্শন করো তবে আমার সামনে আর আসবে না। নিজেদের তরবারিতেই নিজেদের পেট-পিঠ এ ফোঁড় ও ফোঁড় করে দেবে। অন্যথায় আমার তরবারি তোমাদের গর্দান পর্যন্ত পৌঁছে যাবে।'

রুস্তম নতুন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করতে লাগলো তার ফৌজকে। কিন্তু তার চালচলন হাবভাব দেখে সন্দেহ হতো সে বুঝি ভেতর ভেতর উন্মাদ বনে যাচ্ছে। রাগে-ক্রোধে গর্জন করতে করতে আচমকা সে নীরব হয়ে যেতো। কেমন নিঃশব্দ আর ঘোরের মধ্যে ডুবে যেতো। জালিয়ুনুস তখনো তার সামনে আসেনি। সিকাতিয়ায় পরাজয়ের কথা শুনেই তার এই ভয়ংকর অবস্থা হয়েছিলো।

ঃ 'যরথুষ্টের কসম'!– সে বললো–'সালতানাতে ফারিসের তো এমন পরিণাম হওয়ার কথা ছিলো না'– সে নিজের সঙ্গেই চাপাকণ্ঠে এসব বলতো-'এগুলো কি হচ্ছে? হায়!-- পরাজয়-- প্রতিটি ময়দানেই পরাজয় আমাদের মধ্যে কি কোন বিশ্বাসঘাতক আছে? মুসলমানরা কি রোমকদের চেয়েও শক্তিশালী? না - না- তা কেন হবে? তারা তো সংখ্যায় অতি নগণ্য।'

রুস্তম নতমস্তকে দু'হাত বেঁধে কামরায় পা টেনে টেনে এমন অপরাধীর মতো পাক খাচ্ছিলো যেন সে সিকাতিয়া থেকে মার খেয়ে এসেছে।

ঃ 'রুস্তম'!-মালিকায়ে ফারিস পুরানের শব্দ শুনতে পেলো সে 'তুমি কি মন থেকে বলছো, সালতানাতে ফারিসের পরিণাম এমনই হতে থাকবে?'

ঃ 'উহ!'– রুস্তম চমকে উঠলো– 'মালিকায়ে ফারিস! জানতাম না আপনি'।

ঃ 'মালিকায়ে ফারিস নয় রুস্তম!'– পুরান বললো- 'পুরান বলো। কয়েকবারই বলেছি আমাকে মালিকায়ে ফারিস বলবে না। আর শোন রুস্তম এখন প্রায়ই দেখছি পরাজয়ের খবর শুনে তোমার মনোবল ও মানসিক অবস্থা বিগড়ে যাচ্ছে। কিছু সময়ের জন্য হলেও এই পরাজয়ের কথা মন থেকে বের করে দাও। মাথা থেকে এই বোঝা সরিয়ে ফেলো। রাগ আর ক্ষোভ নিয়ে কোন চিন্তা করো না। আমার কাছে এসে বসো। এখনই আমাকে তোমার প্রয়োজন।'

রুস্তম পুরানের দিকে এমন ফ্যালফ্যাল চোখে তাকিয়ে থাকলো যেন ভয় পাওয়া শিশুটি তার মার দিকে তাকিয়ে আছে। পুরানের হাতে ছিলো শরাব ভর্তি মস্তবড় এক পেয়ালা। রুস্তম তার দিকে এমন ঘোরলাগা পায়ে এগিয়ে গেলো যেন পুরান তাকে জাদু করেছে। পুরান পেয়ালাটি দু'হাতে রুস্তমের দিকে বাড়িয়ে ধরলো। রুস্তম যেন এর জন্যই কতকাল অপেক্ষায় ছিলো। রুস্তম পেয়ালাটি পুরানের হাত থেকে প্রায় ছিনিয়ে নিলো। তারপর দু'তিন চুমুকই পেয়ালা খতম করে টেবিলে নামিয়ে রাখলো।

পুরান চেয়ার থেকে উঠে গিয়ে খাটের ওপর গিয়ে একেবারে রুস্তমের ঘা ঘেঁষে বসলো এবং রুস্তমকে তার দু'হাতে জড়িয়ে ধরলো। রুস্তমও পুরানকে তার বুকে উঠিয়ে নিলো। তারপর দু'জনেই যেন মরুর তপ্ত বালিয়াড়ি পাড়ি দেয়ার পর সুদূর ঝর্ণার জলে হারিয়ে গেলো।

পারস্য বিখ্যাত ছিলো তিনটি জিনিসের জন্য– নারীর রূপ-যৌবন, স্বপ্ন ছোঁয়া মদ ও রণশক্তি। রণাঙ্গনের এক চেটিয়া শক্তির অধিকারী ছিলো তারা জঙ্গী হাতির কারণে। কিন্তু এখন আর রণশক্তির সেই হুংকার তাদের মধ্যে নেই। শুধু যৌবনবতী নারীর রূপ-সৌন্দর্য আর মদই ছিলো তাদের শেষ সান্ত্বনার বিষয়। মুসলমানরা তাদের যুদ্ধশক্তির দম্ভকে গুড়িয়ে দিয়েছিলো।

যে রুস্তমের নাম শোনার সঙ্গে সঙ্গে দুশমনের পশম দাঁড়িয়ে যেতো সেই রুস্তমের শেষ আশ্রয় হলো এক নারীর রূপ-মাধুর্যে আর শরাবের পেয়ালায়। সে যে ভয়ে চুপসে গিয়েছিলো এমন নয়। পরাজয় মেনে নেয়ার পাত্র ছিলো না সে। তার ফৌজের এই পরাজয়কে বিজয়ে রূপান্তরের যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা সে নিয়েছিলো তাও টলে যায়নি। সে অঙ্গীকার করেছিলো, পারস্যের কোথাও একজন মুসলমানেরও স্থান হবে না। সে বলতো, আমি শুধু পারস্যের এই ভূ-খণ্ডে সেই মুসলমানের অস্তিত্বই মেনে নেবো যে মৃত, যে পারসিকদের তরবারি ও বর্শার আঘাতে দ্বিখণ্ডিত থাকবে।

পুরান তার দীর্ঘদিনের লালিত রূপ আর কুমারী দেহ রুস্তমের কাছে এজন্যই সোপর্দ করেছিলো যাতে পারস্যের এই কিংবদন্তী তুল্য জেনারেল পরাজয়ের সব গ্লানি ভুলে গিয়ে পারস্যের ভূলুণ্ঠিত লাগাম সে আবার নিজ হাতে তুলে নিতে পারে এবং ধ্বংসের হাত থেকে পারস্যকে বাঁচায়।

ঃ 'পুরান!'– রুস্তম পুরানের বুকে মাথা রেখে বললো– 'আরবের ঐ বুদ্ধুদের থেকে আমি ভয়ংকর প্রতিশোধ নেবো'- থেমে থেমে চিবিয়ে চিবিয়ে রুস্তম বলছিলো- 'কিন্তু আমি এটা বুঝতে গিয়ে হয়রান হচ্ছি, মুসলমানদের মধ্যে এমন কি শক্তি আছে যা আমাদের মেধ্যেই নেই?'

ঃ 'শুনেছি তারা শরাব পান করে না'– পুরান বললো।

ঃ 'তারা মূর্খ আর গোয়ার'– রুস্তম বিদ্রূপের সুরে বললো– 'শরাব তো আমাদের মতো অভিজাত শাহেনশাহরাই পান করে।'

'আরো শুনেছি'– পুরান বললো– 'কোন শহর বা বসতি তারা জয় করার পর সেখানকার মেয়েরা যতই সুন্দরী আর কমনীয়ই হোক না কেন তাদের দিকে চোখ তুলে পর্যন্ত এরা তাকায় না।'

'আরে তারা তো মরুর বেদুইন, জানোয়ার'– রুস্তম বললো– 'সুন্দরের পূজা তো আমাদের মতো শাহী কওমই করতে পারে'–কথা বলতে বলতে সে এক লাফে উঠে বসলো এবং বললো- 'আমাকে বলা হয়েছে আমাদের বারসিমার জায়গীরদার ফারাখ ও ফারাওয়ান্দাদ মুসলিম বাহিনীকে শাহী খাবার খাইয়েছে। এরাই সেসব গাদ্দার যারা সালতানাতে ফারিসের বুনিয়াদকে ধ্বংস করেছে। মুসলমানদেরকে নয় আমাদের এসব জায়গীরদারদের সুন্দরী মেয়ে আর রূপসী বধূদেরকে আমার ক্ষুধার্থ সৈন্যদের হাতে তুলে দেবো।'

ঃ 'লড়াইয়ে তুমি এখনো হাতি কেন ব্যবহার করছো না'?–পুরান জিজ্ঞেস করলো।

ঃ 'যেকোন যুদ্ধেই হাতি ব্যবহার করা যায় না। যদি প্রত্যেক লড়াইয়ে আমরা হাতি পাঠাতাম, আমাদের কাছে একটি হাতিও অবশিষ্ট থাকতো না। প্রত্যেক লড়াইতেই কিছু কিছু হাতি মারা যেতো বা যখমী হতো। হাতি দিয়ে যুদ্ধ করার সময় এখন এসেছে। হাতি চূড়ান্ত কোন লড়াইয়ে ব্যবহার করা হয়......হিন্দুস্তানের এই হাতিগুলো মুসলমানদেরকে পিষে ফেলবে। আচ্ছা জালিয়ুনুস এখনো আসেনি।?'

ঃ 'সে তোমার সামনে আসতে ভয় পাচ্ছে'–পুরান বললো– 'সে আসলে ভীষণ লজ্জিত।'

ঃ 'আমি তো তাকে শাস্তি দেবো না, তাকে আমি শুধু জিজ্ঞেস করতে চাই ঐ আরবদের মধ্যে সে এমন আহমরি কি দেখেছে যার মোকাবেলা সে করতে পারেনি।'

অহংকার, দাম্ভিকতা, অহমিকা, লোভ যত ধরনের নেতিবাচক গুণ থাকতে পারে সবই রুস্তমের মধ্যে প্রবলভাবে ছিলো। মুসলমানদের কাছে এতগুলো পরাজয়ের পরও তার অহমিকায় কোন ভাটা পড়েনি। তবে তার মাথায় এই প্রশ্নটা একেবারে বদ্ধমূল হয়েগিয়েছিলো যে, মুসলমানদের মধ্যে এমন কি শক্তি আছে যার দ্বারা এতো সামান্য সৈন্যবল ও মামুলি হাতিয়ার নিয়ে বিশ্বের পরাশক্তি পারসিকদেরকে এভাবে পরাস্ত করে চলছে।

এই চিন্তায় সে মগ্ন ছিলো। এমন সময় তাকে জানানো হলো বয়োবৃদ্ধ এক পণ্ডিত তার সাক্ষাতে এসেছে। নাম তার শামুয। রুস্তমের মনে পড়লো এই সেই শামুয- বয়োবৃদ্ধ পণ্ডিত, কয়েক দিন আগেও তাকে জিজ্ঞেস করে ছিলো- জ্যোতিষ বিদ্যার মাধ্যমে সে যখন জানতে পেরেছে সালতানাতে ফারেসের ধস নামা শুরু হয়ে গেছে। কেউ তা রোধ করতে পারবে না। তারপর ও সে এর যিম্মাদারী কেন তার মাথায় নিলো?

রুস্তম জবাব দিয়েছিলো-' নেতৃত্বের লোভ আর হুকুমের লালসা!'

রুস্তম শামুযকে ভেতরে আসতে বললো এবং পুরানের কাছ থেকে উঠে চেয়ারে গিয়ে বসলো। শামুয ভেতরে এসে মালিকায়ে ফারিসের সামনে এসে ঝুঁকে তাকে অভিভাদন জানালো। রুস্তম উঠে গিয়ে তাকে স্বাগত জানালো এবং সসম্মানে বসতে দিলো।

ঃ 'এখন তোমার নক্ষত্ররা কি বলে রুস্তম?'-শামুয জিজ্ঞেস করলো।.

ঃ 'আবর্তনে আছে আমার মহামান্য!'–রুস্তম জবাব দিলো– নক্ষত্ররা এখন ধোঁকা দিচ্ছে।'

ঃ 'মানুষ যখন নিজেকে নিজে ধোঁকা দিতে থাকে তখন তার ভাগ্যতারকারা আকাশের কোন এক দিগন্তে হারিয়ে যায়!'– শামুয বললো।

ঃ 'আপনি মহামান্য বুযুর্গ ও মহাজ্ঞানী'– রুস্তম বললো-'আপনি কি বলতে পারবেন মুসলমানদের মধ্যে তো কোন অদৃশ্য শক্তি নেই বা কোন রহস্য তো নেই?'

ঃ 'এটা বিশ্বাসের ব্যাপার'- বৃদ্ধ শামুয বললো– 'তুমি নক্ষত্রের কাছে তোমাদের ভবিষ্যতের কথা জিজ্ঞেস করে থাকো। আর মুসলমানরা তাদের আল্লাহর ইবাদত করে। যিনি চন্দ্র-সূর্য ও নক্ষত্রপুঞ্জকে আকাশে আবর্তন করেন এবং তাঁর আবর্তনের কক্ষপথ থেকে তারা কখনো সামান্যতম এদিক ওদিক দিয়েও অতিক্রম করে না।'

ঃ 'তবে আপনি কি বলতে চাচ্ছেন আমরাও তাদের বিশ্বাস মেনে নিই'– রুস্তম জিজ্ঞেস করলো– 'মনে হচ্ছে আপনিও তাদের এই ধর্মীয় বিশ্বাসে প্রভাবান্বিত এবং ....'

ঃ 'না'– শামুয রুস্তমকে বাধা দিয়ে বললো– 'আমি তাদের কথায় মোটেও প্রভাবান্বিত হয়নি। কেন, তুমি কি জানো না আমি ইহুদী?' ইসলামের ধ্বংস সাধনই আমাদের ইহুদীদের ধর্মীয় কর্তব্য। আমি তোমাকে বলতে এসেছি এসব পরাজয়ের কারণে হতাশ হয়ে বসে যেয়েও না। আমি তোমাকে আশান্বিত করতে এসেছি। তুমি কি জানো না মুসলিম বাহিনীতে কিছু খ্রিস্টানও আছে?'

ঃ 'হ্যাঁ শুনেছি। আমি এজন্য পেরেশান হয়ে ভাবছি, খ্রিস্টানরা কি করে মুসলমানদের সঙ্গে হাত মিলালো?'

ঃ 'আরব জাতীয়তার ভিত্তিতে'– শামুয বললো–' তুমি সম্ভবতঃ জানো না যে, আমি কতগুলো খ্রিস্টান গোত্রকে মুসলিম ফৌজে ভর্তি হওয়া থেকে বিরত রেখেছি। কিছু খ্রিস্টান তো মালে গনীমতের লোভে লড়াই করে। কিন্তু আরো একটা কারণ আছে। তাহলো খ্রিস্টানরা তোমাদের শাহেনশাহী অহমিকাকে ভয় পায়। মুসলমানদের মধ্যে বাদশাহীর কোন কৃত্রিম রেওয়াজ নেই। মুসলমানরা বিশ্বাস করে বাদশাহী একমাত্র আল্লাহর জন্যই। আর যাদেরকে হাকিম বা রাষ্ট্রনায়ক বানানো হয় তারা আল্লাহর বিধান মেনে চলে। এবং জনসাধারণের মধ্যে আল্লাহর বিধান কার্যকরী করে। তাদেরকে আল্লাহর হুকুম মেনে চলতে বাধ্য করে। তারা ব্যক্তিগত কোন স্বার্থসিদ্ধির জন্য কোন হুকুম প্রয়োগ করে না।'

ঃ 'তাদের ধর্মবিশ্বাসকে ভেঙে দেয়া কি আমাদের জন্য ফরজ নয়?' পুরান জিজ্ঞেস করলো।

ঃ 'হ্যাঁ মালিকায়ে ফারিস!'– শামুয বললো– 'এটা আপনাদের জন্য ফরয। আর এটাই আমাদেরও একমাত্র ফরয কর্ম। আপনারা রণাঙ্গনে আপনাদের ফরয আদায় করুন। আর আমরা ইহুদীরা যমীনের নিচ থেকে মুসলমানদের শাহরগ পর্যন্ত পৌছে যাবো। এটাই আমাদের প্রথম ও শেষ কাজ।'

শামুয ইহুদী ছিলো। ইহুদী আর শয়তান চক্রের মধ্যে নামগত পার্থক্য ছাড়া আর কোন পার্থক্য নেই। সে পুরান আর রুস্তমের বিশ্বাসকে তার সম্মোহনী কথায় এটা দৃঢ় করে দিলো যে, শাহেনশাহী আর বাদশাহী তাদের পৈতৃক অধিকার। তাদের এই সাম্রাজ্যের হেফাজত আর সমৃদ্ধির জন্য নিজেদের সব ধরনেরই ত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। অন্যথায় মুসলমানরা তাদেরকে পরাজিত করে তাদেরকে দাস-দাসীতে পরিণত করবে।

ঃ 'নক্ষত্রের এসব আবর্তন বিবর্তন থেকে বেরিয়ে এসো রুস্তম!'– শামুয বললো– 'মুসলমানদেরক নিজেদের ভয়ংকর রণশক্তি দেখিয়ে দাও। আর তাদেরকে প্রমাণ করে দেখাও তাদের ধর্ম ধোঁকা ছাড়া অন্য কিছু নয়। এ কাজ শুধু তুমিই করে দেখাতে পারো।'

জালিয়ুনুস যখন রুস্তমের সামনে এলো তখন তাকে রুস্তম কি বলবে ভেবেই পাচ্ছিলো না। জালিয়ুনুসের মাথা আনত ছিলো। কামরা জনমানব শূন্য– নিস্তব্ধ মনে হচ্ছিলো।

ঃ 'জালিয়ুনুস'!- নিস্তব্ধতা ভেঙে রুস্তম বললো– 'পরাজিত হয়ে পলায়নকারী যদি তুমি একলা হতে তবে আজ এই কামরা থেকে জীবিত বের হয়ে যেতে পারতে না। আফসোস হচ্ছে, তোমার প্রতি আমার যে অগাধ আস্থা ছিলো তা আজ ক্ষতবিক্ষত। আরবদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তোমাকে পাঠিয়ে আমি বিজয়ের সংবাদ শোনার অপেক্ষায় ছিলাম ... তুমি কি আমাকে বলবে, মুসলমানদের এমন কোন শক্তিটা আছে যা আমাদের মধ্যে নেই?'

ঃ 'ভয়– মৃত্যু ভয়, আক্রান্ত হওয়ার ভয়'– জালিয়ুনুস বললো– 'এটা এমন এক বিষ যা আমাদের ফৌজে আছে মুসলমানদের মধ্যেই নেই। এই ভয় আমাদের ঐসব সৈন্যরা বিস্তার করেছিলো যারা মুসলমানদের কাছে মার খেয়ে পালিয়ে এসেছিলো। আমি সিকাতিয়ার ময়দান থেকে তখনই বেরিয়ে এসেছিলাম যখন আমার সিপাহীরা শিয়ালের মতো ঝাঁকে ঝাঁকে ময়দান ছেড়ে পালাচ্ছিলো। আমার জযবা আমার মনোবল এখনো অটুট আছে। আমি পরাজিত হয়েছি ঠিক কিন্তু আমি পরাজয় মেনে নেয়নি। আমি সে পর্যন্ত দুদণ্ড শান্তিতে বসতে পারবো না যে পর্যন্ত না আমি এই পরাজয়ের বদলা নিতে পারবো'।

রুস্তম আর জালিয়ুনুসের সঙ্গে কথা বললো না। ফৌজের উচ্চপদস্থ অফিসারসহ সব অফিসারকে সে মহলের বাইরে জমায়েত হওয়ার নির্দেশ দিলো।

রুস্তুম বাইরে বের হলো। রুস্তমের পদ প্রধান সেনাপতির হলেও কার্যত সেই ছিলো পারস্যের বাদশাহ। শুধু শাহীখান্দানের হওয়ার কারণেই পুরান কেবল সম্রাজ্ঞী ছিলো। পুরান সাম্রাজ্যের সবকিছুই রুস্তমের দায়িত্বে দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলো। ফৌজের ছোট বড় সবাই রুস্তমের এই পদ মর্যাদার কথা জানতো। এজন্য তাকে সম্রাটের মতোই সম্মান জানাতো।

রুস্তম যখন বাইরে বের হলো তখন তার সঙ্গে ছিলো সম্রাজ্ঞী পুরান আর তার পেছনে ছিলো জালিয়ুনুস।

ঃ 'আচ্ছা তুমি তাকে সম্রাজ্ঞী বলবে?'– এক ফৌজী অফিসার তার সঙ্গের আরেক অফিসারকে জিজ্ঞেস করলো।– 'রুস্তম তো তাকে ঘরের বউ করে রেখেছে।'

ঃ 'আরে এটা কে না জানে!– দ্বিতীয়জন বললো– 'রুস্তম এখন আর সেই রুস্তম নেই। যে রণাঙ্গনের সম্রাট ছিলো, সে এখন পারস্যের সম্রাট বনে গেছে।'

রুস্তম কাছে আসতেই সকল ফৌজী অফিসার মাথা ঝুঁকিয়ে তাকে কুর্নিশ করলো।

ঃ 'এটা তো আর বলার প্রয়োজন নেই যে, পারস্যের অর্ধেক আজ মুসলমানদের কব্জায়'– রুস্তম বক্তৃতার ভঙ্গিতে বললো– 'শুধু সেসব জেনারেলরাই আরবদের হাতে এখনো পরাজিত হয়নি যারা এখনো তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেনি ... জাবান, মারদান,

নারসী, জালিয়ুনুস এরা কি পরাজিত হওয়ার মতো জেনারেল ছিলো?– রুস্তম হঠাৎ নীরব হয়ে গেলো। অফিসারদের সারির এক মাথা থেকে আরেক মাথা পর্যন্ত সবার ওপর তার নজর ঘুরতে লাগলো– 'এখন আর আমি আমার পক্ষ থেকে কোন জেনারেলকে বলবোনা যে, ফৌজের নেতৃত্ব নিয়ে আরবদের নাস্তানাবুদ করার জন্য ফারিস থেকে কোচ করো। তোমরাই বলো এখন কে যাবে? তোমাদের দৃষ্টিতে এমন কোন অনারবী আছে যে আরবদের কাছ থেকে বিজয় ছিনিয়ে আনতে পারবে?'

ঃ 'বাহমন জাদাবিয়া!'– এক সঙ্গে অনেকগুলো কণ্ঠের আওয়াজ উঠলো– 'বাহমন জাদাবিয়াই আরবদের পরাজিত করতে পারবে।' বাহমান জাদাবিয়ার নাম ছিলো যুল হাজিব। বাহমান উপাধি সে পেয়েছিলো তার বীরত্বপূর্ণ লড়াই ক্ষমতা আর খুনে মেজাজের নেতৃত্বদানের কারণে। রুস্তমের মতো দাম্ভিক জেনারেলও তার বীরত্বের কথা স্বীকার করতো। রুস্তম বাহমানকে আগে এসে দাঁড়াতে বললো।

মুসলিম ফৌজের সংখ্যা দশ হাজারের কমই হবে, বেশি হবে না'– রুস্তম বললো– 'তুমি এর চেয়ে তিন চারগুণ বেশি সৈন্য নিয়ে যাও। তাদেরকে তোমরা ফুরাত নদীর প্রান্তেই পাবে। ফুরাতে তাদেরকে ডুবিয়ে মারাই হবে তোমাদের কাজ।' রুস্তম জালিয়ুনুসের দিকে তাকালো– 'তুমিও বাহমনের সঙ্গে যাচ্ছ জালিয়ুনুস। আর মনে রেখো এখন যদি আবার তোমরা রণাঙ্গনে পিঠ দেখাও তবে আমার সামনে আর আসবে না। নিজেদের তরবারিতেই নিজেদের পেট-পিঠ চিড়ে ফেলবে। অন্যথায় আমার তরবারি তোমাদের গর্দান পর্যন্ত পৌঁছে যাবে।'

ঃ 'যরথ্রুষ্টের কসম!'– জালিয়ুনুস উঁচু আওয়াজে বললো– 'এখন মাদায়েনে আমার বিজয়ের খবর আসবে অথবা মৃত্যুর খবর।'

রুস্তম তাদেরকে বিদায় করে দিয়ে পুরানের সঙ্গে মহলে চলে গেলো। অফিসাররা সেখান থেকে ঘরে গিয়ে বিভিন্ন টিলার ওপর গিয়ে বসলো। তাদের অনেকে রুস্তমের পক্ষে কথা বলছিলো। আবার অনেকে রুস্তমের বিপক্ষে পুরানের পক্ষে কথা বলছিলো। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিলো ফৌজের মধ্যে রুস্তমের পক্ষ বিপক্ষ নিয়ে বিভক্তি তৈরী হচ্ছে।

সিকাতিয়ার লড়াইয়ের পর আবু উবাইদ তার ফৌজকে ফুরাত নদীর কূল ঘেঁষা এলাকা কসুন্নাতিকে নিয়ে এসে এখানেই সৈন্য ছাউনি স্থাপন করেন। এখানে তিনি পরবর্তী লড়াইয়ের জন্য ফৌজকে যেমন তৈরী করছিলেন তেমনি তাদের বিশ্রামেরও ব্যবস্থা করেছিলেন।

আবু উবাইদের স্ত্রী দাওমা তার সঙ্গেই ছিলেন।

ঃ 'নূরে জ্যোতির্ময় উজ্জ্বল চেহারার এক লোককে আকাশ থেকে অবতরণ করতে দেখেছি'– দাওমা একদিন আবু উবাইদকে তার এক স্বপ্ন দেখার কথা বলছিলেন– 'তার হাতে ছিলো পবিত্র শরাবের পাত্র। আমি দেখলাম আপনিও আপনার গোত্র সাকীফের লোকেরা সেই পাত্র থেকে পবিত্র শরাব পান করছেন। এর সঙ্গে সঙ্গেই আমার চোখ খুলে গেলো।'

ঃ 'পরিষ্কার ইংগিত'- আবু উবাইদ তার স্ত্রীকে বললেন- 'আমি ও সাকীফ গোত্রের যারা এই শরাব পান করেছে তাদেরকে জামে শাহাদাত পান করানো হবে। আল্লাহ্ তাআলা এই সুস্পষ্ট ইশারা এজন্যই দিয়েছেন যাতে আমি আমার পরবর্তী সিপাহসালার নিযুক্ত করে যাই। এমন যেন না হয় যে, শাহাদাত আমাকে এর কোন সুযোগই দিলো না।'

তিনি তার স্থলাভিষিক্তের নাম ঘোষণা করলেন। তিনি শহীদ হয়ে গেলে অমুক কমাণ্ডার ঝাণ্ডা সংরক্ষণ করবেন। তারপর অমুক। অমুকের পর অমুক-এভাবে তিনি ধারাবাহিকভাবে কয়েকজন সালারের নাম বললেন।

বাহমন জাদারিয়া বড় জাঁকজমকের সঙ্গে তার সেনাবহর নিয়ে মাদায়েন থেকে বের হলো। মাদায়েনের পুরো শহরবাসী তখন বাইরে বেরিয়ে এসেছিলো এবং তারা হাত নাড়িয়ে নাড়িয়ে তাদের বিজয়ের শ্লোগান দিতে দিতে তাদেরকে বিদায় জানিচ্ছিলো। সম্রাজ্ঞী পুরান আর রুস্তম শহরের দরজার বাইরে ঘোড় সওয়ার হয়ে ফৌজকে আলবিদা বলছিলো। তাদের ঠোঁটে লেগেছিলো আশ্বাসের হাসি।

ঃ 'মুসলমানরা তোমাদের চেয়ে বড় বাহাদুর নয়'- মালিকায়ে পুরান তার সম্মুখ দিয়ে অতিক্রমকারী ফৌজকে বার বার বলছিলো-' তোমরা বিজয় বেশেই ফিরে আসবে।'

মাদায়েন থেকে অনেক যুদ্ধেই অনেক রণাঙ্গনেই সেনাবহর গিয়েছিলো। কিন্তু এমন জাকজমক ও শান শওকতের সঙ্গে আর কোন সেনাবহরকেই বিদায়ী শুভেচ্ছা, জানায়নি যেমন বাহমন জাদাবিয়া ও জালিয়ুনুসের সেনাবহরকে করা হয়ে ছিলো। রুস্তম আর পুরান অনেক দূর পর্যন্ত এ সেনাবহরের সঙ্গে গেলো এবং একটি টিলার ওপর দাঁড়িয়ে তাদেরকে শেষ বিদায়ী হাসিটি উপহার দিলো।

এই ফৌজে পদাতিকের চেয়ে ঘোড়-সওয়ার ছিলো বেশি। সঙ্গে তাদের অনেকগুলো হাতি ছিলো, একটি হাতির রং ছিলো সাদা, অন্যান্য হাতির চেয়ে সেটিকে ভয়ংকর দর্শন মনে হতো। আর শক্তি ও আকারেও ছিলা দ্বিগুণ, হাতিগুলোর ওপর হাওদা স্থাপিত ছিলো। যেগুলোর ওপর তীরন্দায ও নেযাবাযরা দাঁড়ানো ছিলো। লাগাম ঝুলানো ছিলো প্রত্যেকেরই গর্দানে। প্রত্যেক হাতির গলায় বড় বড় ঘন্টা ঝুলানো ছিলো। বিকট আওয়াজে সেগুলো হরদম বাজতেই থাকতো। প্রত্যেক হাতিরই দু'দিকে লোহার শিকলে মোড়ানো ছিলো। এতে কোন হাতিয়ার দিয়ে হাতিকে আঘাত করা সম্ভব ছিলো না। এগুলোকে যুদ্ধের বিশেষ প্রশিক্ষণ দিয়ে প্রস্তুত করা হয়েছিলো। এদেরকে খাবার দেয়া হতো এতো বেশি যে সবসময় নেশায় মত্ত থাকতো এরা।

ঃ 'যুল হাজিব!'- জালিয়ুনুস বাহমন জাদাবিয়াকে জিজ্ঞেস করলো- 'রুস্তম আর মালিকায়ে ফারেসের গোপন সম্পর্কের ব্যাপারে তোমার মতামত কি'?

ঃ 'আমার মতামত কি জিজ্ঞেস করছো জালিয়ুনুস!'- বাহমন বললো- 'ফৌজের মধ্যে আমি ভয়াবহ একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করছি। কিছু তো রুস্তমের সমর্থক আর কিছু পুরানের। রুস্তমের সমর্থকরা পুরানের ওপর আর পুরানের সমর্থকরা রুস্তমের ওপর পরাজয়ের দোষ চাপাচ্ছে।

ঃ 'আমিও দেখেছি'– জালিয়ুনুস বললো– 'আমি আশংকা করছি মাদায়েনে না আবার গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। আমি ব্যক্তিগতভাবে পুরানকে পছন্দ করি। কিসরার বংশের এই একমাত্র মেয়ে যে সালতানাতে ফারেসের স্বাধীনতা রক্ষা ও সমৃদ্ধির প্রতি নিজেকে উৎসর্গ করেছে। শাহী খান্দানের মধ্যে সিংহাসন নিয়ে কি সাংঘাতিক লড়াই শুরু হয়ে গিয়েছিলো। পুরানই সেটা বন্ধ করতে পেরেছে।'

ঃ 'আমিও গৃহযুদ্ধের লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি'– বাহমন বললো– 'শাহীখান্দানে আরো অন্য ধরনের ষড়যন্ত্র শুরু হয়ে গেছে। পুরানের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলা হচ্ছে সে রুস্তম ছাড়া এখন আর কিছুই বুঝে না।

ঃ 'আমাদের যে কর্তব্য আছে তা আমাদের আগে শেষ করতে হবে'–জালিয়ুনুস বললো।

ঃ 'তবে আমাদের মাদায়েনের প্রতিও নজর রাখতে হবে'–বাহমন জাদাবিয়া বললো–

ঃ 'মাদায়েনে আমি দু'জন গুপ্তচর রেখে এসেছি। আমাকে তারা মাদায়েনের অবস্থা সম্পর্কে সবসময় সজাগ রাখবে'।

কসুন্নাতিক কেল্লাঘেরা এক শহর ছিলো। আবু উবাইদ তার ফৌজকে কেল্লায় নিয়ে উঠালেন। সেখানেই তিনি জানতে পারলেন মাদায়েন থেকে ফারসী ফৌজ আসছে। আবু উবাইদ মুসান্না ও সালীত (রা)কে ডেকে বললেন, মাদায়েন থেকে ফৌজ আসছে এবং তাদের রুখ এদিকেই।

ঃ 'আর আমার বন্ধুরা!'– 'আবু উবাইদ বললেন– 'তাদের সঙ্গে অনেক হাতি–ও আছে। আমি শুধু হাতিকেই ভয় পাচ্ছি। ভয়টা হলো আমাদের লোকেরা এখনো হাতি দেখেইনি। তারা ভীত হয়ে পড়বে।'

ঃ 'আমরা আমাদের লোকদের বলবো, হাতির বিশাল আকৃতি দেখে যেন তারা ভয় না পায়'– 'মুসান্না বললেন–'তাদেরকে এটাও বলে দেয়া হবে, হাতির শুঁড় কাটার যেন তারা চেষ্টা করে।'

ঃ 'তীরন্দাজ বাহিনীকে সামনে রাখতে হবে'– সালীত (রা) বললেন– 'যে হাতিই যখমী হবে সে পেছনের দিকে পালাতে চাইবে এবং তাদের ফৌজকেই পিষে মারবে।'

ঃ 'আল্লাহ্ আমাদের সঙ্গে আছেন'– আবু উবাইদ বললেন– 'সবাইকে বলে দিতে হবে হাতি আসছে। তাদেরকে ভয় পাওয়া চলবে না। আরেকটা কথা হলো, আমরা কেল্লার ভেতর থেকে লড়তে চাই না। কারণ কেল্লা ছোট আর খুব মজবুতও নয়। ফটকগুলো হাতির ধাক্কাতেই ভেঙে যাবে, পারসিকরা ভেতরে চলে আসলে আমাদের লড়াইয়ের স্থানও সংকীর্ণ হয়ে যাবে।'

ঃ 'আরেকটা আশংকা রয়েছে'– মুসান্না বললেন–'এই এলাকার লোকদের কোন বিশ্বাস নেই। এখন এরা আমাদের অনুগত হয়ে আছে। হতে পারে তাদের ফৌজকে দেখে আমাদের দুশমন বনে যাবে এবং তীর বর্শা নিয়ে আমাদের পিঠে বিদ্ধ করতে থাকবে।'

ঃ 'আমাদের ফৌজকে এখনই বাইরে বের করে নিয়ে যাও'– আবু উবাইদ বললেন-

ঃ 'শহরের দরজাগুলো বন্ধ করে দাও আর শহরবাসীকে জানিয়ে দাও শহরের কোন নারী-পুরুষ বা শিশু শহরের বাইরে বেরোনোর চেষ্টা করতে পারবে না।'

শহরজুড়ে নারীপুরুষ আর শিশুদের শোরগোল শুরু হয়ে গেলো। মুজাহিদরাও পূর্ণদ্যোমে প্রস্তুতি শুরু করে দিলো। শহরীরা নিজেদের মূল্যবান আসবাপত্র, সোনা-গয়না ও যুবতী মেয়েদেরকে এদিক ওদিক লুকাতে লাগলো। সন্ধ্যা নাগাদ মুজাহিদরা কেল্লা থেকে বের হয়ে গেলো। ফুরাতের কূল ঘেঁষে ছাউনি ফেললো তারা। স্থানটির নাম ছিলো মারুহা। সেখানে নৌকার পুলও ছিলো।

বাহমন জাদাবিয়া মুসলমানদের শুধু এজন্যই শত্রু মনে করতো না যে, মুসলমানরা তার দেশ পারস্য দখল করে নিচ্ছে, বরং আগ থেকেই তার মনে মুসলমানদের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা ছিলো।

ঃ 'জালিয়ুনুস!'– পথে সে বলছিলো– 'আমি মালিকায়ে ফারিস আর রুস্তমের হুকুমে এই লড়াইয়ে আসিনি। এটা আমার ব্যক্তিগত লড়াই। আমি তাদের সবচেয়ে বড় সালার খালিদ ইবনুল ওয়ালীদের কাছে যে মার খেয়েছি তার প্রতিশোধ নেবো এই মুসলমানদের কাছ থেকে।'

ঃ 'প্রতিশোধ তো আমাকেও নিতে হবে'– জালিয়ুনুস বললো– 'আমি তাদের খুনে ফুরাত লাল করে দেবো।'

পারসিকরা যখন ফুরাতের প্রান্তে পৌঁছলো সূর্য তখন ডুবু ডুবু অবস্থা, তাই সেদিন আর লড়াই সম্ভব ছিলো না। নদীর এপার থেকে ওপারের সারিবদ্ধ হাতিগুলো দেখা যাচ্ছিলো। অধিকাংশ আরবই কখনো হাতি দেখেনি। সূর্য অন্ধকারে মিলিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত তারা নিষ্পলক হাতিগুলোর দিকে তাকিয়ে রইলো। রাতে সালাররা তাদেরকে কিভাবে হাতির মোকাবেলা করতে হবে তা বলে দিলো।

বরাবরের মতো পারসিকরা মুসলমানদের চেয়ে প্রায় তিন গুণ বেশি ছিলো, আর হাতি তো তাদের বাড়তি শক্তি ছিলোই।

পরদিন ফজরের নামাযের ইমামতি করলেন আবু উবাইদ। নামাযে তিনি সূরা আনফালের এই আয়াতটিও পড়লেন– "আজকের দিনে সঙ্গত কারণ ছাড়া যে রণাঙ্গনে পিঠ দেখাবে তার ওপর আল্লাহর আযাব নাযিল হবে। তার ঠিকানা হবে জাহান্নামে।" নামাযের পর তিনি দাঁড়িয়ে বললেন– 'আজ পর্যন্ত তোমরা প্রতিটি ময়দানেই বাতিল আর মিথ্যার পূজারীদেরকে পরাজিত করেছ। প্রতিটি ময়দানেই তাদের সংখ্যা তোমাদের চেয়ে কয়েক গুণ বেশি ছিলো। তবুও আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে বিজয় দান করেছেন। তবে আল্লাহ তাআলা তার অনুগ্রহ তার ওপরই বর্ষণ করেন যে তাঁর পথে আত্মত্যাগ করে। এমন যেন না হয় যে, আমরা পরাজয়ের কালিমা চেহারায় মেখে মদীনায় গেলাম। তখন তোমাদের মা-বোন ও স্ত্রী-সন্তানরা তোমাদের চেহারা আর দেখতে চাইবে না। তাদের হাতিকে ভয় পেয়ো না। এই শুষ্ক ময়দানকে তাদের রক্তে সিক্ত করে তোল।'

সকালের আকাশ কিছুটা ফিঁকে হয়ে এলে নদীর ওপার থেকে পারসিকদের ডাক শোনা গেল। আবু উবাইদ এপার থেকে তাকিয়ে দেখলেন বাহমন জাদাবিয়া চিৎকার করছে।

ঃ 'তোমরা কি নদী পার হয়ে এধারে আসবে না আমরা ওধারে আসবো?'– বাহমন উঁচু আওয়াজে জিজ্ঞেস করলো।

আবু উবাইদ তার সালারদের সাথে পরামর্শ করে জবাব দেবেন বলে ঠিক করলেন।

ঃ 'আরে আরবের বেওকুফরা! তোমরা তো এপারে আসতে সাহসই করছোনা'– বাহমন বিদ্রূপ করে বললো।

ঃ 'তোমার চেহারাই বলছে তুমি এপারে আসতে ভয় পাচ্ছ'– জালিয়ুনুস খোঁচা দিলো।

ঃ 'আমরা আসছি'– আবু উবাইদ উত্তেজিত গলায় বললেন এবং নদীর পার থেকে সরে এলেন।

ঃ 'আল্লাহর কসম!'– আবু উবাইদ তার সালারদেরকে বললেন– 'এই অপমান আমি কখনো সহ্য করতে পারবো না, আমরা নাকি এসব অগ্নিপূজারীদের ভয় পাচ্ছি যাদেরকে আমরা প্রতিটি লড়াইতেই পরাজিত করেছি। নৌকার পুল তো আছেই। ফৌজ দরিয়ার ওপারে গিয়ে লড়বে। অগ্নিপূজারীরা মৃত্যুর ব্যাপারে আমাদের চেয়ে অধিক সাহসী নয়। আমরাই নদী পার হয়ে যাবো।'

ঃ 'আবু উবাইদ!'– মুসান্না বললেন– 'খোদার কসম!–আমি এটা বিশ্বাস করতে পারছি না যে, তুমি লশকরকে নদীর ওপার নিয়ে গিয়ে লড়াইয়ে জড়িত হওয়ার মতো কাজ করবে।'

ঃ 'তোমার কেন বিশ্বাস হচ্ছে না ইবনে হারিসা!'– আবু উবাইদ বললেন– 'তারা আমাদেরকে অপমানজনক ভাষায় ডেকেছে। আমরা নদীর ওপারে যাচ্ছি।'

ঃ 'তুমি কি দেখছো না আমাদের ফৌজ খুব বেশি হলে নয় হাজার হবে?'– মুসান্না বললেন– 'তারা হাতিও নিয়ে এসেছে। তাদের প্রস্তুতি দেখো, নদীর ওপারে যাওয়া আমাদের জন্য উচিত হবে না। তাদেরকে ডেকে এপারে আসতে বলো।'

ঃ আবু উবাইদ বাহমন আর জালিয়ুনুসের অপমানজনক কথায় এমন উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন যে, মুসান্নার কোন কথা বা যুক্তিকেই তিনি মানতে পারছিলেন না।'

ঃ 'আর এটাও তো দেখতে হবে আবু উবাইদ!'– সালার সালীত (রা) বললেন–

ঃ 'আমাদের ফৌজ নয় হাজারও হবে না, আর তাদেরকে দেখো পঁচিশ হাজারেরও বেশি হবে। ময়দানের বেশিরভাগ অংশই তারা দখল করে আছে। আর হাতিগুলো তারা তাদের মাঝখানে রেখেছে। তারা আমাদের মুজাহিদদের জন্য যে জায়গাটুকু রেখেছে তা মোটেও যথেষ্ট নয়। আমাদের সওয়ারদের ঘোরা নড়াচড়া করার জন্যও জায়গাটি সংকীর্ণ। ডান ও বাম দিকের যমীন দেখো কেমন এবড়ো থেবড়ো। না, আমাদের ওপারে যাওয়া উচিত হবে না'।

ঃ 'আল্লাহর কসম!'–আবু উবাইদ বললেন–'এটা কাপুরুষতা ছাড়া আর কিছুই হবে না।'

ঃ 'আমি তোমাকে আবারও বলছি'– সালীত ইবনে কায়েস (রা) কিছুটা তপ্তগলায় বললেন– 'নিজের এই ইচ্ছা পরিত্যাগ করো, না হয় পস্তাবে।'

ঃ 'তোমরা বুযদিল'– আবু উবাইদ আরো তপ্তগলায় বললেন– 'আমি আমার দেয়া যবান থেকে ফিরে আসতে পারবো না। আমি তাদেরকে বলে দিয়েছি যে, আমরা আসছি।'

ঃ 'আল্লাহর কসম!'– সালীত (রা) বললেন– 'তোমার চেয়ে আমি কম সাহসী নই। আমি আমার মতামত তোমাকে জানিয়ে দিলাম। বিপদ থেকে তোমাকে সাবধান করেছি। তুমি সিপাহসালার। আমাদের আমীর। তোমার আনুগত্য করা আমাদের জন্য ফরয।'

ঃ 'তবে তোমরা আমার হুকুম মেনে নাও'– আবু উবাইদ বললেন।

মুসান্না ইবনে হারিসার ওপর তখন যেন নিস্তব্ধতা নেমে এসেছিলো। আবু উবাইদ ভুলে গিয়েছিলেন যে, আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর (রা) মদীনা থেকে বিদায় দেয়ার সময় নসীহত করে বলেছিলেন–'তাড়াহুড়া করে কোন ফয়সালা করবে না। মনে রেখো, তোমার সঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মানিত সাহাবীও যাচ্ছেন। তাঁদের পরামর্শ ছাড়া কোন ফয়সালা ও বড় কোন পরিকল্পনা করবে না। সালীত ইবনে কায়েস (রা) এর মতামতকে গুরুত্ব দেবে।'

মুসলমানরা আমীরের প্রতি বশ্যতা স্বীকার করাকে তাদের ধর্মীয় কর্তব্য বলে মনে করতো। তাদের ধারাবাহিক বিজয়ের অন্যতম কারণ ছিলো এটাই। আমীর নিজেকে কখনো নির্দেশদাতা মনে করতো না। তার কোন ফয়সালাই ব্যক্তিগত কোন সুবিধা-অসুবিধার প্রেক্ষিতে হতো না।

মুসান্না ইবনে হারিসা, সালীত ইবনে কায়েস (রা) ও সা'দ ইবনে উবাইদ (রা) আবু উবাইদের ফয়সালার সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করলেও তার নির্দেশ তারা পালন করলেন। তাদের নিজেদের অধীনস্থ ফৌজকে নদীর ওপারে যাওয়ার হুকুম করলেন। সর্বপ্রথম নদী পার হন সালীত (রা)।

পারসিকরা যুদ্ধ-শৃংখলায় নিশ্চুপ দাঁড়িয়েছিলো। যেন তারা কোনদিকে ফিরেও তাকাবে না।

মুজাহিদরা তাদের দুশমনকে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে পুল দিয়ে নদী পার হতে লাগলো। তারা নিশ্চিন্ত ছিলো, নদী পার হয়ে যুদ্ধের শৃংখলায় সারিবদ্ধ হওয়ার পরই লড়াই শুরু হবে। তখন যুদ্ধের রীতি ছিলো এক পক্ষের কোন যোদ্ধা বিপক্ষদলের কাউকে লড়ার জন্য আহ্বান করবে। এই ব্যক্তিগত লড়াইয়ে হারজিতের পরই মূল যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে। যুদ্ধের সূচনা এভাবেই হবে বলে মুসলমানরা আশ্বস্ত ছিলো। আবু উবাইদ তার সালারদেরকে কোন পজিশনে থাকবে তাও বলে দিয়েছিলেন। তিনি তার লশকরকে ডান, বাম, মধ্য ও রিজার্ভ বাহিনীতে ভাগ করে নিয়েছিলেন। এই পজিশনেই সালাররা প্রথমে সারিবদ্ধ হতে চেয়েছিলেন।

অধিকাংশ মুজাহিদই নদী অতিক্রম করে এপার চলে এসেছিলো। শেষ দু'চার জন মুজাহিদও এপারে এসে পৌঁছেছিলো। লশকরের বিভিন্ন অংশ এখনো নিজেদের জায়গায় গিয়ে দাঁড়াতে পারেনি। বাহমনের ঘোড় সওয়ার সৈন্যরা ডান ও বাম দিক দিয়ে হামলা করে বসলো। আবু উবাইদের সৈন্যরা তা সামলানোরও সুযোগ পেলো না। মুজাহিদরা এই আচমকা হামলার জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিলো না।

এটাই দুশমনের চাল ছিলো। আবু দাউদ দুশমনের সেই জালেই আটকে গিয়েছিলেন।

পারসিকরা তারস্বরে শ্লোগান দিতে লাগলো---'আরবদের কেটে কুচি কুচি করো----বিজয় আজ আজমীদেরই----ঘোড়ার তলায় পিষে মারো----তাদের খুনে ফুরাতকে লাল করে দাও---কী এখন তোমাদের আল্লাহ ও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে ডাকো না কেন'----আরো কটু ও অশ্রাব্য ভাষায় গাল দিতে দিতে তারা মুসলমানদেরকে নির্বিচারে হত্যা করতে লাগলো।

লড়াই চলছিলো একতরফা। ময়দান তখন অগ্নিপূজারীদের হাতে এসে গিয়েছিলো। পঁচিশ হাজার ফৌজের আক্রমণে নয় হাজার মুজাহিদদের লশকর তখন নিজেদের রক্ষা ছাড়া আর কিছুই করার ছিলো না। কিন্তু পারসিকদের অপমানজনক শ্লোগান মুসলমানদেরকে আত্মিক শক্তিকে আবার জাগিয়ে তুললো। তারা এমন জোশ-উদ্যোমে লড়তে লাগলো যে, তাদের পা জমে গেলো। তারা জবাবী শ্লোগান দিতে লাগলো–

ঃ 'অগ্নিপূজারীরা কোন ময়দানে দাঁড়াতে পারেনি এখানেও দাঁড়াতে পারবে না।'

ঃ 'এরা তো ভাগোড়া ফৌজ।'

ঃ 'এরা তো ভারাটে সৈন্য।'

ঃ 'এরা এক মহিলার অধীনস্থ প্রজা।'

ঃ 'নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবার।'

এই শ্লোগানের মাধ্যমে খোদ মুজাহিদদেরই ফায়দা হলো। তারা টের পেলো, তাদের সাথী সঙ্গীরা এখনো জীবিত আছে এবং পূর্ণজযবা নিয়েই লড়াই করছে। পারসিকরাও বুঝতে পারলো, মুসলমানদেরকে মারা যেমন সহজ তাদের জযবা ভাঙ্গা তেমনি কঠিন।

মুজাহিদদের জন্য এটা ছিলো জীবন মরণ লড়াই। এই চিন্তা তাদের শরীরে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছিলো যে, তারা যদি হেরে যায় তবে তাদের পূর্বের সব বিজয় ম্লান হয়ে যাবে। কিসরার ফৌজে তাদের যে ভয় ছেয়ে গিয়েছিলো তাও খতম হয়ে যাবে। কিন্তু মুসলমানরা এমন অবস্থায় ফেঁসে গিয়েছিলো যে, তাদের জন্য পেছানোও সম্ভব ছিলো না। একটি শ্লোগানে তারা জান তোড়ে দিলো।

ঃ 'বিজয় বা মৃত্যু'?–এক মুজাহিদের বুক থেকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতো এটা বের হয়ে এলো। এখন মুসলমানদের ক্রোধবর্ষণ দেখার মতো ছিলো। কালিমায়ে তাইয়েবার উদ্দীপ্ত উন্মত্ততায় তারা হামলা চালালো এবং পারসিকদের ঘেরাও ভেঙে সারিবদ্ধ হতে শুরু করলো। সালাররাও সিপাহীদের মতো লড়তে লাগলেন এবং বিক্ষিপ্ত মুজাহিদদেরকে শৃংখলাবদ্ধ করারও চেষ্টা করতে লাগলেন।

বাহমন জাদাবিয়া হস্তিবাহিনীকে আগে বাড়িয়ে দিলো। বন্য ষাঁড়ের মতো হাতিগুলো দৌড়ে আসতে লাগলো। তাদের মোকাবেলার জন্য সওয়ারী মুজাহিদরা আগে বাড়লো। কিন্তু হাতির গলায় ঝুলানো ঘন্টার বিকট শব্দে মুজাহিদদের ঘোড়াগুলো দিগ্বিদিকশূন্য হয়ে পালাতে শুরু করলো। তাই মুজাহিদরা আর হাতিবহরের কাছে ঘেষতে পারছিলো না। এই ফাঁকে পারসিক তীরন্দাযরা বিক্ষিপ্ত মুসলমান ফৌজকে বেছে বেছে তাদের নিশানা বানাতে লাগলো। মুসলমান সওয়াররা খুব দ্রুত শহীদ হতে লাগলো।

মুসলমানরা পিছু হটে শৃংখলাবদ্ধ হতে পারতো। কিন্তু পেছনে তাদের উত্তাল নদী ছিলো। তারা পারসিকদের ডানে বায়েও ছড়িয়ে পড়তে পারতো এবং ছড়িয়ে পড়ার চেষ্টাও করছিলো। কিন্তু পারসিকরা তাদেরকে সে সুযোগও দিচ্ছিলো না। সালাররা দেখলেন, হাতির বিকট ঘন্টাধ্বনির কারণে ঘোড়াগুলো সন্ত্রস্ত হয়ে উঠছে আর পদাতিক মুজাহিদদের প্রতিরোধও কমজোর হয়ে যাচ্ছে। সালাররা তখন নিজেদের ফৌজদের ডেকে ডেকে উৎসাহ দিতে লাগলেন। পারসিকদের ঘোড়াগুলো তো তাদের হাতি ও হাতির ঘন্টাধ্বনির সঙ্গে পরিচিত ছিলো। আর মুসলমানদের ঘোড়াগুলো এই প্রথমবার হাতি দেখেছিলো।

সিপাহসালার আবু উবাইদ হয়তো তার ভুল বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তিনি যেন তার ভুলের ক্ষতিপূরণ করতে চাইলেন। তিনি ঘোড়া থেকে এক লাফে নেমে পড়লেন। যে সওয়ার মুজাহিদরা হাতিকে রুখছিলো তিনি তাদের সঙ্গেই ছিলেন। ঘোড়াগুলোর সন্ত্রস্ত আর পলায়নপর অবস্থা দেখে তিনি ঘোড়ার আশা ছেড়ে দিয়ে ঘোড়া থেকে নেমে পড়লেন।

তার দেখাদেখি অন্যান্য সওয়াররাও ঘোড়া থেকে নেমে পড়লো এবং আবু উবাইদের নেতৃত্বে পারসিকদের ওপর এমন তীব্র হামলা চালালেন যে, অল্প সময়ের মধ্যেই তারা ছয় হাজার পারসিককে যমের বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন। এতে পারসিকদের হিম্মত অনেকখানি টুটে গেলো। কিন্তু হাতিগুলো মুশকিলের কারণ হয়ে দাঁড়ালো। তাদের হাওদায় যে তীরন্দায আর বর্শাতীরা ছিলো তারা মুসলমানদের ওপর তীর-বর্শার বৃষ্টি বর্ষণ শুরু করে দিলো। হাতিগুলোও এমন উন্মাদের মতো হেলে দুলে ছোটাছুটি করছিলো যে, যে মুজাহিদকেই সামনে পেতো শুঁড় দিয়ে উঠিয়ে তাকে আছড়ে মারতো।

ঃ 'হাতির সামনে তোমরা যেয়ো না'–আবু উবাইদ চিৎকার করতে করতে বললেন–

ঃ 'হাতিগুলোর পাশ থেকে হাওদার রশিগুলো কেটে দাও।' আবু উবাইদ নিশ্চিত পরাজয়কে বিজয়ে রূপান্তর করার জন্য তার জানবাজি রেখে লড়ছিলেন।

হাতির হাওদাগুলো থেকে সমানে তীরবৃষ্টি চলছিলো। মুজাহিদরা তা থেকে বাঁচার চেষ্টা করতে করতে– হাতির এক পাশে গিয়ে তরবারি দ্বারা হাওদার রশি কেটে দিচ্ছিলো। আর হাওদার সৈন্যরা নিচে গড়িয়ে পড়ছিলো। তারা নিজেদেরকে সামলে নেয়ার পূর্বেই মুজাহিদরা তারেদকে দ্বিখণ্ডিত করে দিচ্ছিলো। এভাবে মুজাহিদরা কয়েকটি হাতিকেও যখমী করে দিলো।

হাওদাও লাগামবিহীন হাতিগুলো নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে দিগ্বিদিক দৌড়াচ্ছিলো। তাদের এই হুঁশও ছিলো না যে, তারা নিজেদের ফৌজকে পিষে মারছে না দুশমনকে। এই লাগামবিহীন যখমী হাতিগুলো যুদ্ধের পুরো চেহারাটাই পাল্টে দিলো। কিন্তু মুজাহিদরা এতোই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলো যে, তাদের ভারন্ত দেহগুলোও খুব কষ্টে বয়ে নিচ্ছিলো।

তবুও সালাররা মুজাহিদদেরকে শৃংখলাবদ্ধ করে নিজের মতো করে লড়িয়ে যাচ্ছিলেন। হামলার প্রচণ্ডতা সামলাতে না পেরে কখনো মুজাহিদরা পিছু হটছিলো কখনো পারসিকরা।

প্রায় সবগুলো হাতিই ময়দান ছেড়ে গিয়েছিলো, শুধু সাদামতো একটি হাতি রয়ে গিয়েছিলো। অন্যান্য হাতির চেয়ে ওটার শরীর দ্বিগুণ তো ছিলোই দেখতেও বিকট দর্শন ছিলো। মুসলমানদের ওপর সেটি কেয়ামতের বিভীষিকা নিয়ে হামলে পড়ছিলো।

আবু উবাইদ হাতিটিকে খতম করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন এবং হাতির সামনে চলে গেলেন। হাতি তার দিকে দৌড়াতে শুরু করার পূর্বেই তিনি এক আঘাতে তার শুঁড়ের অর্ধেকটা কেটে ফেললেন। কিন্তু আশ্চর্য! হাতিটি পিছু হটলো না। আবু উবাইদের দিকে চরম ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে এগিয়ে এলো। একটা ধাক্কা মেরে আবু উবাইদকে তার পায়ের তলায় নিয়ে গেলো এবং তাকে পিষে ফেললো– আবু উবাইদ শহীদ হয়ে গেলেন।

আহত বাঘ, চিতা, হাতি ও উট প্রতিপক্ষ থেকে প্রতিশোধ না নিয়ে ছাড়ে না। হাতি আর উটের প্রতিশোধের কথা তো বিখ্যাতই। আর এই হাতিটি এমনিতেই হিংস্র আর খুনে মেজাজের ছিলো। আবু উবাইদ শহীদ হয়ে গেলে তার ভাই– যে তার কাছেই ছিলেন– তিনি ঝাণ্ডা উঠিয়ে নিলেন এবং হাতির পায়ে তরবারি দিয়ে আঘাত করলেন, আর নারা লাগালেন–

ঃ 'আমাদের ঝাণ্ডা এখনো বুলন্দ আছে।'

আবু উবাইদের ভাইহাকামের দৃষ্টি ছিলো ঝাণ্ডার দিকে। তিনি ঝাণ্ডাটি উঁচু করে ধরলেন যাতে মুসলমানদের জযবা অটুট থাকে। ওদিকে আহত হাতিটি আরো ভয়ংকর হয়ে উঠেছিলো। হাকামকে সে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে আবু উবাইদের মতো পিষে ফেললো।

আরেকজন মুজাহিদ অগ্রসর হয়ে ঝাণ্ডাটি উঠিয়ে নিলো এবং নারাতে লাগালো– 'আমাদের ঝাণ্ডা সমুন্নত রয়েছে'– তারা নারা শেষ হওয়ার আগেই হাতিটি তাকে পা চাপা দিলো।

আবু উবাইদের শাহাদাতের পর একের পর এক সাতজন মুজাহিদ ঝাণ্ডা সমুন্নত করে এবং হাতি তাদের প্রত্যেককে একইভাবে পিষে ফেলে। মুশকিলের ব্যাপার ছিলো– হাতির আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য কোথাও পালানোর পথ ছিলো না। সেখানে ঘোড়া, মানুষের লাশ আর যখমী ও বেহুশদের স্তূপ ছিলো। কোথাও পা দেয়ারও জায়গা ছিলো না।

আবু উবাইদের পর শহীদ হওয়া সাতজন মুজাহিদ আবু উবাইদেরই গোত্র বনু সাকীফের লোক ছিলেন। আবু উবাইদের স্ত্রী দাওমা কয়েক রাত আগে স্বপ্নে আবু উবাইদের সঙ্গে এই সাত ব্যক্তিকেই পবিত্র শরাব পান করতে দেখেছিলেন।

মুসান্না ইবনে হারিসা কিছুটা দূরে ছিলেন। দূর থেকেই তিনি দেখলেন একবার ঝাণ্ডা উঠছে আবার গড়িয়ে পড়ছে।..... তিনি দৌড়ে এসে ঝাণ্ডা উঠালেন এবং এক মুজাহিদের হাতে দিয়ে দূরে সরে গেলেন এবং সবাইকে হাতি থেকে দূরে সরে যেতে বললেন। কয়েকজন মুজাহিদ হাতিটিকে ঘেরাওয়ের মধ্যে নিয়ে বর্শা দিয়ে আঘাত করতে করতে ফেলে দিলো। কেউ এর সামনে গেলো না। পেছন থেকে এবং পাশ থেকে বর্শা ছুঁড়ে দিলো।

মুসান্না ঝাণ্ডা তো উঠালেন। কিন্তু মাজাহিদদের মধ্যে পালাই পালাই অবস্থা দেখে তিনি আতকে উঠলেন। আবু উবাইদের পর যে সাতজন মুজাহিদ শাহাদাতবরণ করেছিলেন তাদের সবাই কাবীলার সরদার ছিলেন। এজন্য মুসলমান সৈন্যদের মধ্যে হতাশা ছড়িয়ে পড়লো। মুসান্না অভিজ্ঞ ও বাস্তব সচেতন সালার ছিলেন। তিনি বুঝে ফেললেন লড়াই চালিয়ে যাওয়ার অর্থ আত্মহত্যা ছাড়া কিছুই না। এখন সবচেয়ে বড় কাজ হলো বেঁচে থাকা মুজাহিদদেরকে জীবিত এই কেয়ামতের ময়দান থেকে নদী পার করে মারূহায় নিয়ে যাওয়া।

মুসান্না কাউকে পালানোর হুকুম দিতে রাজী ছিলেন না। তিনি তার লশকরকে নিয়ে সুশৃংখলভাবে পিছু হটার কৌশল চিন্তা করছিলেন। মুজাহিদরা ক্লান্ত হয়ে প্রায় অচল হয়ে পড়েছিলো এবং অধিকসংখ্যক দুশমন তাদের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করেছিলো, আর অর্ধেকের চেয়ে বেশি যখমী আর শহীদ হয়ে গিয়েছিলো। এ অবস্থায় লড়াই চালিয়ে যাওয়া আদৌ সম্ভব ছিলো না।

ইতিমধ্যে তিনি দেখলেন সওয়ারী ও পদাতিক মুজাহিদরা নৌকার পুলের কাছে পৌঁছে গেছে এবং পিছনে সরে যাচ্ছে। ওদিকে মুসান্না তার কাসেদকে বলে দিলেন– লড়াই থেকে পিঠ বাঁচিয়ে সরদারদের অবস্থান পর্যন্ত পৌঁছে গিয়ে আমার পয়গাম দাও যে, তারা যেন নিজ নিজ সৈন্য নিয়ে পুলের ওপর দিয়ে পিছনে সরে যায়। কিন্তু পলায়নপর ভাবভঙ্গিতে নয়।

আবদুল্লাহ বিন মারছাদ ছিলেন আবু উবাইদার বনী সাকীফ গোত্রের। তিনি দেখলেন মুজাহিদরা পুলের ওপর দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে এবং সালার মুসান্নাও পিছু হটার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি অত্যন্ত জোশপ্রবণ আশেকে রাসূল ছিলেন। তিনি দৌড়ে গিয়ে নৌকাগুলোর রশি কেটে দিলেন। এতে পুলের সামনের দিকের পাঁচ ছয়টি নৌকা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো।

ঃ 'ইবনে মারছাদ!'– মুসান্না ক্ষিপ্ত গলায় বললেন– 'এটা তুমি কি করলে? আল্লাহর কসম!–তুমি কি চাচ্ছো আমরা সবাই অগ্নিপূজারীদের হাতে কেটে কুচি কুচি হই?'

ঃ 'হ্যাঁ ইবনে হারিসা!'–ইবনে মারছাদ বললেন– 'আমি পিছু হটার রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছি। আবু উবাইদ এবং সাতজন সরদার শহীদ হয়ে গেছেন, তারা সাকাফী ছিলেন আমিও সাকাফী। যেভাবে আমাদের সিপাহসালার ও সরদাররা শহীদ হয়েছেন আমরাও লড়াই করতে করতে সেভাবে শহীদ হবো।'

আবদুল্লাহ সাকাফী ঘোড়ার ওপর সওয়ার হয়ে ঘোষণা করলো–

ঃ 'আরবের লোকেরা! আল্লাহর অনুগত বান্দারা!– নিজেদের সালার ও সরদারের মতো লড়তে লড়তে জান দিয়ে দাও। ফিরে যাওয়ার রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে।'

❖ ❖

মুজাহিদদের মনোবল আগেই ভেঙে গিয়েছিলো। তারা যখন শুনলো পুলের রশি কেটে দেয়া হয়েছে তখন অবশিষ্ট মনোবলও খতম হয়ে গেলো। কয়েকজন তো নদীর দিকে দৌড়ে গিয়ে লাফিয়ে পানিতে পড়লো। নদী ছিলো খরস্রোতা। ঢেউয়ে উন্মাতাল। আর আরবের লোকেরা সাধারণ পুকুরেও সাতারে অভ্যস্ত ছিলো না। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই তারা ডুবে গেলো।

এবার মুসান্নাকে সত্যিই আতংক পেয়ে বসলো। ভয় তাকে জাপ্টে ধরলো। আর ভয় ছিলো- সৈন্যরা যদি এভাবে পালাতে চেষ্টা করে তবে নদীতে ডুবে মরবে অধিকাংশই। আর যারা সাঁতরে ওপারে যেতে চাইবে তারা পারসিকদের সহজ তীরের নিশানা বনে যাবে।

মুসান্না যথাসম্ভব তার হিম্মত ধরে রাখলেন। এ অবস্থার তিনি কখনো মুখোমুখি হননি। তিনি ঝাণ্ডাটি হাতে নিয়ে উঁচু করলেন। লড়াই তখন চলছিলো পুল থেকে অনেক দূরে। তারপর মুসান্না তার মুহাফিজ সৈন্যদেরকে বুঝিয়ে দিলেন যেমন করেই হোক যেখান থেকে পুলটি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে সেখানটা যেন কোনক্রমে জোড় লাগানো হয়।

এই প্রলয়ংকরী অবস্থায় এ ধরনের কাজের চিন্তা করাও অসম্ভব ছিলো। কিন্তু মুজাহিদরা নদীতে নেমে পড়লো। তাদের জন্য এতে কিছুটা হলেও সহজ হয়ে গেলো যে, নদীর তীর ঘেঁষা জায়গাটিতে পানি খুব গভীর ছিলো না। তারা রশি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া নৌকাগুলো ধরে ধরে কয়েকজনে মিলে খুব ঝাক্কি সয়ে রশিগুলো জোড়া দিয়ে দিলো। পুলটি আবার আগের মতো হয়ে গেলো।

ঃ 'মুজাহিদ ভাইয়েরা!'- মুসান্না নিজে ঘোষণা করলেন- 'নদীতে লাফিয়ে পড়ো না, পুল মেরামত হয়ে গেছে। আমি দুশমনকে ঠেকিয়ে রাখছি। তোমরা নিরাপদে পুল দিয়ে ওপারে চলে যাও।'

সারা ময়দানে এই ঘোষণাটি পৌঁছে গেলো। মুজাহিদদেরকে বলা হলো- তারা পলায়নপর অবস্থায় নয় লড়াই করতে করতে যেন পিছু হটতে হটতে পুল পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

মুসান্না তার মুহাফিজ ফৌজসহ আরো কিছু ফৌজ তার সঙ্গে রাখলেন। তার ডানে ও বায়ে কিছু তীরন্দায বাহিনীও দাঁড় করিয়ে দিলেন। মুজাহিদরা ময়দান থেকে বের হয়ে পুলের দিকে অগ্রসর হতে লাগলো। এতে পারসিকরা তাদের পিছু ধাওয়া করতে শুরু করলো। কিন্তু মুসান্না ও তার সঙ্গী মুজাহিদরাও তাদেরকে রুখে দিতে লাগলো। আর মুসলমান তীরন্দাযরাও তাদেরকে তীরের নিশানা বানাতে কসুর করলো না। এভাবে মুজাহিদরা আস্তে আস্তে পুল অতিক্রম শুরু করলো।

পারসিকরা মুসলমানদেরকে পুলের রাস্তায় যাওয়া থেকে প্রাণপণ বাঁধা দিতে চেষ্টা করলো। কিন্তু মুসান্না, তার জানবায সঙ্গীরা ও তীরন্দাযরা যেভাবে লড়ে যাচ্ছিলেন এতে পারসিকরা আগে বাড়তে পারছিলো না। মুসলমানদের ঝাণ্ডা মুসান্নার হাতেই সমুন্নত ছিলো।

আবদুল্লাহ ইবনে মারছাদ তখন দারুণ উদ্যোমে লড়ে যাচ্ছিলেন। এই চরম রক্তক্ষয়ী লড়াই থেকে যারা জীবিত ফিরে এলো তারা পরে বলেছে– আবদুল্লাহ পিছু হটার লোক ছিলেন না। এমন ক্রুদ্ধ গর্জনে তিনি লড়ছিলেন যেন পাগল হয়ে গেছেন। তার সামনে যেই পড়লো সেই দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেলো। এক মুসলমান ও আরেক ফরাসী সওয়ার মুখোমুখি লড়ছিলো। উভয়ের ঘোড়াই বড় তীব্র গতিতে কখনো ডানে কখনো বায়ে আগ পিছ করছিলো। একবার একটি ঘোড়া দ্রুত পিছু হটলো, আবদুল্লাহ এক ফরাসীকে তখন ফেলে দিয়েছিলেন। পিছু হটা ঘোড়ার দিকে তার পিঠ ছিলো। ঘোড়া এত তীব্রগতিতে পিছু হটলো যে, আবদুল্লাহর সঙ্গে পিঠাপিঠি সংঘর্ষ হলো। আবদুল্লাহ পড়ে গেলেন। তিনিও এতো ক্লান্ত ছিলেন যে, আর উঠতে পারলেন না। প্রথমে ঘোড়ার পেছনের পা দুটো তার পেটের ওপর গিয়ে পড়লো পরে ঘোড়ার সামনের পাও শরীরে উঠে এলো।.... আবদুল্লাহ শহীদ হয়ে গেলেন।

মুসলমানরা খুব দ্রুতই পুল পর্যন্ত পৌঁছে গেলো। মুসান্না তার সঙ্গীদের নিয়ে দুশমনকে পথেই আটকে দাঁড়াচ্ছিলেন এবং অসাধারণ বীরত্বে লড়ছিলেন।

ঃ 'তাদেরকে পালাতে দিয়ো না'– এই আওয়াজ বাহমনের ছিলো – 'সামনে গিয়ে পুল ভেঙে দাও।'

পারসিকরা পুল পর্যন্ত পৌঁছার জন্য জানবাজি রেখে এগুতে চাচ্ছিলো। কিন্তু তাদের সামনে মুজাহিদদের ক্রোধ বর্ষণের দেয়াল দাঁড়িয়েছিলো।

ঃ 'ওদের ঝাণ্ডা ফেলে দেয়ার চেষ্টা করো'– এটা ছিলো জালিয়ুনুসের আওয়াজ।

মুসলমানদের ঝাণ্ডা মুসান্নার কাছে দাঁড়ানো এক মুজাহিদের হাতে ছিলো। মুসান্না জালিয়ুনুসের আওয়াজ শুনে সেই মুজাহিদের হাত থেকে ঝাণ্ডাটি নিয়ে তার দু'হাতে উঁচু করে ধরলেন।

ঃ 'এই ঝাণ্ডা কখনো মাটিতে লুটায় না'– মুসান্না জবাবী শ্লোগানে বললেন।

সঙ্গে সঙ্গেই পারসিকদের নিক্ষিপ্ত একটি বর্শা মুসান্নার বুকের নিচের অংশে লাগলো, তবে বর্শার অগ্রভাগ শরীরে বিদ্ধ হলো না। কারণ মুসান্নার গায়ে কোন এক ফারসী ফৌজের শিকলযুক্ত বর্ম পরা ছিল। এর দ্বারা শুধু বুক আর পিঠই আবৃত ছিলো। তবে বর্শার ভাঙ্গা একটি টুকরা তার পাঁজরে ঢুকে পড়লো। এতে তিনি ভালোই যখমী হয়ে পড়লেন। কিন্তু মুসান্না পরওয়া করলেন না। ঝাণ্ডা সমুন্নত রাখলেন।

মুসান্নার ডানে বায়ে দু'জন জানবায ফৌজ মুসান্নাকে হেফাজত করছিলেন। একজন ছিলেন সালীত (রা) অপরজন এক খ্রিষ্টান– আবু যুবায়েদ আততায়ী। এরা দুজন এমন জানতোড় লড়ে পারসিকদের রুখছিলেন যে, আবু যুবায়েদ আততায়ী মারাত্মক যখমী হয়ে পড়লেন। আর সালীত (রা) শহীদ হয়ে গেলেন।

অবশেষে জীবিত আর অক্ষত মুজহিদরা পুল অতিক্রম করে গেলো। মুসান্নার যখম থেকে রক্ত ঝরছিলো। চরম যন্ত্রণাও দিচ্ছিলো। কিন্তু সেদিকে তিনি মন দিলেন না। তীরন্দাযদেরকে তার পেছেনে রেখেছিলেন। তারা তীর বর্ষণ করতে করতে পিছু

হটছিলো। মুসলমানদের ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ তো ছিলো অকল্পনীয়, পারসিকদেরও ক্ষয়-ক্ষতি কম হয়নি। তারা আর সামনে বাড়ার সাহস করলো না। তবে তারা তীর ছোড়া অব্যাহত রেখেছিলো।

মুসলমানরা পুলের ওপর থেকে পেছনে চেয়ে দেখলো– পারসিকরা পুলের মুখে ভীড় করছে। তারা সম্ভবত মুসলমানদের ধাওয়া করতে চাচ্ছিলো। মুসান্নার হুকুমে পুলের রশি কেটে দেয়া হলো এবং কয়েকটি নৌকা ভেঙ্গেও দেয়া হলো।

মুসলমানদের গুণে দেখা হলো। নয় হাজারের মধ্যে মাত্র তিন হাজার জীবিত ফিরতে পেরেছিলো। গুরুতর আহতদের উদ্ধার করা গেলো না। সালীত ইবনে কায়েস (রা), আবু যায়েদ আনসারী (রা), উকবা বিন কিবতী, ইয়াযীদ ইবনে কায়েস (রা), আবদুল্লাহ বিন কিবতী (রা) এবং আবু উমাইয়া (রা) এর মতো প্রখ্যাত সাহাবীরা শহীদ হয়ে গেলেন।

যেদিন এই তিন হাজার মুজাহিদ ফিরে এলো সেদিনটি ছিলো তের হিজরীর রমযান মাসের এক শুক্রবার। মুসান্নার ওপর অনেক বড় এবং ভয়ানক দায়িত্ব এসে পড়লো। তার সঙ্গের অভিজ্ঞ সব সালার ও প্রভাবশালী সরদাররা শহীদ হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি নিজেও আহত হলেন। তার সঙ্গে ফৌজের যে অংশটি ছিলো তারা সবদিক থেকেই লড়াইয়ে অক্ষম হয়ে পড়েছিলো। কোথাও থেকে সেনা সাহায্যেরও আশা ছিলো না।

তাই মুসান্নার ওপর আপনিতেই এই পরাজিত অচল ফৌজকে বাঁচানোর দায়িত্ব এসে পড়েছিলো। এর একটাই মাত্র উপায় ছিলো– তাদের দূরে কোথায় নিয়ে গিয়ে সুস্থির হতে দেয়া এবং খুব দ্রুত। বাহমন জাদাবিয়া যে তাদের পিছু নেবে এটা তিনি নিশ্চিতই ধরে নিয়েছিলেন। বাহমনই পারসিকদের প্রথম জেনারেল ছিলো যে মুসলমানদের পরাজিত করেছিলো। সে সম্রাজ্ঞী পুরান আর রুস্তমের চোখের তারকা বনে গিয়েছিলো। মুসান্না জানতেন বাহমন মুসলমানদেরকে তার প্রাণের শত্রুদেরও অধম মনে করে। সে এই সুযোগ থেকে পুরো ফায়দাই উঠাবে। এই ক্লান্ত পরাজিত মুজাহিদদের পিছু ধাওয়া করে তাদেরকেও খতম করে দেবে।

ঃ 'প্রিয় সঙ্গীরা আমার!'– মুসান্না তিন হাজার মুজাহিদের উদ্দেশে বললেন–

ঃ 'সিপাহসালার আবু উবাইদের ভুলের শাস্তি আমরা পেয়েছি। তোমরা যে জীবিত ফিরে এসেছো এটাও তোমাদের বাহাদুরি। জয়-পরাজয় আল্লাহর হাতে। তোমরা যে দুশমনের সামনে হাতিয়ার রেখে আত্মসমর্পণ করোনি এটাও তোমাদের বিজয়। মহান আল্লাহর দরবারে তোমরা প্রার্থনা করো। আমরা ইনশাআল্লাহ এই পরাজয়ের প্রতিশোধ নেবো। এখানে আর বিলম্ব করার সময় নেই। ফারসীরা আমাদের ধাওয়া করবেই। আমরা এখন লড়াইয়ে নামতেও সক্ষম নই। তোমাদের সামনে এগুতেই হবে। পালা করে সবাই ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে এগুতে থাকো, আমরা কোন মনযিলে পৌঁছে পরবর্তী লড়াইয়ের প্রস্তুতি নেবো।'

তারা সেখান থেকে হীরাতে গিয়ে পৌঁছলো। মুসান্না সেখানেও পেছন থেকে ধাওয়া খাওয়ার আশংকা করছিলেন। মুজাহিদদেরকে তিনি সেখানে কিছু সময় আরাম ও খাবার দাবারের সময় দিলেন এবং পরদিন ভোরে তারা হীরা থেকে কিছুটা দক্ষিণে আলিয়াস নামক স্থানে গিয়ে পৌঁছলো। মুসান্না তার সহকারী নিযুক্তি করলেন। যে পুরো অভিজ্ঞ

না হলেও আনাড়ি ও নবীন ছিলো না। তার মধ্যে চমৎকার একটা বোধ তৈরি হয়ে গিয়েছিলো যে, তার মনে প্রতিশোধের জ্বালা সব সময় তাকে যন্ত্রণা দিতো।

'দিন রাত সজাগ-সচেতন থাকবে।'– মুসান্না তাকে বলেছিলেন– 'অগ্নি পূজারীরা আমাদের পিছু আসছে....আমি হয়রান হচ্ছি তারা কেন এখনো এসে পৌঁছালো না।'

অগ্নিপূজারীরা মুসলমানদের পিছু পিছু আসছে এই আশংকা মুসান্নাকে হররোজ পেরেশান করছিলো। কিন্তু অগ্নি পূজারীদের সালার বাহ্‌মনের পিছু ধাওয়া করার ফুরসত ছিলো না তখন। মুসান্না যখন মুসলমানদেরকে নিয়ে নদী পার হয়ে পিছু হটছিলো এবং বাহ্‌মন ও জালিয়ুনুস তার স্বরে চিৎকার করে বলছিলো– 'তাদেরকে যেতে দিয়ো না– শেষ করে দাও'। তখন বাহ্‌মনের এক ব্যক্তিগত গুপ্তচর মাদায়েন থেকে এসে তাকে জানালো– মাদায়েনে ফৌজি অফিসার ও শহরীরা দু'দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। এখন তারা প্রকাশ্যে একে অপরকে উস্কানি দিচ্ছে।

ঃ 'এটা তো আপনি জানেন যে– এক দল রুস্তমের সমর্থক আরেক দল ফায়রোযানের'– গুপ্তচর বললো– 'ফায়রোযানও বড় জেনারেল। তার সমর্থকও বেশি। মালিকায়ে ফারিস তো নামকাওয়াস্তে সম্রাজ্ঞী, তিনি তো সম্রাজ্ঞীর সমস্ত অধিকার রুস্তমকে সমর্পণ করেছিলেন।'

ঃ 'পুরানই সম্রাজ্ঞী'– বাহ্‌মন বললো– 'কিন্তু কার্যত ক্ষমতা রুস্তমের হাতে'।

ঃ 'জালিয়ুনুস!'– বাহ্‌মন বললো– 'অধিকসংখ্যক সেনা সমাবেশ করে আমার সঙ্গে মাদায়েন চলো। আমি তো স্পষ্ট গৃহযুদ্ধ দেখতে পাচ্ছি। এদিকে আমরা আরবদের পিষতে শুরু করে দিয়েছি আর ওদিকে গৃহযুদ্ধের প্রস্তুতি চলছে। এর পরিণাম এছাড়া আর কি হবে যে, আরবরা আবার আমাদেরকে পাদপিষ্ট করে মারবে!'

ঃ 'এটা পুরানের রূপের জাদু'– জালিয়ুনুস বললো– 'শাহী খান্দানের কাউকে তার বিয়ে করা উচিত ছিলো। তাহলে আর রুস্তম তার এতো কাছে যেতে পারতো না।'

ঃ 'চলো চলো সেখানে গিয়েই দেখা যাক কি হচ্ছে– বাহ্‌মন বললো– 'এদিকে এতো মোটা এক শিকার আমার হাত থেকে বেরিয়ে গেলো। আমি ঐ মুসলমানদেরকে পিছু ধাওয়া করে তাদেরকে খতম করতে চেয়েছিলাম--- তারা আমার হাত থেকে ফস্কে গেলো'!

নামারিকের লড়াইয়ে পরাজিত জেনারেল জাবানও তাদের সঙ্গে ছিলো। বাহ্‌মন তাকে ডেকে মাদায়েনের অবস্থা জানিয়ে বললো সে আর জালিয়ুনুস মাদায়েন যাচ্ছে।

ঃ 'তুমি চাইলে মুসলমানদের পিছু ধাওয়া করতে পারো'– বাহ্‌মন বললো– 'আমি তোমার জন্য সামান্য কিছু ফৌজ রেখে যাচ্ছি।'

ঃ 'আরবদের যে ফৌজ এখান থেকে পালিয়েছে তা তো সংখ্যায় আরো অনেক কম'– জাবান বললো– 'তোমরা চলে যাও। আমি মুসলমানদের পিছু নিচ্ছি। তাদের একজনকেও জীবিত ছাড়বো না।'

❖ ❖ ❖

জাবান মুসান্নার পশ্চাদ্ধাবনে একদিন এক রাত পর রওয়ানা হলো। এই সময়টুকু লেগেছিলো নৌকার পুল মেরামত করার কাজে। মুনান্না এ সময়ে আলিয়াস গিয়ে পৌঁছে ছিলেন।

আলিয়াস পূর্বেই মুসলমানদের বিজিত এলাকা ছিলো। সেখানকার দুই সরদার মুসান্নাকে মাদায়েনের অবস্থা ও বাহমন এবং জালিয়ুনুসের মাদায়েন গমন সম্পর্কে বিস্তারিত জানালো। আলিয়াসের উমারারা আগ থেকেই মুসলমানদের প্রভাবে প্রভাবান্বিত ছিলো। মাদায়েনের আভ্যন্তরীণ দলাদলি ও মুসলমানদের ধারাবাহিক বিজয়ের ফলে সালতানাতে ফারেসের যে ধস শুরু হয়ে গিয়েছিলো তা তারা জানতো। এজন্য আলিয়াসের উমারা ও নেতৃস্থানীয়রা মুসলমানদের ওফাদার হয়ে গিয়েছিলো।

একদিন আলিয়াসেরই এক লোক মুসান্নাকে জানালো মাদায়েনের ফৌজ আসছে। আগে থেকে জানতে পেরে মুসান্না এ থেকে ফায়দা উঠাতে ভুললো না। মুজাহিদদেরকে তৈরি করে তিনি জাবানের আগমনের রাস্তার দু'দিকে লুকিয়ে ফেললেন। আলিয়াসেরও স্থানীয় কয়েকজন মুসলমানদের দলে যোগ দিয়েছিলো।

জাবান মোটেও টের পেলো না। আস্তে আস্তে মুসলমানদের জালে তার ফৌজ আটকে গেলো। আচমকা তার ফৌজের ওপর দু'দিক থেকে হামলা হলো। মুজাহিদরা তাদের পরাজয়ের প্রতিশোধ কাটায় কাটায় নিলো। ঝরে যাওয়া তাদের প্রতিটি রক্তবিন্দুর বদলা নিলো। একজন ফারসীকেও জীবিত ছাড়লো না। জাবানকে জীবিত পাকড়াও করে মুসান্নার সামনে হাজির করা হলো।

ঃ 'আমার মনে আছে জাবান!'– মুসান্না বললেন– 'নামারিকে তুমি আমাদের এক সাদা দিল মুজাহিদকে ধোঁকা দিয়ে রেহাই পেয়ে গিয়েছিলে? এখন আর নয়'----।

মুসান্নার ইশারায় জাবানকে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলা হলো।

ওদিকে মাদায়েনে আরেক নাট্যমঞ্চের পর্দা উঠছিলো।

মদীনায় হযরত উমর (রা) মসজিদে ঢুকার সময় মসজিদের দিকে আগত এক ব্যক্তির দিকে তার দৃষ্টি চলে গেলো। তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন।

ঃ 'ইবনে যায়েদ!'– উমর (রা) হয়রান হয়ে আগন্তুককে জিজ্ঞেস করলেন– 'তুমি কি মুসান্নার সঙ্গে ইরাক গিয়েছিলে না? তোমার অবস্থা বলছে তুমি রণাঙ্গন থেকে আসছো---- কি খবর নিয়ে এসেছো?'

আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ কাছে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর দু'চোখ বেয়ে অশ্রুর বন্যা বয়ে গেলো। মারুহা থেকে যারা মদীনায় পালিয়ে এসেছিলো তিনি তাদেরই একজন ছিলেন। আবদুল্লাহ উমর (রা) কে সব খুলে বললেন। আবু উবাইদের ভুলের কারণে কিভাবে পারসিকরা মুসলমানদেরকে হত্যা করেছে– বিস্তারিত জানালেন।

হযরত উমর মসজিদের দরজায় এমন নির্বাক মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইলেন যেন এজগতে তার দেহটিই আছে প্রাণ উড়ে গেছে। আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ দাঁড়িয়ে কাঁপছিলেন। উমর (রা) এর মতো কঠিন মেজাজের খলীফা না জানি এখন কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

মুসান্না তার ভাইয়ের লাশ যেমন পরম মমতায় ও শ্রদ্ধায় উঠালেন তেমন মমতা-মর্যাদায় উঠালেন আনাস বিন হেলালকে এবং পেছনে সরে এসে তার ভাইয়ের লাশের সঙ্গেই তাকে শুইয়ে দিলেন।

আবু উবাইদের ভুলের কারণে যে লড়াইয়ে মুসলমানরা পরাজিত হয়েছিলো তার নাম ছিলো জিসিরের যুদ্ধ। জিসিরের ময়দানে হাজারো লাশের স্তূপ মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছিলো। খুনে সারা ময়দান ভেসে যাচ্ছিলো। কে আরব কে অনারব তা চেনার উপায় ছিলো না। মৃত ঘোড়ার নিচে চাপা পড়েছিলো মানুষ, ঘোড়ার ওপর মানুষের লাশ। যখমী ঘোড়াগুলো লাগামহীন দিক বিদিক ছোটাছুটি করছিলো। শুঁড় কাটা হাতিগুলো রক্ত ঝরে যাওয়ায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করছিলো।

এসব লাশের মধ্যে গুরুতর আহত আরবী-ফারসী সৈন্যরাও ছিলো। তাদের মধ্যে কেউ উঠতে চেষ্টা করছিলো। হামাগুড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে আবার পড়ে যাচ্ছিলো। কেউ কেউ অজ্ঞান হয়ে। ধীরে ধীরে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছিলো। মুসলমানরা তাদের মৃত সঙ্গীদের লাশ এভাবে ময়দানে ফেলে যেতো না। আর যখমীদের উদ্ধারের জন্য তো নিজেদের জান তোড়ে দিতো। কিন্তু জিসারের ময়দানে সেটা সম্ভব ছিলো না। কারণ নিজেদেরই তখন বাঁচা মরার প্রশ্ন ছিলো। পারসিকরাও তাদের যখমীদের তোলার সুযোগ দিলো না। মাদায়েনের গৃহযুদ্ধের সংবাদ এবং মুসলমানদের পিছু ধাওয়ার কারণে তারা এদিকে তাকানোরই সুযোগ পায়নি। আর মৃতদের লাশ উঠানোর তো রেওয়াজই ছিলো না তাদের মধ্যে। তাদের ফৌজ শুধু হুকুমতের বেতনভুক্ত কর্মচারী ছিলো। হুকুমত তাদের সঙ্গে সাধারণত কর্মচারীর মতোই ব্যবহার করতো। তাদের দৃষ্টিতে একজন সৈনিকের মৃতদেহ একটি ঘোড়ার মৃতদেহের মতোই সমান ব্যাপার ছিলো।

সূর্যাস্তের পরপরই শিয়াল, জংলী কুকুর এবং অন্যান্য মাংসাশী জানোয়ার মৃতদেহগুলোর ওপর হামলে পড়লো। যে কোন লড়াই শেষের পর নিয়মিত দৃশ্য ছিলো এটা। আরেকটা দৃশ্যও প্রায় নিয়মিতই ছিলো। লড়াই যদি কোন আবাদীর আশে পাশে হতো এবং দুপক্ষেরই সৈন্যরা চলে যেতো তখন বসতির অনেকেই সেখানে পৌঁছে যেতো। তারপর মৃতদের পরিত্যক্ত জিনিসগুলো লুট করে নিয়ে যেতো।

জিসিরের যুদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়ার পর যখন সূর্য ডুবে গেলো তখন আশে পাশের শহর ও গ্রাম থেকে এখানে লোকজন আসতে লাগলো। বারসিমা, যাদাবী এবং কসুন্নাতিকের লোকেরাও এসেছিলো। তাদের মধ্যে যুবতী, মধ্যবয়স্কা এবং বৃদ্ধা মহিলারাও ছিলো। তাদের মধ্যে কেউ মা ছিলো, কেউ স্ত্রী, কেউ বোন, এবং কেউ কারো কন্যাও ছিলো।

তাদের অধিকাংশই লুটপাটের জন্য এসেছিলো। আবার অনেকে এসেছিলো লাশের পড়ন্ত স্তূপ থেকে নিজেদের আপনজনের তালাশে। যারা পারস্যের সৈনিক ছিলো, তাদের কেউ কেউ তো জানতো তাদের ছেলে, ভাই বা স্বামী এই যুদ্ধে লড়েছে। আবার কেউ কেউ সন্দেহের বশে এসেছিলো। তারা এটাও জানতো, কিছু যখমীকে এখনো জীবিত পাওয়া যাবে।

তাদের সবার সঙ্গেই ছোট বড় মশাল ছিলো। মশালের কারণে স্তূপিকৃত লাশ আর যখমীদের লম্বা লম্বা ছায়া বড়ই ভীতিকর দৃশ্যের অবতার কর ছিলো। পুরুষরা লাশের গা থেকে হাতিয়ারগুলো খুলে নিচ্ছিলো। আর মহিলারা লাশের চেহারা দেখে দেখে চেনার চেষ্টা করছিলো। কখনো কখনো কোন মহিলার আর্তচিৎকার শোনা যেতো– 'হায় আমার বেটা'!– 'হায় আমার ভাই!'– 'হায় আমার স্বামী!' চারদিক থেকে এমন করুণ আর্তচিৎকারের রোল উঠছিলো।

বারসীমার এক ষোল-সতের বছরের নবযৌবনাও হাতে মশাল নিয়ে তার ভাইকে তালাশ করছিলো। তার সঙ্গে তার মা-বাবাও এসেছিলো। তারা আলাদা আলাদা হয়ে বিভিন্ন লাশের চেহারা শনাক্ত করছিলো। কিছুক্ষণ পর তারা সবাই একত্রিত হলো।

ঃ 'তোমরা কেন আমার কথা শুনছো না– বাবা মেয়ে ও তার মাকে বললো– 'সে সিকাতিয়ার লড়াইয়েই মারা গিয়েছিলো। সংবাদদাতা সঠিক খবরই দিয়েছিলো, তারপরও তোমরা তাকে তালাশ করতে এখানে চলে এসেছো।'

ঃ 'সংবাদদাতার কথায় বেশ সন্দেহ ছিলো'– মা বললো– 'আজকের লড়াইয়ে তো সে মারা গিয়ে থাকতে পারে'?

ঃ 'আরো কিছুক্ষণ দেখে নিলে দোষ কি?'– মেয়ে বাবাকে বললো।

ঃ 'দেখো দেখো'......বাবা ঝাঁঝালো গলায় বললো– 'যাও যাও দেখো।'

একটি ছিলো মায়ের মন আরেকটি বোনের মন। তাই তাদের বিশ্বাস হচ্ছিলো না। তারা আবার পরস্পর থেকে আলাদা হয়ে গেলো এবং ঝুঁকে ঝুঁকে লাশগুলোর চেহারা পরখ করতে লাগলো।

কিছুক্ষণ পর মেয়েটি একটি লাশের সামনে থেমে গেলো। লাশটি মাটিতে পড়া ছিলো না। বরং তার পিঠ একটি গাছের সঙ্গে ঠেস দেয়া ছিলো, পা দুটো সামনে ছড়ানো। যেন জীবিত কোন মানুষ গাছের সাথে পিঠ লাগিয়ে বসে আছে। তার এক পায়ের উরুর অংশের সঙ্গে তার কাপড় লেপ্টানো ছিলো। কাপড়টি একেবারে রক্তে মাখামাখি হয়ে গিয়েছিলো। দ্বিতীয় পায়ের কাপড়ও এমন লেপ্টানো ছিলো। লাশটি কোন ফারসীর নয়, আরবীর ছিলো। আর মেয়েটিও যেহেতু পারসিক ছিলো তাই কোন আরবের প্রতি তার কোন আগ্রহ ও সহানুভূতি থাকার কথা ছিলো না। কিন্তু মেয়েটি তার সামনে বসে মশালটি একটু ওপরে উঠিয়ে গভীরভাবে আরব মুসলমানের লাশটি পরখ করতে লাগলো। হঠাৎ লাশটির চেহারা একদিকে সরে গেলো। যেন মশালের তাপ থেকে বাঁচার জন্য মুখটি ফিরিয়ে নিলো। তার হাতটিও নড়ে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে ঠোঁট দুটি কেঁপে উঠে বেরিয়ে এলো 'পানি।'

ঃ 'আরে জীবিত'– মেয়েটির মুখ থেকে আপনিই বেরিয়ে এলো। সে মশালটি পেছনে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো– 'জীবিত?'– যেন তার বিশ্বাস হচ্ছিলো না।

যখমী লোকটি তার দিকে মুখ করে কোন রকমে মাথায় ইশারা করলো। যার অর্থ সে জীবিত।

মেয়েটি এদিক ওদিক পানি খুঁজতে লাগলো। পানি সেখানে কম ছিলো না। তাদের সিপাহীরা নিজেদের সঙ্গে পানির মশক রাখতো। একটি মশক সেও পেয়ে গেলো। মশকটি উঠিয়ে দৌড়ে এসে যখমীর মুখে মশকের মুখটি তুলে ধরলো।

ঃ 'কাকে পানি পান করাচ্ছো যামরাদ?'– এক লোকের গর্জন শোনা গেলো" 'এতো আরবী, আমাদের সৈন্য নয়। মুসলমান সে। সামনে থেকে সরে বসো।'

লোকটি তরবারি বের করে আহতকে হত্যা করার জন্য আগে বাড়লো। এটা দেখে যামরাদ তার দু'হাত ছড়িয়ে যখমী লোকটির সামনে ঢাল বনে দাঁড়িয়ে গেলো।

ঃ 'না বাবা।' যামরাদ বললো– 'তুমি তার কথা ভুলে গিয়েছো। কিন্তু আমি ভুলতে পারিনি। এই লোক আমার বেইয্যতীর বদলা নিয়েছিলো। আমি তাকে চিনতে পেরেছি।'

তুমি একে নিয়ে কি করবে?'– বাবা জিজ্ঞেস করলো– 'তাকে এখানেই রেখে দাও। আমি একে মারবো না। সে এমনিই মরে যাবে।'

ঃ 'আমি ওকে মরতে দেবো না'– যামরাদ বললো– 'আমাকে সাহায্য করো বাবা।'

ঃ 'আমাকে কি তুমি কতল করাতে চাও?– বাবা বললো– 'কোন ফৌজ যদি দেখে ফেলে যে, আমি একজন আরবীকে সাহায্য করছি তবে একেসহ যে আমাকেও হত্যা করবে।'

ঃ 'তাহলে তুমি চলে যাও বাবা! যামরাদ বললো।'

বারসিমার এক গ্রামে যে মেয়েটি তার ইয্যত লুণ্ঠনকারী এক ফারসী সৈনিকের গর্দানে তরবারি চালাতে পারছিলো না। কাঁপতে কাঁপতে তরবারি নামিয়ে নিয়েছিলো এবং সালার মুসান্না ইবনে হারিসার হাতে তরবারি ফিরিয়ে দিয়েছিলো, তখন এক মুজাহিদ দৌড়ে এসে তার তরবারিটি কোষমুক্ত করে এক আঘাতে ফারসী সৈনিকটিকে দ্বিখণ্ডিত করে তার বেইয্যতীর প্রতিশোধ নিয়েছিলো। এরপর মেয়েটির মাথায় হাত রেখে বলেছিলো– 'আমিই তোমার ইয্যতের হেফাজতকারী।' একথা বলেই মুজাহিদটি ঝড়ের গতিতে তার স্বস্থানে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ছিলো। আর মেয়েটি ফ্যালফ্যাল করে মুজাহিদটির মুখপানে চেয়েছিলো। সেই মেয়েটিই এই যামরাদ। আর সেই মুজাহিদটিই এই যখমী। যার নাম সুহায়েব সাকাফী। অসাধারণ বীরত্বের জন্য সে প্রসিদ্ধ ছিলো। সেদিন মুসান্নার ফৌজসহ সুহায়েব যখন সেখান থেকে চলে গেলো যামরাদ তখন তার চলে যাওয়া পথটির দিকে নির্নিমেষ তাকিয়েছিলো। সে রাতে তার দু'চোখ আর এক করতে পারেনি সে। ক্ষণে ক্ষণে তার বীরত্বের দীপ্তিমাখা মুখটি ভেসে উঠছিলো।

জিসিরের লড়াইয়ে মুসান্না যখন তার বেঁচে যাওয়া অবশিষ্ট মুজাহিদদের নিয়ে পুল দিয়ে নদী পার হচ্ছিলেন সুহায়েব সাকাফী তখন তার সঙ্গী মুজাহিদদেরকে নিয়ে পুল থেকে পারসিকদের দূরে রাখার জন্য লড়ছিলো। তার সঙ্গীদের মতোই একটু পিছু হটে লড়া উচিত ছিলো তার। কিন্তু সে আরো অনেক সামনে গিয়ে লড়তে লাগলো। এক ফরাসীর তলোয়ার হঠাৎ তার উরুর মাংস কেটে হাড্ডি পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছলো। সে সেই

ফারসীকে তো খতম করলো। কিন্তু নিজে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলো না। পড়ে গেলো। তারপর একটি ঘোড়া তার খুর দিয়ে তার গোড়ালিও মাড়িয়ে দিয়ে অনেকখানি ছাল তুলে দিয়ে চলে গেলো। সুহায়েব অনেকক্ষণ আর নড়তে পারলো না।

সে তার তিন হাজার মুজাহিদ সঙ্গীকে তো নদী পার করে দিলো। কিন্তু নিজে সেই জাহান্নাম থেকে বের হতে পারলো না। যখম থেকে রক্তের স্রোত বয়ে যাচ্ছিলো। যখমী পা দেহের ভারও বইতে পারছিলো না। সুহায়েব কোনক্রমে একটি গাছের নিচে গিয়ে পড়ে গেলো এবং এমনভাবে শ্বাস ফেললো যেন মরে গেছে। দুশমনের ফৌজ যখন চলে গেলো তখন কাছেই পড়ে থাকা একটি লাশের কোমরের পাশ থেকে রক্তে লেপ্টানো কাপড় খুলে নিলো। যেটি অর্ধ চাদরের মতো ছিলো। তারপর সেটি ছিঁড়ে যখমের ওপর আড়াআড়িভাবে বেঁধে ফেললো। উঠতে চেষ্টা করলো। কিন্তু দাঁড়াতে পারলো না। দেহের রক্ত দ্রুত ঝরে পড়ছিলো।

গাছের সঙ্গে কোন রকমে পিঠ ঠেকিয়ে কাত হয়ে বসে গেলো এবং মৃত্যুর প্রতীক্ষা করতে থাকলো। তার ঠোঁট দুটি আল্লাহর কালামে সামান্য কাঁপছিলো। কিন্তু তৃষ্ণা তার শরীরের সব জীবনী শক্তি শুষে নিয়েছিলো, গলা শুকিয়ে এমন কাঠ হয়ে গিয়েছিলো যেন গলায় কাটার সারি বসে গেছে। আস্তে আস্তে তার চোখ ঝাপসা হয়ে আসছিলো। সে মৃত্যুকে কবুল করে নিয়েছিলো। এটাই তার জন্য শান্তিদায়ক ছিলো। কিন্তু যখমের তীব্র ব্যথা তবুও তাকে অনেক পেরেশান করছিলো।

তারপর সে এমন বেহুঁশ হয়ে পড়লো যে, হুঁশ ফেরার সব সম্ভাবনাই খতম হয়ে গেলো।

অনেকবার সে ঝাপসা চোখে দেখলো বেহেশতের এক হুর মশাল হাতে নিয়ে তাকে কি সব বলছে, তারপর তাকে পানি পান করাচ্ছে!

সুহায়েবের দেহে যখন পানি গেলো তখন তার চেতনা ফিরে এলো। তার চোখ দুটি খুলে গেলো।

ঃ 'কে তুমি?'– সুহায়েব অস্ফুট গলায় যামরাদকে জিজ্ঞেস করলো– 'তুমি তো আরব নও।'

ঃ 'আরবী নই– তবে প্রয়োজনীয় আরবী বলতে পারি'– যামরাদ বললো– 'বারসিমার অধিবাসী আমি। তোমাকে ভালো করেই চিনি।'

'কেমন করে?'– সুহায়েব কাতর গলায় বললো– 'আমি তো তোমায় চিনতে পারছি না।'

যামরাদ তাকে সেই ঘটনাটি মনে করিয়ে দিলো।

ঃ 'এরপর থেকে তোমার কথা আমার হরদম মনে পড়েছে'– যামরাদ বললো– 'তুমি ঐ শয়তানের গর্দান দ্বিখণ্ডিত করে আমার মাথায় তোমার দৃঢ় হাতটি রেখে বলেছিলে–

ঃ 'আমিই তোমার ইয্যতের হেফাজতকারী।' আমি তো জানতাম আমাদের সৈন্যরাই আমাদের ইয্যতের হেফাজতকারী। অথচ আমাদের হেফাজতকারীরাই আমাদের ইয্যত লুটেছে।.... এখন এসব বলার সময় নয়। বলতো তোমাকে কি করে বাঁচিয়ে তুলবো? আমি তোমাকে এখানে পড়ে থাকতে দেবো না।'

'আমাকে আমার লশকর পর্যন্ত যেতে হবে'- সুহায়েব বললো- 'কিন্তু তুমি তো এ কাজ করতে পারবে না।'

ঃ 'আমি তোমাকে বারসিমা নিয়ে যাবো'- যামরাদ বললো- 'আমার ঘরে নিয়ে রাখবো।'

ঃ 'কোন ফারসী ফৌজ দেখে ফেললে আমার সঙ্গে তোমাকেও কতল করে দেবে'- সুহায়েব বললো- 'তুমি চলে যাও। আমাকে আমার মতোই থাকতে দাও। সামান্য কিছু সময়ের মেহমান মাত্র আমি। আমার চোখ দুটো আর সকালের সূর্য দেখবে না। আমার মৃত্যুর সময় তোমাকে কোন বিপদে ফেলতে চাই না।'

যামরাদ সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে 'আসছি' বলে চলে গেলো।

একটি ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে একটু পরেই সে চলে এলো, এক লাফে নেমে সুহায়েবের হাত ধরে তাকে উঠানোর জন্য কসরৎ করতে লাগলো।

ঃ 'হিম্মত করে উঠে পড়ো'- সে বললো- 'যেভাবে হোক ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে যাও এবং খুব দ্রুত। এটা বাবার ঘোড়া। তিনি আশে পাশেই কোথাও আছেন। তিনি দেখে ফেললে সব মাটি হয়ে যাবে।'

যামরাদ সুহায়েবকে উঠিয়ে এমনভাবে তাকে ধরে রাখলো যে, নিজের শরীরে তার দেহের পূর্ণ ভারটা নিয়ে নিলো। ঘোড়া কাছেই দাঁড়ানো ছিলো। প্রাণপণ চেষ্টা করে যামরাদ সুহায়েবের পা ঘোড়ার রেকাবিতে রাখলো এবং সুহায়েবকে তার কাঁধ ও পিঠের উপর উঠিয়ে ঘোড়ায় সওয়ার করালো। সুহায়েবের জন্য ঘোড়ার পিঠে বসে থাকাটা অসম্ভবই ছিলো।

ঃ 'পথেই আমি পড়ে যাব'- সুহায়েব যামরাদকে বললো।

ঃ 'তোমাকে তো আমি একা যেতে দিচ্ছি না'- যামরাদ বললো- 'তোমার সঙ্গে আমিও যাচ্ছি।'

যামরাদ ঘোড়ায় সুহায়েবের পেছনে সওয়ার হয়ে গেলো। সুহায়েবের পিঠ তার বুকের সঙ্গে লাগিয়ে বাহু দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরলো।

ঃ 'ঘোড়াকে তুমি কাবু করে রেখো আমি তোমাকে কাবুতে রাখবো'- যামরাদ বললো- 'আর নিজেকে সজ্ঞান রাখার চেষ্টা করো।'

ঃ 'কি হচ্ছে এটা'?- 'তারা একটি আওয়াজ শুনতে পেলো'- 'যামরাদ দাঁড়া।'

এটা ছিলো যামরাদের বাবার আওয়াজ। তাদের দিকে দৌড়ে আসছিলো।

ঃ 'এটা বাবার আওয়াজ'- যামরাদ বললো- তিনি ঘোড়া না পেয়ে এদিকেই আসছেন।' ঘোড়াকে সে খোঁচা দিয়ে বললো- 'সামলে বসো----পুলের দিকে চল্।'

ঘোড়া এদিক সেদিক ছড়িয়ে থাকা লাশগুলোর ওপর দিয়ে ছুটে পুলের ওপর গিয়ে পৌঁছলো। যামরাদ মশাল ফেলে দিয়েছিলো। যামরাদের চাচা চিৎকার চেচামেচি করতে করতে হাচড়ে পাচড়ে ছুটছিলো। কিন্তু ঘোড়া ততক্ষণে পুলও পার হয়ে গেছে।

পারস্যের দারুল হুকুমত মাদায়েনের আকাশে জমছিলো বিভক্তির কালো মেঘ। সম্রাজ্ঞী পুরান আর রুস্তমকে ঘিরেই এর আনাগোনা চলছিলো। ফায়রুযান ও মেহরান মাদায়েনের অন্যতম জেনারেল ছিলো। এরা বাহমন জাদাবিয়া ও জালিয়ুনুসের সমপর্যায়েরই জেনারেল ছিলো। কিন্তু রুস্তম এদেরকে উপেক্ষা করে বাহমন আর জালিয়ুনুসকেই প্রাধান্য দিতো। ফায়রুযান ও মেহরানের মনে এজন্য বিদ্বেষ পুঞ্জীভূত হতে থাকে। রুস্তম যখন বাহমন ও জালিয়ুনুসকে বিশাল সৈন্য ও হাতিবহর দিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে পাঠালো তখনই তা ঝড়ের রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করলো।

ফৌজকে বিদায় দিয়ে রুস্তম আর পুরান মহলে ফিরে গেলো। ফায়রুযান তার এক লোককে বলে রেখেছিলো, রুস্তম এদিক ওদিক চলে গেলে তাকে যেন জানানো হয়, কিছুক্ষণ পরেই সে জানতে পারলো রুস্তম পুরানের কাছ থেকে চলে গেছে। ফায়রুযান কোন অনুমতি ছাড়াই পুরানের মহলে গিয়ে হাজির হলো।

ঃ 'বিনা অনুমতিতে চলে আসাতে আমার এই দুঃসাহস মালিকায়ে ফারিসের হয়তো ভালো লাগবে না'– ফায়রুযান বললো।

ঃ 'ফায়রুযান! বসো'– পুরান বললো– 'বিনা অনুমতিতে তোমার চলে আসাটা তো এতো খারাপ লাগছে না কিন্তু কিছু কথা আমার পর্যন্ত পৌঁছে যা আমার আর রুস্তমের সত্যিই খারাপ লেগেছে।'

ঃ 'এর পূর্বে আমি একটি কথা জিজ্ঞেস করতে চাই। মালিকায়ে আলিয়ার হয়তোবা খারাপ লাগছে'– ফায়রুযান বললো– 'আমি এটা জিজ্ঞেস করা জরুরি মনে করছি যে, রুস্তম কে? সে কি শাহীখান্দানের কেউ? কিসরার কোন বংশধর সে? মেহরান ও আমার মতোই সে একজন জেনারেল মাত্র।'

ঃ 'তুমি কি জানো না ওকে আমি সব অধিকারই দিয়েছি'– পুরান বললো– 'এটাও কি জানো না আমি এই ফয়সালা সালতানাতে ফারিসের নিরাপত্তা ও এর হেফাজতের জন্যই করেছি? আমি সেদিনই নিজেকে পারস্যের সম্রাজ্ঞী মনে করবো যেদিন আমার কানে এই খবর আসবে যে, এখন আর পারস্যের পবিত্র মাটিতে কোন জীবিত মুসলমান নেই এবং পারস্যের হারানো এলাকাগুলো ফিরে পাওয়া গিয়েছে।'

ঃ 'মালিকায়ে ফারিসা'!– ফায়রুযান বললো– 'কিন্তু আপনার ও রুস্তমের মধ্যে যা হচ্ছে তা যদি চলতে থাকে তবে সেদিন আর কখনো আসবে না।'

ঃ 'ফায়রুযান!'– পুরান বললো– 'মনে হচ্ছে তোমার মনে রুস্তমের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত কোন বিদ্বেষ রয়েছে!'

ঃ 'না মালিকায়ে আলিয়া!'– ফায়রুযান বললো– 'বিদ্বেষের কথা যদি উঠে তবে রুস্তমের মনেই যথেষ্ট বিদ্বেষ রয়েছে। বাহমন ও জালিয়ুনুস ছাড়া আর কাউকেই তার নজরে পড়ে না। এরা তো হেরে যাওয়া জেনারেল। এরা শুধু পিছুই হটেনি বরং নিজেদের ফৌজকে ছেড়ে পালিয়ে আসা জেনারেল।

'আমি তোমার অভিযোগ বুঝতে পেরেছি ফায়রুযান!'–

ঃ 'আপনি কিছুই বুঝেননি মালিকায়ে আলিয়া!'– ফায়রুযান বললো– 'আপনি ভুলে যাচ্ছেন পারস্যের সিংহাসন নিয়ে শাহী খান্দানে কতো প্রাণ বিনষ্ট হয়েছে। যেই তাতে বসেছে নিহত হয়েছে। আমি জানি আপনি রুস্তমকে নিয়ে সিংহাসনকে সামরিক হেফাজতে নিয়ে এসেছেন। কিন্তু রুস্তমের ওপর আপনি এতটা নির্ভর করে ঠিক করেননি। তারপর তার সঙ্গে আপনার ব্যক্তিগত সম্পর্ক পাতিয়ে আরো খারাপ করেছেন।--- মালিকায়ে আলিয়া! আমার মধ্যে পারস্যের ভালোবাসা ও ব্যথা রয়েছে। পারস্যের সঙ্গেই আমার ওফাদারী। আপনার সঙ্গে নয়। আমি এটা বলতে মোটেও ভীত নয় যে, রুস্তম আপনার রূপ যৌবনে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। তাকে আপনি স্বস্তি আর আনন্দে রাখতে চান। এজন্য তাকে আপনি এই এযাজত দিয়ে রেখেছেন যে, সে আপনার দেহসুধা নিয়ে খেলা করতে পারবে। আপনার সঙ্গে ভালোবাসার অভিসার করতে পারবে।'

ঃ 'ফায়রুযান!'– পুরান রাগে ফেটে পড়ে বললো– 'তোমার অবস্থান ভুলে যেয়ো না। ভুলে যেয়ো না আমি এই সালতানাতের সম্রাজ্ঞী আর তুমি কর্মচারী। আমার প্রতি তুমি এমন নেংরা দোষরোপ করছো?'

ঃ 'মালিকায়ে ফারিস!'– ফায়রুযান নির্বিকার কণ্ঠে বললো– 'আমি যা বলছি চিন্তা-ভাবনা করেই বলছি। আপনি কোন পারস্যের সম্রাজ্ঞী? যার ফৌজ মুসলমানদের ভয়ে পালিয়ে আসছে? যার জেনারেল স্বীয় ফৌজের আগেই ময়দান ছেড়ে পালিয়ে এসেছে? সেই পারস্যের সম্রাজ্ঞী আপনি যার অর্ধেকেরই অধিক মুসলমানদের কব্জায় চলে গেছে?– আমি দূর ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করছি। মাদায়েনও যদি মুসলমানদের কব্জায় চলে যায় তবে সারা দুনিয়াকে তারা শোনাবে এবং হুমকি দিবে যে, কিসরা পারভেজ তাদের রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পয়গাম ছিড়ে ফেলেছিলো আর তাদের রাসূল বলেছিলেন– সালতানাতে ফারিসও এমন করেই ভেঙে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে। মুসলমানরা বলবে, দেখো আল্লাহর রাসূলকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অপদস্থকারীদের প্রতি কেমন গজব নাযিল হচ্ছে। আমি আরবের মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর ভবিষ্যদ্বাণী কখনো পূর্ণ হতে দেবো না।'

ঃ 'তুমি যেতে পারো'– পুরান রাজকীয় গাম্ভীর্য নিয়ে বললো– 'রুস্তমের সঙ্গে আমি কথা বলে দেখবো।'

ফায়রুযান কামরা থেকে বের হয়ে গেলো।

সূর্যাস্তের কিছুক্ষণ পূর্বে সারা মাদায়েন জুড়ে ফৌজী নাকারা বেজে উঠলো। শহরের লোকদের মধ্যে ভীতি ছড়িয়ে পড়লো– এই বুঝি মুসলমানরা এসে মাদায়েন অবরোধ করে নিচ্ছে। ফৌজের জেনারেল, অফিসার ও সাধারণ সিপাহীরা খুব দ্রুত ময়দানে জমা হতে লাগলো। সেনা অফিসাররা সবাইকে সামরিক শৃংখলায় দাঁড় করিয়ে দিলো।

রুস্তমকে দেখা গেলো ঘোড়ার ওপর সওয়ার হয়ে সমাবেশস্থলে আসছে, তার সঙ্গে তার ঘোড়সওয়ার মুহাফিজরাও ছিলো। রুস্তম সমাবেশস্থলের মাঝখানে এসে দাঁড়ালো। পুরো ফৌজের ওপর তার নজর ঘুরে গেলো। ফৌজের ওপর নিস্তব্ধতা নেমে এলো।

ঃ 'মালিকায়ে ফারিসের একটি হুকুম কান খুলে শুনে নাও'– রুস্তম বুলন্দ আওয়াজে বললো– 'ফৌজের যত বড় অফিসারই হোক না কেন বা যত সাধারণ সেনাই হোক না কেন কারো জন্য এই এজাযত নেই যে, সে মালিকায়ে আলিয়া পুরান দাখতের মহলে গিয়ে বা অন্য কোথাও গিয়ে সরাসরি কথা বলে। তাকে কোন পরামর্শ দিতে চাইলে স্বীয় অফিসারকে দাও। কারো কোন অভিযোগ থাকলে তাও নিজ নিজ অফিসারকে জানাবে। তোমাদের বলা সব কিছুই সেখানে পৌঁছে যাবে। তোমরা কি দেখছো না পারস্যের ওপর এখন কত কঠিন সময় যাচ্ছে। অর্ধেক পারস্য এখন মুসলমানদের দখলে। এর দায়িত্ব কে নেবে? তোমরা, কেবল তোমরাই।---- ফৌজ--- প্রতিটি ময়দান থেকে তোমরা পালিয়েছো। জেনারেলরাও পিঠ দেখিয়েছে। অফিসাররাও পালিয়েছে। এতো সেই ফৌজ ছিলো যারা রোমের হেরাকলকে পালাতে বাধ্য করেছিলো। রোমকদের চেয়ে শক্তিশালী কারা ছিলো? এতো বড় যুদ্ধশক্তির ওপর আমাদের পাঁচ আঙ্গুলের দাগ বসিয়ে দিয়েছি। যে ভীতি পারসিকরা কেবল রোমকদের ওপরেই নয় সারা দুনিয়ায় বিস্তার করেছিলো, আরবের ঠিকানাবিহীন বেদুইনরা আজ তা তোমাদের ওপর বিস্তার করেছে। আমি শুনেছি, তোমরা যখন 'আরব আসছে' খবর পাও ভয়ে কাঁপতে থাকো তখন। আজমীরা তো এমন বুযদিল– কাপুরুষ ছিলো না যে, আরবদের ভয় পেতে হবে।'

ঃ 'আরবদের চিরতরে পাদপিষ্ট করে মারার জন্য আমরা হাতিবহর পাঠিয়েছি। আমি এমন দু'জন জেনারেল পাঠিয়েছি যারা আরব্য মুসলমানদের রক্তে ফুরাতের পানিকে রঞ্জিত করবে। কিন্তু মাদায়েনে এমন লোকও আছে যাদের ওফাদারী ফারেসের সঙ্গে নয় বরং নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থ আর নেতৃত্বের সঙ্গে। তারা নির্লজ্জ হিংসুটে। মালিকায়ে ফারিসকে আমার বিরুদ্ধে উস্কানি দিচ্ছে– মালিকায়ে আলিয়া আমাকে যে দায়িত্ব দিয়েছেন তা যাতে রহিত করা হয়।'

ঃ 'খামোশ রও রুস্তম!'–একটি কণ্ঠের গর্জন শোনা গেলো– 'নেতৃত্বের ভুখা তো তুমি নিজেই।'

সমস্ত ফৌজের মধ্যে নীরবতা নেমে এলো। এটা ছিলো মাদায়েনের জেনারেল ফায়রুযানের আওয়াজ। সে তার ঘোড়া ছুটিয়ে রুস্তমের কাছে নিয়ে গেলো এবং সমবেত ফৌজের দিকে মুখ করে দাঁড়ালো।

ঃ 'আমি আমার চেয়ে উচ্চপদস্থ সালার সেনাপতির শানে গোস্তাখী করছি'– ফায়রুযান বললো–'এই অপরাধের শাস্তিও আমি মেনে নিচ্ছি। কিন্তু সত্য বলা থেকে আমাকে কেউ বিরত রাখতে পারবে না। আমি রুস্তমকে জিজ্ঞেস করছি সে কি এক বৃদ্ধ পাদ্রীকে বলেনি যে, নেতৃত্বের লোভ আর হুকুমতের লালসায় সে সালতানাতের যিম্মাদারী নিয়েছে? রুস্তম নিজেকে নিজে জ্যোতিষবিদ্যার পণ্ডিত মনে করে। ঐ পাদ্রীকে সে বলেছিলো, জ্যোতিষবিদ্যা বলছে, সালতানাতে ফারিসের পরিণাম শুভ

হবে না---। আমি বলছি কেন শুভ হবে না? এই লোকটির নিয়ত যদি ঠিক হয়ে যায় তবে সালতানাতে ফারিসের পরিণামও ঠিক হয়ে যাবে। বাহমন আর জালিয়ুনুসকে এই লোক এত কুশলী জেনারেল মনে করে যে, তারা নাকি মুসলমানদের রক্তে ফুরাতের পানি রঞ্জিত করে আসবে। কিন্তু কাণ্ড কি হয়েছে জানো– এই দুই জেনারেল আরবদের হাত থেকে জান নিয়ে পালিয়ে এসেছে। রুস্তম নিজে কেন রণাঙ্গনে যায় না?----শুধু এই কারণে যে, নামসর্বস্ব সম্রাজ্ঞী পুরান দখতের সঙ্গে যে ভোগ ভালোবাসার সম্পর্ক তাতে----।

ঃ 'একে গ্রেফতার করো'– রুস্তম তার তরবারি কোষমুক্ত করতে করতে বললো– 'আমি আমার অপমান সহ্য করবো, মালিকায়ে আলিয়ার শানে গোস্তাখী বরদাশত করবো না।'

রুস্তমের পেছনে দাঁড়ানো চার ঘোড়সওয়ার ফায়রুযানের দিকে এগিয়ে গেলো। ফায়রুযান তার তরবারিও একটানে বের করে ফেললো।

ঃ 'আমাকে গ্রেফতার করার জন্য রুস্তম নিজেই আসুক না'–ফায়রুযান চ্যালেঞ্জ ছুঁড়লো।

ঃ 'খবরদার!' সমবেত ফৌজের মধ্য থেকে আরেকটি আওয়াজ গর্জন করলো– ফায়রুযানের কাছে যেন কেউ না আসে।'

চার পাঁচ সওয়ার খোলা তরবারি নিয়ে এগিয়ে এসে ফায়রুযানকে তারা তার হেফাজতে নিয়ে নিলো। এর সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত ফৌজে শোরগোল উঠলো।

ঃ 'আমরা ফায়রুযানের সঙ্গেই থাকবো।'

ঃ 'ফায়রুযানই সত্য বলেছে।'

ঃ 'রুস্তম আমাদের বাদশাহ।'

ঃ 'আমরা রুস্তমের সঙ্গেই থাকবো।'

ঃ 'ফায়রুযান গাদ্দার।'

ঃ 'রুস্তম সবচেয়ে বড় গাদ্দার।'

দেখতে দেখতেই ফৌজ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়লো। ফৌজ যেমন সারিবদ্ধ ছিলো তা অনেক আগেই ভেঙে পড়েছিলো। গৃহযুদ্ধের চূড়ান্ত রূপ সৃষ্টি হলো। রুস্তম তার জীবনের সবচেয়ে বড় ধাক্কাটা খেলো। তার লোকেরা তাকে এতটুকু অবশ্য বলেছিলো যে, ফৌজ ও শহরী আমলাদের মধ্যে তার বিরুদ্ধে গুঞ্জন চলছে। কিন্তু অর্ধেক ফৌজ তার বিরুদে বিদ্রোহ করে বসবে এটা সে কল্পনাও করেনি।

ঃ 'তোমরা থামো'– রুস্তম এই শোরগোলের মধ্যেই চিৎকার করতে লাগলো– 'থেমে যাও। থামো---আমার সবগুলো কথা আগে শুনে নাও। একে অপরের বিরুদ্ধে তরবারি ধরো না।'

ঃ 'না'–শুনবো না---শুনবো না আমরা'–শোরগোল থেকে ভেসে এলো।

একদিক থেকে একটি ঘোড়া ছুটে এলা এবং ফৌজের দুই অংশের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালো। এর ওপর সম্রাজ্ঞী পুরানদেখত সওয়ার ছিলো।

যরথুস্টের পূজারীরা!'– পুরান চিৎকার করে বললো– 'তোমরা কি করছো? একে অপরের খুন করতে পাগল হয়ে গেছো? নিজেদের দেশকে টুকরো করার আগে নিজেদের অস্ত্র দিয়ে আমার শরীরটা টুকরো টুকরো করে দাও। তোমরা কি ভুলে গেছো পারস্যের সিংহাসনকে ঘিরে যে খুন খারাবী চলছিলো তা আমি কিভাবে বন্ধ করেছি? আমি আমার দেশের চিরস্থায়ী নিরাপত্তার জন্য বিয়ে পর্যন্ত করিনি। দুশমনের হাত থেকে ফারেসকে রক্ষার জন্য আমার সব অধিকার আমি ফৌজকে হাওলা করে দিয়েছি। নিজেকে কখনো আমি সম্রাজ্ঞী মনে করিনি। রুস্তমকে আমি যে অধিকার দিয়েছি তোমরা যদি এজন্য তাকে অনুপযুক্ত মনে করো তবে আমার ভুলকে শোধরানোর সুযোগ দাও। আমি কোন হুকুম জারী করবো না। তোমাদের কথাই শোনবো এবং তোমাদের কথাই মানবো।'

পুরো ফৌজ খামোশ হয়ে গেলো। তাদের অফিসাররাও তাদেরকে শান্ত থাকার নির্দেশ দিলো।

ঃ 'তোমাদের প্রকৃত দুশমনকে চিনে নাও'– পুরান বলে গেলো– 'পরস্পরের দুশমন হয়ে তোমরা মুসলমানদের গোলামী ছাড়া আর কিছুই অর্জন করতে পারবে না। মাদায়েনে মুসলমানদেরকে তোমরা কি ডেকে বলেছো– তোমাদের যুবতী কন্যাদের-বোনদের যেন তারা দাসী বানিয়ে নেয়? তোমরা এই শাহী লেবাসে আরবের গলিতে গলিতে তখন ভিক্ষা চাইবে।'

ঃ 'বাহমন আর জালিয়ুনুস সৈন্য ও হাতিবহর নিয়ে মারুহা গিয়েছে। আমি পূর্ণ প্রত্যাশা করছি মুসলমানদেরকে তারা পিষে ফেলবে। তখন তোমাদের সব অভিযোগ খতম হয়ে যাবে, তারা আসলেই সব জেনারেলকে নিয়ে আমি এমন ফয়সালায় পৌঁছবো তোমরা তাকে উত্তম ফয়সালা বলে মেনে নেবে। নিশ্চিত থাকো এবং নিজেদের শিবিরে ফিরে যাও।'

ফৌজের সমাবেশস্থল শূন্য হয়ে গেলো। শুধু রুস্তম আর পুরানই রয়ে গেলো। তাদের মুহাফিজরা তখন কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে ছিলো।

ঃ 'মুশকিলটা হলো যুদ্ধাক্রান্ত অবস্থায় আমরা রয়েছি'– রুস্তম বললো– 'স্বাভাবিক অবস্থা থাকলে আমি ফায়রুযান ও মেহরানকে জীবিত ছাড়তাম না–' রুস্তম হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে পুরানের দিকে তাকিয়ে বললো–

ঃ 'এখন আমি তোমার থেকে অনেক দূরে থাকবো। কঠিন প্রয়োজন হলেই আসবো।'

ঃ 'আমাদের অবস্থা এতো খারাপ হয়ে যাবে এটা আমি আশা করিনি'– পুরান বললো– 'তবুও এই ব্যাপারকে ব্যক্তিগত জটিলতায় নিয়ে যেয়ো না।'

ফায়রুযান ও রুস্তমকে ঘিরে ফৌজ যখন দুভাগে বিভক্ত হয়ে পড়লো তখন মাদায়েন থেকে এক ঘোড়-সওয়ার মারুহার দিকে ছুটলো। বাহমন জাদাবিয়া আর জালিয়ুনুস সেদিন মুসলমানদেরকে চরমভাবে পরাজিত করেছে এবং সিপাহসালার আবু উবাইদসহ অসংখ্য মুসলমানকে শহীদ করেছে। মুসলিম ফৌজের অবশিষ্টদের নিয়ে

সালার মুসান্না কোনক্রমে পুল বেয়ে পার পেয়েছিলেন। বাহমনও মুসলমানদেরকে পিছু ধাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলো। এমন সময় মাদায়েনের সেই ঘোড়সওয়ার বাহমন ও জালিয়নুসের সামনে ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নামলো।

ঃ 'তোমার চেহারা বলছে তুমি কোন ভালো খবর নিয়ে আসোনি'– বাহমন বললো।

হ্যাঁ, মোটেও ভালো খবর না'– সওয়ার হাঁপাতে হাঁপাতে অল্প কথায় মাদায়েনের পরিস্থিতি তাদেরকে শোনালো।

বাহমন ও জালিয়নুস হয়রান হয়ে বারবার তার দিকে তাকাচ্ছিলো।

ঃ 'জানি না সেখানে এখন কি হচ্ছে'– সওয়ার বললো–'ফৌজকে আমি দুইভাগে বিভক্ত ও একে অপরকে উস্কানি দিতে দেখে এসেছি। রুস্তম ও ফায়রুযান তাদের হাতিয়ার বের করে একে অপরের ওপর প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছিলো।'

বাহমন জাদাবিয়া ও জালিয়নুস তাদের ফৌজ নিয়ে কোথাও না থেমে অত্যন্ত দ্রুত মাদায়েনে পৌঁছলো। তার কাসেদের খবর অনুযায়ী মাদায়েন তখন গৃহযুদ্ধে আক্রান্ত থাকার কথা ছিলো। কিন্তু শহরে ঢুকে তারা দেখলো সারা শহর শান্ত। ফৌজকে বিদায় করে দিয়ে তারা রুস্তমের কাছে চলে গেলো এবং ফায়রুযান ও মেহরানকেও ডাকালো। তারপর সবাই পুরানের মহলে গিয়ে হাজির হলো।

ঃ 'ফুরাতের পানি আমরা মুসলমানদের রক্তে কি করে লাল করেছি তা দেখে না আসলে বিশ্বাস হবে না'– বাহমন সবাইকে বলতে লাগলো–' তাদের ফৌজের বেশি হলে এক-তৃতীয়াংশ পালাতে পেরেছে। মাদায়েনের এই খবর না পৌঁছলে তাদেরও একই দশা করতাম। তোমরা ভেবে দেখো তো– মুসলমানদেরকে আমরা এতো শোচনীয়ভাবে হারিয়েছি আর তোমরা একে অপরকে হাতিয়ার নিয়ে উস্কানি দিচ্ছো– তোমাদের কি লজ্জিত হওয়া উচিত নয়? মুসলমানদেরকে আমরা এখন প্রতিটি ময়দান থেকেই বিতাড়িত করবো। তোমরা পরস্পর যদি লড়াইয়ে লিপ্ত হও তবে মাদায়েনকে কেন মুসলমানদের হাওলা করছো না?'

সম্রাজ্ঞী পুরান, রুস্তম ও অন্যান্য জেনারেলের কানে এই প্রথম 'জয়' শব্দটা ঢুকেছিলো। এই প্রথম তারা শুনলো মুসলমানদের বিরুদ্ধে পারসিকরা কোন ময়দানে বিজয়ী হয়েছে। এজন্য কামরার মধ্যে যে চাপা উত্তেজনা আর অস্বস্তি ছিলো তার অনেকটাই কমে গিয়েছিলো।

ঃ 'আমি তোমাদেরকে এই নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে, আমি সম্রাজ্ঞী রইলাম কি রইলাম না এতে আমার কোন আগ্রহ নেই'– পুরান বললো– 'শাহী হুকুম জারী করার অধিকার আমার রইলো কি রইলো না তাও আমি জানতে চাই না। আমি চাই ফারেস– পারস্য। আমি চাই সেই ফারেস যা রোমের হেরাকলকে পরাজিত করেছিলো। যার যুদ্ধ শক্তির দাপটে সারা দুনিয়া কাঁপতো।'

মুসান্নার তিন হাজার সৈন্যের পিছু ধাওয়াকারী জাবান ও তার ফৌজকে হত্যা করার পর মুসান্না তার ফৌজ নিয়ে আলিয়াসের কেল্লায় গিয়ে উঠলেন। মুজাহিদদের দৈহিক অবস্থা একেবারেই অচল ছিলো। হামাগুড়ি দিয়ে চলার মতো শক্তিও তাদের ছিলো না। তারা যে চলা ফেরা করছিলো এটা ছিলো তাদের প্রচণ্ড আত্মিক শক্তির কারণে।

ঃ 'প্রিয় সাথীরা আমার!'- মুসান্না মুজাহিদদের বলছিলেন- 'তোমরা কি অবস্থায় আছে তা আমি জানি। তোমাদের মানসিক অবস্থাও উপলব্ধি করতে পারছে জিসিরের লড়াইয়ে শহীদ হওয়া তোমাদের সঙ্গীদের জন্য তোমরা ব্যথায় কাতর। তোমরা শোকাবহ। তোমাদের বন্ধুদের শোক মন থেকে বের করে দাও। যারা আল্লাহর পথে জান দিয়েছে তাদেরকে মৃত মনে করো না। তারা জীবিত। তোমাদের সঙ্গেই আছে তারা। তোমরা জাবানের পুরো ফৌজকে মেরে স্বীয় বন্ধুদের খুনের বদলা নিয়েছো। তোমাদের শহীদ বন্ধুরা ও তাদের রূহ তোমাদের সঙ্গে ছিলো। না হয় তোমাদের এই ভাঙ্গা-চোরা শরীর নিয়ে এত বড় ফৌজকে মেরে স্তূপিকৃত করতে পারতে না'----।

জিসিরের লড়াইয়ে মুসান্না যে যখমী হয়েছিলেন সেই যখম তার শরীরে মরণকামড় বসাচ্ছিলো। কথা বলতে তিনি ভীষণ কষ্ট অনুভব করছিলেন। তার কাছে মনে হচ্ছিলো পাঁজর আর গলার রগগুলো যেন ছিঁড়ে একাকার হয়ে যাচ্ছে। ক্ষত পরিচর্যা করার কোন সুযোগই তিনি পাচ্ছিলেন না। ক্ষতের ভেতরে কাপড় ভরে দিয়ে এর ওপর শুধু কাপড়ের পট্টি বেঁধে দেয়া হয়েছিলো। এ অবস্থাতেই আলিয়াস পর্যন্ত তাকে সফর করে রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ে লড়তে হয়েছে। ক্ষত থেকে অনবরত রক্ত ঝরছিলো। তার শরীরেও রক্তক্ষরণ হচ্ছিলো। মুজাহিদদের মনোবল চাঙ্গা করার জন্য তিনি কোন বিশ্রাম না নিয়েই বক্তৃতা করছিলেন। কিন্তু হঠাৎ ব্যথাটা পাঁজর থেকে এতো দ্রুত গলায় উঠে এলো যে মনে হচ্ছিলো কেউ যেন তার গলা চেপে ধরেছে। তিনি আর কিছু বলতে পারলেন না। ঘোড়া নিয়ে তার কামরায় চলে গেলেন।

আলিয়াস বড় শহর ছিলো। সেখানে অভিজ্ঞ ডাক্তারও ছিলো। তারা দৌড়ে এসে যখমে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিলো। শক্ত করে তাকে বলে দিলো তিনি যেন পূর্ণ বিশ্রাম করেন। কোন লড়াইয়ে শরীক না হন এবং যখম সেরে যাওয়ার আগ পর্যন্ত ঘোড়ায় সওয়ার না হন।

'বিশ্রামের সময় নেই ভাই এখন'- মুসান্না বললেন- 'তোমরা তোমাদের কাজ করো, আমাকে আমার কাজ করতে দাও। তোমাদের কাজ হলো আমার যখম সারিয়ে তোলা। আমার কাজ হলো যখমের পরোয়া না করা। আমি শুধু আল্লাহর হুকুমই পালন করে যাবো।'

ডাক্তাররা অনেক করে বললো যে, যখমের যদি আরো অবনতি ঘটে তবে তা মরণব্যাধির রূপ নেবে। কিন্তু মুসান্না কোন কথাই শুনতে রাজী নন।

সূর্য প্রায় ডুবে গিয়েছিলো। যামরাদ সুহায়েবকে নিয়ে আলিয়াসের প্রধান ফটকে তখন পৌঁছলো। সুহায়েব সাকাফীকে সে তার বাহুতে জড়িয়ে রেখেছিলো। সুহায়েব ছিলো বেহুঁশ। কেল্লার দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো। মুসান্নার হুকুম ছিলো সন্ধ্যার পর কারো জন্য দরজা খোলা যাবে না। দরজার ওপর বড় একটি জানালার সামনে এক প্রহরী দাঁড়িয়েছিলো। যামরাদকে সে তার পরিচয় জিজ্ঞেস করলো এবং এ সময় এখানে আসার কারণও জিজ্ঞেস করলো। আর বলে দিলো দরজা খোলা যাবে না।

'দরজা যদি না খোল, তোমাদের এই মুসলমান বন্ধুটিরও জীবনের দরজা বন্ধ হয়ে যাবে'— যামরাদ বললো— 'একে আমি জিসিরের ময়দান থেকে উঠিয়ে নিয়ে এসেছি।'

ঃ 'তুমি মুসলমান নও'— প্রহরী বললো— 'তোমার জন্য দরজা খোলার এজাযত নেই।'

ঃ 'আমার জন্য নয়। তোমাদের এই ভাইয়ের জন্য দরজা খোল। না হয় সে মারা যাবে।'

ঃ 'তুমি তো অনারবী'— ওপর থেকে আওয়াজ এলো।

ঃ 'এতো আরবী'— যামরাদ বললো— 'সুহায়েব ইবনুল কদর সাকাফী এর নাম। আমি একজন অসহায় নারী হয়ে জিসিরের ময়দান থেকে একে উঠিয়ে নিয়ে এসেছি। আর তুমি পুরুষ হয়েও আমাকে ভয় পাচ্ছো! দরজা খুলছো না! আমি এর জন্য আমার ঘর, আমার মা, বাবা, ভাই-বোন এমনকি আমার ধর্ম পর্যন্ত ছেড়ে এসেছি। তুমি কি চাও তোমাদের এই সঙ্গীকে এখানে রেখে আমি আমার পূর্ব ধর্মে ফিরে যাই? এটাই কি তোমাদের ধর্ম।'

ঃ 'খোদার কসম!'—একেবারে কেল্লার ওপর তলা থেকে আওয়াজ এলো— 'এক মেয়ে এই অভিযোগ করে যেতে পারবে না যে, মুসলমানদের কাছে তার আশ্রয় মেলেনি। তোমার কুরবানী ত্যাগের প্রতিদান তুমি পুরোপুরিই পাবে। দরজা খুলে দাও'— এটা কোন নতুন সালারের বুলন্দ আওয়াজ ছিলো।

দরজা খুলে গেলো। যামরাদ দেড় দিনের সফরে তার ঘোড়াকে এতই কম বিশ্রাম দিয়েছিলো যে, দরজা খোলার পর ঘোড়াটি আর কদম উঠাতে পারলো না। সুহায়েব তো বেহুঁশ ছিলোই। যামরাদও প্রায় বেহুঁশের মতোই কমজোর হয়ে গিয়েছিলো। পথে মাঝে মধ্যে সে সুহায়েবকে মুখে পানি দিয়েছে, নিজেও পানি পান করেছে। কিন্তু কোথাও একটি দানাও মিলেনি।

একজন ঘোড়াটিকে টানতেই সে সামনে অগ্রসর হলো এবং কেল্লার ভেতর ঢুকে গেলো। কয়েকজন মুজাহিদ এগিয়ে এসেছিলো। তারা সোহায়েবকে চিনতে পেরে তাকে ঘোড়া থেকে নামিয়ে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলো। মুসান্নাকে জানানো হলো এক অগ্নি উপাসকের মেয়ে জিসিরের ময়দান থেকে এক মুজাহিদকে উদ্ধার করে নিয়ে এসেছে। মুসান্না তাকে সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে যেতে বললেন।

যামরাদকে মুসান্নার কামরায় নিয়ে যাওয়া হলো। যামরাদ মুসান্নাকে তার ধর্মমতে অভিভাদন জানালো। মুসান্না তাকে গভীর দৃষ্টিতে দেখতে লাগলেন। তিনি কিছু একটা স্মরণ করার চেষ্টা করলেন।

ঃ 'আল্লাহর কসম! এই চেহারা আমার অপরিচিত নয়'– মুসান্না উচ্ছ্বসিত গলায় বললেন– তোমাকে আমি কোথায় দেখেছিলাম বলো তো? ক্লান্তির এতো গভীর ছাপও তোমার চেহারাকে লুকোতে পারেনি।'

ঃ 'আপনি ভুলে যেতে পারেন মহামান্য'– যামরাদ বললো– 'আমি তো আপনাকে ভুলতে পারি না। সেদিনের কথা কি মনে আছে, যে দিন আপনি বারসিমায় এসেছিলেন এবং আমাদের দেশের ঐসব সৈন্যদের গর্দান উড়িয়ে দিয়েছিলেন যারা আমাদের নারীদের ইয্যত লুটেছিলো। আপনার তরবারিটি আমার হাতে দিয়ে বলেছিলেন– এই সিপাহীর গর্দান নিজ হাতে উড়িয়ে দিয়ে তোমার বেইয্যতীর প্রতিশোধ নাও। আমি তরবারি ওপরে উঠিয়েছিলাম, কিন্তু ....।

ঃ 'কিন্তু তুমি তা নিচে নামিয়ে নিয়েছিলে'– মুসান্না বললেন– 'তুমি ফুপাচ্ছিলে। পরে আমাদের এক মুজাহিদ প্রচণ্ড মানবীয় ও নৈতিকতাবোধে উজ্জীবিত হয়ে আগে বাড়লো এবং সেই ফারসীর ধড় আলাদা করে দিলো।'

ঃ 'আপনার সেই মুজাহিদকে আমি ভুলতে পারিনি'– যামরাদ বললো– 'দিনে যখন জেগে থাকি তখন কল্পনায় আর রাতে স্বপ্নের বিভোরতায়---- আমি ভাবতাম তাকে আমি কি পুরস্কার দিবো। এই অনুগ্রহের কি প্রতিদান তাকে দেবো। কিন্তু আমি অক্ষম আর অজ্ঞান ছিলাম। আমি জানতাম না– মুসলমান যে আল্লাহকে মান্য করে তিনিই এই মুজাহিদকে এর প্রতিদান দিবেন। মহান আল্লাহ আমাকেই তার প্রতিদান দেয়ার মাধ্যম মনোনীত করেছেন। লাশের স্তূপ থেকে তাকে আমি উঠিয়ে এনেছি। আমার ভাইয়ের খোঁজে আমি সন্ধ্যার পর যুদ্ধের পরিত্যক্ত ময়দানে গিয়েছিলাম। কিন্তু আমার নজর এই যখমী মুজাহিদের ওপর গিয়ে পড়লো। কিছুক্ষণ পরই তার মরে যাওয়ার কথা ছিলো। আমার বাবা তো তাকে তখনই মেরে ফেলছিলো। কিন্তু আমি তাকে বাধা দিলাম। তার সামনে দেয়াল হয়ে দাঁড়ালাম।'

যামরাদ পুরো ঘটনা মুসান্নাকে শোনালো। তার বাবার ঘোড়া চুরি করে কিভাবে সুহায়েব সাকাফীকে উদ্ধার করলো, কিভাবে আলিয়াস পর্যন্ত পৌঁছলো সবই খুলে বললো।

ঃ 'এতো সাহস আমার ছিলো না। কিন্তু আমার মনে তার ভালোবাসার পবিত্রতা ছড়িয়ে পড়েছিলো, অথবা যে আল্লাহকে আপনারা মান্য করেন তিনি আমার হৃদয়ে আলো বর্ষিত করে দিয়েছিলেন। অথবা আপনাদের মনের দৃঢ়তাই আমার মনকে সজীব করে তুলেছিলো যা আমাকে পুরুষের মতো নির্ভীক বানিয়ে দিয়েছে....। আপনাদের আল্লাহকে আমি অন্তরের গভীর থেকে মান্য করি। আপনি যদি আমাকে কবুল করে থাকেন, ইসলাম ধর্মে আমাকে দীক্ষিত করুন। আর সুহায়েব সাকাফী যদি আমাকে গ্রহণ করে বাকী জীবন আমি তার সেবায় কাটিয়ে দেবো। আমার ফিরে যাওয়ার তো আর কোন জায়গা নেই।'

ঃ 'তোমার মনের উভয় ইচ্ছাই পূরণ হবে'– মুসান্না বললেন– 'প্রথমে তোমাকে ইসলাম ধর্মেই দীক্ষিত করবো আমরা। এখানে আমাদের কিছু মুজাহিদের স্ত্রী রয়েছেন। তুমি তাদের সঙ্গেই থাকবে। সুহায়েব সাকাফী পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠলে তোমাদের শাদীর কাজটি সেরে ফেলা হবে।'

যামরাদের চেহারায় রক্তিম আভা ছড়িয়ে পড়লো।

মুসান্না তখনই যামরাদকে ইসলামে দীক্ষিত করলেন। এরপর হুকুম দিলেন মুজাহিদদের স্ত্রীদের মহলে যেন তাকে নিয়ে যাওয়া হয় এবং খাবারের পর তার বিশেষ যত্ন নেয়া হয়। যামরাদ চলে যাওয়ার পর মুসান্না উঠে সুহায়েবকে দেখতে চলে গেলেন। ডাক্তার সুহায়েব সাকাফীর ক্ষতস্থান তখন পরিচর্যা করেছিলো এবং মধুমিশ্রিত দুধ তার মুখে তুলে দিচ্ছিলো।

আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদই সর্বপ্রথম ব্যক্তি যিনি জিসিরের ময়দান থেকে মদীনায় পৌঁছেছিলেন। মুসলমানদের শোচনীয় পরাজয় ও পিছু হটার খবর তিনিই প্রথম উমর (রা)কে শুনিয়েছিলেন। নির্বাক মূর্তি হয়ে উমর (রা) মসজিদের দরজায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব শুনেছিলেন।

ঃ 'আল্লাহর কসম!'– উমর (রা) বলেছিলেন– 'সাহাবীদের বাদ রেখে আবু উবাইদকে সিপাহসালার করে ভুল করিনি তো আমি?

আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ আমীরুল মুমিনের এই অবস্থা দেখে নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলেন না। কাঁদতে লাগলেন। উমর (রা) কান্নার আওয়াজ শুনে তার চেহারার দিকে তাকালেন এবং তিনি হয়রান হয়ে বললেন–

ঃ 'ইবনে যায়েদ!–কেঁদো না। তুমি তো আমার কাছে এসে গেছো। তোমার যিম্মাদার আমি। আল্লাহ আবু উবাইদের ওপর রহম করুন। সেও যদি আমার কাছে আসতো আমি তারও যিম্মাদার হতাম।'

ঃ 'আমীরুল মুমিনীন!'– আবদুল্লাহ অভয় পেয়ে বললেন– 'আমি একা পালিয়ে আসিনি। শত শত মুজাহিদ ময়দান থেকে পালিয়ে এসেছে। কিন্তু লজ্জায় অনুতাপে তারা মদীনায় প্রবেশ করেনি।'

আল্লাহ তাদের লজ্জা ও অনুতাপ কবুল করুন'– আমীরুল মুমিনীন মসজিদে বসে লোকদের উদ্দেশে বললেন– 'সবাই শুনে নাও এবং বাইরে গিয়ে প্রত্যেককে বলে দাও– যেসব মুজাহিদ যুদ্ধের ময়দান থেকে চলে এসেছে তাদেরকে যেন শুভেচ্ছা জানিয়ে বরণ করা হয়। তিরস্কারমূলক কোন কথা যেন তাদের সঙ্গে বলা না হয়। আল্লাহ ক্ষমাশীল– দয়ালু। তোমরা তো আল্লাহরই বান্দা।'

মাআয কারীও ইবনে যায়েদের মতো জিসিরের ময়দান থেকে সোজা হযরত উমর (রা) এর কাছে এসেছিলেন। তারপর কেঁদেছিলেনও দীর্ঘসময়। হযরত উমর (রা) তাকে ও আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদের মতো সান্ত্বনা দিয়েছিলেন।

পরদিন এশা বা মাগরিবের নামাযে যখন উমর (রা) সূরা আনফালের এই আয়াতটি পড়লেন– 'আজকের দিনে যে রণাঙ্গনে পিঠ দেখাবে সঙ্গত কোন কারণ ছাড়া– তার ওপর আল্লাহর গজব নাযিল হবে। তার আবাস হবে জাহান্নামে'– তখন নামাযের মধ্যেই মাআয কারী এমন করে কাঁদবে লাগলেন যে, তার হেচকি উঠতে লাগলো।

ঃ 'মাআয কেঁদো না'– নামাযের পর উমর (রা) তাকে বললেন– 'কেঁদো না মাআয! আমার কাছে যখন এসে গেছো তখন তোমার যিম্মাদার আমিই!'

আবু শাদ্দাদ ছিলেন বনী তামীম গোত্রের লোক। মদীনা থেকে দূরের এক গ্রামে থাকতেন তিনি। এই কবীলার বেশ কয়েকজন যুদ্ধে গিয়েছিলো, যাতে বৃদ্ধ প্রায় আবু শাদ্দাদও ছিলেন। তার একটাই মাত্র ছেলে। বয়স ষোল সতের। ছেলেটির চেয়ে ছোট তার তিনটি মেয়ে ছিলো।

ঃ 'তোমার ছেলেকে তোমার জন্যই আমি রেখে যাবো'– আবু শাদ্দাদ তার স্ত্রীকে বলেছিলেন– 'আমি না থাকলে তোমার ও তোমার মেয়েদের ওপর সে ছায়া হয়ে থাকতে পারবে। তার ওপর যে জিহাদ ফরয করা হয়েছে তা আমি পালন করবো। আমার একমাত্র ছেলেটির আমার পর জীবিত থাকা জরুরি। এটা বলে তিনি আবু উবাইদের সঙ্গে ইরাকের রণাঙ্গনে চলে গিয়েছিলেন।

জিসির যুদ্ধের অনেক দিন পর এক রাতে আবু শাদ্দাদের ঘরের কড়া নড়ে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে একটি ঘোড়াও চিহি চিহি রব তুললো। আবু শাদ্দাদের স্ত্রী জেগে উঠলেন। ছেলেকেও ধাক্কিয়ে জাগালেন।

ঃ 'দেখ বাবা!–তোর বাপ এসেছেন। আমি তার ঘোড়ার আওয়াজও শুনেছি।'

মা ছেলে দৌড়ে গিয়ে দরজা খুললো। বাইরে আবু শাদ্দাদ ঘোড়া থেকে নেমে দাঁড়িয়েছিলেন। ছেলে বাবাকে জাপ্টে ধরলো। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই পিছু সরে এলো।

ঃ 'রক্ত'– ছেলে আঁতকে উঠে বললো– 'এই রক্ত কি আপনার না দুশমনের যা আপনার কাপড়ে লেগে আছে?'– ছেলে বাবার ঘোড়ার লাগাম ধরে বললো– 'আপনি ভেতরে আসুন। ঘোড়া আমি সামলাচ্ছি।'

ঃ 'তুমি চুপ কেন? স্ত্রী তাকে জিজ্ঞেস করলেন'– 'অনেক বেশি যখমী হয়েছো?'

ঃ 'না'– আবু শাদ্দাদ বললেন– 'শরীরের যখম তো মামুলি কিন্তু অন্তরের যখম অনেক গভীর। আমি ভেতরে যাবো না, আমার কথা শোন বেটা! ইরাকের রণাঙ্গন থেকে আমি পরাজিত হয়ে এসেছি। লড়াই বড়ই রক্ত ক্ষয়ী ছিলো। খুব কম মুসলমানই প্রাণ নিয়ে পালাতে পেরেছে। কিন্তু আসার সময় এই ভাবনা আমার গলা চেপে ধরেছে যে, যারা শহীদ হয়েছে আমারও তো তাদের সঙ্গে শহীদ হওয়ার কথা ছিলো। পরে রাস্তায় রণাঙ্গন থেকে পালিয়ে আসা আরো কিছু সঙ্গীর সঙ্গে দেখা হলো। তারাও আমার মতো লজ্জায় অনুতাপে মরমে মরমে মরে যাচ্ছিলো। তারা সবাই সিদ্ধান্ত নিলো– নিজেদের ঘরে তারা যাবে না। ঘরে গেলেই তাদেরকে পরাহয়ের লজ্জা সইতে হবে।'

ঃ 'ভেতরে এসো'– স্ত্রী বললেন– 'তোমাকে কেউ লজ্জা দেবে না।'

ঃ 'দিনে দিনেই আমি এখানে আসতে পারতাম'– আবু শাদ্দাদ বললেন– 'কিন্তু রাতের অন্ধকারে এসেছি তোমরা যাতে স্পষ্ট আমার চেহারা দেখতে না পারো। আমি আমার ছেলেকে একটি কথা বলতে এসেছি। ---- ভালো করে শুনে নাও বেটা! আমি কোথাও লুকিয়ে টুকিয়ে বেঁচে থাকার চেষ্টা করে যাবো। যদি বেঁচে থাকি তবে পরাজয়ের প্রতিশোধ নিয়ে তবে ফিরবো। আমি চাইতাম তুমি তোমার মা ও ছোট বোনদের ওপর

ছায়া হয়ে থাকো। কিন্তু এখন ভাবছি– মুসলমানদের যদি এমন আরেকটি শোচনীয় পরাজয় ঘটে তবে ইসলামের নাম নিশানাও মুছে যাবে। আমি তো প্রায় বুড়োই হয়ে গেছি। এখন আমার জায়গাটি নিয়ে নাও বেটা। আমি ঘোড়াটি রেখে যাচ্ছি। মদীনা থেকে ময়দানে যাওয়ার যখন ডাক আসবে সঙ্গে সঙ্গে পৌঁছে যাবে। মনে এই তেজদীপ্ত মনোবল নিয়ে লড়বে যে, আমার বুযদিল বাবার পরাজয়ের প্রতিশোধ আমাকে নিতে হবে। আর দুশমনকে পরাজিত করে আল্লাহর কাছ থেকে তোমার বাবার রণাঙ্গন থেকে পালিয়ে আসার অপরাধটিও মাফ করিয়ে নেবে। নিজের মা বোনকে আল্লাহর হাওলা করে যাবে।'

আবু শাদ্দাদ তার ঘোড়াটি ছেলেকে দিয়ে চলে গেলেন। তার স্ত্রী তার পেছন পেছন দৌড়াতে লাগলেন। আবু শাদ্দাদ তাকে ধমক দিয়ে থামিয়ে দিলেন এবং রাতের অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

হযরত উমর (রা) একদিন জানতে পারলেন রণাঙ্গন থেকে পালিয়ে আসা অনেকে যাযাবরের মতো এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। আবার অনেকে আশা-পাশের প্রতিবেশিদের ঘরে লুকিয়ে বসে আছে। লজ্জায় অনুতাপে বাইরে বের হচ্ছে না। পরাজয়ের গ্লানি তাদের অবস্থায় প্রায় মাতম করে রেখেছে। হযরত উমর (রা) তখন ব্যক্তিগতভাবেই প্রত্যেকের ঘরে গেলেন। তাদেরকে সান্ত্বনা দিলেন। তাদের মনোবল চাঙ্গা করে তুললেন।

আলিয়াসের দুর্গ।

মুসান্না ইবনে হারিসা পেরেশানী আর অস্থিরতায় কখনো কামরায় এসে শুয়ে পড়ছিলেন আবার উঠে গিয়ে বাইরে পায়চারী করছিলেন। আর বার বার মাথা চেপে ধরছিলেন। পাঁজরের যখমের ব্যথা যখন কিছুটা কম মনে হচ্ছিলো তখন কামরায় গিয়ে শুয়ে পড়ছিলেন। অবশেষে দারোয়ানকে ডেকে প্রথমে ডাক্তরকে পরে আশআর ইবনে আওসামাকে আসতে বললেন।

ডাক্তার কাছেই ছিলেন। দৌড়ে এলেন। নিজের যখমের কথা না বলে প্রথমে তিনি সুহায়েব সাকাফীর কথা জিজ্ঞেস করলেন।

ঃ 'প্রায় মুজিযা হয়ে গেছে ইবনে হারিসা।'– ডাক্তার বললেন– 'তার দেহের রক্ত তো প্রায় সবই ঝরে গিয়েছিলো। আলহামদুলিল্লাহ রক্তস্বল্পতা অনেকটা পূরণ হয়ে গেছে। যখমও শুকিয়ে যাচ্ছে। পায়ের একটি হাড় ভেঙে গিয়েছিলো সেটার সংযোগও দিয়েছি কিন্তু ঠিক হতে সময় লাগবে।----আর সেই মেয়েটি যে তাকে উদ্ধার করে এনেছিলো– সর্বক্ষণ তার পাশেই বসে থাকছে।'

ঃ 'মহান আল্লাহ তাকে বাঁচিয়ে রাখার মুজিযা দেখিয়েছেন'– মুসান্না বললেন– 'আল্লাহ তাআলা হয়তো তার হাতে আরো মুজিযা দেখাবেন---- আপনাকে আমি এজন্য ডেকেছি যে, ভবিষ্যতে আপনি আর আমাকে বলবেন না যে, আমি যেন আরাম করি। এই যখম নিয়ে যদি আমি বসে থাকি তবে সারা ইসলামী জগত এমন যখমী হয়ে পড়বে

যে তা আর সামলানো সম্ভব হবে না। আপনি বয়সের ভারে অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। আপনি এটা নিশ্চয় বুঝবেন যে, অগ্নি পূজারীরা মাদায়েনে হাত পা গুটিয়ে আরামে বসে থাকবে না। জিসিরে তারা আমাদের যে ক্ষতি করেছে তা থেকে পুরো ফায়দাই তারা তুলবে। যে কোন দিন তারা হামলা করতে পারে। এবার আরো বেশি হাতি থাকবে তাদের সঙ্গে। তাদের কাছে তাজাদম ফৌজের কমতিও নেই। আমি খুবই হয়রান হচ্ছি।'

ঃ 'আল্লাহ সাহায্য করবেন ইবনে হারিসা!'– ডাক্তার বললেন- 'হতাশ হয়োনা। আমীরুল মুমিনীনকে জানিয়ে সেনা সাহায্য চাও।'

ঃ 'নতুন ফৌজ আসতে আসতে দুটি চান্দ্রমাসের উদয়াস্ত ঘটবে'– মুসান্না বললেন– ফৌজ একত্রিত করতে সময়ের প্রয়োজন। পারসিকরা এর আগেই যদি হামলা করে তবে এখান থেকে আমাদের বেরিয়ে যেতে হবে---- শুনুন মুহতারাম! আমি একলা রয়ে গেলাম। আমার সঙ্গী সালার ও নায়েবে সালাররা শহীদ হয়ে গেলেন। সাহাবায়ে কেরামও শহীদ হয়ে গেলেন। কেউ রইলো না যার সঙ্গে পরামর্শ করা যাবে----- পারস্যের এই যমীন থেকে আমি আর এক হাতও পিছু হটতে চাই না।'

ঃ 'প্রথমে আমীরুল মুমিনীনকে ফৌজ পাঠাতে পত্র লেখো'– ডাক্তার বললেন– 'আর তোমার নিজের পক্ষ থেকে সমস্ত কাবীলার সরদারদের কাছে পয়গাম পাঠাও যে রণাঙ্গনে মুসলমানদের অবস্থা শোচনীয়।---- হতাশ হয়ো না মুসান্না।'

ডাক্তার চলে গেলে আশআর ইবনে আওসামা কামরায় ঢুকলো।

ঃ 'ইবনে আওসামা।'– মুসান্না তাকে বললেন– 'তুমি তো দেখতেই পাচ্ছো আমাদের আর কিছুই রইলো না। মাদায়েন থেকে যদি আচমকা ফৌজ এসে যায় তবে আমাদের এখনে থেকে পালানো ছাড়া আর কিছুই করার থাকবে না। আরেকবার তোমার খেলা দেখাও। তুমিই ভালো জানো কি বেশে তুমি সেখানে যাবে। আমি শুধু এতটুকু চাই যে, মাদায়েন থেকে ফৌজ বের হওয়ার একদিন পূর্বে যেন খবরটা পাই। তখন তিন চার জায়গায় গুপ্তঘাতক লাগিয়ে রাস্তাতেই পারসিকদের খতম করতে পারবো।'

ঃ 'এমনই হবে সিপাহসালার!'– আশআর বললো–'ইনশা আল্লাহ এমনই হবে---- আমি ফিরে না আসলে বুঝে নেবেন মাদায়েনে এখনো কোন ফৌজী তৎপরতা শুরু হয়নি। আপনি নিশ্চিন্তে তৈরি নিতে থাকুন।

মুসান্না আমীরুল মুমেনীন হযরত উমর (রা) এর কাছে পয়গাম লেখালেন। যাতে সেনাসাহায্যের কথাই বেশি ছিলো।

ঃ 'আমীরুল মুমিনীনকে জিসিরের লড়াই, আমাদের ধ্বংস ও পিছু হটার বিস্তারিত বিবরণ শোনাবে'– মুসান্না কাসেদকে বললেন– 'এটাও বলবে আলিয়াসে আমরা পরাজয়ের বদলা তো নিয়েছি কিন্তু তিন হাজার ফৌজ নিয়ে এতবড় ফৌজের মোকাবেলা আমরা কি করে করবো----রাস্তায় খুব কমই যাত্রাবিরতি করবে। যত দ্রুত পৌঁছানো যায় ততই মঙ্গল। অবস্থা তো তুমি দেখতেই পাচ্ছো।'

কাসেদকে বিদায় করে দিয়ে মুসান্না লশকরের বিভিন্ন গোত্রের সরদার বা সরদার গোছের লোকদের ডাকালেন। তাদেরকে বললেন, সব কিছু তো তাদের চোখের সামনেই রয়েছে। প্রতিটি ময়দানে বিজয় অর্জন করার পর মাদায়েনের কাছে গিয়ে এমন পরাজয় ঘটলো যে, এখন টিকাই অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

ঃ ----'এটা তোমাদের কাপুরুষতা ছিলো না'– মুসান্না বললেন– 'আমি তোমাদেরকে পিছু হটতে বলেছিলাম। এটা ছিলো সিপাহসালার আবু উবাইদের ভুলের মাশুল। যার শাস্তি আমরা পেয়েছি। তোমরা হাতির মোকাবেলা করেছো এবং পরবর্তী লড়াইয়ের জন্য হাতিগুলোকে বেকার করে দিয়েছো। আমীরুল মুমিনীনকে আমি পয়গাম পাঠিয়েছি যে, মুজাহিদরা পালিয়ে পিছু হটেনি'---।

ঃ 'আমরার বন্ধুরা!' আমাদের যদি এমন আরেকটি পরাজয় ঘটে তবে তোমরা কেউ বাঁচবে না। যারা বেঁচে যাবে বাকী জীবন অগ্নিপূজারীদের জুতো চেটেই কাটাতে হবে।-----তোমাদের সেসব ভাইদেরকে দেখো যারা রোমকদের পরাজিত করে সিরিয়াকে ইসলামী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেছে, তারা কি আমাদেরকে বুযদিল বলবে না----? নিজেদের প্রত্যেকের কাবীলায় গিয়ে লোকদেরকে বলো তোমরা যদি আমাদের সাহায্যে এগিয়ে না আসো তবে আরবের পবিত্র মাটিতে অগ্নিপূজারীদের বাদশাহী চলবে। এর পরিণাম কি হবে তোমরা তাও জানো। আমরা আল্লাহ্ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে আসামী হয়ে হাজির হবো।

মুসান্না কাবীলার এসব সরদারদেরকে চাঙ্গা করে তাদেরকে তাদের কাবীলায় পাঠিয়ে দিলেন। তারপর তিনি অনুভব করলেন আলিয়াসে বেশিদিন থাকা নিরাপদ নয়। তিনি একদিন তার ফৌজ সিবাখের দিকে কোচ করার হুকুম দিলেন। সিবাখ খিফান আর কাদিসিয়ার মাঝামাঝি একটি জায়গা। যা আরব ও ইরাকের সীমান্তবর্তী এলাকার নিকটেই ছিলো।

মুসান্না ও মুসান্নার কাসেদ জানতেন না আমীরুল মুমিনীন অনেক আগেই জিসিরের লড়াই সম্পর্কে অবগত হয়েছেন। এরপর থেকে আমীরুল মুমিনীনের মধ্যে একটা ভাবনাই সবসময় ঘুরপাক খাচ্ছিলো সেটা হলো, এই পরাজয়কে খুব দ্রুত কিভাবে বিজয়ে রূপান্তর করা যায়। তিনি খেলাফতের সব কিছুই একদিকে রাখলেন। তারপর মদীনার সকল গোত্রপ্রধানকে জানালেন, মুসান্নাকে সেনাসাহায্য দেয়ার জন প্রচুর স্বেচ্ছাসেবক দরকার। সর্বপ্রথম বনী ফুজায়লার সরদার জারীর ইবনে আবদুল্লাহ্ এলেন। হযরত উমর (রা) সবকিছু বলে তার কাছে স্বেচ্ছাসেবক চাইলেন।

বনী ফুজায়লার লোকেরা বিভিন্ন কারণে ছোট ছোট গোত্রে ছড়িয়ে পড়েছিলো। জারীর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় এই সংকটের কথা বলে কলছিলেন, তার এই গোত্রগুলোকে একটি গোত্রের রূপ দিয়ে তাদের একজন সরদার বানানো হোক। কিন্তু তিনি তা করে যেতে পারেননি। প্রথম খলীফা হযরত আবুবকর (রা) এর কাছেও জারীর এই সরদারীর কথা উত্থাপন করেছিলেন। কিন্তু আবু বকর (রা)

তাকে ধমক দিয়ে বলেছিলেন, মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চলছে আর তুমি এসে গেছো তোমার সরদারী নিয়ে। যাও নিজের গোত্র থেকে লোক নিয়ে সিরিয়ার রণাঙ্গনে চলে যাও। মুরতাদদের ঝামেলা মিটলে তোমার সরদারীর দিকে মন দেয়া যাবে।

জারীর ইবনে আবদুল্লাহ এই প্রস্তাব পরিষ্কার এড়িয়ে গেলেন।

হযরত উমর (রা) যখন তাকে ডেকে লোক-সাহায্য চাইলেন তখনও তিনি তার সরদারীর বিষয়টি উত্থাপন করলেন। উমর (রা) তখনই এক পয়গামের মাধ্যমে বনু ফুজায়লার সবগুলো গোত্রকে একত্রিত হওয়ার নির্দেশ দিলেন এবং জারীর ইবনে আবদুল্লাহকে সরদার বানিয়ে দিলেন।

ঃ 'এখন তুমি তোমার লোকদের নিয়ে ইরাক রণাঙ্গনে মুসান্না ইবনে হারিসার কাছে চলে যাও।' উমর (রা) তাকে বললেন।

ঃ 'আমরা ইরাক নয় সিরিয়ার রণাঙ্গনে যাবো'– জারীর বললেন– 'কারণ আমাদের পূর্বপুরুষরা সিরিয়ার অধিবাসী ছিলেন।'

ঃ 'প্রয়োজন তো ইরাক রণাঙ্গনে' উমর (রা) বললেন।

ঃ 'তবুও আমরা সিরিয়ার রণাঙ্গনেই যাবো।'

ঃ 'আহ! আল্লাহ তোমাকে সুমতি দিন!' –উমর (রা)- রাগ বহু কষ্টে সামনে নিয়ে বললেন– 'তোমার লোকদের জন্য তুমি অতিরিক্ত বিনিময় চাচ্ছো। ঠিক আছে আমি তা দেবো। মালে গনীমতের যে অংশ তোমার কাবীলার লোকেরা ও তুমি পাবে তা তো পাবেই আরো অতিরিক্ত বাইতুলমালের অংশ থেকেও এক-চতুর্থাংশ তোমাদেরকে দেয়া হবে।'

জারীর রাজী হয়ে গেলেন

উমর (রা) এর কাছে প্রায় সবগুলো গোত্র সরদারই এলেন।

ঃ 'তোমরাও কি জিহাদের জন্য বিনিময় চাইবে'– উমর (রা) জিজ্ঞেস করলেন– 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ফরযকর্ম বিনিময় নিয়ে পূর্ণ করবে? তোমরাও কি শহীদদের রক্ত বিক্রি করতে এসেছো?'

ঃ 'আমরা জানি পারস্যের রণাঙ্গনে এখন কি বিপদ চলছে'– এক সরদার বললেন– 'কিন্তু আপনি যা বলছেন তা তো আপনার মনের কথা নয়। লোকেরা বলতো উমর (রা) রক্তগরম লোক– তাকে খলীফা বানানো ঠিক হবে না। কিন্তু তারা কি ঠিক কথাটি বলতো? বলুন ব্যাপার কি হয়েছে।'

ঃ 'আল্লাহর কসম ইবনুল খাত্তাব!'– আরেক সরদার বললেন– 'পারস্যের রণাঙ্গন থেকে কিছু মুজাহিদ পালিয়ে এসেছে। কিন্তু ইবনুল খাত্তাব! আপনি তো আমাদের খলীফা– আমীরুল মুমিনীন। আপনি যদি মনোবল ভেঙে বসে পড়েন তবে আমাদের কি হবে? আপনার ক্রোধ বলছে আপনি ঘাবড়ে গেছেন। আমাদেরকে আমাদের কর্তব্যের কথা বলে দিন।'

ঃ 'আল্লাহ্ তোমাকে এর বদলা দিন'– উমর (রা) বললেন– 'তুমি শুধু আমার নয় আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিল করে নিয়েছো। এই তো কিছুক্ষণ আগে এক বাজালী নিজের মুজাহিদবাহিনী ও শহীদদের দাম চুকিয়ে গেছে।'----

ঃ 'এমন মুসলমানের ওপর লানত হোক'– হুসাইন ইবনে মাবাদ বললেন– 'আপনার কি চাই তা শুধু আমাদেরকে বলুন।'

ঃ 'মুসান্না শুধু তিন হাজার ফৌজ নিয়ে একা অসহায় অবস্থায় রয়েছে'– উমর (রা) বললেন– 'এজন্য অতিরিক্ত ফৌজ চাই এবং খুব দ্রুত।'

হুসাইন ইবনে মাবাদ ছিলেন বনু তামীমের সরদার। তিনি বেশি কথা বললেনও না শুনলেনও না। শুধু বললেন– আমার কবীলার এক হাজার তৈরি লোকের নাম লিখে ফেলুন। হুসাইন ইবনে মাবাদের বলতে দেরী হলো শুধু, অন্য সকল সরদাররাও লোক দেয়ার কথা বলে লোকদের তৈরি করতে চলে গেলেন।

প্রতিটি গোত্র সরদারই উল্লেখযোগ্য পরিমাণ লোক নিয়ে এলেন। সবার মধ্যে জিহাদের জযবা এমন তেজদীপ্তভাবে জেগে উঠলো যে, তা আরব্য-খ্রিষ্টানদের মনেও ছুঁয়ে গেলো। খ্রিষ্টান গোত্র বনু আনমার ও বনু তাগলিকের সরদার আনাস ইবনে হেলাল ও ইবনে মারওয়া উমর (রা) এর দরবারে হাজির হলেন।

ঃ 'আমীরুল মুমিনীন!'– তাদের একজন বললেন– 'যদি ধর্মীয় বাঁধা না থাকে তবে আমরাও আপনার সঙ্গে আছি। আমরা আরবের অধিবাসী। আজকের যুদ্ধ আরব আর অনারবে। মুসলমান অমুসলমানের নয়। আমরা আরবের ঝাণ্ডা সমুন্নত রাখতে প্রস্তুত।'

ঃ 'ধর্মীয় কোন বাধা নেই'– উমর (রা) বললেন– 'তোমরা আমাদের ভাই। আল্লাহ তোমাদেরকে এর প্রতিদান দেবেন।'

প্রায় হাজারখানেক খ্রিষ্টান এই সেনাসাহায্যে যোগ দিলো– যাদের অধিকাংশই সওয়ার ছিলো।

বড় অংকের এক সেনা-সাহায্য ইরাক রণাঙ্গনের উদ্দেশে পাঠানো হলো। মুসান্নার কাসেদ যখন মদীনায় পৌঁছলেন তখন এই লশকর রওয়ানা হয়ে গিয়েছিলো।

ওদিকে মুসান্না যে তার ফৌজের সরদারদের আরব সরদারদের লোকবল সংগ্রহ করতে পাঠিয়েছিলেন তাদের গোত্রগুলো ছিলো আরব সীমান্তে অবস্থিত। তাদের গোত্রগুলোও 'লাব্বাইক' বলে যথেষ্ট সংখ্যক লোক পাঠিয়ে দিলো।

ইরাক রণাঙ্গনে যখন সাহায্যকারী ফৌজ যাচ্ছিলো তখন জিসিরের ময়দান থেকে পালিয়ে আসা মুজাহিদরাও তাদের পিছু পিছু রওয়ানা হয়ে গেলো– যারা এতদিন লজ্জায় অনুতাপে আত্মগোপন করেছিলো তাদের সংখ্যা এক হাজারের কম ছিলো না। তাদের মধ্যে আবু শাদ্দাদও ছিলেন। তার ছেলেও স্বীয় কবিলার মুজাহিদদের সঙ্গে যাচ্ছিলো। সে জানতো না তার বাবাও পেছন পেছন আসছেন।

❖ ❖ ❖

মাদায়েনে এক ইহুদী পাদ্রী শহর থেকে বের হলো। কয়েকটি দানা ওয়ালা তাসবীহ্ হাতে নিয়ে সে অগ্রসর হচ্ছিলো। হঠাৎ দেখলো এক ঘোড়সওয়ার শহরের দিকে আসছে। সওয়ার ইহুদী ছিলো। তাই তাদের ধর্মীয় নেতাকে দেখে সসম্মানে মাথা ঝুঁকিয়ে ঘোড়া দাঁড় করালো। তারপর ঘোড়া থেকে নেমে পাদ্রীর সঙ্গে হাত মেলালো।

ঃ 'কোত্থেকে আসছো'– পাদ্রী জিজ্ঞেস করলো।

ঃ কাদিসিয়া থেকে রব্বী মুহতারাম!'– ইহুদী জবাব দিলো।

ঃ 'কাদিসিয়া?'–পাদ্রী বললো– তাহলে তো তুমি মুসলমান ফৌজকে দেখেছো।'

ঃ 'দেখেছি।'

ঃ 'তারা তো সামান্যই বাঁচতে পেরেছিলো'–পাদ্রী বললো–'এখনো পালিয়ে যায়নি?'

ঃ 'সামান্য কোথায় প্রভু?'– ইহুদী বললো– 'তাদের তো সেনা-সাহায্য মিলেছে যার কোন হিসাব নেই।'

ঃ 'এতো সেনা-সাহায্য'?– পাদ্রী হয়রান হয়ে বললো– 'এতো বড় খারাপ কথা---আমাদের সম্রাজ্ঞী ও জেনারেলরা কিছুই করলেন না। তারা তো এসব এলাকায় নিজেদের গুপ্তচর মোতায়েন রাখতে পারতেন। এখন দেখবে মুসলমানরা সোজা মাদায়েনে হানা দেবে।'

ঃ 'আমিই একজন গুপ্তচর প্রভু'– ইহুদী বললো– এই খবরই দিতে এসেছি আমি।'

ঃ 'আচ্ছা আচ্ছা- তাড়াতাড়ি গিয়ে রুস্তমকে বলো।'

ইহুদী তার ঘোড়ার দিকে ঘুরলো। পেছন থেকে পাদ্রী তার জামার নিচে হাত দিয়ে ইহুদীকে একটু দাঁড়াতে বললো। ইহুদী পাদ্রীর দিকে ঘুরেই দেখলো তার প্রভুর হাতে খঞ্জর। ইহুদী হতভম্ব হয়ে গেলো। তার জানা ছিলো না এ ইহুদী পাদ্রী নয় মুসলমান গোয়েন্দা আশআর ইবনে আওসামা।

আশআর খঞ্জর দিয়ে ইহুদীকে আঘাত করলো। ইহুদীও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত লড়াকু ছিলো। সে আঘাত এড়িয়ে পর মুহূর্তেই তরবারি বের করে নিলো। শহরের দরজা থেকে তারা বেশি দূরে ছিলো না। লোকেরা প্রায় কাছে এসে গিয়েছিলো। দূর থেকে তারা দেখলো এক লোক এক পাদ্রীর সঙ্গে লড়াই করছে। তারা দৌড়ে এলো। তারা কাছে আসতেই ইহুদী চেচামিচি করতে লাগলো– এ পাদ্রী নয় মুসলমানদের গুপ্তচর।

আশআর ইহুদীর ঘোড়ার দিকে দৌড় লাগালো। এক লাফে ঘোড়ায় চড়েই ঘোড়া ছুটালো।

সেই গুপ্তচর ইহুদী রুস্তমের কাছে গিয়ে তাকে জানালো মুসলমানরা বিরাট এক লশকর সিবাখে সমাবেশ ঘটিয়েছে।

রুস্তম এতটা আশা করেনি যে, মুসলমানরা এত দ্রুত তৈরি হয়ে যাবে। জিসিরের যুদ্ধের পুরো এক বছর তখন চলে গিয়েছিলো। রুস্তম সম্রাজ্ঞী পুরানের কাছে গিয়ে হাজির হলো। জেনারেলদেরকে ডাকালো। তারা সবাই ফয়সালা করলো মুসলমানরা

মাদায়েনের দিকে অগ্রসর হওয়ার পূর্বেই মেহরান ফৌজ নিয়ে যাবে এবং বাহমন জাদাবিয়া ও জালিয়ুনুস যেমন জিসিরের যুদ্ধে মুসলমানদেরকে পরাজিত করেছে তেমনি এবারও পরাজিত করবে।

যৌবনে মেহরান আরবের কোন এক এলাকায় ছিলো। লড়াইয়ের কৌশল ও রণাঙ্গনে নেতৃত্বদানের কৌশল আরবদের কাছ থেকে শিখেছিলো। তাই পুরান আর রুস্তম তাকে বলেছিলো– আরবদের যুদ্ধ কৌশল সম্পর্কে তোমার অভিজ্ঞতা অত্যন্ত মূল্যবান। তাই তুমি খুব সহজেই তাদের পরাজিত করতে পারবে।

মাদায়েন থেকে যখন ফৌজ বের হচ্ছিলো তখন আশআর ইবনে আওসামা মুসান্নার কাছে পৌঁছে মাদায়েনে এক গুপ্তচর ইহুদীর সঙ্গে তার কি ঘটেছিলো এবং সে মুসলিম ফৌজ সম্পর্কে কি বলেছিলো সবই জানালো।

মুসান্নাকে পাঁজরের যখমটি বেশ ভুগাচ্ছিলো। তিনি বিশ্রামের সুযোগ পাচ্ছিলেন না। ডাক্তার আর শল্য চিকিৎসকরা কয়েকবারই তাকে সাবধান করে দিয়েছিলেন যে, যখম যদি আরো গুরুতর হয় তবে তা মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু মুসান্নার মন জ্বলছিলো জিসিরের প্রতিশোধের চিন্তায়। আর সেনা সাহায্যও এই পরিমাণ পেয়েছিলেন যা কখনো তার প্রত্যাশা ছিলো না। তার চেহারা সব সময় তেজদীপ্ত দেখাচ্ছিলো এবং বিভিন্ন গোত্র থেকে আসা লোকদের তিনি দ্বিগুণ উৎসাহে শেষবারের মতো প্রস্তুত করে নিচ্ছিলেন। তাদের মধ্যে অনেকেই এমন ছিলো যারা লড়াই জানলেও এবং জিহাদের পূর্ণ মনোবল থাকলেও যুদ্ধের ময়দানে এই প্রথমবারই এসেছিলো।

মুসান্না তার লশকরকে সিবাখ থেকে কোচ করার হুকুম দিলেন। এই জায়গাটি তিনি লড়াইয়ের জন্য তেমন অনুকূল মনে করলেন না। ফুরাতের উত্তর-পশ্চিম কূলের বুয়ুব নামক স্থানকেই এর চেয়ে আরো অনুকূল মনে করলেন।

মাদায়েনের ফৌজ দ্বিতীয় দিন ফুরাতের ওপারে এসে পৌঁছলো। শিকলে আবৃত হাতিবহর দ্বারা সুসজ্জিত এই ফৌজ দূর থেকেই যে কোন যুদ্ধশক্তিকে ভরকে দেয়ার ক্ষমতা রাখতো। পারসিকদের কমাণ্ডার মেহরান নদীর পারে এসে তার এক কাসেদকে মুসলমানদের কাছে পাঠালো। সে নৌকার পুল বেয়ে এ পারে এলে মুসান্না তাকে জিজ্ঞেস করলেন– সে কেন এসেছে!

ঃ 'আমাদের সালারে আলা মেহরান জিজ্ঞেস করছেন নদী পার হয়ে তোমরা ওপারে যাবে, না আমরা এ পারে আসবো'– কাসেদ বললো।

ঃ 'তোমরাই এপারে আসো'– মুসান্না বললেন– 'আর তোমাদের সালারে আলাকে বলে দেবে– যে পর্যন্ত তোমরা নদী পার হয়ে নিজেদের ফৌজকে সারিবদ্ধ না করবে সে পর্যন্ত আমরা হামলা করবো না।'

পারসিকদের প্রায় লাখখানেক ফৌজ বিশাল হাতিবহরকে নিয়ে আর এতো দ্রুত নদী পার হওয়া সম্ভব ছিলো না। পারসিকরা এপারে আসতে থাকলে মুসান্না তার ফৌজকে পেছন দিকে সরিয়ে নিলেন– যাতে পারসিকরা অতর্কিত হামলার আশঙ্কা না

করে। যেমন জিসিরের লড়াইয়ে পারসিকরা করেছিলো। মুসান্না আবু উবাইদের ভুলের পুনরাবৃত্তি করতে চাইলেন না। তিনি তার ফৌজকে বলে দিলেন পূর্ণ বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত কেউ যেন নদীর ওপারে না যায়।

প্রায় অর্ধদিন লেগে গেলো পারসিকরা এপারে আসতে।

পরদিন ফজরের সময় মুসান্না তার লশকরকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করালেন। মূলবাহিনীর নেতৃত্ব তার হাতে নিলেন। ডান পার্শ্বস্থ ফৌজের নেতৃত্ব মাযউরকে আর বাম পার্শ্বস্থ ফৌজের নেতৃত্ব পারানসিয়ারকে দিলেন। পদাতিক বাহিনীর সালার বানালেন মাসউদকে ও সওয়ার বাহিনীর সালার আসেমকে। আর সংরক্ষিত বাহিনীর কমাণ্ড দিলেন ইসমাকে। ফৌজের প্রতিটি অংশের কাছে একটি করে ঝাণ্ডা ছিলো।

মুসান্নার পাঁজরের যখম গত এক বছরে ঠিক তো হয়ইনি বরং আশে পাশে আরো ছড়িয়েছে। তার চেহারায় বেদনার ছাপ স্পষ্ট ছিলো। কন্তু তার কথা ও চলাফেরায় মনে হচ্ছিলো তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ। ফৌজকে তিনি সুশৃংখলভাবে দাঁড় করিয়ে এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে দৃষ্টি ফেললেন এবং ফৌজের একধার থেকে আরেক ধারে চলে গেলেন। লশকরের প্রতিটি অংশের ঝাণ্ডাধারীর কাছে থামলেন এবং বুলন্দ আওয়াজে বলে গেলেন–

'আরবের বীর বাহাদুররা, খোদার কসম!–আমার বিশ্বাস আছে তোমরা আরবের বীরত্ব আর মর্যাদাবোধের ওপর দুর্নামের কলংক লাগাতে দেবে না। আজকের দিনে আমার পছন্দ সেটাই যা তোমাদের সকলের পছন্দ।'

জিসিরের যুদ্ধ এক বছর পূর্বে রমযান মাসে সংঘটিত হয়েছিলো। আবার সেই রমযানেই মুসলমানরা আরেকটি যুদ্ধের জন্য সারিবদ্ধ হয়ে আছে। মুসান্না আরো উঁচু আওয়াজে বললেন-

ঃ 'তোমরা সবাই রোজাদার।' রোজা স্বভাবে নম্রতা আর দৈহিকভাবে কমজোর করে দেয়। আজ একটি বড়ই কঠিন লড়াইয়ের দিন। তোমরা দুশমনের সংখ্যা ও তাদের শক্তি দেখে নাও। তোমরা ইফতার করে নিলেই ভালো করবে। শরীরে বাড়তি শক্তি পাবে।

প্রায় সবাই কিছু না কিছু খেয়ে রোজা ভেঙে ফেললো। সবার সঙ্গেই খাবার ছিলো। যাদের কাছে খাবার ছিলো না তাদের সঙ্গীরা কিছু কিছু করে তাদেরকে দিলো।

মুসান্না দুশমনের ফৌজের দিকে তাকালেন। তারাও মূল অংশকে তিনভাগে ভাগ করে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়েছিলো, মুসান্না তার লশকরকে শেষবারের মতো বিভিন্ন নির্দেশনা দিচ্ছিলেন। হঠাৎ দুশমনের ফৌজ থেকে হল্লা উঠলো। এতে মুসলিম ফৌজে অস্থিরতা দেখা দিলো। যেসব আরবরা আগে কখনো হাতি দেখেনি তাদের মধ্যে অস্থিরতার মাত্রাটা বেশিই ছিলো।

ঃ 'তাদের শোরগোলের দিকে মন দিয়ো না'– মুসান্না তার সৈন্যবাহিনীক বললেন–

ঃ 'এই হল্লা তাদের কাপুরুষোচিত কৌশল। তোমরা নীরব থাকো, পরস্পর কথা বলতে চাইলে ফিসফিসিয়ে বলো---- ইসলাম ও আরবের মুহাফেজরা! হাতিকে ভয় পেয়ো না। হাতির হাওদার রশিগুলো কেটে দেবে। হাতির শুঁড়গুলোও কাটার চেষ্টা করবে।'

পারসিকদের ফৌজের মধ্যবাহিনী আস্তে আস্তে অগ্রসর হতে লাগলো মুসলমানদের রীতি ছিলো– সালার প্রথম তিনবার নারা (শ্লোগান) লাগাবে। প্রথম নারায় সৈন্যরা তৈরি হয়ে যাবে। দ্বিতীয় নারার পর হাতিয়ার প্রস্তুত করবে। তৃতীয় নারার পরই হামলা শুরু করবে। পারসিকদের অগ্রসর হতে দেখে মুসান্না নারা লাগালেন 'আল্লাহু আকবার।'

ফারসী জেনারেল মুসলমানদের এই পদ্ধতি সম্পর্কে জানতো। তাই দ্বিতীয় ও তৃতীয় নারার সুযোগ না দিয়ে মুসলমানদের ওপর হামলার হুকুম করলো। তাদের মূলবাহিনী হামলার জন্য দ্রুত অগ্রসর হতে লাগলো।

মুসলমান ফৌজে এমন কিছু যোদ্ধা ছিলো যারা ব্যক্তিগতভাবে অভিজ্ঞ লড়াকু ও দক্ষ তীরন্দায বা নেযাবায হলেও যুদ্ধের ময়দানে কোন কমাণ্ডারের নেতৃত্বে সুশৃংখলভাবে লড়াইয়ের অভিজ্ঞতা তাদের ছিলো না। উভয় ফৌজের মধ্যে অধিক ব্যবধান থাকায় পারসিকদের হামলাকারী মূলবাহিনী তখনও কিছুটা দূরে ছিলো। বনু আজালের মুজাহিদরা তখন তীব্র জোশ আর আবেগে নিজেদের শৃংখলা ভেঙে পারসিকদের প্রতিরোধে এগিয়ে গেলো।

মুসান্না পেরেশান হয়ে গেলেন। রাগে তিনি দাঁতে তা ঠোঁট কামড়াতে লাগলেন। কাসেদকে ডেকে বললেন– 'এই দেখো বনু আজালের লোকদের অবস্থা। দৌড়ে তাদের সরদারকে গিয়ে আমার সালাম দিয়ে বলো, তারা যেন ইসলামকে এমন করে লাঞ্ছিত না করে। নিজেদের জায়গায় যেন ফিরে আসে।'

সিপাহসালারের কাসেদ যুদ্ধের ময়দানে পয়গাম পৌঁছানোর ব্যাপারে বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও দক্ষ ছিলো। কাসেদের ঘোড়া তুফান বেগে দৌড়ে বনু আজালের সদরদারের কাছে চলে গেলো। তাকে মুসান্নার পয়গাম জানালো। সরদার হাজার দেড় হাজার ফৌজকে তখনই তার নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসে তাদেরকে শৃংখলাবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে দিলো।

এর সঙ্গে সঙ্গেই মুহূর্তের ব্যবধানে মুসান্না দ্বিতীয় ও তৃতীয় নারা লাগিয়ে দিলেন। মুজাহিদদের যে বাহিনীকে পূর্বেই হামলার জন্য বলা হয়েছিলো তারা অত্যন্ত জোশদীপ্ত কদমে এগিয়ে গেলো এবং পারসিকদের হামলাকারী অগ্রবাহিনীকে থামিয়ে দিলো। ভীষণ যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলো।

জিসিরের লড়াই থেকে যারা পালিয়ে গিয়েছিলো এবং যারা বেঁচে গিয়েছিলো মুসলিম ফৌজে তারাও ছিলো। প্রতিশোধের আগুন তাদের মধ্যে ধাউ ধাউ করে জ্বলছিলো। এছাড়াও তারা যে বুযদিল নয় এটা প্রমাণ করারও মোক্ষম সুযোগ এসে গিয়েছিলো।

ভয় ছিলো হাতির। জিসিরের ময়দানে যে মুজাহিদরা লড়েছিলো তারা পূর্ব কৌশলই অবলম্বন করলো এবং হাওদার রশি কেটে কেটে এর সওয়ারদের মারতে লাগলো বা যখমী করতে লাগলো। অবশ্য এজন্য কিছু কিছু মুজাহিদ হাতির তলায় পড়ে পিষ্ট হলো বা যখমী হলো। পারসিকদের হাতি পারসিকদের জন্য বিপদ হয়ে দেখা দিলো। আর যেসব আরবরা প্রথমবার হাতি দেখেছিলো তাদের মনে হাতির ভয় ঢুকে যাওয়াতে হাতিকেই তারা প্রধান শত্রু মনে করে হাতির ওপর তুফান হয়ে হামলে পড়লো।

মুসান্না দেখলেন ফারসীরা সংখ্যায় কয়েক গুণ বেশি। তাই তিনি তাদের মাঝখানে ঢুকে হামলা করে তাদেরকে ছত্রভঙ্গ করে দিতে চাইলেন। দুই খ্রিস্টান সরদার আনাস বিন হেলাল ও ইবনে মারওয়াকে তার কাছে ডাকলেন–

ঃ 'তোমরা আমাদের ধর্মের নয়'– মুসান্না বললেন– 'কিন্তু এই লড়াই আরব আর অনারবেরও। খোদার কসম! আরবরা কখনো নিজেদের কুরবানী করতে পিছপা হয় না।'

ঃ 'ধর্মের কথা নয় এখন'– আনাস বিন হেলাল বললেন– 'আরব হিসেবে আমাদের নির্দেশ দিন'।

ঃ 'আমি দুশমনের মধ্যবাহিনীতে হামলা করছি'– মুসান্না বললেন– 'তাদের সালারে আলা মেহরান সেখানেই আছে। তাকে ঘোড়া থেকে ফেলতে চেষ্টা করো। তাকে ফেলতে পারলেই দেখবে কি হয়। তার সমস্ত ফৌজ ভাগো ভাগো রব পড়ে যাবে। তোমরা তোমাদের ফৌজ নিয়ে আমার ডানে বামে থাকবে। মেহরানের মুহাফিজ ফৌজের ওপর আমি হামলা করলেই তোমরা ডান ও বাম দিক থেকে হামলা করে বসবে।'

মুসান্না তার মূলবাহিনী নিয়ে মেহরানের মূলবাহিনীর ওপর হামলা করে বসলেন। মেহরান শাহী জেনারেল ছিলো। তাকে ঘোড় সওয়ার ও হাতি বহরের মুহাফিজরা দুর্ভেদ্য প্রাচীরের ভেতর হেফাজত করছিলো, তাকে মারা ও তার ঝাণ্ডা ফেলে দেয়া প্রায় অসম্ভবই ছিলো। মুসান্নার হামলা এতো তীব্র ছিলো যে, মেহরানের মুহাফেজ বাহিনীর দুর্ভেদ্য প্রাচীর না ভাঙ্গলেও মুসান্না ও তার খ্রিষ্টান সঙ্গী ফৌজরা তাদেরকে প্রায় ধাক্কিয়ে পারসিকদের দক্ষিণ বাহুতে নিয়ে গেলেন। এতে পারসিকদের ডান বাহুর শৃংখলা ভেঙে গেলো।

ফারসীদের এক জেনারেল যখন দেখলো মুসলমানরা মেহরানকে বড় ভয়ংকর বেষ্টনীতে ফেলে দিয়েছে তখন সে তার মূলবাহিনী নিয়ে মুসলমানদের ওপর ভেঙে পড়লো। উভয় ফৌজের মূলবাহিনীর মুখোমুখি সংঘর্ষ ছিলো এক ভয়াবহ দৃশ্য। আক্রমণের প্রচণ্ডতায় হাতি আর ঘোড়াগুলো উন্মাদপ্রায় হয়ে উঠলো। তাদের কারণে যেন ময়দানে ধূলিঝড় উঠলো। কোন পক্ষই দেখতে পাচ্ছিলো না কে কোথায় আছে এবং লড়াইয়ে কারা সুবিধাজনক অবস্থায় রয়েছে।

মুসান্না এবার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তার ফৌজকে পিছু হটাতে শুরু করলেন। পিছু হটে তিনি দেখলেন পারসিকদের ডান বাহু বিশৃংখল হয়ে পড়ছে আর মূলবাহিনী নতুন করে আবার একত্র হচ্ছে। মুসান্না আর সুযোগ দিলেন না। পারসিকদের উভয় বাহিনীর ওপরই অতর্কিত হামলা করে বসলেন। যেসব হাতি আহত হয়ে গিয়েছিলো এবং যেগুলোর হাওদা পড়ে গিয়েছিলো সেগুলো লাগামহীন হয়ে নিজেদের ফৌজদেরই পিষতে লাগলো।

আর মুসান্নার এই বুলন্দ আওয়াজ বার বার শোনা যাচ্ছিলো– 'ইসলামের জানবাযরা! তোমরা আল্লাহকে সাহায্য করো, আল্লাহও তোমাদেরকে সাহায্য করবেন।' এই শ্লোগানে মুসলমানদের মনোবল আরো বেড়ে যাচ্ছিলো।

পারসিকদের ডান বাহুর ব্যূহ এমনভাবে ভেঙে গেলো যে, তারা আর ময়দানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলো না। নৌকার পুলের দিকে পালাতে শুরু করলো। এই প্রান্তের মুসলমানরা পলায়নপর পারসিকদের এমন প্রচণ্ড চাপে হামলা করতে করতে নদীর দিক নিয়ে গেলো যে, ফারসীরা নদীতে লাফিয়ে পড়তে শুরু করলো। মুসান্না তার সংরক্ষিত বাহিনীকে এই হুকুম দিয়ে দ্রুত পুলের দিকে পাঠিয়ে দিলেন যে, পুলের রাস্তা বন্ধ করে দাও। কোন ফারসীকে পালাতে দিয়ো না। আর কাউকে জীবিত পাকড়াও করবে না। সবগুলোকে খতম করে দাও। যারা নদীতে লাফিয়ে পড়বে তীর দিয়ে তাদেরকে শেষ করে দাও।

লড়াইয়ে কোন পক্ষের ফৌজের কোন অংশে পালানোর মড়ক লাগে তবে এর প্রভাব সারা ফৌজে ছড়িয়ে পড়ে। পারসিকদেরও ডান বাহুর সৈন্যরা যখন পালাতে শুরু করলো তখন অন্য অংশের সৈন্যদের মনোবলও ভেঙে পড়তে লাগলো। কিন্তু তাদের কমাণ্ডার মেহরান তখনো জীবিত ছিলো। তার ঝাণ্ডাও বুলন্দ ছিলো।

মুসান্না তার পুরো লশকরকে পিছনে হটিয়ে নিলেন এবং অতি দ্রুত তাদেরকে শৃংখলাবদ্ধ করলেন। মুসলমানরা যখন দেখলো পারসিকদের সমস্ত হাতিবহরই যখমী হয়ে এদিক ওদিক ছুটছে এবং নিজেদের ফৌজকে সুশংখল হতে দিচ্ছে না এবং ময়দানের এদিক ওদিক লাশের স্তূপ পড়ে আছে, তখন মুসলমানদের ক্লান্তি দূর হয়ে গেলো এবং লড়াইয়ের জযবায় নতুন উদ্যমে বলীয়ান হয়ে উঠলো।।

ওদিকে পুলের কাছে পারসিকদের লাশের লাইন লেগে গিয়েছিলো। নদীতে যারা লাফিয়ে পড়েছিলো মুসলমানদের তীরের আঘাতে নদীতেই তাদের সলিল সমাধি হয়ে গেলো বা সাঁতার না জানার কারণে ডুবে মরলো।

মুসান্নার চোখে বিজয়ের ফলক ধরা পড়লেও পারসিকদের সংখ্যা মুসলমানদের চেয়ে পাঁচ ছয়গুণ বেশি ছিলো। তিনি বুঝতে পারলেন পারসিকদের মনোবল ভেঙে গেলেও তারা ময়দানে শুধু এজন্যই লড়ছে যে, তাদের কমাণ্ডার মেহরান এখনো বহাল তবিয়তে আছে এবং তার ঝাণ্ডাও সমুন্নত। মুসান্না আরেকবার গর্জে উঠলেন– 'নিজেদের ঝাণ্ডা সমুন্নত রাখো আল্লাহ তোমাদের মাথা সমুন্নত রাখবেন।'

মুসান্না এবার যে হামলা করলেন তা ছিলো অসম্ভব তীব্র। ফারসীরা ততক্ষণে হাতিবহরের প্রাচীর থেকে বঞ্চিত হয়ে গিয়েছিলো। তবুও তারা একত্রিত হয়ে মোকাবেলা করলো। কিন্তু মুসলমানরা এই যুদ্ধে লড়াইয়ের সব নিপুণতা প্রয়োগ করেছিলো। মুসান্নাও এত বিশাল ময়দানে দৌড় ঝাপ করে যেমন নেতৃত্ব দিয়েছেন তেমনি সিপাহীদের মতো লড়েছেনও। এর সামনে পারসিকরা আর কতক্ষণ দাঁড়াতে পারবে!

মুসান্না বনু বকরের লোক ছিলেন। তার ভাই মাসউদ তারই অধীনস্থ সালার ছিলেন। মাসউদ তার কবীলার মুজাহিদদের বলেছিলেন–

ঃ 'তোমরা যদি আমাকে যখমী হয়ে পড়ে যেতে দেখো তবুও লড়াই থামাবে না। নিজেদের জায়গায় অটল থাকবে এবং দুশমনের পাওনা মিটিয়ে দেবে।'

মাসউদ একথা বলার পরই মুসান্না হামলার হুকুম দিয়েছিলেন। মুসান্নার ভাই মাসউদ তখন পারসিকদের সৈন্য সারি ভেদ করে গিয়ে হামলা চালালেন। তার তলোয়ার যেদিকে ঘুরছিলো সেদিকেই পারসিকদের লাশ দেখা যাচ্ছিলো। অবশেষে তিনি এমন দুটি আঘাত খেলেন যে, গভীরভাবে যখমী হয়ে পড়লেন। কিন্তু পড়তে পড়তেও নিজেকে সামলে নিয়ে বড়ই বুলন্দ আওয়াজে বললেন–

ঃ 'হে বনু বকরের সন্তানরা!– নিজেদের ঝাণ্ডা বুলন্দ রাখো। আল্লাহ্ তোমাদের বুলন্দ রাখবেন। খবরদার, আমার মৃত্যুতে ভীত হয়ে মন ভেঙে বসে পড়ো না।'

একথা বলে মাসউদ ঘোড়াটি সামান্য পিছিয়ে আনলেন এবং ঘোড়া থেকে পড়ে গেলেন। মুসান্না দেখেই সঙ্গে সঙ্গে সেখানে পৌঁছলেন এবং ঘোড়া থেকে নেমে তার ভাইকে উঠিয়ে পেছনে এক স্থানে শুইয়ে দিলেন। মাসউদ ততক্ষণে শাহাদাতের শরাব পান করে ফেলেছিলেন। মুসান্না দৌড়ে গিয়ে লাফিয়ে ঘোড়ায় সওয়ার হলেন এবং গলা ভেঙে ঘোষণা করলেন–

ঃ 'বুন বকরের সন্তানরা!–আমার ভাই শহীদ হয়েছেন। কিন্তু তোমরা ভেঙে পড়ো না। আত্মমর্যাদার অধিকারীরাই এভাবে জান কুরবান করে দেয়। তোমাদের ঝাণ্ডা সমুন্নত রাখো।'

মুসান্না অন্যদিকে গিয়ে দেখলেন খ্রিস্টান সরদার আনাস বিন হেলাল তার ভাই মাসউদ ইবনে হারিসার মতোই জানতোড় লড়াই করছেন। কিন্তু এক ফারসী পেছন থেকে বর্শা দিয়ে তার পিঠে পরপর তিনবার গেঁথে দিল এবং বের করে নিলো। আনাস ইবনে হেলাল ঘোড়া থেকেই নিষ্প্রাণ হয়ে পড়ে গেলেন।

মুসান্না তেজ দৌড়ে সেই ফরাসীকে এক কোপে জাহান্নামে পাঠিয়ে দিলেন। মুসান্নার মুহাফিজরাও আশে পাশের সবগুলো পারসিক সৈন্যকে খতম করে দিলো। মুসান্না ঘোড়া থেকে নামলেন। তার মুহাফিজ ফৌজ তাকে বেষ্টনীতে রাখলো। তারপর মুসান্না তার ভাইয়ের লাশ যেমন পরম মমতায় ও শ্রদ্ধায় উঠালেন তেমন মমতা-মর্যাদায় উঠালেন আনাস বিন হেলালকে এবং পেছনে সরে এসে তার ভাইয়ের লাশের সঙ্গেই তাকে শুইয়ে দিলেন।

পারসিকদের প্রতিরোধের ক্ষমতাও খতম হয়ে গিয়েছিলো। বিক্ষিপ্তভাবে তারা লড়ছিলো। প্রত্যেকেই জান বাঁচিয়ে পালানোর জন্য লড়ছিলো। কিন্তু তাদের পিছু হটার জন্য পেছনের যমীনও সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিলো। নদীতে লাফিয়ে পড়তেও তারা ভয় পাচ্ছিলো। সেখানেও মৃত্যুদূত দাঁড়ানো ছিলো। আর পুল তো মুজাহিদদের দখলেই ছিলো।

মেহরানের ঝাণ্ডা তখনো উঁচুই ছিলো।

মুসান্না হুকুম দিয়ে যাচ্ছিলেন কোন ফারসীকেই যেন জীবিত রাখা না হয়।

হঠাৎই মেহরানের ঝাণ্ডা পড়ে গেলো এবং মেহরান ঘোড়া থেকে পড়েই শেষ হয়ে গেলো। তখনই একটি আওয়াজ শোনা গেলো–

ঃ 'আমি বনু তাগলিবের জোয়ান যে আজকের ফারসী সেনাপতিকে কতল করে দিয়েছে।'

খ্রিষ্টানগোত্র বনু তাগলিবের এই যুবক মেহরানের ঘোড়ার ওপর চড়ে বসলো এবং সারা ময়দানে দৌড়াতে দৌড়াতে বলতে লাগলো– 'আমি আজমের সালারকে কতল করে দিয়েছি'।

ঃ 'না পারস্যের ঝাণ্ডা কখনো গড়িয়ে পড়তে পারে না'– এটা ছিলো কোন ফারসী সরদারের আওয়াজ। যে তার ঝাণ্ডা বুলন্দ করে রেখেছিলো।

সঙ্গে সঙ্গেই আরেকটি আওয়াজ শোনা গেলো।

ঃ 'না---পারস্যের ঝাণ্ডা আর বুলন্দ হবে না'– এ ছিলো এক মুজাহিদের আওয়াজ। সে ঐ ফারসী সরদারের হাত থেকে ঝাণ্ডা ছিনিয়ে নিয়ে তাকে হত্যা করেছিলো। তার ঘোড়া ছুটছিলো। ফারসীর ঝাণ্ডা মাটিতে লুটাচ্ছিলো। সেও ঘোষণা করলো–

ঃ 'আমি সুহায়েব সাকাফী। এই নিন ঝাণ্ডা'– এই বলে সে মুসান্নার কাছে এসে পারসিকদের ঝাণ্ডা তার পায়ে নিক্ষেপ করলো।

তারপর যা হলো তা ছিলো এক কথায় গণহত্যা। প্রায় কোন পারসিক সৈন্যই বাঁচতে পারেনি। যুদ্ধ শেষে মুসলমানরা তাদের সঙ্গীদের লাশ উঠিয়ে উঠিয়ে দাফন করলো। কিন্তু পারসিকদের লাশ শিয়াল কুকুর ছাড়া আর কেউ উঠানোর জন্য রইলো না।

বুয়ুবের এই লড়াই শেষ হওয়ার পর মুসান্না তার সালার ও সরদারদের মাহফিলে বলেছিলেন–

ঃ 'ইসলাম গ্রহণের পূর্বে আমি আজমীদের বিরুদ্ধে আরো কয়েকটি লড়াইয়ে অংশ নিয়েছিলাম। তখন একশ আজমী এক হাজার আরবীর জন্য যথেষ্ট ছিলো। আর ইসলাম গ্রহণের পর দেখছি এক আরব এক হাজার আজমীর জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ তায়ালা পারসকিদের সেই দাপট খতম করে দিয়েছেন। তাদের শান শওকত, জাঁকজমকপূর্ণ সৈন্যবহর, একই ধরনের হাজারো বিষমিশ্রিত বর্শা এবং তোমাদের চেয়ে কয়েকগুণ বেশি ফৌজকে তাই তোমরা ভয় পাও না। তাদের সেই দাপট হারিয়ে তারা এখন চতুষ্পদ জন্তুর মতো হয়ে গেছে। তোমরা যেদিকে ইচ্ছা হাঁকিয়ে নিয়ে যাও ওদের।'

ইহুদী জাদুঘর সারানকে বলেছিলো– এই খান্দানের ভাগ্য মানুষের রক্তেই নির্ধারিত হয়। এই খান্দানের প্রতিটি কামিয়াবীই রক্তের বদলে অর্জিত হয়। নিজেদের রক্তেই এরা ডুবে যাবে।

বুয়ুবের যুদ্ধ শেষে।

মুসান্না তার ভাই মাসউদ ও খ্রিষ্টান সরদার আনাস বিন হেলালের লাশের ওপর পড়ে কাঁদতে কাঁদতে বেসামাল হয়ে যাচ্ছিলেন। এক সালার তখন এগিয়ে এসে তাকে উঠালেন এবং জড়িয়ে ধরলেন।

'ঃ খোদার কসম!'– মুসান্না বললেন– তখনো তারা কান্নার রেশ যায়নি– 'এটা ভেবে আমার দুঃখ সত্যিই কমে আসে যে, এরা দুজনে বুয়ুবের যুদ্ধে লড়েছেন, অটল থেকেছেন, চরম বীরত্ব দেখিয়েছেন। ভয় পাননি। বুযদিলি দেখাননি। এবং শহীদ হয়েছেন। আর শাহাদাত তো গুনাহের কাফফারাই হয়।'

ঃ 'কোথায় সেই খ্রিষ্টীয় বাঘ যে ফারসী সিপাহসালারকে হত্যা করেছে?'– মুসান্না ঘোষণা করলেন–

ঃ 'আর কোথায় সেই মুজাহিদ যে এক ফারসী সরদারকে হত্যা করে মেহরানের পড়ে থাকা ঝাণ্ডা উঠিয়ে আমার সামনে এনে নিক্ষেপ করেছিলো?'

দু'জনকেই ডাকা হলো।

ঃ 'হে আরবের সিংহ!'– মুসান্না খ্রিষ্টান যুবককে বললেন– 'যদি আমার ধর্ম অনুমতি দিতো তবে তোমাকে একটি জায়গীর পুরস্কার দিতাম। তুমি শুধু ফারসী সিপাহসালারকেই হত্যা করোনি, তুমি পারসিকদের অহংকার আর অহমিকার মস্তকটাই কেটে দিয়েছো। ইসলাম জায়গীর দানের অনুমতি দেয় না। এই যমীন আল্লাহর। তাঁর হুকুম হলো– তাঁর প্রতিটি বান্দাই এর সমান অধিকারী।'

ঃ 'আপনাদের এবং আমার নিজের ধর্মের ব্যাপারে আমার কোন আগ্রহ নেই সিপাহসালার।'– খ্রিষ্টান যুবক বললো– 'আমি আরবের পতাকা সমুন্নত রাখার জন্যই আমার জানবাজি রেখেছিলাম। আজমীদের এই তিরস্কার আমি বরদাশত করতে পারি না যে, আরবরা কাপুরুষ।'

ঃ 'আল্লাহর কসম!'– তুমি পুরস্কারের উপযুক্ত তো অবশ্যই'– মুসান্না বললেন– 'মেহরানের ঘোড়াসহ যা তোমার কাছে আছে তা তোমারই। মেহরানের অতি মূল্যবান পোষাক থেকে যা পাও তা এবং তার তলোয়ারটিও তোমার ব্যক্তিগত মালে গনীমত। আর গনীমতের মালের অংশ তো তুমি পাবেই। মেহরানের তলোয়ার নিয়ে তোমার অনাগত বংশধররা গর্ববোধ করবে'----'আর তুমি'– মুসান্না সুহায়েব সাকাফীকে উদ্দেশ করে বললেন– 'তোমার অবদানও কম নয় মুজাহিদ---- তোমার নাম?

ঃ 'সুহায়েব ইবনুল কদর সাকাফী।'

ঃ 'উহ'– মুসান্নার মনে পড়লো– 'তুমি কি সে নয় যাকে জিসিরের ময়দান থেকে সেই এলাকার একটি মেয়ে যখমী অবস্থায় উদ্ধার করে এনেছিলো?'

ঃ 'হ্যাঁ, আমি সেই– সিপাহসালার।'

ঃ 'তুমি অনেক যখমী ছিলে!'

ঃ 'সে তো অনেক আগের কথা সিপাহসালার!'– সুহায়েব বললো– 'পায়ের হাড় ভেঙে গিয়েছিলো। এখনো তা সারেনি। ঘোড়ার রেকাবে শুধু পা রাখতে পারি। কিন্তু সেই পা দিয়ে ঘোড়া চালাতে পারি না।'

ঃ 'যে ফারসী সরদারকে তুমি হত্যা করেছিলে তার স্বর্ণখচিত তলোয়ারসহ মূল্যবান যা কিছু পাও তা তুমি নিয়ে নাও। মুসান্না তাকে বললেন এবং জিজ্ঞেস করলেন– 'সেই মেয়েটির সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়ে গেছে?'

ঃ 'না-সিপাহসালার!'– সুহায়েব জবাব দিলো– 'বিয়ে তো পড়ানোর কথা আপনারই।'

ঃ 'আজ রাতেই বিয়ে হয়ে যাবে' মুসান্না বললেন।

মুসান্না তার ভাই ও অন্যান্য সঙ্গীদের শাহাদাতে শোকে বিহ্বল ছিলেন। কিন্তু এত বড় বিজয়ের আনন্দ তা অনেকটা কমিয়ে দিয়েছিলো। তিনি এটা দেখে নিজে নিজে সান্ত্বনা নিচ্ছিলেন যে, আরো তো কতো বোনের ভাই, মার পুত্র, স্ত্রীর স্বামী শহীদ হয়েছে। তাই মুসান্না মুখে হাসি ফুটিয়ে সবার সঙ্গেই কথা বলছিলেন। আচমকা তিনি যখমযুক্ত পাজরে হাত রাখলেন এবং তার হাস্যময় মুখটি নিমিষেই বেদনায় নীল হয়ে গেলো। ডাক্তাররা তাকে বারংবার বলেছিলো পূর্ণ বিশ্রাম নিতে। কিন্তু অনবরত ঘোড়সওয়ারী, এখান থেকে ওখানে কোচ করা, বিভিন্ন লড়াইয়ে যোগ দেয়া, রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়া এসব কারণে তার যখম এক বছরে সেরে তো উঠেইনি বরং ভেতর তা অনেক দূর ছড়িয়ে পড়েছিলো। তার শ্বাস নিতেও কষ্ট হতো। এজন্য তিনি এককারে পূর্ণ শ্বাসও নিতেন না।

লোকদের ছোট্ট একটা ভীর মুসান্নার দিকে এগিয়ে এলো এবং তাকে ধরে তার তাঁবুতে নিয়ে গেলো। ডাক্তাররা দৌড়ে এলো। তার স্ত্রী সালমা তাকে দেখে পেরেশান হয়ে গেলেন।

ঃ 'জযবা আর আবেগ সবখানেই চলে না ইবনে হারিসা!'–সালমা মুসান্নাকে বললেন– 'নিজেদের দিকেও তো তাকাতে হয়। কেন আপনি আপনার প্রাণ নিয়ে খেলছেন।'

ঃ 'জীবন আর মৃত্যু তো আল্লাহর হাতে সালমা!'– মুসান্না বললেন– 'কখন যে তাঁর দরবার থেকে ডাক এসে যায় কে জানে। কিন্তু আমার ফরয আমি পালন করেই তাঁর দরবারে যাবো। এই পারসিকরা– যারা নিজেদেরকে সূর্যের পুত্র বলে– তাদের মধ্যে কেবল তাদেরকেই জীবিত রাখবো যে আল্লাহকে এক– লা শারীক ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর বান্দা ও রাসূল বলে মান্য করবে।'

ডাক্তার তার ব্যান্ডেজ খোলার পর সালমা তা দেখে আতকে উঠলো। যখম থেকে রক্ত আর পুঁজের মিশ্রণ বের হচ্ছিলো। মুসান্নার শ্বাস প্রশ্বাস স্বাভাবিক ছিলো না। তিনি অর্ধ-শ্বাস নিচ্ছিলেন।

ঃ 'আজকের লড়াই যখমের অবস্থা আরো গুরুতর করে দিয়েছে।'– শল্য চিকিৎসক গরম পানিতে যখম পরিষ্কার করতে করতে বললেন।

ঃ 'আর আজকের লড়াইয়ের পরিণামটাও দেখে নাও'– মুসান্না মুচকি হেসে বললেন– 'কোন ফারসীকে জীবিত দেখতে পাচ্ছো? জিসিরের লড়াই আমার আত্মাকে ক্ষত বিক্ষত করেছিলো, আমার লশকর গণহত্যার কবলে পড়েছিলো। আজ আমার আত্মার ক্ষত শুকিয়েছে'– মুসান্না আবেগে কাঁপতে লাগলেন– 'আমার মনযিল মাদায়েন। মাদায়েনে অগ্নিপূজারীদের যে সিংহাসন আছে তা আমার প্রতীক্ষা করছে। যেদিন মাদায়েনের মহলে চড়ে আমার মুয়াযযিন আযান দেবে সেদিন আমার এই ক্ষতটিও শুকিয়ে যাবে।'

ডাক্তার ও শল্যচিৎসক ব্যান্ডেজ বেঁধে চলে যাওয়ার পর মুসান্না সালমাকে সমস্ত সালারদের ডাকতে বললেন।

ঃ 'আপনি কি কিছুক্ষণ বিশ্রামও নেবেন না?'– সালমা বললেন– 'সালারদের সঙ্গে কথা বললে তো যখমে এর চাপ পড়বে।'

ঃ 'সালমা!'– মুসান্না তার হাত নিজ হাতে নিয়ে বললেন– 'জীবনটা আর ক'দিনের! ডাক্তার আমার যখম যখন পরিষ্কার করছিলেন আমি তার চেহারা পড়তে চেষ্টা করছিলাম। আমার চোখে তার মুখের হতাশাই ধরা পড়লো। আমাকে আরামের কথা বলে গেছেন ডাক্তার। কিন্তু সময় কোথায় আমার। সালারদের আমি একটা জরুরী কথা বলতে চাই। আজ আমার একটি ভুল হয়ে গেছে। যেটাকে তারা আমার কীর্তি মনে করতে পারে। কিন্তু আমি যখন তাদের সঙ্গে থাকবো না তখন এই ভুলকে আশ্রয় করেই তারা ক্ষতির সম্মুখীন হবে।'

সালাররা সবাই আসলে মুসান্না উঠে বসলেন।

ঃ 'বন্ধুরা আমার!' মুসান্না বললেন– 'তোমাদের মধ্যকার দুজন সালার আমার এই সিদ্ধান্তের প্রশংসা করেছো যে, আমি পুল দখলে নিয়ে পারসিকদের পালানোর রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছিলাম। এর ফলে সেখান দিয়ে পালাতে আসা ফারসীরা আমাদের মুজাহিদদের হাতে সমানে মারা পড়েছে। কিন্তু বন্ধুরা আমার! আমার এই সিদ্ধান্তটা প্রশংসাযোগ্য ছিলো না। এটা আমার দুর্বলতা ছিলো। আমি মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি যে, আমি এই দুর্বলতার মন্দ পরিণাম থেকে বেঁচে গিয়েছি।'

সমস্ত সালাররা হয়রান হয়ে মুসান্নার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

ঃ 'আমি চাচ্ছি আমার ভুলটা তোমাদের ভালো করে বুঝিয়ে দেই। পুলের রাস্তা দখল করে দুশমনের পালানোর রাস্তা বন্ধ করাটা কেন ভুল ছিলো? হতে পারে কখনো আমি তোমাদের সঙ্গ ছেড়ে যে কোন মুহূর্তে দুনিয়া থেকে চলে যাবো। তাই আমার অভিজ্ঞতা তোমাদের দিয়ে যাওয়াটা জরুরি মনে করছি।--- মনে রেখো যে পর্যন্ত দুশমনের সামান্য শক্তিও অবশিষ্ট থাকবে সে পর্যন্ত দুশমনের কোন দলকেই আমার মতো পথ আগলে বাঁধা দেবে না। এতে দুশমন আহত সিংহের মতো প্রচণ্ড ক্রোধ নিয়ে হামলা করে বসবে। তোমরা কি দেখোনি মুজাহিদরা যখন পুলের ধারে পারসিকদের ঘেরাও করে কাটতে শুরু করলো তখন মেহরানের তাজাদম দলটি আমাদের ওপর চারদিক থেকে হামলা করেছিলো। তোমরা এটাও দেখেছো, পারসিকরা পূর্ব থেকে

আরো অধিক জানবায হয়ে লড়ছিলো। আল্লাহর কসম! আমি আশংকা করছিলাম আমরা বুঝি হেরে গেলাম! আমরা যে জিতে গেছি এটা তো আল্লাহর মেহেরবানী। আমি আমার ভুল স্বীকার করছি। তোমরা কেউ কখনো এধরনের ভুল করো না। দুশমনের পালানোর পথে তখন বাধার সৃষ্টি করবে যখন দেখবে তাদের দম খতম হয়ে গেছে এবং তারা তখন পড় পড় অবস্থায় পৌঁছে গেছে।' মালে গনীমত খুব তাড়াতাড়ি একত্রিত করতে হবে'– মুসান্না হুকুম দিলেন– 'দিনে দিনেই এর বণ্টন হয়ে যাবে। মালে গনীমতের এক পঞ্চমাংশ মদীনায় আমীরুল মুমিনের কাছে পাঠিয়ে দেয়া হবে। এর পরপরই মাদায়েনের পথে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। মাদায়েনের পথে 'সাবাত' নামক একটি স্থান আছে, এটাই আমাদের মনযিল। শহীদানের লাশ তখনই একত্রিত করা হবে। কাল ফজর নামাযের পর জানাযা পড়া হবে। এই ময়দানেই তাদেরকে দাফন করা হবে।'

মুসান্না যখন তার সালারদের সঙ্গে কথা বলছিলেন তখন ছিলো রাতের প্রথম প্রহর। তখন অনেক মুজাহদ নিজেদের শহীদ সঙ্গীদের লাশ উঠিয়ে এক জায়গায় জড়ো করছিলো। মুজাহিদদের স্ত্রীরা যখমীদের তাঁবুতে নিয়ে যাচ্ছিলো। যামরাদও তাদের সঙ্গে ছিলো। সবার কাছেই পানির ঝুলানো মশক ছিলো। এ থেকে যখমীদের তারা পানি পান করাচ্ছিলো। রাতে যুদ্ধের ময়দানেও দৃশ্য ছিলো ভয়াবহ– যে কারো শরীরের রোম দাঁড় করিয়ে দেয়ার মতো লাশের পর লাশের স্তূপ পড়েছিলো। সুবিশাল ময়দানের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তের নদীর তীর পর্যন্ত লাশের স্তূপ ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছিলো। এর মধ্যে সে সব যখমীরা কাতরাচ্ছিলো যারা উঠতেও পারছিলো না আবার তীব্র যন্ত্রণা থেকে বাঁচার জন্য মৃত্যু কামনা করছিলো। অসংখ্য জ্বলন্ত মশালগুলো এমন লাগছিলো যে, সেগুলো বুঝি লাশের গায়ে জ্বলছে। ময়দানের অন্য প্রান্তে জংলী শিয়াল কুকুর ও হিংস্র প্রাণীরা লাশের গা চিড়ে খুবলে খুবলে মাংস খাচ্ছিলো।

ঃ 'মনে হয় তুমি মুসলমান'– এক যখমী মুজাহিদ এক মহিলাকে বললেন– 'আমাকে উঠিয়ো না। পানি পান করাও। আমার সময় শেষ হয়ে এসেছে। সিপাহসালার মুসান্না ইবনে হারিসাকে আমার সালাম পৌঁছে দিয়ে বলবে জিসিরের লড়াইয়ে পালিয়ে গিয়েছিলাম। আজকের লড়াইয়ে আমি সেই বুযদিলির গুনাহের কাফফারা আদায় করেছি। আল্লাহ আমাকে মাফ করুন----- আল্লাহ আমাকে মাফ করুন।' সেই মুজাহিদ শহীদ হয়ে গেলেন।

আরো কয়েকজন যখমী মুজাহিদ সিপাহসালারকে এমনই পয়গাম দিয়ে শহীদ হয়ে গেলেন। লাশ আর যখমী উদ্ধারকারীদের মধ্যে যুবক শাদ্দাদও ছিলো। চার পাঁচটি লাশ উঠিয়ে পেছনে নিয়ে রেখেছিলো সে। এমন এক যখমী মুজাহিদকেও উঠিয়ে পেছনে নিয়ে রেখেছিলো যার একটি পা হাতি ছাতু বানিয়ে ফেলেছে।

ঃ 'শাদ্দাদ!'–হঠাৎ শাদ্দাদের কানে ক্ষীণ কণ্ঠের একটি আওয়াজ গেলো।

ঃ 'আমাকে কি কেউ ডেকেছে?'– শাদ্দাদ তার সঙ্গীদেরকে জিজ্ঞেস করলো।

ঃ 'কোন যখমীর আওয়াজ মনে হচ্ছে'– তার এক সাথী বললো।

তিনজনই থেমে গেলো।

ঃ 'এদিকে শাদ্দাদ! এদিকে!- আবার সেই ক্ষীণ কণ্ঠের আওয়াজ।

তিনজনই আওয়াজ লক্ষ্য করে এগিয়ে গেলো। পাঁচ-সাত পা দূরে এক যখমী মুজাহিদ উঠতে চেষ্টা করছিলো। তার কাপড় রক্তাক্ত শরীরের সঙ্গে লেপ্টে গিয়েছিলো। চেহারা রক্তে ঢেকে গিয়েছিলো। দাড়ির ওপর রক্ত জমাট বেঁধে গিয়েছিলো। একে তো যখমের তীব্র বেদনা তাকে উঠতে দিচ্ছিলো না, তারপর আবার দুই ফারসীর লাশের পা দু'দিক থেকে তার পেটে এসে পড়েছিলো।

মুজাহিদদের কারো স্ত্রী যখমীর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তাকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়লো। মহিলার এক হাতে পানির মশক অন্য হাতে মশাল ছিলো। মহিলা পানির মশক যখমীর মুখে ধরে থাকলো। যখমী অধৈর্য হয়ে পানি পান করতে লাগলেন। পানি পান শেষ হলে যখমী শাদ্দাদ ও তার সঙ্গীদের সাহায্যে উঠতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু হঠাৎ অন্যদের ছেড়ে শাদ্দাদকে তার বাহুতে নিয়ে নিলেন।

ঃ 'তুমি হয়তো আমার নামে লানত করতে বেটা!'- যখমী প্রায় ফিসফিসিয়ে বললেন- 'আমি জিসিরের ময়দান থেকে পালিয়ে গিয়েছিলাম। আমার শহীদ সঙ্গীদের সঙ্গে আমি গাদ্দারি করেছিলাম।'

ঃ 'খোদার কসম!'- শাদ্দাদ তার বাহুতে থেকে অস্থির হয়ে বেরিয়ে বললো- তুমি-----তুমি বাবা!'

ঃ হ্যাঁ বেটা!- যখমী বললেন- আমি আবু শাদ্দাদ। 'আমি জিসিরের শহীদদের অভিযোগ ধুয়ে ফেলেছি। আমার চেহারায় লেপ্টে থাকা কালিমা নিজের খুনে নিজেই ধুয়ে ফেলেছি। কি যে তৃপ্তি পাচ্ছি। কি যে শান্তি পাচ্ছি বেটা! তুমি আমার কথা রেখেছো এবং আমার পরাজয়ের প্রতিশোধ নিয়েছো।'

শাদ্দাদ তার বাবাকে উঠাতে চেষ্টা করছিলো। কিন্তু বাবা কয়েকটি হেচকি তুলে শহীদ হয়ে গেলেন। শাদ্দাদ তার দুই সঙ্গীর কাছ থেকে অশ্রু লুকোতে চেষ্টা করলো। কিন্তু তাদের চোখও ভিজে গিয়েছিলো।

পরদিন ফুরাতের কিনারায় তিন সারিতে শহীদদের লাশ রাখা হয়েছিলো। মুসান্না জানাযার নামায পড়াচ্ছিলেন। দূরে মহিলারা দাঁড়ানো ছিলো। তাদের চোখ দিয়ে নামছিলো অশ্রুবন্যা। তাদের ভালোবাসার মানুষরা- স্বপ্নের সঙ্গীরা- সুখ-দুঃখের সঙ্গীরা চিরতরে হারিয়ে গিয়েছিলেন। তাদের একলা ফেলে একাই শাহাদাতের জাম পান করেছিলেন। জানাযা আদায়কারী মুজাহিদদের চোখেও অশ্রুবন্যা বইছিলো। ঘর থেকে তারা এক সঙ্গে বের হয়েছিলো, গল্প করতে করতে, হাসতে হাসতে, শ্লোগান আর নারা লাগাতে লাগাতে, কত রকমের ঠাট্টা করতে করতে রণাঙ্গনে পৌঁছেছিলো। আজ তাদের অনেকেই আখেরাতের পথের যাত্রী।

শহীদদেরকে সেই কাপড়েই দাফন করা হলো যে কাপড়ে তারা লড়েছিলো। রক্তে লাল ছিলো কাপড়গুলো। তাদেরকে গোসল দেয়া হয়নি। রক্তেই তাদের গোসল হয়ে গিয়েছিলো।

তারপর মালে গনীমতের বন্টন করা হলো।

ঃ 'ইবনে হারিসা!'– ফুজায়েলা গোত্রের সরদার জারীর ইবনে আবদুল্লাহ মুসান্নাকে বললেন– 'আমীরুল মুমিনীনের হুকুম তো ভুলে যাওনি যে মালেগনীমতের এক-চতুর্থাংশ অতিরিক্ত আমার কবিলাকে দেয়া হবে!'

ঃ 'আমি ভুলিনি ইবনে আবদুল্লাহ!'– মুসান্না বললেন– 'কিন্তু এটা বলো না যে, এটা আমীরুল মুমিনের হুকুম। বলো এটা তোমারই আরোপ করা শর্ত। আমীরুল মুমিনীন এমন হুকুম দিতে পারেন না যে, একজনকে সবার চেয়ে অতিরিক্ত অংশ দেয়া হবে---- এ নাও তোমার অতিরিক্ত এক-চতুর্থাংশ।– আল্লাহ তোমাকে হেদায়েত করুন। শহীদদের রক্তের মূল্য তো কেউ চাইতে পারে না---।'

জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ কোন কথা না বলে অতিরিক্ত অংশ নিয়ে নিলেন। আমীরুল মুমিনের নির্দেশমতো বায়তুল মালের জন্য এক-পঞ্চমাংশের বদলে তিন-চতুর্থাংশ পাঠিয়ে দেয়া হলো। মদীনায় নিয়ে যাওয়া এই গনীমতের মাল বহনকারী কাফেলার আমীর ছিলেন আমর ইবনে আবদুল মাসীহ।

বুয়ুবের লড়াই থেকে মুসলমানরা এত বেশি মালে গনীমত পেয়েছিলো যে, অন্য কোন লড়াই থেকে এর আগে এত মালেগনীমত পায়নি। রুস্তম মুসলমানদেরকে চূড়ান্তরূপে পরাজয়ের জন্য প্রায় এক লাখ সৈন্য পাঠিয়েছিলো। সৈন্যরা যাতে জানবাজি রেখে লড়ে যায় এজন্য তাদের জন্য বরাদ্দ ছিলো সর্বাধিক উন্নতমানের খাবার। এক লাখ ফৌজের রেশন আর বেতনের স্বর্ণমুদ্রা ছিলো হিসাব ছাড়া। তাদের জন্যে অগ্রিম কয়েকমাসের রেশন ও বেতন বরাদ্দ করা হয়েছিলো। যাতে মুসলমানদের এই বাহিনীকে পরাজিত করে ফৌজ মদীনা পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

তাদের রেশনে টনকে টন উন্নত জাতের আটা, হাজার হাজার ভেড়া বকরী, দুধেলা গাভী-উটনী ইত্যাদি ছিলো। এছারাও কত রকমের যে সোনা রুপা ও মুক্তার অলংকার ছিলো তার হিসাব ছিলো না।

আরবের সীমান্তবর্তী এলাকায় যে সব মুসলিম গোত্রের বসবাস ছিলো সেখান থেকেও অসংখ্য মুজাহিদ পারস্যের রণাঙ্গনে গিয়েছিলো। গোত্রের মহিলারা প্রতিদিন এলাকার বাইরে এসে মুজাহিদদের অপেক্ষা করতো বা রণাঙ্গন থেকে অন্য কোন সংবাদ শোনার জন্য অধীর প্রতীক্ষায় লোকালয় থেকে বেরিয়ে আসতো। দিনের খাবার দাবারের পর সেখানেই সারাদিন কাটিয়ে দিতো। একদিন এক কাফেলা নজরে পড়লো। তাদের সঙ্গে উট আর ঘোড়ার পাল ছিলো। যেগুলোর ওপর স্তূপিকৃত ছিলো অসংখ্য আটার বস্তা। দশ বার জনের একটা ঘোড়-সওয়ারের দল ছিলো সেটা। তাদের সঙ্গে ভেড়া বকরীর পালও ছিলো। কয়েকজন মহিলা বালির ঢিবির পাশে দাঁড়ানো তখন।

ঃ 'এরা আমাদের মুজাহিদ হতে পারে না'– এক মহিলা বললো।

ঃ 'ব্যবসায়ীদের কাফেলাও মনে হচ্ছে না'– আরেকজন বললো– 'ব্যবসায়ীদের পোষাক এমন হয় না।'

ঃ 'রাখো রাখো আমি বলছি'– এক বুড়ি বললো– 'এরা ডাকাত।' 'ডাকাতদের সুরতই এমন হয় আমাদের লোকেরা ময়দানে যুদ্ধ করে মরছে আর এরা লুটপাট করে ঘুরে বেড়াচ্ছে'– সদ্য যুবতী একটি মেয়ে বললো।

ঃ 'এদেরকে যেতে দেবে না। পাকড়াও করো'– বুড়ি বললো।

গোত্রের যুবকরা কেউ খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা) এর ফৌজের সাথে সিরিয়ায় চলে গিয়েছিলো। কেউ কেউ মুসান্নার ফৌজে যোগ দিয়েছিলো। কিছু বৃদ্ধ, শিশু আর মহিলারাই রয়ে গিয়েছিলো। সেই মহিলারা গোত্রের প্রত্যেকের ঘরে ঘরে গিয়ে বললো ডাকাত আসছে বাঁচতে হলে সামনে যা পাও তা নিয়ে বেরিয়ে এসো। গোত্রের সব মহিলারাই লাঠি সোঠা, ডাণ্ডা, ঝাড় , গাছের ডাল, বড় বড় পাথর নিয়ে ডাকাতদলের দিকে হৈ হৈ করে ধেয়ে গেলো। এবং ডাকাত দলকে ঘিরে ফেললো।

ঃ 'দাঁড়াও। সব কিছু আমাদের হাওলা করে দাও'– এক মহিলা চিৎকার করে বললো।

ঃ 'এখান থেকে জীবিত বের হতে পারবে না'– আরেক মহিলা বলল'– 'আমরা জানি তোমরা ডাকাত।'

কাফেলা থেকে এক ঘোড়সওয়ার মহিলাদের দিকে এগিয়ে গেলো। তার হাতে খোলা তরবারিও ছিলো না। মুখে ছিলো হাসি।

ঃ 'শাবাশ আরবের মেয়েরা'– সেই সওয়ার বললো– 'এমন বিজয়ী সেনাবাহিনীর ঘরের মেয়েদের এমনই তো হওয়া উচিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো আমরা ডাকাত নই। আর সুখের বিষয় হলো এগুলো পারস্যের যুদ্ধের ময়দানের মালে গনীমত। আমীরুল মুমিনীনের কাছে মদীনায় যাচ্ছে। আমি আমর ইবনে আবদুল মাসীহ। এই কাফেলার আমীর।

ঃ 'তবুও তোমরা যেতে পারবে না'– এক মহিলা আনন্দ ঝলমলে মুখে বললো– 'আমাদের এখানে কিছু সময় থাকো, খাও দাও এবং রণাঙ্গনের খবর শোনাও।'

মালে গনীমতের কাফেলার সেখানে যাত্রাবিরতি করতে হলো। গ্রামের মেয়েদের তারা ময়দানের কথা শোনালো। মেয়েরা তাদেরকে প্রাণভরে খাওয়ালো– যত্ন করলো।

মদীনাগামী এই কাফেলা যখন এই গ্রামে যাত্রাবিরতি করেছিলো মুজাহিদরা তখন বুয়ুর থেকে মাদায়েনের পথে যাচ্ছিলো– পেছনে অসংখ্য লাশ ফেলে। হিংস্র প্রাণীরা সেগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছিলো সারা ময়দানময় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিক্ষিপ্ত লাশগুলো থেকে কিছুটা দূরে ফুরাতের পাশেই শহীদদের কবর দেয়া হয়। মুজাহিদরা সেখান থেকে বিদায় নেয়ার সময় শহীদ সঙ্গীদের জন্য অশ্রুভেজা চোখে ফাতেহা পাঠ করে যায়।

মুসান্না যখন তার লশকরকে মাদায়েনের দিকে কোচ করার হুকুম দিয়েছিলেন তখন তার সালাররা ও বিভিন্ন গোত্রের সরদাররা বলেছিলেন– লশকর যেহেতু বেশ পরিশ্রান্ত তাই কয়েকদিন আরাম করে নিলে হয়তো ভালো হতো।

ঃ 'দুশমনও পরিশ্রান্ত'– মুসান্না বলেছিলেন– 'আমরা যদি তাদেরকে গুছিয়ে নেয়ার সুযোগ দেই তখন আমাদের তাজাদম লশকরও তাদের সামনে দাঁড়াতে পারবে না।

ফারেসের যে ফৌজ বুয়ুবের রণাঙ্গন থেকে পালিয়েছে তারা নিজেদের মনের মধ্যে আমাদের আতংক নিয়ে পালিয়েছে। এই আতংক দূর হওয়ার আগেই আমি তাদের শাহরগ পর্যন্ত পৌঁছে যেতে চাই--- আর ফারসীরা যে বুয়ুবের পরাজয়ের চরম প্রতিশোধ নেবে এটা ভুলে যেয়ো না। তারা এর চেয়ে অনেক বড় ফৌজ আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড় করাবে। চেষ্টা করতে হবে তারা যাতে এই সুযোগ না পায়।

বুয়ুব থেকে কোচ করার একদিন পূর্বে মুসান্নার তাঁবুতে সালমা তার কাছেই বসা ছিলেন।

ঃ 'লশকরকে কিছুদিনের জন্য আরামের সুযোগ দিলে কি ভালো হতো না'?– সালমা মুসান্নাকে বলেছিলো–

ঃ 'আর আপনি বিশ্রামের সুযোগ পেতেন এই যখমও ঠিক হয়ে যেতো।'

ঃ সালমা!'– মুসান্না বলেছিলো– 'সবকিছুই আমি তড়িৎ করতে পছন্দ করি। মাসের কাজ আমি দিনে করতে চাই।'

ঃ 'এত তাড়াহুড়ার কি আছে?'– সালমা বললো– 'আপনি কি আমার জন্যও জীবিত থাকতে চান না?'

ঃ 'শুধু তুমি যদি হতে তবে আল্লাহর কাছে আমি দীর্ঘ আয়ু কামনা করতাম'– মুসান্না আবেগ–কম্পিত গলায় বললেন– 'কিন্তু আমি আরো কারোও----ইসলাম----প্রথম ইসলাম তারপর তুমি----মহান আল্লাহ যে দায়িত্ব আমার ওপর সোপর্দ করেছেন তা পালন করতে গিয়ে যদি আমি দীর্ঘ আয়ু প্রার্থনা করি তবে এর অর্থ হবে– আমি শাহাদাতবরণকে ভয় পাই এবং ভয়ে ভয়ে কদম ফেলি। তুমি তো আমার ভালোবাসার সহযাত্রী সালমা! তুমি আমার কাছে থাকলে আমার ক্লান্তি দূর হয়ে যায়। আমার বিশ্বাস– আমার জন্য তোমার অস্তিত্ব আল্লাহর একটি পুরস্কার। কিন্তু আমরা সবাই যদি ভালোবাসা আর আবেগের বন্ধনে আটকা পড়ি তবে আল্লাহর দ্বীন ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম নেয়ার মতো কেউ থাকবে না।'

ঃ 'আমি আপনাকে আমার মায়ার বাঁধনে বন্দি করতে চাই না'– সালমা ধরা গলায় বললো– শুধু---শুধু এতটুকু বলবো যে, আপনি বিশ্রাম করুন----বেশি দিন না---- আট দশদিন---- আপনি যে আমার গর্ব। গর্ব বনু বকরের।'

ঃ 'আরেকটি কথা সালমা!'–মুসান্না বললেন– 'এখনই আমি সে কথা বলতে চাইনা। আসলে আমার যখমটা এত নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়েছে যে, এখন আর তা শুকোবে না। আমি ইংগিত পাচ্ছি এই ফৌজের সঙ্গে বেশি দিন আর থাকতে পারবো না।'

ঃ 'রণাঙ্গন থেকে চলে যাবেন?'

ঃ 'রণাঙ্গন থেকে নয়– দুনিয়া থেকে।'

ঃ 'সালমার চোখ অশ্রুতে ভরে গেলো।'

ঃ 'তুমি কি দেখছো না তোমার সঙ্গের কত মহিলারাই নিজেদের স্বামীদের কুরবানী হাসিমুখে মেনে নিয়েছে?'– মুসান্না বললেন– 'আমি জানি সালমা! মুজাহিদ হওয়া এত

কঠিন নয়, কিন্তু মুজাহিদের স্ত্রী হওয়া বড়ই ধৈর্য ও পরীক্ষার বিষয়। আল্লাহ তোমাকে এর প্রতিদান দেবেন সালমা! পানি মুছে নাও। তোমার চোখের পানি যেন আমার কদমকে সত্য পথ থেকে অন্য দিকে না নিয়ে যায়।'

সে রাতে মুসান্নার কথায় বিদায়ী কোন পথিকের সুর বাজছিলো। এ জন্য সালমার অশ্রুধারা মুহূর্তের জন্যও বন্ধ হচ্ছিলো না।

মুসান্নার ফৌজ এমন বিপদসঙ্কুল অভিযানে যাচ্ছিলো যে, মুজাহিদদের স্ত্রীদেরকে সঙ্গে নেয়া সম্ভব ছিলো না। তাই ফৌজের সমস্ত মহিলাকে হীরাতে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিলো।

মুজাহিদদের এই এগিয়ে যাওয়াটা এতই দ্রুত ছিলো যার তুলনা কেবল বাঁধভাঙ্গা বন্যার সঙ্গেই চলে- যার সামনে না কোন মজবুত বৃক্ষ দাঁড়াতে পারে না কোন দেয়াল। মুসান্না তার ফৌজকে সাবাত নিয়ে গিয়েছিলেন। সাবাত মাদায়েনের পথের অনেক বড় শহর ছিলো। পথে যত গ্রাম বা উপশহর পড়েছিলো সেখান থেকে ফারসী ফৌজ বেরিয়ে গিয়েছিলো। বুয়ুব থেকে পালিয়ে আসা ফারসী ঘোড়সওয়াররা মাদায়েন যাওয়ার পথে প্রতিটি বসতিতেই মুসলমান ভীতি ছড়িয়ে গিয়েছিলো।

ঃ 'তাহলে তো আরবের এই লোকগুলো কোন সাধারণ মানুষ হতে পারে না।'- এই আওয়াজ সবখানেই শোনা যাচ্ছিলো-

ঃ 'মাদায়েন থেকে তো এক লাখেরও বেশি ফৌজ গিয়েছিলো। এতে ঘোড় সওয়ারই বেশি ছিলো। সঙ্গে হাতিও ছিলো।'

ঃ 'এক লাখ'?-সবার হয়রান প্রশ্ন- 'আমাদের এক লাখ ফৌজকে তারা মেরে ফেলেছে?'

ঃ 'ওরা আসছে'- মুজাহিদদের রুখ যেদিকেই যাচ্ছিলো সেদিক থেকেই এই সুর উঠছিলো। সেখানে যদি পারসিকদের কোন ফৌজ থাকতো তবে তারা আগে পালাতো। তারপর সাধারণ লোকেরা পালাতো।

'খানাফিস' ও 'আম্বার' নামক বড় দুটি এলাকার সংবাদ মুসান্নাকে দেয়া হলো। এই এলাকা দুটো ছিলো বড় ব্যবসায়ী ও সম্পদশালীদের। এজন্য সেখানে সোনাদানা ও আসবাবপত্রসহ সবধরনের সম্পদের বেশ প্রাচুর্য ছিলো। তাকে আরো জানানো হলো সেখানে দুটি মেলা বসেছে। সেই এলাকা দুটির ব্যবসায়ীরাসহ অন্যান্য এলাকার নামি দামি ব্যবসায়ীরাও সেখানে পসরা সাজিয়ে বসেছে।

মুসান্না মেলা দুটির ওপর হামলার হুকুম দিলেন।

মুজাহিদ বাহিনী বিদ্যুৎগতিতে সেখানে পৌঁছলো এবং মেলা দুটি ঘিরে নিলো। পারসিক ফৌজ সেখানে তৈরি ছিলো। তারা মোকাবেলা করলো। কিন্তু তাদের লড়াইয়ের ধরন বলে দিচ্ছিলো- তারা হামলা করছে প্রতিরোধ করার জন্য নয় বরং জান বাঁচানোর জন্য। লড়াই শুরু হতেই মেলায় আসা ব্যবসায়ী ও সাধারণ লোকেরা সবকিছু রেখে পালিয়ে গেলো। তারপর পারসিকদের অধিকাংশই পালিয়ে গেলো আর কিছু মারা পড়লো। সন্ধ্যার পূর্বেই মুসলমানরা এলাকা দুটিতে প্রবেশ করলো। সেখান থেকে অনেক মূল্যবান মালেগনীমত পাওয়া গেলো।

রাতে সালাররা সিপাহসালার মুসান্নার কাছে বসা ছিলেন। মালে-গনীমত নিয়ে কথা হচ্ছিলো।

ঃ 'ইবনে হারিসা'– এক সালার মুসান্নাকে বললেন– 'যেসব কেল্লাধারী শহরের লোকেরা তাদের ফৌজের সঙ্গে আমাদের মোকাবেলা করে আমরা শুধু সেখান থেকেই মালে-গনীমত নিয়ে থাকি। কিন্তু আজকে যে হামলা হয়েছে সেখানকার লোকেরা তো আমাদের মোকাবেলা করেনি। আপনি যে সেখান থেকেও গনীমত নেয়ার এজাযত দিলেন? আমরা আল্লাহকে ভয় পাই, জয় পরাজয় জীবন-মৃত্যু তার হাতেই। তিনি তো এতে নারাজ হবেন না?'

ঃ 'না-ইবনে আয়শা'– মুসান্না প্রশ্নকর্তা বললেন– 'এসব মালে-গনীমত আমাদের কতটুকু প্রয়োজন তা কি তুমি দেখছো না? এ পর্যন্ত যে হাজার হাজার মুজাহিদ শহীদ হয়েছেন তাদের সন্তান সন্ততির জন্যও তো এসবের তীব্র প্রয়োজন রয়েছে। শহীদগণের ইয়াতীম সন্তানদের ভরণ-পোষণ তো বায়তুল মালের তহবিল থেকেই হওয়া উচিত। এটাও ভেবে দেখো– আমরা সবগুলো লড়াই তো শহরের দূরবর্তী কোন স্থানে লড়েছি এবং আমি যা দেখছি পরবর্তী লড়াইও শহর থেকে দূরে কোন ময়দানেই হবে। সুতরাং আমাদের প্রয়োজন পূরণের জন্য আমরা মালেগনীমত কোথায় পাবো? আমরা আমাদের ঘর-বাড়ি ও মদীনা থেকে এতই দূরে রয়েছি যে, সেখান থেকে রসদ পৌঁছতে পৌঁছতে কয়েক মাস লেগে যাবে----।

ঃ 'আমি আরো কিছু চিন্তা করেছি--- খোদার কসম!–তোমরাও তো এই চিন্তাটা করতে পারতে! তোমরা তো এটাও ভাবতে পারতে যে, আমরা শুধু ফারসী ফৌজেরই নই– এই পারসিকদেরও জযবা ও মনোবল ভেঙে দিতে চাই। এর কারণ তোমরাও জানো। এরা অবাধ্য ও বিদ্রোহী জাতি। কোন এলাকা আমরা জয় করে সেখান থেকে চলে গেলে এরা সেখানে বিশৃংখলা শুরু করে দেয় এবং বিদ্রোহ করতেও পিছপা হয় না। অথচ আমাদের উপস্থিতিতে তারা একেবারে গোলাম বনে যায়। এটাও তো ভাবতে পারতে যে, আমি এ হুকুম দেইনি যে, তোমরা লোকদের বাড়িঘরে হামলা করো। শুধু বলেছি এসব ব্যবসায়ী ও সম্পদশালীরা আমাদের বিরুদ্ধে তাদের ফৌজকে আর্থিক সহযোগিতা করছে, তাদেরকে সেটা করতে না দিয়ে তাদের মূল উৎসটা উঠিয়ে নাও।'

কথা বলতে বলতে মুসান্না হঠাৎ থেমে গেলেন। তার পাঁজরের ব্যথা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো, ডাক্তার ডাকা হলো। ডাক্তার এসে মুসান্নাকে ব্যথানাশক ঔষধ খাইয়ে দিয়ে আরাম করতে বলে গেলেন। কিন্তু মুসান্না আরাম করার পাত্র ছিলেন না। তার যখম দিন দিন তাকে মুমূর্ষু করে তুলছিলো। শ্বাস তো নিতেই পারতেন না। ভুলে স্বাভাবিকভাবে কখনো শ্বাস নিলে শুধু যখমই নয় সমস্ত শরীরটাই যেন ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যেতো। কিন্তু মুসান্না আগের চেয়ে আরো সুস্থ ও ফুর্তিবাজ লোকের মতো ঘুরে বেড়াতেন।

তার পরবর্তী লক্ষ্য ছিলো বাগদাদ। তখন বাগদাদ মূল শহর ছিলো না। উপশহর ছিলো। মুসান্নার লশকর সেখানে হামলা করে বসলো। অন্যান্য শহর ও বসতি থেকে

পালিয়ে আসা ফারসী ফৌজ সেখানে ছিলো। তারা স্থানীয় ফৌজের মধ্যে মুসলমানদের ব্যাপারে এমন ভীতির সঞ্চার করলো যে, তারা বেশিক্ষণ মুসলমানদের সঙ্গে মোকাবেলা করতেও প্রস্তুত ছিলো না। কিছু পালালো। আর কিছু হাতিয়ার ছেড়ে দিলো। লড়াই খতম হয়ে গেলো।

মালে-গনীতম একত্রিত করে বাগদাদেরই কাছে তিকরীতে চলে গেলো মুসলিম ফৌজ। মুসান্না সেখানেই তাঁবু ফেললেন।

ঃ 'এখন আমাদের পরবর্তী মানযিল মাদায়েন'– মুসান্না তার সালারদেরকে বললেন– 'আর আমি আশা করছি এটাই হবে আমাদের সর্বশেষ মানযিল। মাদায়েন ইরাক ও পারস্যের কেন্দ্রীয় রাজধানী। মাদায়েনে যদি আমরা প্রবেশ করতে পারি সারা ইরাক তো বটেই পারস্যই আমাদের মুঠোয় চলে আসবে।'

সকালে মাদায়েনের কেল্লার ফটক যখন খুলতো তখন থেকেই শুরু হতো নানান জায়গা থেকে পালিয়ে আসা শরণার্থীদের প্রবেশ। এতে ফৌজও থাকতো। রুস্তম আর পুরান মুসলমানদের বিরুদ্ধে এতবড় ফৌজ পাঠিয়ে স্বাভাবিকভাবেই ধরে নিয়েছিলো– এই ভয়ংকর বাহিনী মুসলমানদেরকে টুকরো টুকরো করে ফিরে আসবে এবং তাদের সঙ্গে মুসলমানদের জীবিত সালাররাও শিকলে বন্দী হয়ে আসবে। কিন্তু কাসেদ যখন পুরান আর রুস্তমের কাছে গেলো তখন কাসেদের মুখ দিয়ে কথা সরছিলো না তার মুখ কাঁপছিলো। কাসেদকে দেখে ফায়রুযানও সেখানে গিয়েছিলো।

ঃ 'কথা বলছো না কেন?'– রুস্তম ক্ষুব্ধ গলায় জিজ্ঞেস করলো" 'এটা বলছো না কেন তোমাদের এতবড় ফৌজ ফুরাতে ডুবে মরেছে।'

ঃ 'মুখ দিয়ে কথা সরছে না রুস্তমে আযম!'– কাসেদ বললো। তার চোখ দিয়ে পানি গড়াতে লাগলো ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলায় বললো– 'জেনারেল মেহরানও মারা গেছেন। প্রায় পুরো ফৌজই মুসলমানদের হাতে কাটা পড়েছে----এটা বুঝে নিন আরবরা জিসিরের পরাজয়ের প্রতিশোধ নিয়েছে।'

ঃ 'আরবরা সংখ্যায় কত ছিলো?'– পুরান জিজ্ঞেস করলো।

'আমাদের ফৌজের অর্ধেকেরও কম'– কাসেদ বললো– 'যদি এক-চতুর্থাংশ বলি তবুও ভুল হবে না।'

ঃ 'এখন বলো ফায়রুযান!'– রুস্তম বললো– 'তুমি আর মেহরান তো আমার ওপর অপবাদ আরোপ করতে যে, তোমাকে আর মেহরানকে আমি লড়াইয়ের সুযোগ দিচ্ছি না। বাহমন জাদাবিয়া আর জানিয়ুনুসকে ভাগোড়া বলতে, এখন বলো তোমার দোস্ত মেহরানের পরিণাম কি হলো?'

ঃ 'তুমি তো মাদায়েনে গৃহযুদ্ধ বাঁধিয়ে দিয়েছিলে'– পুরান বললো– 'আমি মাঝখানে এসে না পড়লে আমাদের ফৌজ সেদিন পরস্পর লড়াই করে খতম হয়ে যেতো।'

ঃ 'আর মুসলমানরা বড় আয়েশ করে মাদায়েনে প্রবেশ করতো'– রুস্তম বললো।

ঃ 'এটা কি পরস্পরকে দোষারোপের সময়?'– ফায়রুযান বললো,– 'আগে তো ভাববে কেন এটা হলো এবং কিভাবে হলো--- মেহরান যদি অনুপযুক্ত ও কাপুরুষ হওয়ার কারণে মারা গিয়ে থাকে এবং আমিও যদি তোমাদের চোখে অযোগ্য কাপুরুষ হই তাহলে তুমি নিজে কেন মাদায়েন থেকে বের হচ্ছো না রুস্তম? এখন তোমার পালা।--- আর মালিকায়ে ফারিস! আরবরা যে আমাদের এক লাখ ফৌজকে কেটে দিলো এর দায় আপনাদের উভয়ের ওপরই এসে পড়ে। কিন্তু এখন এটা আলোচনার সময় নয়। এই আলোচনা সেদিনই করা উচিত ছিলো যেদিন আরবরা আমাদেরকে প্রথমবারের মতো পরাজিত করেছিলো। এখন কথা হলো, মুসলমানদেরকে কিভাবে মাদায়েন থেকে দূরে রাখা যায়!'

রুস্তম আর ফায়রুযানের মধ্যকার পারস্পরিক বিরোধিতা শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিগত শত্রুতা পর্যন্ত গড়িয়েছিলো। বুয়ুবের লড়াইয়ে পারসিকদের লজ্জাজনক পরাজয় রুস্তম আর ফায়রুযান একে অপরের বিরুদ্ধে ব্যবহারের চেষ্টা করছিলো। পুরান দু'জনের মধ্যস্থতা করে দু'জনকে সেদিন আলাদা করে দিয়েছিলো এবং রাগে ক্ষোভে সে কামরা থেকে বেরিয়ে তার শাহী মহলে গিয়ে নির্বাক হয়ে বসেছিলো। চোখ ধাঁধানো শান শওকত ও শাহী মদ তাকে শান্ত করতে পারছিলো না। দুই হাঁটুর ওপর মাথা রেখে গোল হয়ে বসেছিলো সে ।

রুস্তম যে ঘরে প্রবেশ করেছে সে টেরই পেলো না। তার চুলে রুস্তমের স্পর্শ লাগলো।

ঃ 'এতো দ্রুত ভেঙে পড়ো না পুরান!'– রুস্তম বললো।

পুরান চমকে উঠে রুস্তমের দিকে তাকালো। রুস্তম তার চুলে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলো।

ঃ 'রুস্তম!'– পুরান বললো– 'আমি কি স্বপ্ন দেখে পারস্যের সিংহাসনে বসেছিলাম এবং আমার সব অধিকার তোমাকে কেন দিয়েছিলাম! আজ জেনারেলদের মধ্যে কেন দুশমনী ছড়িয়ে পড়লো--- রুস্তম!– হতাশায় প্রায় নিষ্প্রভ গলায় জিজ্ঞেস করলো– 'তুমি কি সত্যিই জ্যোতিষবিদ্যা বোঝ? দেখে কি বলতে পারো নক্ষত্রের আবর্তন আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছে?'

ঃ 'অনেক মন্দ পরিণামের দিকে– রুস্তম বললো– 'আমি দেখেছি, সালতানাতে ফারেসের পরিণাম আমার চোখে ভালো ঠেকেনি।'

ঃ 'আমি যদি বলি তোমার এই ভবিষ্যদ্বাণী আমি মানি না– তুমি আমাকে কি বলবে?'– পুরান জিজ্ঞেস করলো এবং কোন জবাবের আশা না করে বলতে লাগলো– 'মানুষ যখন একের পর এক ব্যর্থতা সইতে থাকে তখন তার মন ভেঙে যায়। সে তখন তার বদ কিসমত আর অশুভ ভাগ্যকে নক্ষত্রের আবর্তন বলে চালিয়ে দেয়। আমার মনে হয় তুমিও সে ধরনেরই মানুষ। তুমি নিজে যদি এখন ফৌজ নিয়ে যাও আশা করি পারস্যকে মন্দ পরিণাম থেকে বাঁচাতে পারবে।'

রুস্তম কিছু না বলে পুরানের ডানা ধরে তাকে উঠালো এবং তার দুই বাহুর মাঝখানে তাকে নিয়ে নিলো। পুরান ছট্‌ফট্‌ করতে করতে তার বাহু থেকে বেরিয়ে গেলো।

ঃ 'যে পর্যন্ত একজন মুসলমানও পারস্যের মাটিতে থাকবে রুস্তম!'– পুরান বললো– 'সে পর্যন্ত তুমি আমার দেহে হাত লাগাবে না। পুরান দু'বার তালি বাজালো। দারোওয়ান এলে তাকে বললো– বড় পুরোহিতকে তোমার সঙ্গে নিয়ে এসো।'

মাদায়েনের সবচেয়ে বড় পূজামণ্ডপের পুরোহিত এলো।

ঃ 'অবস্থা বড় সঙ্গীন পবিত্র পিতা!'– পুরান বললো– 'এখন থেকে পারস্যের নিরাপত্তা ও দুশমনের ধ্বংসের জন্য নিয়মিত পূজা ও প্রার্থনার ব্যবস্থা করুন। পবিত্র আগুন সব সময় জ্বলতে থাকবে। অন্যান্য পূজামণ্ডপেও যেন এই পয়গাম পৌঁছে দেয়া হয়। লোকদের পূজামণ্ডপে জমা করা আপনার দ্বারাই সম্ভব।'

পুরোহিত চলে গেলো। কিছুক্ষণ পর পূজামণ্ডপে পূজা আর প্রার্থনা শুরু হলো। নাকারা বাজিয়ে লোকদেরকে পূজামণ্ডপে ডাকতে শুরু করলো। পুরান চাচ্ছিলো এবার সূর্য পিতা তার পুত্র-কন্যাদের দিকে চোখ তুলে তাকান। আর তা তার নিয়মিত পূজা আর প্রার্থনার মাধ্যমেই সম্ভব হবে। কিন্তু লোকেরা সেটা বুঝলো না। লোকেরা মনে করলো এই সময়ে পূজা-প্রার্থনার সাজসাজ রব শুরু হওয়ার অর্থ হলো, মাদায়েনে অনেক বড় এক বিপদ নখদন্ত নিয়ে ছুটে আসছে। এতে জনসাধারণের মধ্যে নতুন করে ভীতি ছড়িয়ে পড়লো। আর ফৌজের যে অংশ এখনো কোন লড়াইয়ে যোগ দেয়নি তাদের লড়াইয়ের মনোবলও ভেঙে গেলো।

বুয়ুবের লড়াইয়ের পর মুসান্নার বাগদাদ পর্যন্ত পৌঁছতে দেড় মাস সময় লাগালো। মুসলিম ফৌজ পথে যত বসতি বা শহর পড়লো সবগুলোতেই হানা দিয়ে গেলো। সেসব বসতির লোকেরা মাদায়েনে আশ্রয়ের জন্য পালাচ্ছিলো।

ঃ 'এটা কোন জুলুম নয়'– মুসান্না তার সালারদের বলেছিলেন– 'আমি চাই এসব এলাকার লোকেরা শাহী খান্দানের বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াক এবং তাদের প্রশাসনে বিপর্যয় নেমে আসুক। মাদায়েনে রুস্তম, ফায়রুযান ও সম্রাজ্ঞী পুরান দখতের মধ্যে দিন দিন দ্বন্দ্ব আর বিরোধ বেড়েই চলেছে। আমি তাদের একে অপরের দুশমন বানানোর ব্যবস্থা করছি।'

ব্যবস্থা ছিলো এই যে, আশআর ইবনে আওসামা কোন বসতি থেকে বাছাই করে চারজন লোককে তার বন্ধু বানিয়ে নিলো। তারা ছিলো ইরাকি খ্রিস্টান। আশআর এদেরকে বলেছিলো– খ্রিষ্টান গোত্র বনু তাগলিব ও বনু নসরও মুসলিম ফৌজে যোগ দিয়েছে। ফারসী জেনারেল মেহরানকে হত্যাও করেছে বনু তাগলিবের এক খ্রিষ্টান। এখন তোমরা যদি তোমাদের খ্রিষ্টান ভাইদের মতো মুসলমানদের হয়ে কাজ করো তবে মালেগনীমতের অংশ ছাড়াও আরো পুরস্কার থাকবে তোমাদের জন্য।

ঃ 'তোমরা তো দেখতেই পাচ্ছো– পারস্যের বাদশাহী এখন শুধু একটি ধাক্কার অপেক্ষা করছে'– আশআর ইবনে আওসামা তাদেরকে বলেছিলো– 'পারস্যের অর্ধেকেরও বেশি মুসলমানদের কব্জায়। এগুলো সালতানাতে ইসলামিয়াতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। খ্রিষ্টানরা যেহেতু আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছে তাই পারস্য জয় হলে তাদেরকেও অনেক সুযোগ-সুবিধা দেয়া হবে। কিন্তু তোমাদের মর্যাদা ও পুরস্কার অন্যসব খ্রিষ্টানদের চেয়ে আরো অনেক লোভনীয় হবে।'

চারজনই রাজী হয়ে গেলো। আশআর তাদেরকে সিপাহসালার মুসান্নার কাছে নিয়ে গেলে তাদেরকে কি করতে হবে মুসান্না তা বলে দিলেন। এরা সবাই মাদায়েন চলে গেলো।

যতদিন যাচ্ছিলো মাদায়েন শরণার্থীতে ভরে যাচ্ছিলো। শহরে যে কয়টা সরাইখানা ছিলো সেগুলো বিত্তশালীদের দখলে চলে গেলো। সাধারণ শরণার্থীদের আশ্রয় হয়েছিলো খোলা আকাশের নিচে। তবুও শরণার্থীদের সংখ্যা দিন দিন বাড়তেই লাগলো। খোলা জায়গা– বড় বড় মাঠও মানুষের ভীড়ে উপচে পড়লো। লাখ লাখ লোকের খাবারের সংস্থান করাটা মুশকিল হয়ে দাঁড়ালো। শরণার্থীরা অতিষ্ঠ হয়ে দাবি তুললো– তাদেরকে তাদের বসতিতে পাঠিয়ে দিতে হবে এবং তাদের নিরাপত্তার জন্য যথেষ্ট ফৌজ দিতে হবে। মাদায়েনের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এই সুর উঠতে লাগলো।

পুরান দখত আর রুস্তমকে জানানো হলো, এরা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে এবং তাদের বিদ্রোহী হয়ে ওঠাটাও অসম্ভব কিছু নয়। মুসলমানদের সঙ্গেও এরা হাত মিলিয়ে বসতে পারে। পুরান আর রুস্তম মাদায়েনের এ প্রান্ত থেকে অন্য প্রাপ্ত পর্যন্ত ঘুরে বেড়ালো এবং তাদেরকে সান্ত্বনা দিলো যে, মুসলমানদেরকে খতম করার জন্য ফৌজ পাঠানো হচ্ছে।

ঃ 'আমাদের ফৌজ কাপুরুষ'– শরণার্থীদের ভীড় থেকে আওয়াজ উঠতে লাগলো– 'আমাদের ফৌজ ভেড়া বকরীর পাল ছাড়া কিছুই না----আমাদের ফৌজ হয়েও এরা খাবারের মতো আমাদের লুটপাট করেছে– আমাদের মেয়েদের গান্ধা করেছে----।

পুরান আর রুস্তম তাদেরকে খামোশ করতে পারলো না। শ' কয়েক লোক হলে মুখবন্ধ করা কোন ব্যাপার ছিলো না। কিন্তু এতো ছিলো হাজারে হাজারে– অগণিত। মহিলা, বৃদ্ধ, যুবক শিশু, আতুর লেংড়া সবরকম লোকই ছিলো। ফারসীদের প্রশাসন আরো বেশি পেরেশান হচ্ছিলো এজন্য যে, মাদায়েনের স্থানীয় লোকেরাও শরণার্থীদের মতো বেপরোওয়া হয়ে উঠছিলো। তারা বলতো এখন মাদায়েনের পালা।

এক রাতে শরণার্থীদের মধ্যে আরেক আওয়াজ উঠলো– 'মালিকায়ে ফারেস আর রুস্তমের ওপর ভরসা করো না। এরা নিজেদের ভোগ বিলাসে মজে আছে---- ফায়রুযানের হাতকে মজবুত করো----ফায়রুযানের পেছনে চলো।'

এই আওয়াজ শ্লোগানে বনে গেলো। পরদিন সারা মাদায়েন জুড়ে এই গুঞ্জনই চললো।

রুস্তম আর পুরানের কানে যখন এটা গেলো তারা ফায়রুযানকে ডেকে পাঠালো।

ঃ 'তুমি কি নিজেকে খুব বুদ্ধিমান মনে করো ফায়রুযান?'–পুরান জিজ্ঞেস করলো– 'তোমার মতো আহমক তো কখনো দেখিনি'।

ঃ 'আহমক নয় মালিকায়ে ফারেস!' – রুস্তম চাপা ক্ষোভে বললো– গাদ্দার বলুন---- গাদ্দার-- সালতানাত আজ অকুল সমুদ্রে ডুবে মরছে। আর এই লোক নিজের ফায়দা হাসিলের পায়তারা করছে–'

ঃ 'তোমাদের দুই জনের কি হয়ে গেলো'– ফায়রুযান হয়রান হয়ে বললো– 'আমি তোমাকে ক্ষমা করবো না রুস্তম! তুমি আমাকে গাদ্দার বলেছো। কিন্তু আমি এটা বিশ্বাস করা জরুরি মনে করছি– তোমাদের দেমাগ খারাপ হয়ে গেছে।'

ঃ 'তুমি তো আগেও আমাদেরকে গৃহযুদ্ধ পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিলে'– রুস্তম বললো– 'এটা মালিকায়ে পুরানের প্রশংসাযোগ্য কীর্তি ছিলো যে, নিশ্চিত গৃহযুদ্ধের আশংকা দূর হয়ে গিয়েছিলো। তখন তুমি মাদায়েনের বাইরে থেকে আসা লোকদেরকে আমাদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলেছো।'

ঃ 'এটা মিথ্যা--মিথ্যা'– ফায়রুযান রাগে প্রায় দাঁড়িয়ে গিয়ে বললো– 'এটা নির্জলা অপবাদ। আমি কখনো তা বরদাশত করবো না।' রাগে তার মুখ রক্তবর্ণ ধারণ করলো।

ঃ 'তুমি কি লোকদের শ্লোগান আর বিক্ষোভ শুনতে পাচ্ছো না?'– পুরান বললো– 'তোমার নাম নিয়ে এই শ্লোগানই তো বলে দিচ্ছে এই আগুন তুমিই লাগিয়েছো এবং তুমি আলাদা ফৌজ নিয়ে দল ভারী করছো।'

ঃ এখন বুঝতে পারছি, তোমার নেতৃত্বে ফৌজ পাঠানোই উচিত হবে না'– রুস্তম বললো– 'এক লাখ ফৌজ তোমার প্রাণের দোস্ত মেহরান মেরে ফেললো। কিন্তু সে যরথুস্ট্রের গজব থেকে বাঁচতে পারেনি। সে তো মরেছেই। তার লাশ শিয়াল কুকুরেও খেয়েছে।'

ঃ 'তোমরা আমাকে গাদ্দারীর অপবাদ দিচ্ছো'– ফায়রুযান বললো– 'এই অপরাধের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। আমাকে মৃত্যুদণ্ড দাও।'

ঃ 'আমরা তোমার মতো অভিজ্ঞ এক জেনারেলকে হারাতে চাই না'– রুস্তম বললো– 'এটা কি ভালো হয় না যে, তুমি তোমার ব্যক্তিগত শত্রুতা ও বিদ্বেষ মন থেকে বের করে দিলে এবং সালতানাতে ফারেসের নিরাপত্তা ও রক্ষার জন্য কিছু করলে?'

ঃ 'মালিকায়ে আলিয়াকে আমি একটি কথা পরিষ্কার ভাষায় বলে দিতে চাই'– ফায়রুযান বললো– 'এক জেনারেলকে আপনার হারাতে হবে---রুস্তম অথবা আমি---কে মিথ্যা আর সে সত্য এর ফয়সালা তলোয়ার করবে--- চিন্তা করে জবাব দাও রুস্তম! কবে তুমি আমার সঙ্গে লড়বে? যে হাতিয়ারে তুমি লড়তে চাও আমি তোমার সঙ্গে লড়বো। তোমার জবাবের প্রতীক্ষায় থাকবো আমি।'

ফায়রুযান মালিকায়ে ফারেস পুরানের অনুমতি ছাড়াই বের হয়ে গেলো। শাহী আদবের প্রতি সম্মান দেখানোর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলো না।

ঃ 'অবস্থা এমন না হলে আমি তাকে এখনই মোকাবেলা করতে বলতাম'– রুস্তম বললো– 'কিন্তু অবস্থা আমাকে সহ্য করতে বাধ্য করছে। তারপরও তার প্রতি আমাদের নজর রাখতে হবে।'

এটা ছিলো সেই চার খ্রিষ্টানের কাজ, মুসান্না যাদেরকে মাদায়েনে এই বলে পাঠিয়েছিলেন যে, মাদায়েনে রুস্তম আর ফায়রুযানের বিরোধ ও ফৌজের মধ্যে যে ফাটল সৃষ্টি হয়েছিলো তাতে আগুন ধরিয়ে দাও। মুসান্না ও আশআর ইবনে আওসামা এই চার খ্রিষ্টানকে ভালো করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন– বাইরে থেকে আসা শরণার্থীদের সঙ্গে মিশে যেতে হবে এবং তাদের মধ্যে রুস্তম আর ফায়রুযানের বিষ ছড়িয়ে দিতে হবে।

পুরান আর রুস্তমের পেরেশানীর অন্ত ছিলো না। তাদের সবচেয়ে বড় চিন্তা ছিলো মুসলমানদেরকে কিভাবে চূড়ান্তরূপে খতম করা যায়। তার সঙ্গে আরো বড় চিন্তা ছিলো ফৌজ আর সাধারণ লোকদের কিভাবে শান্ত করা যায়। তারপর আরেক ঝামেলা ঘাড়ে চেপে বসেছে, ফায়রুযান রুস্তমকে চ্যালেঞ্জ করে বসেছে। তাকে পক্ষে আনাও আরেক চিন্তার বিষয়।

এর একদিন পরই আরেক ঘটনা ঘটলো। সম্রাজ্ঞী পুরানের সাথে এক প্রতিনিধি দল সাক্ষাত করতে এলো। এতে মাদায়েন ও আশ পাশের বড় বড় কয়েকজন জায়গীরদার ছিলো। দুই তিন গোত্রের সরদার ও শীর্ষস্থানীয় কয়েকজন ধনী ব্যবসায়ীও ছিলো। এদের সবার নিজ নিজ এলাকায় ছিলো একচ্ছত্র আধিপত্য। জায়গীরদাররা মাদায়েনের প্রশাসনেও বেশ প্রভাবশালী ছিলো। পুরান তাদেরকে তখনই ভেতরে ডাকলো। রুস্তম সেখানেই ছিলো।

ঃ 'মালিকায়ে ফারেস!'- প্রতিনিধিদলের প্রধান বললো- 'আমরা আপনাকে সালাম আরজ করতে আসিনি। আপনার সামনে সিজদা করতেও আসিনি। আমরা বলতে এসেছি যে, আপনারা দু'জন সালতানাতে ফারেসকে তার ফৌজের রক্তে ডুবিয়ে দিয়েছেন। দেখুন, মুসলমানরা কোথায় পৌঁছে গেছে। আমাদের ফৌজ মারা পড়েছে, ধন-দৌলত সব লুট হয়ে গেছে। আমাদের জায়গীরগুলো মুসলমানদের দখলে। আমরা খাযনা স্বরূপ যে কাড়ি কাড়ি স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে থাকি তা কোথেকে দেবো। আপনি কি আমাদেরকে মুসলমানদের গোলাম বানাতে চাচ্ছেন? আপনি কি পারস্যের বাদশাহী খতম করে দিতে চাচ্ছেন? আপনি কিছুই যদি না করতে পারেন আমাদেরকে বলুন।'

ঃ 'তোমরা কি করতে পারবে?'- পুরান বিষাদ গলায় জিজ্ঞেস করলো- 'তোমরা কি লড়াইয়ের মতো লোক দিতে পারবে? ফৌজ তো অনেক কমে গেছে?'

ঃ 'এ বিষয়েই আমরা কথা বলতে এসেছি'- প্রতিনিধি দলের প্রধান বললো- 'আমরা হাজার হাজার লোক দিতে পারবো। মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের দখলকৃত এলাকায় আমরা বিদ্রোহও উস্কে দিতে পারবো কিন্তু আমরা আরো কিছু চাই। আপনি আমাদের শর্ত পূরণ করুন এবং আপনার পছন্দ মতো আমাদের থেকে সহযোগিতা গ্রহণ করুন।'

ঃ 'তোমাদের শর্তগুলো বলো'- রুস্তম বললো।

ঃ 'মালিকায়ে আলিয়া পারস্যের তখতে শাহী থেকে পদত্যাগ করুন'- তাদের প্রধান বললো।

ঃ 'এই সিংহাসনে কি তুমি বসবে'- রুস্তম বিদ্রূপাত্মক কণ্ঠে বললো- 'পারস্যের পবিত্র মুকুট তোমার মাথায়---আচ্ছা এ ধরনের শর্ত তোমার মাথায় কেন এলো বলতো?'

ঃ 'এ কারণে যে, মাদায়েনের শাহী মহল এখন জেনারেলদের যুদ্ধক্ষেত্র হতে শুরু করেছে'- দলের প্রধান বললো- 'আপনার ও ফায়রুযানের বিরোধ ব্যক্তিগত শত্রুতার আকার ধারণ করেছে। এর পরিণাম গৃহযুদ্ধ ছাড়া আর কি হবে। ফৌজ ও জনসাধারণের মধ্যেও কলহ বাড়ছে। এর ফায়দা আগ্রাসী আরবরা ভোগ করে চলেছে। মালিকায়ে আলিয়াও এই কলহে জড়িত রয়েছেন। মালিকায়ে আলিয়ার মনে যদি সালতানাতের

মহব্বত থাকে তবে এই সিংহাসন তিনি ছেড়ে দিন। আমরা কিসরা পারভেজের খান্দানের কোন পুরুষকে সিংহাসনে বসাবো। ফৌজের অভাব আমরা পূরণ করবো। মুসলমানদের দখলকৃত এলাকায় আমরা বিদ্রোহ করবো। তাদেরকে শান্তিতে- স্বস্তিতে থাকতে দেবো না। কিন্তু শর্ত হলো- ফৌজের নেতৃত্ব এখন রুস্তম যেন তার হাতে গ্রহণ করে এবং মুসলমানদেরকে এমন মার দেয় যে, তারা যেন আর উঠে দাঁড়াতে না পারে। এই শর্তগুলো যদি মেনে না নেন আমরা মুসলমানদের সঙ্গে হাত মিলাবো। তখন মুসলমানরাই আপনাকে সিংহাসন থেকে নামাবে।'

ঃ 'আমি সালতানাতের রক্ষার খাতিরে সিংহাসন থেকে নেমে যাবো'- পুরান বললো- 'কিন্তু কিসরার খান্দানের কোন পুরুষটা রয়ে গেছে যাকে তোমরা সিংহাসনে বসাবে?'

ঃ 'একজন আছে'- প্রতিনিধিদলের প্রধান বললো- 'কিসরা পারভেজের এক স্ত্রীর পুত্র সে। তার মা তাকে সযত্নে লুকিয়ে রেখেছে। আমরা তিনজনই কেবল জানি সে কোথায় আছে। আমরা তাকে নিয়ে আসবো।'

ঃ 'তাকে নিয়ে এসো'- পুরান বললো।

ঃ 'আপনি জানেন এই সিংহাসনের জন্য কত দাবীদার নিহত হয়েছে'- দলের প্রধান বললো- 'কিসরার পর যেই সিংহাসনে বসেছে কতল হয়ে গেছে। সে সময় কিসরার এক স্ত্রী তার একমাত্র পুত্র সন্তানকে নিয়ে এই ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিলো যে, সিংহাসনের উত্তরাধিকার হওয়াতে তাকে হত্যা করা হবে----আমি তাকে নিয়ে আসবো। কিন্তু এটাও শুনে রাখুন, তাকেও যদি হত্যা করা হয় তবে শাহী মহলের প্রতিটি ইট খুলে নিয়ে এর প্রতিশোধ নেবো আমরা।'

সবার ধারণা ছিল কিসরা পারভেজের বংশধারা শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু তার এক স্ত্রী যে তার এক সন্তানকে নিয়ে মাদায়েন থেকে গায়েব হয়ে গিয়েছিলো তা কারো জানা ছিলো না। কিসরা পারভেজের কতজন স্ত্রী ছিলো তা তার একান্ত ঘনিষ্ঠজন ছাড়া কেউ জানতে পারেনি।

পুরানের কাছে যাওয়া প্রতিনিধিদলের যে প্রধান ছিলো সে ছিলো কিসরা পারভেজের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। শাহী খান্দানের সঙ্গে তার বেশ উষ্ণ সম্পর্ক ছিলো। তার নাম ছিলো সারান। শাহী দরবারে তার এতই প্রভাব ছিলো যে বড় বড় জেনারেলরাও তাকে সমীহ করতো। এজন্য রুস্তমের মতো জাদরেল জেনারেলও তার প্রস্তাবে কিছু বলতে পারেনি এবং পুরান সম্রাজ্ঞী হয়েও তার কথা মেনে নেয়।

সারান মাদায়েন থেকে অজ্ঞাতনামা এক বসতিতে চলে গেলো। তার সঙ্গে ছিলো পাঁচজন মুহাফিজ। বসতিতে সে গিয়ে পৌঁছলো বেশ রাতে। একটি ঘরের দরজায় কয়েকবার কড়া নাড়ার পর এক বুড়ি দরজা খুলে দিলো। সারান তাকে বললো, সে নাওরীনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। বুড়ি বললো- এখানে নাওরীন নামক কেউ নেই।

ঃ 'ভয় পেয়োনা বুড়ি'– সারান তার নাম বলে বললো– 'নাওরীনকে আমার নাম বলে বলো আমি কোন ধোঁকা দিতে আসিনি। রাতে আমি এজন্যই এসেছি যে কেউ যাতে আসতে দেখে না ফেলে।'

ঃ 'তাকে আসতে দাও'– ভিতর থেকে এক মহিলার আওয়াজ ভেসে এলো।

সারান ভেতরে গেলো, অপূর্ব সুন্দরী মধ্যবয়স্কা এক মহিলা তাকে অভ্যর্থনা জানালো। মহিলার চোখে মুখে ছিলো আভিজ্যাত্যের ছাপ।

ঃ 'কেন এসেছো?'– মহিলা জিজ্ঞেস করলো– 'তোমার সঙ্গে আর কে আছে?'

ঃ 'ভয় নেই নাওরীন'!– সারান বললো– 'আমার সঙ্গে আমার দেহরক্ষীরা এসেছে। তাদেরকে বসতি থেকে দূরে রেখে এসেছি। আমার ঘোড়াটিও এখানে আনি। আমি পুরোপুরি সাবধানতা অবলম্বন করেছি– আমি তোমাকে ও তোমার পুত্র ইয়াযদগিরদকে নিতে এসেছি।'

ঃ 'কোথায়?'

ঃ 'মাদায়েনে। পারস্যের সিংহাসন তোমার ছেলে ইয়াযদগিরদের জন্য অপেক্ষা করছে। আমি তাকে আমার সঙ্গে মাদায়েনে নিয়ে যাবো।'

ইয়াযদগিরদের বয়স ছিলো তখন একুশ বছর। কিন্তু বুদ্ধি বলে সে আরো অনেক পরিণত হয়ে গিয়েছিলো।

ঃ 'আমি আমার ছেলেকে মাদায়েন যেতে দেবো না'– নাওরীন ভয় পাওয়া গলায় বললো– 'আমার ইযদী মাদায়েন যাবে না। পারস্যের সিংহাসন নয়, আমার চাই পুত্র। আমার ইযদীকে আমি জীবিত রাখতে চাই। তুমি কি জানো কতো দাবীদারের রক্ত পান করেছে এই সিংহাসন? আমার ইযদীকে আমি লুকিয়ে রেখেছি। সে এই বাড়িরই এক কামরায় শুয়ে আছে। একটু আস্তে কথা বলো। তার ঘুম ভেঙে যাবে।'

ঃ 'নাওরীন!'– সারান তার গলা নামিয়ে বললো– 'এখানে আমি মোট চারবার এসেছি। আমি ধোঁকা দিতে চাইলে অনেক আগেই ধোঁকা দিতে পারতাম---তুমি এটা কেন ভুলে যাচ্ছো ইযদীকে শুধু তুমিই বাঁচিয়ে রাখতে চাও? আমিও চাই এই রূপ-যৌবনময় ছেলেটি বেঁচে থাকুক। সে তো আমাদের ভালোবাসার স্মৃতি। এটা শুধু তুমি জানো আর আমি জানি যে, কিসরা এই ছেলের পিতা কি করে হয়েছিলো!'

কিসরা পারভেজের প্রত্যেক স্ত্রীরই স্বপ্ন ছিলো একটি করে ফুটফুটে পুত্র সন্তানের। এটা ছিলো তাদের সিংহাসনের উত্তরাধিকারের লোভ। কিসরার স্ত্রীরা তাকে উনিশটি পুত্র-সন্তান দিয়েছিলো। শিরওয়া ছিলো সবার বড়। কিন্তু নাওরীনের কোন সন্তান ছিলো না, পুত্র-সন্তান তো দূরে থাক। নাওরীনের সঙ্গে সারানের পর্দার আড়ালে গোপন প্রণয় ছিলো। আর প্রকাশ্যে সারান বন্ধু ছিলো পারভেজের। নাওরীনের পুত্র-সন্তানের ক্ষুধা দিন দিন তাকে পাগল করে তুললো। একদিন নাওরীন নির্জনে সারানকে পেয়ে তার ইচ্ছাটি ব্যক্ত করলো। তাকে সে বললো– যেভাবেই হোক তার একটি পুত্র-সন্তান চাই-ই-চাই। তখনই সারান জানতে পারলো মাদায়েন থেকে দূরের এক পাহাড়ে এক ইহুদী জাদুকর থাকে। যে মুজিযার মতো অলৌকিক কাণ্ড করেও দেখাতে পারে।

সারান তার খোঁজে বেরিয়ে গেলো। প্রায় দু' মাস খোঁজাখুঁজির পর সেই ইহুদী জাদুকরের দেখা পেলো। সারান তাকে সব কিছু খুলে বলে বললো– পারস্য সম্রাট কিসরা পারভেজের এক নিঃসন্তান স্ত্রী ফুটফুটে এক পুত্র-সন্তানের জন্য আকুল হয়ে পড়েছে। শুধু একটাই।

ঃ 'তুমি যদি এই উদ্দেশ্য পূরণ করতে পারো তোমাকে ধন-দৌলতে ভরিয়ে দেবো'– সারান বললো।

ইহুদী বিশ পঁচিশটি দানাওয়ালা একটি তসবীহ্ হাতে নিয়ে প্রত্যেকটি দানা গভীর মনোযোগে দেখলো। তারপর তা মাটিতে রেখে ফুঁক দিয়ে চোখ বন্ধ করে ফেললো এবং ধ্যানে ডুবে গেলো।

ঃ 'উহ'– জাদুকর চমকে উঠে চোখ খুললো– রক্তবৃষ্টি! রক্তবৃষ্টি পড়ছে। পারস্যের সিংহাসন এতে সাঁতার কাটছে। এতো ডুবে যাবে--'।

ঃ 'একটি পুত্র সন্তানের কথা বলছিলাম আমি'– সারান ইহুদীর কাঁধে হাত রেখে গম্ভীর গলায় বললো– তুমি কি একাজ করতে পারবে?'

ঃ 'তুমি কি কোন নবজাতক-শিশুর এক আজলা রক্ত জোগাড় করতে পারবে?'– ইহুদী জিজ্ঞেস করলো–

ঃ 'চেষ্টা করবো'– সারান বললো– তবে বড় মুশকিলের ব্যাপার।'

ঃ 'এছাড়া এ কাজ আমার দ্বারা সম্ভব নয়'– ইহুদী বললো– 'বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরপরই তার রক্ত নিতে পারলে আরো বেশি কার্যকরী হবে। এটা সম্ভব না হলে বাচ্চার বয়স একদিন এক রাতের বেশি হতে পারবে না। জন্মের পর এক সূর্য উদিত হয়ে আরেক সূর্যোদয় পর্যন্ত পৌঁছলে সেই রক্ত কোন কাজে আসবে না। এই রক্ত শুধু এক রাত আমার কাছে থাকবে। তারপর তা পানিতে মিশিয়ে ঐ মহিলা গোসল করবে। উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে যাবে।'

সারান ফিরে এসে নাওরীনকে বললো। নওরীন সব শুনে বললো– নবজাতকের আজলা ভরা রক্তের দাম তার মা যা চাইবে আমি এর চেয়ে অনেক বেশি দেবো। সারান অনেক ঘোরাঘুরি করে গরিব ঘরের এক মহিলাকে বের করলো যার বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হওয়ার কয়েকদিন বাকী ছিলো। সারান সেই মহিলা ও তার স্বামীকে মোটা অংকের মুজুরী ও লোভনীয় চাকরির লোভ দেখিয়ে তার ঘরে নিয়ে এলো।

সারান বড় আমীর ও জায়গীরদার ছিলো। সেই মহিলাকে সে বিশাল এক শাহী কামরায় রাখলো এবং মহিলার সেবার জন্য তার পাঁচজন খাদেম নিযুক্ত করলো। মহিলা বাচ্চা প্রসব করলো। বাচ্চা হতেই এক খাদেম বাচ্চাকে গরম পানিতে গোসল করাবে বলে অন্য এক ঘরে নিয়ে গেলো। সেখানে নিয়ে বাচ্চার শরীর থেকে একটি সূচের মাধ্যমে অর্ধেক পেয়ালা রক্ত বের করে নিলো। বাচ্চাও বেঁচে গেলো। তার মা যখন তাকে দুধ খাওয়াতে শুরু করলো তখন বাচ্চার রক্তের স্বল্পতাও পূর্ণ হয়ে গেলো।

সারান এই রক্ত ইহুদীর কাছে নিয়ে গেলে ইহুদী পরদিন সকালে সে রক্ত সারানকে ফেরত দিলো। সেদিনই সারান সেই রক্ত খুব গোপনে মাদায়েন নিয়ে এসে নাওরীনকে দিলো। নাওরীন তা পানিতে মিশিয়ে গোসল করলো এবং ইয়াযদগিরদকে জন্ম দিলো।

ইহুদী জাদুকর সারানকে বলেছিলো– 'এই খান্দানের প্রতিপালন মানুষের রক্তের ভেতরেই। এদের প্রতিটি কামিয়াবী রক্তের মাধ্যমেই অর্জিত হবে। আর এই খান্দান নিজেদের রক্তেই ডুবে যাবে।'

ঃ 'আর নবজাতকের এই রক্ত দ্বারা পুত্র-সন্তানই জন্মাবে'– ইহুদী জাদুকর বলেছিলো– 'তবে তার পরিণাম খুব ভালো হবে না।'

পরে শাহী খান্দানের কেউ কেউ জেনেছিলো জাদুকরের কৃতিত্ব ছাড়াও সারান আর নাওরীনের গোপন প্রণয়ের ফসল ইয়াযদগিরদ।

একমাত্র ছেলেকে নাওরীন মাদায়েন পাঠাতে কোনমতেই রাজী হচ্ছিলো না। সে তখন শাহেনশাহে ফারেস কিসরা পারভেজের পত্নী ছিলো। সে কোন সাধারণ বধূ ছিলো না। শুধু ছেলের প্রাণটা রক্ষার জন্য অজ্ঞাত এক গ্রামে অজ্ঞাত জীবন যাপন করেছিলো। মুরগীর মতোই তার ছেলেকে সব সময় আঁচলের নিচে লুকিয়ে রেখেছিলো।

সারান তাকে অনেক বুঝালো, বললো, সালতানাতে ফারেসের সেই শৌর্যবীর্য তো অনেক আগেই হারিয়ে গেছে। এখন তা পরিত্যক্ত কোন নগরী হওয়ার বাকী। মুসলমানরা তো পারস্যের অর্ধেকেরও বেশি ফৌজ ধ্বংস করে দিয়েছে। আর অনেককে কার্যত অক্ষম করে দিয়েছে। ধ্বংসলীলা এই সালতানাতের শেষ ইটটি বাঁচানোর জন্যই রুস্তম আর পুরান স্বয়ং চাচ্ছে কিসরার কোন ছেলে সিংহাসনে বসুক।

তবুও নাওরীনকে টলানো যাচ্ছিলো না। নাওরীন সারানকে প্রায় ফিরিয়েই দিয়েছিলো। কিন্তু ইয়াযদগিরদ সবকিছু শোনার পর তার চোখ খুলে গিয়েছিলো। সে আগেই জানতো– সে এক হারানো শাহযাদা। মাদায়েনের অবস্থা শুনতেই সে ছট্‌ফট্‌ করে উঠলো।

ঃ 'আমার সম্মানিত পিতার এই সালতানাত কখনো ধ্বংস হতে দেবো না আমি'– ইয়াযদগিরদ আবেগাপ্লুত গলায় বললো– 'যদি আমি কতল হয়ে যাই কোন পরওয়া নেই।'

ঃ 'কতল তুমি কখনো হবে না'– সারান বললো– 'রুস্তম ধোঁকা দিলে ফায়রুযান তো রয়েছেই। ফৌজ ও সাধারণ লোকেরাও পুরান আর রুস্তমের বিপক্ষে চলে গেছে। পুরোহিত আর ধর্মীয় নেতারা বলছিলো, সালতানাতের ধ্বংসের একমাত্র কারণ এটাই যে, মসনদের ওপর বসে আছে এক মহিলা।'

পরদিন সকালে সারান নাওরীন ও ইয়াযদগিরদকে সঙ্গে নিয়ে মাদায়েন চলে গেলো।

মাদায়েন পৌঁছতেই ইয়াযদগিরদের মুকুট ধারণ প্রথা খুব সাদামাটাভাবেই সম্পন্ন হলো। তারপর ঘোষণা করে দেয়া হলো, এখন সালতানাতে ফারেসের বাদশাহ

ইয়াযদগিরদ। নাওরীনের মনে তার পুত্রহত্যার যে ভয় ছিলো তা পুরান আর রুস্তমের আন্তরিক অভ্যর্থনা উড়িয়ে দিলো। পুরান ইয়াযদগিরদকে আনন্দে জড়িয়ে ধরেছিলো। রুস্তমও প্রকাশ্যে এমনই আন্তরিকতা দেখিয়েছিলো। সবচেয়ে বেশি আনন্দ নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলো ফায়রুযান। ফৌজের সমস্ত অফিসার ও জেনারেলরা ইয়াযদগিরদের সামনে এসে মাথা নুইয়ে তরবারি নাড়িয়ে আনুগত্য প্রকাশ করলো। তারপর শহর ও আশপাশের এলাকার রঈস ও উমারারা ইয়াযদগিরদের সামনে এসে তাকে সিজদার মাধ্যমে আশ্বস্ত করলো।

মুকুট ধারণ প্রথা পালনের পর সর্বপ্রথম সমস্ত জেনারেল ও আমীর উমারাদের নিয়ে শাহী বৈঠক করা হলো। রুস্তমকে এতে প্রধান সেনাপতি নির্বাচন করা হলো। ফয়সালা করা হলো মুসলমানদের হামলার আগে পারস্যের যে বিশাল সৈন্যবহর ছিলো এমন একটি সৈন্যবহর খুব দ্রুতই গড়ে তুলতে হবে। তারপর মুসলমানদেরকে এমনভাবে খতম করা হবে যাতে একজনও জীবিত ফিরে যেতে না পারে। এরপর এই লশকর মদীনা পর্যন্ত পৌঁছে যাবে এবং অবশিষ্ট মুসলমানদের ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ইসলামকে স্মৃতির পাতায় নিয়ে ফেলা হবে। এছাড়াও আরেকটি প্ল্যান তৈরি করা হলো যে, যেসব শহর-গ্রাম মুসলমানদের দখলে চলে গেছে সেসব এলাকার লোকদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উস্কিয়ে দিয়ে বিদ্রোহী করে তোলা হবে।

ঃ 'মুসলমানদের কাছে এত ফৌজ নেই যে, তারা সব জায়গাতেই এত ফৌজ মোতায়েন রাখবে, যারা লোকদের মাথা উঠাতে দেবে না'– রুস্তম বললো– 'সবখানেই খুব সামান্য মুসলমান রয়েছে যারা প্রশাসন চালাচ্ছে। সহজেই তাদেরকে হত্যা করা যাবে। লোকেরা মুসলমানদেরকে খাযনা দিতে অস্বীকার করবে। আমাদের ধর্মের কেউ মুসলমান হয়ে থাকলে জন সম্মুখে তাদেরকে হত্যা করা হবে যাতে লোকেরা সাবধান হয়ে যায়।'

ঃ 'একাজ তো তারাই করতে পারবে যারা দখলকৃত এলাকা থেকে পালিয়ে মাদায়েন এসেছে'– পুরান বললো– 'তাদেরকে এ কাজের জন্য তৈরি করে দখলকৃত এলাকায় পাঠিয়ে দেয়া হবে। তাদের মধ্যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধের স্পৃহা জাগিয়ে তুলতে হবে। তাদের মধ্যে আমি ঘুরে ফিরে দেখেছি কিছু রূপযৌবনা মেয়ে রয়েছে। তাদের অনেককেই আমার চতুর-চঞ্চলা ও আবেগী মনে হয়েছে। ওদেরকে আমি তৈরি করে মুসলমান সালারদের পর্যন্ত পৌঁছে দেবো। এরা তাদেরকে বিষ প্রয়োগ করে খতম করবে বা ভুলিয়ে ভালিয়ে কোন নির্জন স্থানে নিয়ে যাবে। সেখান থেকে আমাদের লোকেরা পাকড়াও করে ওদেরকে মাদায়েন নিয়ে আসবে।'

মাদায়েনে মুসান্নার লশকরের বিরুদ্ধে ভয়াবহ এক ধ্বংসের নীল নকশা তৈরি করা হলো। যাতে মুসলমানদেরকে সবদিক থেকেই আক্রান্ত করে নাস্তানাবুদ করার ষড়যন্ত্র ছিলো।

এদিকে মুসলমানদের জন্য আরেকটি ভয়াবহ খবর' ছিলো এটা যে, মাদায়েনে আগের চেয়েও আরো অনেক বড় ফৌজ তৈরি হচ্ছিলো। দলে দলে লোকেরা দ্বিগুণ

উৎসাহে ফৌজে যোগ দিচ্ছিলো। রাতদিন সমানে ফৌজী ঘোড়া আর হাতির জঙ্গী প্রশিক্ষণ চলছিলো। ওদিকে মুসান্না মাত্র তিন হাজার মুজাহিদ নিয়ে বাগদাদের কাছে সাবাতে সেনা সাহায্যের জন্য পেরেশান ছিলেন। এছাড়াও মুসান্নার যখম আরো ভয়ংকর আকার ধারণ করেছিলো। ডাক্তারদের দৃষ্টিতে তো অনেক আগেই তিনি লড়াইয়ের ক্ষমতা হারিয়েছিলেন। এখন তো তিনি স্বাভাবিক চলাফেরাও করতে পারছিলেন না।

ইয়াযদগিরদের সঙ্গে তার পিতা কিসরা খসরু পারভেজের নাম আবারও এসে গেলো।

খসরু পারভেজ ছিলো হরমুজের পুত্র এবং ন্যায়পরায়ণ সম্রাট বলে খ্যাত নওশিরওয়ার পৌত্র। দাদার খ্যাতি যেমন ছিলো ন্যায়পরায়ণ আর সুশাসক হিসেবে, নাতির খ্যাতি সম্পূর্ণই এর বিপরীত অত্যাচারী ও কুশাসক হিসেবে।

খসরু পারভেজের উত্থানও বৈচিত্র্যপূর্ণ ছিলো।

তার এমন সময়ও গিয়েছে যখন সে দুর্বল বাহরামের বিরুদ্ধেও দাঁড়াতে পারেনি। মাত্র তিনজন সিপাহী নিয়ে সে মাদায়েন থেকে পালিয়েছিলো। তার মধ্যে দুটো জিনিস ছিলো– 'ষড়যন্ত্রের সব যোগ্যতা' ও 'লজ্জাহীনতা'। লজ্জা আর ব্যক্তিত্ববোধ তার স্বভাবের বিপরীত ধর্মী ছিলো। মাদায়েন থেকে বিতাড়িত হয়ে সে তার চিরশত্রু কায়সারে রুমের কাছে নিঃসংকোচে একদিন সাহায্য চেয়ে বসলো। কায়সার কিসরার বরাতটাই পাল্টে দিলো। খসরু পারভেজকে কায়সার অনেক বড় ফৌজী শক্তির সাহায্য দিলো।

খসরু পারভেজ এই ফৌজ নিয়ে তার সালতানাতে ফিরে এলো। বাহরাম তার মোকাবেলা করলো। কিন্তু বাহরাম শাহী খান্দানের কেউ ছিলো না। তাই যেসব আমীর উমরারা তার সঙ্গ দিয়েছিলো তারা এই সুযোগে তাকে ত্যাগ করে চলে গেলো। বাহরামের ফৌজও শুধু প্রাণ বাঁচানোর জন্য কোনরকমে লড়াই চালিয়ে গেলো। পরিণামে বাহরামকে তার প্রাণ নিয়ে পালাতে হলো। আর খসরু পারভেজ সুবিশাল সালতানাতের একেশ্বরী মালিক বনে গেলো। এখান থেকেই তার বিজয়ের ধারা শুরু হলো।

খুব অল্প সময়েই সে বিশাল এক দুর্ধর্ষ ফৌজ গড়ে তুললো। পারস্যকে দুর্ভেদ্য এক শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করলো। যে কায়সারে রোমের সাহায্যে সে মাদায়েনে বিজয় বেশে আসতে পেরেছিলো তাকেই সে তার প্রথম শিকার বানালো। কিসরা রোমে হামলা করে বসলো এবং রোমের অনেকগুলো এলাকা দখল করে নিলো। কিসরা তার সেনাবাহিনীতে আরবের সীমান্তবর্তী এলাকার অনেক গোত্রকেই অনেক সম্পদ ও সুযোগের লোভ দেখিয়ে শামিল করে নিয়েছিলো।

তাঁর দাদা নওশিরওয়া ফিলিস্তীনকে তার সালতানাতের অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তার মৃত্যু তার সামনে বাধা হয়ে দাঁড়ালো। খসরু পারভেজ তার দাদার ইচ্ছাকে পূর্ণ করার ঘোষণা করলো। সে ঘোষণা করলো– বায়তুল মুকাদ্দাসকে জয় করে সেখানে হযরত ঈসা (আ) এর সমস্ত স্মৃতিচিহ্ন মুছে ফেলা হবে। ফিলিস্তীন তখন রোমকদের অধিকারে ছিলো। ইহুদীরা যখন খসরু পারভেজের এই অভিসন্ধি

জানতে পারলো তখন ৬২ হাজার ইহুদী পারসিক ফৌজে যোগ দিলো। কারণ তারা তখন খ্রিষ্টানদেরও মুসলমানদের মতো জাত শত্রু ছিলো।

কিসরা পারভেজ বায়তুল মুকাদ্দাসে ঢুকে পড়লো এবং এমন নির্বিচারে হত্যা শুরু করলো যে, যুবক-বৃদ্ধ ও শিশু মহিলাসহ নব্বই হাজার খ্রিষ্টানকে হত্যা করলো। কোন গীর্জা-ইবাদতখানা অক্ষত থাকতে দিলো না। অধিকাংশ গির্জাতেই আগুন দিলো। খ্রিষ্টানদের কোন পবিত্র স্থানই তার ধ্বংসযজ্ঞ থেকে বাদ গেলো না। সবকিছু লুটে নিলো। সোনা-রুপা, হীরা জহরতের হাজার হাজার স্তূপ মাদায়েন নিয়ে এলো।

খসরু পারভেজ তারপর ইসলামের ধ্বংসলীলার জন্য তৈরি হতে লাগলো তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে কুদাফা (রা) মারফত ইসলামের দাওয়াত দিয়ে খসরু পারভেজের কাছে পত্র প্রেরণ করেন। কিসরা পারভেজ নিজেকে শুধু সূর্যের পুত্র মনে করতো না, দুনিয়ার দ্বিতীয় খোদাও মনে করতো। এই পত্র দেখে সে রাগে ক্রোধে অগ্নিমূর্তি ধারণ করলো এবং পত্রবহনকারী দূত আবদুল্লাহ ইবনে কুদাফার দিকে এমন ঘৃণা আর অবহেলার চোখে তাকালো– যেন তিনি দুনিয়ার তুচ্ছ একটি কীট। খসরু পারভেজ চিঠিটি পড়ে কুচি কুচি করে ছিঁড়ে হাওয়ায় উড়িয়ে দিলো। সারা দরবার কক্ষে সেই চিঠির টুকরো ছড়িয়ে পড়লো।

দরবারীরা এই দেখে হয়রান হচ্ছিলো যে, কিসরা পারভেজের মতো এমনি ফেরআউন মানসী লোক– যে মানুষের রক্তের ফোয়ারা দেখে আনন্দে বিহ্বল হয়ে পড়ে– সে মদীনার দূত আবদুল্লাহ ইবনে কুদাফাকে এমনিই চলে যাওয়ার অনুমতি দিয়ে দিলো।

আবদুল্লাহ ইবনে কুদাফা (রা) সেখান থেকে বের হয়ে যাওয়ার পর কিসরা পারভেজ আরেকটি হুকুম জারী করে সবার পেরেশানী দূর করে দিলো। কাসেদের মাধ্যমে সে ইয়ামানের গভর্নর বাযানের কাছে এই হুকুম দিয়ে পত্র প্রেরণ করলো যে, মদীনার মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গ্রেফ্তার করে তার দরবারে পেশ করা হয়-- যাতে তাঁকে উচিত সাজা দেয়া যায়।

বাযান কাসেদের মাধ্যমে কিসরা পারভেজের এই হুকুম মদীনায় পাঠালে রাসূলুল্লাহ (সা) সেই কাসেদকে মুচকি হেসে বলেছিলেন– "ইয়ামানের গভর্নর আর কিসরাকে গিয়ে বলো আমার পূর্বেই ইসলাম মাদায়েন পৌঁছে যাবে।"

খসরু পারভেজ এতই নৃশংস ছিলো যে, তার জেনারেলরাও তার ভয়ে কাঁপতো।

তার জাদরেল ও অভিজ্ঞ এক জেনারেলের স্ত্রী ছিলো খ্রিষ্টান। পারভেজেরও এক স্ত্রী– শিরী– ছিলো খ্রিষ্টান। শিরী যেমন ছিলো উপমাহীন এক সুন্দরী মহিলা তেমনি ছিলো চতুর। পারভেজের মতো একেশ্বরী অধিপতিকেও সে তার অঙ্গুলী হেলনে উঠাতো বসাতো।

খসরু পারভেজ ভর দরবারে তার সেই জেনারেলকে হুকুম দিলো– সে যেন তার স্ত্রীকে ছেড়ে দেয়, কারণ সে খ্রিষ্টান।

ঃ 'আপনারও তো এক স্ত্রী খ্রিষ্টান'– জেনারেল পারভেজকে নির্ভীক গলায় বললো– 'শিরী কি খ্রিষ্টান নয়? আপনি কেন তাকে ছেড়ে দিলেন না'?

ঃ 'এই দরবারেই এবং এখনই ওর শরীরের চামড়া তুলে ফেলো' খসরু পারভেজ হুকুম দিলো।

জেনারেলকে সকল দরবারীর সামনেই তার কাপড় ছিঁড়ে জীবন্ত তার শরীরের চামড়া তুলে ফেলা হলো।

মাদায়েন থেকে ষাট মাইল উত্তরে রোমের সীমান্তে খসরু তার অবসর বিনোদনের জন্য বিশাল এক এলাকা নিয়ে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করলো। সেই প্রাসাদটি ছিলো তখন পৃথিবীর এক আশ্চর্য সৃষ্টি। প্রাসাদের নাম ছিলো 'কসরে দস্তাগিরদ।' সেটাকে জান্নাতুল ফেরদাউসের সমতুল্য বলে অনেকে মনে করতো। এর চারদিকে দূরদূরান্ত পর্যন্ত গভীর সবুজ বনানীর বিস্তার ছিলো। বনানীর ভেতর দিয়ে যে কত শত ঝর্নার উৎসারণ ছিলো তা কিসরা পারভেজও জানতো না। বনানীর এক প্রান্তরে বিচরণ করতো হরিণ, উট পাখিসহ কত বিচিত্র প্রাণী। বিশাল প্রাসাদটি দাঁড়ানো ছিলো চল্লিশ হাজার সোনা মোড়ানো স্তম্ভের ওপর। প্রাসাদের ওপর ছিলো খাঁটি সোনায় নির্মিত এক হাজার বুরুজ।

কসরে দস্তাগিরদে নয়শ ষাটটি হাতি, বিশ হাজার উট, ঝলমলে কাপড়ে সজ্জিত উন্নত জাতের ছয় হাজার ঘোড়া প্রস্তুত থাকতো। প্রাসাদের ফটকে বর্ম পরিহিত ছয় হাজার সুশিক্ষিত সৈন্য প্রহরায় থাকতো। আর কিসরার মনো বিহারের জন্য ছিলো তিন হাজার হৃদয় পাগল করা রূপবতী যুবতী।

খসরু পারভেজের অপ্রতিরোধ্য এই রাজকীয় আধিপত্য ও যুদ্ধশক্তি দেখে সবাই বলতো, একদিন সমস্ত দুনিয়া পারস্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। কিন্তু এই পৃথিবী তার বুকে কখোনই আধিপত্য বিস্তারকারী কোন একক শক্তিকে বেশি ধারণ করেনি। খসরু পারভেজের বেলায় এর ব্যতিক্রম ঘটবে কেন। একদিন সে 'কসরে দস্তাগিরদ' এর চোরা দরজা দিয়ে পালিয়ে এলো। তার সঙ্গে তখন ছয় হাজার পাহারাদার, নয়শ ষাটটি হাতি, বিশ হাজার উট, ছয় হাজার ঘোড়া ও তিন হাজার পরমা সুন্দরী হুরপরীর কেউ ছিলো না। তার সঙ্গে শুধু ছিলো দুটি দাসী ও তার প্রেমের অপ্সরা শিরী।

এমন নিঃস্ব হয়েই সে কসরে দস্তাগিরদ থেকে বের হয়ে ষাট মাইল পাড়ি দিয়ে যখন মাদায়েন পৌঁছলো তখন পথে সবাই তার সিজদায় নুয়ে পড়লো। খসরু পারভেজের প্রাণ যেন ফিরে এলো। ততক্ষণে দুনিয়ার বেহেশত কসরে দস্তাগিরদ চলে গেছে কায়সারে রোমের দখলে। খসরু পারভেজের পিশাচ প্রাণও এই ধাক্কা সামলাতে পারলো না। সে তার রাজমুকুট তার প্রাণপ্রিয় পুত্র মাযাবিয়ার মাথায় পরানোর সিদ্ধান্ত নিলো। কিন্তু সে তখন এটা চিন্তা করেনি যে, তার একমাত্র প্রেমাস্পদ সম্রাজ্ঞী শিরী তার স্ত্রীত্ব হারাতে রাজী আছে কিন্তু তার সিংহাসন হারাতে রাজী নয়।

শিরী তার রূপের জাদু দিয়ে খসরু পারভেজকে যেমন 'রাম' করে রেখেছিলো তেমনি তার রূপের সর্বগ্রাসী জাদু ও মুখের মধু এবং দেহের দুর্লভ স্বাদ দিয়ে বড় বড় আমীর উমরা ও জেনারেলদের তার মুঠোয় পুরে তার পুত্র শিরওয়ার পক্ষে ও তার স্বামী খসরু পারভেজের বিপক্ষে নিয়ে গেলো।

তারপর শিরী গোপনে সমস্ত ফৌজে এই সুখবর ছড়িয়ে দিলো যে, শিরওয়া মসনদে বসলে সকল অফিসার ও সিপাহীদের ভাতা বাড়িয়ে দেয়া হবে। তাদেরকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদের অংশ দেয়া হবে। অনেক ধরনের সুযোগ-সুবিধাও দেয়া হবে। শহরের প্রতিটি খ্রিষ্টান পরিবারে গিয়ে বলা হলো, তাদেরকে ধর্মীয় স্বাধীনতা দেয়া হবে এবং প্রথম শ্রেণীর নাগরিকত্ব দেয়া হবে।

খসরু পারভেজ এই প্রাসাদ ষড়যন্ত্র সম্পর্কে একেবারেই বে-খবর ছিলো। একদিন শিরওয়া তার পিতা খসরু পারভেজকে গিয়ে হুকুমের স্বরে বললো- সিংহাসন যেন সে আপসেই ছেড়ে দেয়। প্রথমে কিসরা পারভেজ এটা শুনে হতভম্ব হয়ে ছেলের দিকে তাকিয়ে রইলো। পরমুহূর্তে প্রচণ্ড ক্রোধে গর্জন করে পুত্র শিরওয়াকে হত্যা করার হুকুম দিলো। কিন্তু তার এই হুকুম ছিলো হাওয়ায় তীর চালানোর মতো। এ অবস্থা দেখে পারভেজ শিরীকে ডেকে বললো, তোমার ছেলে যে পাগল হয়ে গেছে। তাকে সামলাও।

ঃ 'এটা আমার ক্ষমতার বাইরে তাজদার'– সে স্মিতহাস্যে বললো– 'তাকে ফৌজও সামলাতে পারবে না'– সে খসরু পারভেজের কানে কানে বললো– 'এই মসনদে এখন আমার পুত্র বসবে। জেনারেলদের হুকুম দিয়ে দেখো সবাই আমার পুত্রের অফাদার।'

কিসরা পারভেজ চরম ক্রোধে জেনারেলদের ও উমারাদের ডেকে ডেকে শিরী ও শিরওয়াকে ছিঁড়ে ফেলার হুকুম দিলো। কিন্তু আমীর উমারা আর জেনারেলরা উত্তরে কিছুই বললো না। যে কয়েকজন পারভেজের সঙ্গে ছিলো, তাদের সংখ্যা ছিলো গোলানো আটায় লবণের মতো। তারা তাকে মাদায়েন থেকে পালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলো।

ঃ 'আমি রোমকদের সঙ্গে সন্ধি করে হলেও এই পুত্রের অবাধ্যতার শাস্তি দেবো'– খসরু পারভেজ বললো– 'আর শিরীকেও তার ধোঁকাবাজির চরম শাস্তি দেবো।'

শিরী আর শিরওয়ার কানে এই হুমকি পৌঁছতেই শিরীর হুকুমে শিরওয়া তার রক্ষী বাহিনী নিয়ে বাপকে শায়েস্তা করতে বেরিয়ে গেলো। পারভেজ আগেই জানতে পেরেছিলো ভয়ংকর কোন অভিসন্ধি নিয়ে তার ছেলে তার কাছে আসছে। পারভেজ পালিয়ে গেলো। শহরের এক দরিদ্র কৃষকের ঝুপড়িতে গিয়ে আত্মগোপন করলো। ঘরের ভেতরের মাচার নিচে কিছু গোবর ও ঘাস দিয়ে তাকে ঢেকে দেয়া হলো।

শিরওয়ার হুকুমে রক্ষীবাহিনী সারা শহর ঘুরে হুকুম জারী করলো, যে ঘরে খসরু পারভেজকে পাওয়া যাবে সে ঘরে আগুন দেয়া হবে এবং ঘরের বুড়ো থেকে নিয়ে শিশু পর্যন্ত সবাইকেই জীবিত পুড়িয়ে মারা হবে।

এই নির্দেশ শোনার পর কারো এতটুকু হিম্মত ছিলো না যে, সে তার ঘরে খসরু পারভেজকে লুকিয়ে রাখবে। জীর্ণশীর্ণ এক কৃষক মলিন মুখে ঘোড় সওয়ার ফৌজের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। মুখে কিছু বললো না। ইশারায় শুধু ঝুপড়ির দিকে দেখিয়ে দিলো।

পারস্যের ফেরআউন– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গ্রেফতারীর নির্দেশদানকারী কিসরা পারভেজকে পাকড়াও করে পুত্র শিরওয়ার সামনে নিয়ে দাঁড় করানো হলো।

ঃ 'ওকে শিকলে বেঁধে খোলা ময়দানে নিয়ে চলো'– শিরওয়া হুকুম করলো– 'ওর সমস্ত পুত্রকেও পাকড়ে নিয়ে যাও।'

তার পুত্রদেরকেও একে একে ময়দানে হাজির করানো হলো। এরা সবাই শিরওয়ার ভাই ছিলো। পারভেজের বিভিন্ন পত্নীর ঔরসে এদের জন্ম হয়। শিরওয়াসহ তারা ছিলো ঊনিশ ভাই।

শিরওয়া তার ভাইদেরকে গুণে দেখলো। তাকে ছাড়া আঠারো জন হওয়া উচিত ছিলো। কিন্তু দেখা গেলো একজন কম।

ঃ 'একজন কম কেন?'– শিরওয়া বললো– 'ওদের মধ্যে ইয়াযদগিরদ নেই। তাকেও নিয়ে এসো'

মহলের প্রতিটি কোণে তাকে খুঁজে দেখা হলো। শহরে ঘোষণা করা হলো, ইয়াযদগিরদ ও তার মাকে আশ্রয়দানকারীর ঘরে আগুন দিয়ে ঘরের সবাইকে জীবন্ত দগ্ধ করা হবে। কিন্তু মা আর ছেলেকে কোথাও পাওয়া গেলো না। কেউ এটাও জানলো না যে, খসরু পারভেজের পরম বন্ধু সারানও আজ শহর থেকে গায়েব হয়ে গেছে। সারান আগেই বুঝতে পেরেছিলো– শিরীর আদেশে শিরওয়া তার কোন ভাইকেই বেঁচে থাকতে দেবে না। পারভেজ পালিয়ে যেতেই সারান ইয়াদগিরদ ও তার মাকে এক গরীব কৃষকের বেশে শহর থেকে বের করে নিয়ে গিয়েছিলো।

ঃ 'ওদের সবাইকে একে একে কতল করে দাও'– শিরওয়া হুকুম দিলো– 'ওদের বাপের সামনে নিয়ে ওদেরকে কতল করো।'

সে যে কি পৈশাচিক দৃশ্য ছিলো! খসরুর প্রত্যেক পুত্রকে তার সামনে নিয়ে যওয়া হলো এবং দেহ থেকে মস্তক ছিন্ন করে ফেলা হলো। এতে যুবক, সদ্য যুবক, কিশোর বালকও ছিলো। ওদের মধ্যে মারওয়াযাবিয়াও ছিলো। কিসরা পারভেজ যাকে তার স্থালাভিষিক্ত করতে চেয়েছিলো। সে ছিলো তার সবচেয়ে প্রিয় পুত্র। যে ছেলেকেই হত্যার জন্য জল্লাদের সামনে নিয়ে যাওয়া হলো তার মা-ই- চিৎকার করতে করতে শিরওয়ার পায়ে এসে পড়লো। ফৌজ তাকে ধাক্কিয়ে টেনে হিচড়ে দূরে নিয়ে ফেললো। শিরী তার মহলের দরজায় দাঁড়িয়ে এই ভয়াবহ দৃশ্য দেখছিলো পরম আনন্দে। সেই এক মা ছিলো, যার চেহারায় প্রশান্তির হাসি ছড়ানো ছিলো।

শিরওয়া তার সতের ভাইকে হত্যা করে হুকুম দিলো, তার পিতাকে যেন কয়েদখানার সবচেয়ে নিকৃষ্ট, দুর্গন্ধময় নোংরা কুঠরীতে বন্দী করা হয়।

খসরু পারভেজ তার পুত্রের কাছে অনেক কাকুতি মিনতি করে প্রার্থনা করলো– তাকে মুক্ত করে সালতানাতে ফারেস থেকে যেন বেরিয়ে যাওয়ার সুযোগ দেয়া হয়। কিন্তু পুত্রের মনে সামান্যতমও দয়া এলো না।

ঃ 'তোমাকে আমি বেশি দিন কয়েদখানায় রাখবো না'– শিরওয়া তার পিতাকে বললো– 'খুব শিগগিরই তোমাকে রেহাই দেবো।'

খসরু পারভেজকে কয়েদখানার এক অন্ধকার কুঠুরীতে বন্দী করা হলো। এরপর শিরওয়া এক লোককে ডেকে বললো– কয়েদীর পঞ্চম দিনে কয়েদখানায় গিয়ে যেন খসরু পারভেজকে সে হত্যা করে আসে।

কয়েদখানায় খসরু পারভেজের পঞ্চম সন্ধ্যা ছিলো সেটা। সেই অন্ধকার কুঠুরীতে আধা জাগরণ আধা নিদ্রামগ্ন অবস্থায় কিসরা পারভেজ ধুঁকছিলো। হঠাৎ কুঠুরীর দরজা খুলে গেলো। খসরু পারভেজ জিজ্ঞেস করলো, কে?

ঃ 'কিসরা ফারেসকে আমি মুক্ত করতে এসেছি'– সেই খুনী বললো– 'উঠুন আর এই কষ্টের জীবন থেকে মুক্ত হোন।'

খসরু পারভেজের চোখে খুশীতে অশ্রু এসে গেলো। তার পিঠ ছিলো দরজার দিকে। আচমকা একটি খঞ্জর তার কলজেতে গেঁথে গেলো। আবার বের হলো খঞ্জর। আবার গেঁথে গেলো– খসরু পারভেজ তার কষ্টের জীবন থেকে রেহাই পেলো।

শিরওয়া যেমন খসরু পারভেজের পুত্র ছিলো তেমনি সুন্দরী নাগিনী শিরীরও পুত্র ছিলো। শিরওয়াকে খসরু পারভেজের হত্যাকারী এই আশায় বড় বড় ফুর ফুরে মনে এসে তার পিতার হত্যার সংবাদ দিলো যে, সে শিরওয়ার নির্দেশ পালন করে আসাতে তাকে পুরস্কার দেয়া হবে।

ঃ 'তুমি আমার পিতাকে হত্যা করেছো?'– শিরওয়া বললো।

ঃ 'হ্যাঁ, তাজদারে ফারেস।'– খুনী বললো– 'আপনার নির্দেশ পালনে আমি সামান্য বিলম্বও করিনি।'

ঃ 'স্বীয় পিতার হত্যার প্রতিশোধ নেয়া আমার জন্য ফরজ'– শিরওয়া বললো–

ঃ 'আমি তোমাকে জীবিত ছাড়তে পারি না।'

শিরওয়া তরবারি কোষমুক্ত করে তার পিতার হত্যাকারীকে কতল করে দিলো।

টীকা ঃ বইয়ের শুরুতে পারস্য সম্রাট খসরু পারভেজের যে মৃত্যুকাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে ইতিহাসবেত্তাদের কাছে বর্তমান বর্ণনাটি অধিক সঠিক হলেও উভয় বর্ণনার মধ্যে যথেষ্ট যোগসূত্র রয়েছে।

খসরু পারভেজের দাদা আদেল নওশিরওয়া স্বপ্ন দেখেছিলেন– তার মহল থেকে চৌদ্দটি কংকর গড়িয়ে পড়েছে। তার এই স্বপ্ন পরে নির্মমভাবে সত্যে পরিণত হয়েছিলো। কিসরা পারভেজের পরে শিরওয়াসহ পারস্যের সিংহাসনে তের জন মুকুটধারী হয়েছিলো এবং সবাই নিহত হয়েছিলো। মাত্র নয় বছরে এতগুলো হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিলো। ইয়াযদগিরদ ছিলো চৌদ্দতম সম্রাট।

মুসান্না তার লশকর সাবাত থেকে তিকরীত নিয়ে গিয়েছিলেন। মাদায়েনে নিয়োজিত মুসান্নার গুপ্তচর তাকে এমন সংবাদ দিলো তা যেমন অপ্রত্যাশিত ছিলো তেমনি ছিলো ভয়ানক। আরো ভয়ানক অবস্থা ছিলো মুসান্নার যখমের অবস্থা। ঘোড়সওয়ার হওয়া তো দূরের কথা স্বাভাবিকভাবে তিনি হাঁটতেও পারতেন না। কিন্তু

তীব্র মানসিক শক্তি ও প্রবল মনোবলের কারণে তিনি তাঁর দায়িত্ব সুস্থ মানুষের মতোই পালন করে যাচ্ছিলেন।

তিনি অনেকটা নিশ্চিত ছিলেন, মুসলমানরা পারসিকদের প্রতিরক্ষা শক্তির কোমর ভেঙে দিয়েছে এবং তাদের লড়াইয়ের মনোবল দীর্ঘ দিনের জন্য খতম করে দিয়েছে। কিন্তু মাদায়েন থেকে গুপ্তচর সংবাদ নিয়ে আসলো যে, পারসিকরা তাদের নতুন সম্রাট ইয়াযদগিরদের নেতৃত্বে নতুন করে উজ্জীবিত হয়ে উঠেছে। তাদের জেনারেলদের মধ্যে যে ব্যক্তিগত শত্রুতা ছিলো তা মিটে গেছে। তারা সবাই এক হয়ে আগের চেয়ে আরো দ্বিগুণ ফৌজ তৈরি করছে।

ঃ 'আমীরে লশকর!'– এক গোয়েন্দা বললো – 'পারসিকদের এই ফৌজ তৈরি হতে কিছুটা সময় লাগবে। কিন্তু তারা যখন আপনার সামনে আসবে তখন আপনি পেরেশান হয়ে বলবেন– এতো সে ফৌজ নয় যাদেরকে আমরা প্রতিটি ময়দান থেকেই ভাগিয়ে দিয়েছি। কিছু একটা করুন। সেনাসাহায্য চান। এই তিন চার হাজার মুজাহিদ নিয়ে তো পাহাড়ের মতো অটল সেনাবহরের সঙ্গে লড়তে পারবেন না।'

মুসান্না অধিক পরিমাণে সেনাসাহায্য চেয়ে ও মাদায়েনের পরিবর্তিত অবস্থা জানিয়ে আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর (রা) এর কাছে পয়গাম লেখালেন। এই পয়গাম কাসেদকে দিয়ে বললেন, খুব কম বিশ্রাম করে এবং প্রতিটি চৌকি থেকে তাজাদম ঘোড়া নিয়ে যেন দ্রুত মদীনায় পৌঁছে।

কাসেদ পাঠিয়ে মুসান্না তার ফৌজ নিয়ে তিকরীত থেকে যীকরে চলে গেলেন। সেখানে গিয়ে তাঁবু ফেললেন। এ স্থানটি পারস্য ও আরবের সীমান্তবর্তী এলাকায় অবস্থিত ছিলো। কিছুদিন পর মুসান্না খবর পেলেন– যেসব শহর ও গ্রাম মুসলমানরা জয় করেছিলো সেখানকার লোকেরা বিদ্রোহ করে বসেছে। মুসান্না ওসব জায়গায় যেসব গভর্নরদের পাঠিয়েছিলেন তাদের অনেকে পালিয়েছে আবার অনেককে স্থানীয় লোকেরা কতল করে দিয়েছে। এই বিদ্রোহ সেসব এলাকার জায়গীরদার ও আমীররা উস্কে দিয়েছিলো। এভাবে বিজিত এলাকাগুলো মুসলমানদের হাতছাড়া হয়ে গেলো।

মুসান্না তার সালারদের বলে দিলেন, দিনরাত যেন দূরদূরান্ত পর্যন্ত প্রহরার ব্যবস্থা রাখেন। যে কোনদিন পারসিকরা হামলা করতে পারে। আগ থেকেই যদি পারসিকদের খবর জানা যায় তবে কিছুটা হলেও প্রতিরোধ গড়ে তোলা যাবে। তা যদি সম্ভব না হয় তবে নিজেদের সীমানা খুব দূরে নয়। পিছু হটে গিয়ে সেনা সাহায্যের জন্য অপেক্ষা করা যাবে।

হযরত উমর (রা) কাসেদের হাত থেকে পয়গাম নিয়ে পড়লেন। তার চেহারায় পেরেশানীর ছাপ পড়লো। তার পেরেশানী আরো বেড়ে গেলো, যখন তিনি কাসেদের মুখে শুনলেন মুসান্নার যখম তাকে মরণাপন্ন অবস্থায় নিয়ে গেছে। সম্ভবতঃ এই যখম তাকে আর উঠতে দেবে না।

ঃ 'আল্লাহর কসম!'– প্রতিঘাতের সুরে বললেন– 'আমি শাহানে আজমের বিরুদ্ধে আরবকে অবশ্যই দাঁড় করাবো।'

তখনই তিনি বিভিন্ন গোত্রের সরদারের কাছে মুসলমানদের এই চরম অবস্থার কথা জানিয়ে পয়গাম পাঠালেন। এটাও জানালেন, যে সিপাহসালার অগ্নিপূজারীদের বিরুদ্ধে এত প্রতিরোধ গড়ে তুলছিলেন, তিনি এখন গুরুতর আহত হয়ে জীবনের শেষ পর্যায়ে।

পয়গামের ভাষা এতই রক্তস্পর্শী ও উদ্দীপ্ত ছিলো যে, বিভিন্ন গোত্রের সরদাররা দলে দলে নিজেদের লোক নিয়ে মদীনায় পৌঁছতে লাগলো। উমর (রা) হজ্জের জন্য মক্কায় চলে গেলেন। হজ্জ আদায় করে মদীনায় এসে দেখেন লোকদের এত ভীড় যে, কোথাও তিলধারণের জায়গাও নেই। সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা) পাঠিয়েছিলেন তিন হাজার সৈন্য। কবীলায়ে হাজরা মাওত, সাদাফ, মাযহাজ, কায়েস ও গিলানের সরদাররা আট হাজার, বনু তামীম ও বু বনুরবা চার হাজার এবং বনু আসাদ তিন হাজার লোক পাঠিয়েছিলো।

হযরত উমর (রা) মুসান্নার কাসেদকে বলে দিয়েছিলেন, সীমান্তবর্তী গোত্র রবীআ ও মুযার তোমাদের কাছেই রয়েছে। তাদেরকেও অধিক পরিমাণে লোক দিতে বলবে।

এই লশকর এত বড় হয়ে গেলো যে, হযরত উমর (রা) নিজেই এর সিপাহসালার হয়ে রওয়ানা হয়ে গেলেন।

যীকরে একরাতে মুসান্নার কষ্ট এত বেড়ে গেলো যে, তার শ্বাস-প্রশ্বাস কয়েকবারই বন্ধ হয়ে গেলো। ডাক্তাররা প্রাণপণ চেষ্টা করলো। কিন্তু মুসান্নার খিচুনি উঠে গেলো। সালমা সেখানেই ছিলো এবং ভাই মুসান্নাও সেখানে ছিলেন।

ঃ 'মুসান্না!'– মুসান্না অতিকষ্টে বললেন– 'আমার সময় এসে গেছে ভাই। আমার পর যে সিপাহসালার আসবেন তাকে বলে দিয়ো– পারসিকরা যখন একাট্টা হয়ে যাবে তখন যেন তাদের সঙ্গে মোকাবেলা না করে। তাদের এলাকার গভীরে গিয়েও লড়াই করা ঠিক হবে না। তাদের সীমান্তে থেকে খণ্ড খণ্ড লড়াইয়ে তাদেরকে দুর্বল করে দাও। তোমরা যদি তাদের ওপর বিজয় লাভ করো তবে সামনে অগ্রসর হবে। আর যদি বিজিত হও তবে পিছু হটে সীমান্তবর্তী এলাকায় ছড়িয়ে পড়ো। আমাদের মরু রাস্তাগুলো সম্পর্কে আরবরাই কেবল জানে আজমীরা নয়। তারা তোমাদের পিছু ধাওয়া করলে প্রচণ্ড ক্ষতির সম্মুখীন হবে। তখন তোমরা উল্টো তাদের ওপর পাল্টা আক্রমণ করে বিজয় ছিনিয়ে আনতে পারবে।'

শেষ কয়েকটি কথা বলতে বলতে মুসান্নার নিঃশ্বাস ক্ষীণ হয়ে এলো। তারপর একবার হেচকি তুললেন এবং এই পৃথিবীতে এক আকাশ যমীন বীরত্ব গাঁথার ঐশ্বর্য রেখে শহীদ হয়ে গেলেন।

'তুমি কি ভেবে এসেছো রুস্তম?'– শিরী রুস্তমকে জিজ্ঞেস করলো– 'তুমি বলেছিলে এবার এসে তুমি তোমার ফয়সালা শোনাবে----আমি আমার পুত্রের প্রতিশোধ নিতে চাই। এজন্য যদি ফারেসের শাহেনশাহীও খতম হয়ে যায় হয়ে যাক।'

মুসান্না এমন সময় শহীদ হলেন যখন তার তাঁবুর খুঁটি পারস্যের মাটিতে। তার পাশে ছিলো তখন মাত্র তিন চার-হাজার লোকতপ্ত মুজাহিদ। ওদিকে মাদায়েনে এত বিশাল ফৌজ তৈরি হচ্ছিলো যে, খোদ পারসিকরাও এত বড় ফৌজ এর আগে আর কখনো দেখেনি। মুসলমানদের জন্য সবচেয়ে বড় হতাশার ব্যাপার ছিলো, তাদের বিজিত এলাকাগুলো পারসিকদের বিদ্রোহের কারণে হাতছাড়া হয়ে যাওয়া।

মুসান্না সেনাসাহায্য চেয়ে যে কাসেদ পাঠিয়েছিলেন, মদীনা থেকে সেই সেনাসাহায্য রওয়ানা হয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু তাদের জানা ছিলো না, মুসান্নার অনুপস্থিতিতে মুজাহিদদের ওপর দিয়ে কি বয়ে যাচ্ছে। মুসান্নার মৃত্যুর কালো ছায়া ওদেরকে সবসময় সেসব শহীদদের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিলো যারা পারস্যের মাটিতে লড়ে তাদের বুকের তাজা খুন ঢেলে জামে শাহাদাত পান করেছিলো। মুজাহিদরা এক সঙ্গে কোথাও বসলেই তাদের স্মৃতিচারণ করতো।

ঃ 'এতগুলো প্রাণ আর এতগুলো রক্তের বিসর্জন কি বৃথা যাবে?'

ঃ 'আমরা কি আমাদের সঙ্গীদের অগ্নি পূজারীদের মাটিতে দাফন করার জন্য নিয়ে এসেছিলাম?'

ঃ 'কেয়ামতের সেই মহাসমাবেশে তাদেরকে আমরা কি জবাব দেবো?'

ঃ 'আমরা জীবিত ফিরে গেলে তো শহীদদের আত্মা আমাদেরকে লজ্জাই দিয়ে যাবে।'

ঃ 'হে আল্লাহ--- আল্লাহ!--- তুমি তো পারো--- আমাদের নয় এসব শহীদদের মর্যাদা রেখো'।

ঃ 'আমরা কখনো পিঠ দেখাবো না।'

ঃ 'প্রতিশোধ নেবো। শহীদের রক্তের প্রতিটি ফোটার প্রতিশোধ নেবো।'

প্রতিশোধ আর প্রতিরোধের আকাশ সমান দৃঢ়তা নিয়ে মুজাহিদরা রাতে ঘুমাতো এই আশংকা নিয়ে– না জানি সকাল তাদের জন্য কি বয়ে আনে।

মুসান্না যখন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তখন তার স্ত্রী সালমা ও মুসান্না তার পাশেই ছিলেন। সালমা তার প্রিয়তম স্বামীর মুখের দিকে শূন্য চোখে তাকিয়েছিলো। তার চোখে ছিলো অবিশ্বাস। তার স্বামী! তার সোহাগ! তাকে ছেড়ে চিরদিনের জন্য তার মাওলার কাছে চলে গেছেন। নিজ গ্রামে শহরে সফরে এমনকি রক্তাক্ত আর ধুলোয় ধূসরিত রণাঙ্গনেও সালমা তার থেকে দূরে থাকতে পারেনি।

সালমা শুধু একজনের স্ত্রীই ছিলো না, আরব্য মুসলিম নারীও ছিলো সে একজন মুজাহিদাহও ছিলো। একজন সিপাহসালারের স্ত্রী হওয়াতে যুদ্ধবিদ্যা ও যুদ্ধ পরিস্থিতি

সম্পর্কে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলো সে। তার জানা ছিলো মুসান্নার পর এই লশকরে এমন সব সালাররাই রয়ে গেছেন যারা পিছু হটা ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারবেন না। হঠাৎ করেই এই ভাবনা সালমার মনে এলো এবং চমকে উঠে মুসান্নার দিকে তিনি তাকালো।

ঃ 'মুসান্না!'–সালমা মুসান্নার ভাইকে বললেন– 'তোমার ভাই চলে গেলেন! আমার স্বামী চলে গেলেন! কিন্তু এটা মাতমের সময় নয়। মুসলমানরা আজ এমন এক সিপাহসালার হারিয়েছেন যিনি পারস্যকে ইসলামী সাম্রাজ্যে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য এবং পারসিকদের ইসলামের আলোয় আলোকিত করার জন্য ঘর থেকে বের হয়েছিলেন। তুমি কি জানো না এই মুসান্নাই প্রথম খলীফা আবু বকর (রা) কে পারস্যে অভিযান পরিচালনার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছিলেন?'

ঃ 'হ্যাঁ' – মুসান্না বললেন– 'আমার মনে আছে সালমা।---- এখন কি করতে হবে বলুন! ফৌজ যদি এই খবর জানতে পারে তবে তো সবাই হতাশ হয়ে যাবে। এমনও হতে পারে কিছু লোক এই ভেবে ফিরে যেতে পারে যে, মুসান্না ছাড়া আর কারো দ্বারা বিজয় সম্ভব নয়--- মুসান্নার মৃত্যুর খবর কি তবে লশকরের কাছে গোপন রাখবো?'

ঃ 'না'– সালমা বললো– 'এটা গোপন রাখা ভালোও হবে না এবং সম্ভবও নয়। রাত অর্ধেক চলে গেছে। লশকর রয়েছে গভীর ঘুমে। ফজর নামাযের জামাতের পর মুজাহিদদের যেতে দেবে না। আমাকে ডেকে নিয়ো। এটা তো সবাই জানতো, সিপাহসালারকে যখম এতই মাযুর করে দিয়েছিলো যে, তিনি তাঁবুতে নামায পড়তেন।'

ফজর নামাযের ইমামতি মুসান্না বিন হারিসা করলেন। মুসান্না যখন বিছানায় পড়ে গেলেন তখন থেকেই মুসান্না ইমামতি শুরু করেন। অনেকেই বুঝতে পারলো না যে, মুসান্নার আওয়াজ আজ বসানো এবং কেরাতের সুরও করুণ। নামায ও দুআর পর মুজাহিদরা উঠতে শুরু করলে মুসান্না উঠে দাঁড়ালেন।

ঃ 'বসে পড়ো আমার বন্ধুরা!– মুসান্না বললেন– 'আজকের সকাল আমাদের জন্য কোন ভাল সংবাদ বয়ে আনেনি'– ভেজা আওয়াজে মুসান্না বললেন।

ঃ 'সিপাহসালার মুসান্নার সুস্থতার খবর শোনাও ভাই আমাকে– লশকরের মধ্য থেকে এক আওয়াজ উঠলো–'তার যখম কি কিছুটা সেরে উঠেছে?'

ঃ 'না'!– এবার মুসান্না প্রায় কেঁদে ফেলছিলেন– 'তিনি তার এই যখম বুকে ধারণ করে আজ রাতে আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে দিয়েছেন'।

মুজাহিদদের মধ্যে এতক্ষণ যে ফিসফিসানি চলছিলো তা নিমেষেই থেমে গেলো। নীরব নিস্তব্ধতা নেমে এলো। লোকালয় থেকে দূরের এই এলাকায় ভোরের এই নিস্তব্ধতা চারদিক ভূতুড়ে করে তুললো। তারপরই এহ নিস্তব্ধতা হেচকি আর ফোঁপানির রূপ নিলো।

ঃ 'মুসান্না মরতে পারেন না'– এ ছিলো এক খ্রিষ্টানের আহাজারি– 'মুসান্না মৃত্যুকেও পরাজিত করতে পারেন।'

ঃ 'হ্যাঁ মুসান্না মরতে পারেন না'– এটা সালমার আওয়াজ ছিলো। একটি গাছের পেছনে পা থেকে মাথা পর্যন্ত চাদরে আবৃত হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। শুধু চোখ দুটি দেখা যাচ্ছিলো তার। সামনে এসে তিনি উঁচু আওয়াজে বললো– তুমি ঠিক বলেছো। মুসান্না মৃত্যুকেও জয় করতে পারেন। যে মারা গেছেন সেটা মুসান্নার দেহ। মুসান্না আমাদের সঙ্গে জাগরুক থাকবে----মুজাহিদীনে ইসলাম! তোমরা মুসান্নার জন্য ঘর থেকে বের হওনি। তোমরা আল্লাহর হুকুমে বের হয়েছিলে। মুসান্নার মৃত্যুতে সবচেয়ে বেশি বেদনাহত আমার হওয়া উচিত। তিনি আমার জীবন সফরের সঙ্গী ছিলেন। কিন্তু এটা দুঃখে ভেঙে পড়ার সময় নয়। মুসান্নাকে নিজেদের বুকে, নিজেদের চেতনায় জীবিত রাখতে হবে আমাদের। তোমরা সবাই মুসান্না। একজনের মৃত্যুতে সবাই মরে যায় না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের থেকে বিদায় নেয়ার পর কাফেররা আনন্দ করেছিলো। তারা ভেবেছিলো এবার ইসলামও বিদায় নেবে। ধর্মদ্রোহীতার তুফান ছড়িয়ে দিয়েছিলো তারা। মনে হচ্ছিলো কেউ তা রোধ করতে পারবে না। কিন্তু সিদ্দীকে আকবার (রা) তা রুখে দিয়েছিলেন। তোমরাই কি সে তুফান রুখনি? তোমাদের মধ্যে সেই মুজাহিদরাও আছে যারা মুরতাদদের মস্তক পিষে ফেলেছিলো। ফৌজ শিগগিরই আসছে। হিম্মতহারা হয়ে বসে পড়ো না। মুসান্নার ভাই মাসউদের কথা কি তোমাদের মনে নেই? যখমী হয়ে পড়ে যাওয়ার পূর্বে তিনি বলেছিলেন– 'হে বনু বকরের সন্তানরা! নিজেদের ঝাণ্ডা বুলন্দ রাখো। আল্লাহ তোমাদেরও বুলন্দ রাখবেন। খবরদার আমার মৃত্যুতে তোমরা হতাশ হয়ে ভেঙে পড়ো না'--- তারপর মাসউদ শহীদ হয়ে গিয়েছিলেন এবং মুসান্না ঘোষণা করেছিলেন– আমার ভাই শহীদ হয়েছেন– কোন দুঃখ নেই এতে। বীর সেনানীরা এভাবেই প্রাণ দিয়ে থাকে। মুসান্না ও মাসউদের সেই ঘোষণা আজোও তোমরা বুকে ধারণ করো। মুসান্নার চেতনাদীপ্ত মনোবল তোমরা নিজেদের মধ্যে জাগ্রত করো। তিনি তার তীব্র যখমের কোন পরওয়া করেননি। অক্লান্ত লড়ে গেছেন। এবং বীর বাহাদুরের মতো প্রাণ দিয়ে গেছেন।'

ঃ 'আমরাও বীরের মর্যাদায় প্রাণ দেবো'– লশকরের মধ্য থেকে এক মুজাহিদ নারা লাগালো।

এর সঙ্গে সঙ্গেই পুরো লশকর জোশদীপ্ত শ্লোগানে মুখোরিত হয়ে উঠলো।

মুসান্না ছিলেন বনু বকরের সরদার পরিবারের লোক। তার গোত্রের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন এবং অনেকদিন পর্যন্ত তিনিই একমাত্র সে গোত্রের মুসলমান ছিলেন। তিনি শুধু একজন মুসলমানই ছিলেন না, খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা) এর মতো সিপাহসালারের সঙ্গে কাঁধে কঁধে মিলিয়ে রোমকদের বিরুদ্ধে সিরিয়ায় লড়াই করেছিলেন। দু'এক লড়াইয়েই প্রমাণ করে দিয়েছিলেন তিনি খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা) এর মতোই দক্ষ সালার, রণাঙ্গনের কুশলী এক নেতা।

প্রথম খলীফা আবু বকর (রা) এর কাছে এই মুসান্নাই গিয়ে বলেছিলেন, সিরিয়ার মতো পারসিকদের বিরুদ্ধেও এখন অভিযান শুরু করা হোক। আবু বকর (রা) নিজেও

রণাঙ্গনের একজন দক্ষ সৈনিক ছিলেন। একই সঙ্গে দুই বড় শক্তির বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার ব্যাপারে তিনি অস্বীকৃতি জানালেন। কিন্তু মুসান্না তাকে বাস্তবোচিত যুক্তি দিয়ে বুঝানোর পর তিনি পারসিকদের বিরুদ্ধে অভিযানের ব্যাপারে সম্মতি জানালেন।

কিন্তু প্রথম খলীফা আবু বকর (রা) এটা জানতেনই না যে, এই মুসান্না ইবনে হারিসা কে এবং তিনি কোন গোত্রের।

ঃ 'এতো কোন অজ্ঞাতনামা অপরিচিত ব্যক্তি নয় যাকে কেউ চিনেই না বা যার কোন বংশীয় ইতিহাস নেই'– খলীফার মজলিসে এক কবীলার সরদার– কায়েস ইবনে আসেম মুনকিরী বলেছিলেন– 'এতো মুসান্না ইবনে হারিসা শায়বানী। তার কবীলার মধ্যে তিনিই প্রথম ও একমাত্র ব্যক্তি যিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তার মেহনত ও গভীর ব্যক্তি মর্যাদার কারণে খুব অল্প সময়েই পুরো কবীলা ইসলাম গ্রহণ করেছিলো।

ঃ 'তুমি কি বনু বকর ইবনে ওয়ায়েলের কথা বলছো?'– আবু বকর (রা) জিজ্ঞেস করেছিলেন।

ঃ 'হ্যাঁ'– কায়েস ইবনে আসেম জবাব দিয়েছিলেন– 'মুসান্না ইবনে হারেসা বনু বকরের একজন সরদার ও মান্যবর লোক। তার এক ইশারায় পুরো কবিলাই জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়বে।'

মুসান্নার নেতৃত্বের এটা একটা কারিশমা ছিলো যে, তার ফৌজে খ্রিষ্টানরা স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে যোগ দিয়েছিলো এবং রণাঙ্গনে বীরত্বের দৃষ্টিনন্দন ঝলকও দেখিয়েছিলো। মুসান্না এখন নেই। অথচ এখনই তার বড় প্রয়োজন ছিলো।

মদীনায় আমীরুল মুমিনীন উমর (রা) এর আহ্বানে বিভিন্ন গোত্রের সরদাররা সাড়া দিয়ে হাজার হাজার লোক মুসলমান ফৌজে শামিল করিয়েছিলো। সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবেও দলে দলে লোক ফৌজে শামিল হয়েছিলো। এই ফৌজে যেমন বড় বড় আমীর, রঈস, ব্যবসায়ী, কবি, ইমাম, খতীব প্রভৃতি শ্রেণীর লোক যোগ দিয়েছিলো তেমনি সাধারণ লোকেরাও যোগ দিয়েছিলো। তাদের মধ্যে কয়েকজন সাহাবায়ে কেরামও ছিলেন এবং কয়েকজন শহীদ সাহাবায়ে কেরামের পুত্ররাও শরীক ছিলেন। হযরত উমর (রা) এতই আবেগদীপ্ত ছিলেন যে, তিনি নিজেই এই ফৌজের সিপাহসালার হয়ে গেলেন হযরত আলী (রা)কে তার স্থলাভিষিক্ত করে। আলী (রা) এই ফৌজকে বিদায় জানাতে অনেক দূর পর্যন্ত গিয়েছিলেন। মদীনা থেকে তিন মাইল দূরে সিরার নামক স্থানে এই লশকর যাত্রাবিরতি করে।

লশকরের অধিকাংশই জানতো না যে, আমীরুল মুমিনীন সিপাহসালার হয়ে মদীনা ছেড়ে রণাঙ্গনে যাচ্ছেন। তারা ভেবেছিলো, আমীরুল মুমিনীন এখান থেকে মদীনায় ফিরে যাবেন।

উমর (রা) যখন মদীনা থেকে লশকরের সঙ্গে বের হলেন তখন বাড়ি ঘরের ছাদে, উঁচু টিলায় এবং চওড়া গাছগুলোতে মানুষ আর মানুষের ঢল নেমেছিলো। তাদের মধ্যে মহিলা, বৃদ্ধ ও শিশুও ছিলো। উমর (রা) কিছু দূর গিয়ে পেছনে ফিরে তাকাতেই দেখলেন, অসংখ্য নারী পুরুষের আশীর্বাদী হাত নড়ছে। আমীরুল মুমিনীন সেদিকে

তাকিয়েই রইলেন। তখন তার চেহারা আনন্দ আর বিস্ময়ে ঝলমল করছিলো। হঠাৎ তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন– 'হে আল্লাহ! তোমার এই বান্দাদের সামনে আমাকে লজ্জিত করো না'।

সিরারে পৌঁছে উমর (রা) খানিক বিশ্রাম করছিলেন। এমন সময় হযরত উসমান (রা) তার কাছে গিয়ে বললেন।

ঃ 'আমীরুল মুমিনীন'– উসমান (রা) বললেন– 'পুরো লশকর আমি ঘুরে এসেছি। কারোই জানা নেই যে, ফৌজের সিপাহসালার আপনি নিজে। সবাই মনে করছে আপনি এখান থেকে চলে যাবেন।'

ঃ 'এটা তো সবারই জানা উচিত'– উমর (রা) বললেন– 'এই লশকরে বিভিন্ন কবীলার সরদাররা রয়েছেন। রয়েছেন আরবের শীর্ষস্থানীয় বুদ্ধিজীবী, কবি, খতীব এবং সম্মানিত আরো অনেকে। সকলের পরামর্শ ও অনুমতি ছাড়া আমার সিপাহসালার না হওয়াটাই উত্তম।---নামাযের সময় হচ্ছে। আযান দিয়ে নামাযের ব্যবস্থা করো। নামাযের পর লশকরের নেতৃত্বের ব্যাপারে ফয়সালা হবে।'

জামাআতে নামাযের পর উমর (রা) উঠে দাঁড়ালেন। সমবেত লশকরকে জিজ্ঞেস করলেন, তাদের সিপাহসালার কে হবে।

ঃ 'উমর ইবনুল খাত্তাব!'– লশকর থেকে অনেকগুলো কণ্ঠের সম্মিলিত আওয়াজ উঠলো।

তারপর অনেকক্ষণ পর্যন্ত 'উমর ইবনুল খাত্তাব---আমীরুল মুমিনীন--- তিনি স্বয়ং চলুন---তিনিই সিপাহসালার---আওয়াজ উঠতে লাগলো।

ঃ 'মুজাহিদীনে ইসলাম!'– উমর (রা) উঁচু আওয়াজে বললেন– 'আমার ইচ্ছা তো এটাই। কিন্তু এখানে এমন অনেকে আছেন যারা আমার চেয়ে উত্তম ফায়সালা করতে পারেন। আমি তাদের পরামর্শ ছাড়া কোন ফয়সালা করতে পারবো না।'

লশকরে যোগদানকারী সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গে পরামর্শ সভার ব্যবস্থা করা হলো।

ঃ 'আমার বন্ধুরা!– উমর (রা) বললেন– 'লশকরের সামনে আমি আমার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছি যে, এই লশকরের নেতৃত্ব আমি দিতে চাই। আমি খলীফা বলে তোমাদের ওপর কোন কিছু চাপিয়ে দেবো না। আমি কি করবো আমাকে বলো।'

ঃ 'আপনি মদীনায় ফিরে যান আমীরুল মুমিনীন!'– সাহাবী আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা) বললেন– 'এবং সিপাহসালার কোন সাহাবীকে নিযুক্ত করুন। রণাঙ্গনে আমাদের লশকরের ফয়সালা মহান আল্লাহর হাতে এবং তার হাতেই এই ফয়সালা শেষ পর্যন্ত থাকবে। আমাদের জয় পরাজয় উভয়টাই হতে পারে। এই লশকরের সিপাহসালার আপনি হলে এবং আমাদের পরাজয় ঘটলে পরাজয়ের এই ধাক্কা কেউ সামলে উঠতে পারবে না। আর আপনাকে ছাড়া আমাদের পরাজয় ঘটলে মদীনা থেকে আপনি সাহায্য পাঠাতে পারবেন। আপনি সিপাহসালার হলেন এবং শহীদ হয়ে গেলেন তখন আর কোন মরদে মুমিন থাকবে না, যে আল্লাহর বড়ত্ব বর্ণনা করবে ও লাইলাহা ইল্লাল্লাহ এর সাক্ষ্য দেবে।'

সাহাবায়ে কেরামসহ উপস্থিত সবাই এই পরামর্শ জোর দিয়ে সমর্থন করলেন। উমর (রা)ও খুশি মনে তা মেনে নিলেন।

ঃ 'আমি তোমাদের ফয়সালা মতে অবশ্যই কাজ করবো'– উমর (রা) বললেন– 'কিন্তু যে যুদ্ধের জন্য আমরা যাচ্ছি তা ঐসব যুদ্ধ থেকে অনেক বেশি ভয়াবহ হবে যেসব যুদ্ধে আমরা লড়াই করেছি। সাহাবীগণের মধ্যে দু'জনের ওপরেই আমার নজর রয়েছে। খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা) ও আবু উবাইদা (রা)।'

উমর (রা) আলী (রা)কেও প্রস্তাব করেছিলেন কিন্তু আলী (রা) তাতে অসম্মতি জানান।

বিভিন্ন জনের নাম পেশ করা হচ্ছিলো। হঠাৎ দূর থেকে ঘোড়ার দ্রুতগতির খুরধ্বনি শোনা যেতে লাগলো। ঘোড়সওয়ার এদিকেই আসছিলো। কাছে এসে সওয়ার ঘোড়া থেকে নেমে সোজা উমর (রাঃ)-এর কাছে এসে দাঁড়ালো।

ঃ 'আসসালামু আলাইকুম ইয়া আমীরুল মুমিনীন!'– সওয়ার সালাম দিয়ে একটি লিখিত পত্র উমর (রা) এর হাতে দিতে দিতে বললো– 'আল্লাহর শুকরিয়া! আপনাকে এখানে পেয়ে গেছি। এটা সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা) এর পয়গাম। তিনি বলেছিলেন– আমীরুল মুমিনীনকে সম্ভবত সিরারের ঝর্ণার ধারে পেয়ে যাবে।'

ঃ 'আল্লাহ তোমাকে সালামতি দান করুন'– উমর (রা) বললেন– 'তুমি খুবই দ্রুত এসেছো। বসে পড়ো---- সাদ কোথায়?'

ঃ 'নজদে।'

উমর (রা) সাদ (রা) এর পয়গাম সবাইকে পড়ে শুনালেন। তিনি লিখেছিলেন ঃ

ঃ 'বিসমিল্লাহ----আমীরুল মুমিনীন উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) এর নামে---তিন হাজার ফৌজ পাঠিয়েছি। এর মধ্যে সওয়ারের সংখ্যাই বেশি। আরো এক হাজার সওয়ার আমি তৈরি করে রেখেছি। যারা নির্ভীক, জানবায ও কুশলী যোদ্ধা।'

ঃ 'সিপাহসালার পাওয়া গেছে'– আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা) শ্লোগানের সুরে বললেন।

ঃ 'কে সে?'– উমর (রা) জিজ্ঞেস করলেন।

ঃ 'এই যমীনের সিংহ সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা)।'

সাদ (রা) এর নাম শুনে উমর (রা) চিন্তায় পড়ে গেলেন এবং কিছুক্ষণ নীরব রইলেন। কারণ, সাদ (রা)-এর অসাধারণ বীরত্ব ও নির্ভীক-সাহসিকতার ব্যাপারে কারোরই কোন সন্দেহ ছিলো না। কিন্তু রণাঙ্গনের যুদ্ধ কৌশল ও নেতৃত্বের ব্যাপারে উমর (রা) তার প্রতি আশ্বস্ত হতে পারছিলেন না। কিন্তু সেখানে যত সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন সবাই আবদুর রহমান ইবনে আউফের প্রতি জোর সমর্থন জানালেন। সাহাবায়ে কেরাম ছাড়াও সেখানে কয়েকজন বিচক্ষণ ফয়সালাকারী ব্যক্তিও ছিলেন। তারাও আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা) এর প্রতি সমর্থন দিয়ে সাদ (রা) এর পক্ষেই ফয়সালা দিলেন।

ঃ 'এখনই ফিরে যাও নজদে'– উমর (রা) সাদ (রা) এর কাসেদকে বললেন– 'তোমার ঘোড়াটি ক্লান্ত। তাজাদম কোন ঘোড়া নিয়ে যাও এবং সাদ (রা) কে এখনই এখানে আসতে বলো। তার সঙ্গের এক হাজার ঘোড় সওয়ারও যেন নিয়ে আসে।'

❖ ❖ ❖

সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা) শুধু সাহাবীই ছিলেন না রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মামাও ছিলেন। সতের বছর বয়সে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। প্রথম পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে তিনি অন্যতম। সাদ (রা) মোটামুটি সম্পদশালী ছিলেন। দামী কাপড় পরিধান করতে পছন্দ করতেন। কিন্তু তার চালচলনে বিত্তশালীর দাপট ছিলো না। যুদ্ধের ময়দানের প্রসিদ্ধ বীর ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে সবগুলো যুদ্ধেই শরীক ছিলেন। উহুদ যুদ্ধের তীব্র সংকটের সময় যে কয়জন তীরন্দায রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বেষ্টনীতে নিয়ে হেফাজত করছিলেন সাদ (রা) ছিলেন তাদের সবার অগ্রণী। তার অনবরত তীর নিক্ষেপের কারণে দুশমন কাছে ঘেঁষতে পারছিলো না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তাকে বলেছিলেন– "আমার পিতামাতা তোমার প্রতি উৎসর্গিত হোক, এভাবেই তীর চালিয়ে যাও।"

ইসলামে সর্বপ্রথম দুশমনের বিরুদ্ধে তীর নিক্ষেপকারী ছিলেন এই সাদ (রা)-ই।

যুবক বয়সে তিনি একবার কঠিন অসুখে পড়েছিলেন। বাঁচার আশাও প্রায় ছেড়ে দিয়েছিলেন। তার একটি মাত্র কন্যা ছিলো। একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে দেখতে গেলেন।

ঃ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ!'– সাদ (রা) বলেছিলেন– 'আমার যে সম্পদ রয়েছে তার একাংশ আমার মেয়েকে দিয়ে আর দু'অংশ কি মুসলমানদের জন্য দান করে দেবো?

ঃ 'না'– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,

ঃ 'দুই অংশ?'

ঃ 'না সাদ!'

ঃ 'এক-তৃতীয়াংশ?'

ঃ 'এক-তৃতীয়াংশ?' রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছিলেন– এটাও বেশি। আরেকটু কমাও। 'উত্তম হলো নিজের সন্তান-সন্ততিকে এতটুকু স্বচ্ছন্দে রেখে যাওয়া যাতে তারা অন্যের কাছে হাত না পাতে!"

এই সাদ (রা) এখন পারসিকদের বিরুদ্ধে যে লশকর তৈরি করা হয়েছে তার সিপাহসালার নিযুক্ত হলেন।

ঃ 'হে সাদ!'– হযরত উমর (রা) তাকে সর্বশেষ হেদায়েত প্রদানের সময় বললেন– 'হে বনু ওহাইবের গর্ব! কখনো এমন অহংকার মনে ঠাঁই দিয়ো না যে, তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মামা এবং সম্মানিত সাহাবী। তোমার শ্রেষ্ঠত্ব ও অবদান যা কিছু আছে তা তো তোমার কর্মফল---তোমার কৃত আমলের সাফল্য। আল্লাহ মন্দকে মন্দ দ্বারা নয় নেকী দ্বারাই দূর করেন। আল্লাহ ও বান্দার মাঝে আনুগত্য ছাড়া দ্বিতীয় কোন সম্পর্কের অস্তিত্ব নেই। আল্লাহর এই দ্বীনে সবই সমান। শ্রেষ্ঠত্ব শুধু তারই যে আনুগত্যে সবার অগ্রণী।'

'সমস্যা যেমনই হোক তা নিয়ে নবীজীর সুন্নতের মাপকাঠিতে এবং ধৈর্য ও স্থির চিত্ত নিয়ে তার মোকাবেলা করতে হবে। যেখানেই সেনাছাউনি ফেলবে সেখানকার বিস্তারিত সব লিখে পাঠাবে। সংবাদ আদান-প্রদানের মাধ্যম খুব দ্রুত ও তৎপর রাখতে

হবে। এটা ভুলে যেয়ো না– আমরা যেমন বলি সালতানাতে ফারেসকে চিরতরে খতম করে দেবো– তেমনি পারসিকরাও ইসলাম ও মুসলমানদেরকে চিরতরে খতম করে দেয়ার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ওরা অনেক বড় ফৌজ তৈরি করছে। ফৌজ, ঘোড়া, হাতি ও নানান ধরনের অস্ত্রশস্ত্রের এমন এক তুফান হবে সেটা যে, তোমাদের লশকর এর সামনে শুকনো খড়কুটার মতো মনে হবে।'

----ধৈর্য ও সাহসিকতার সঙ্গে যে কোন পদক্ষেপ নিতে হবে। দুশমন অত্যন্ত ধোঁকাবাজ ও প্রতারক। তাদের এই স্বভাবই তাদের পরাজয়ের কারণ হতে পারে। সবার সঙ্গে তোমাদের আচার-আচরণ যেন হৃদ্যতাপূর্ণ ও সহানুভূতির হয়। যেসব ফারসী বন্দী হয়ে তোমার হেফাজতে আসবে তাদের সঙ্গে কোমল আচরণ করবে। পারসিকদের একাট্টা দেখে ঘাবড়ে যেয়ো না। তাদের অন্তর কখনো একাট্টা হবে না। তোমাদের পিছু হটতে হলে আরবের সীমান্তবর্তী এলাকায় ঢুকে পড়বে। পারসিকরা এই কংকর ও টিলাময় মরু সম্পর্কে অবগত নয়। তারা এখানে ঢুকলে রাস্তা হারিয়ে তোমাদের ফাঁদে পা দেবে, তখন তোমরা পাল্টা হামলা করতে পারবে।'

উমর (রা) এরপর হযরত আলী (রা)ও কিছু হেদায়েত দিয়ে লশকরকে বিদায় দিয়ে দিলেন।

এই লশকরে সত্তরজন এমন সাহাবী ছিলেন যারা বদরযুদ্ধে লড়াই করেছিলেন, এমন তিন শ'জন বুযুর্গ ছিলেন যারা মক্কা বিজয়ে শরীক ছিলেন। আর ছিলেন সাতশ জন সাহাবায়ে কেরামের পুত্ররা। কেউ ছিলেন মর্যাদার শীর্ষচূড়ার উজ্জ্বল নক্ষত্র, কারো ব্যক্তিসত্তা ছিলো সূর্যের প্রখর আলোর মতো সর্বত্র বিস্তৃত কিংবা কেউ ছিলো টগবগে শৌর্যবীর্যে বলবান নবীন সৈনিক। আবার কেউ বিত্তশালী। কেউ অতি দরিদ্র। কিন্তু তারা যখন এই ফৌজে একত্রি হলেন তখন সবাই উঠে এলেন মর্যাদার একই কিশতীতে। সবার সত্তা এক--- মুসলমান---মুজাহিদ---সবার অঙ্গীকার এক--- তেজদীপ্ত জযবায় সবাই বলীয়ান। নেতৃত্ব পাওয়ার বাসনা তাদের কারো মনেই ঠাঁই হয়নি। নেতৃত্বকে তারা এড়িয়েই চলতেন। স্থান বিশেষ ঘৃণাও করতেন। অনেক রঈস ও কবীলার অসংখ্য সরদাররাও এই লশকরে ছিলেন। তাদের কেউ ভিন্ন মর্যাদা ও আলাদা সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার আশা করেননি। এমন প্রত্যাশাকে তারা পাপই মনে করতেন।

মাদায়েনের বাইরে এবং ভেতরে সবখানেই বড় ফৌজি ক্যাম্পে ভরে গিয়েছিলো। প্রতিটি ময়দানেই চলছিলো বিভিন্ন প্রশিক্ষণ। কোথাও নবীনদের শাহসওয়ার বানানো হচ্ছিলো। কোথাও তীরন্দাযী ও নেযাবাসীর চর্চা হচ্ছিলো। কোথাও হাতিবহরকে কসরৎ করানো হচ্ছিলো। দুশমনকে কিভাবে পিষে মারতে হবে তাও হাতিদের শেখানো হচ্ছিলো। এতবড় ফৌজ দেখে যে কেউ নিশ্চিত করে বলতে পারতো– এই ফৌজ যেখান দিয়ে যাবে সেখানকার কোন বসতি কোন শহর কোন এলাকা এবং কোন পাহাড়ই দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না। এই ফৌজ প্রচণ্ড তুফানের মতো পেছনে শুধু লাশের মিছিল আর ধ্বংসস্তূপ ফেলে সামনে এগিয়ে যাবে।

পারস্যের নয়া বাদশাহ ইয়াযদগিরদ আট দশজন ঘোড়সওয়ারের একটি মুহাফিজ দল নিয়ে সেনা ক্যাম্প ঘুরে ঘুরে দেখছিলো। তার সঙ্গে রুস্তমও ছিলো। রুস্তমের প্রতি ইয়াযদগিরদের প্রচণ্ড বিশ্বাস ছিলো। প্রকৃতপক্ষেই রুস্তম রণাঙ্গনের

কেয়ামত মাতানো একটি বিভীষিকার নাম ছিলো। এই বিভীষিকা রোমকদের মতো যুদ্ধশক্তিকেও আচ্ছন্ন করেছিলো।

একুশ বছরের নৌজোয়ান ইয়াযদগিরদ ফৌজের এই নব উদ্যোম দেখে আবেগে ফেটে পড়ছিলো। কিন্তু তার মা ছেলের নাম জপ করেই দিন গুজরান করতো। তাই তার পেরেশানী ছিলো সবসময় তাকে নিয়েই। সালতানাতে ফারেসের বিপদ নিয়ে তার কোন পেরেশানী ছিলো না। তার ছেলে যাতে জীবিত ও সুস্থ থাকে এই ছিলো তার প্রার্থনা।

ঃ 'রুস্তম'!–ইয়াযদগিরদের মা নাওরীন রুস্তমকে বলেছিলো– 'পারস্যের এই তাজ– এই মুকুট তার কত উত্তরাধিকারের রক্ত পান করেছে। তুমি তো জানো– আমার বেটা পারস্যের বাদশাহ বনবে– এমন স্বপ্ন আমি কখনো দেখিনি। তোমার যখন সন্দেহ হবে এই সিংহাসনের অন্যকোন দাবীদার আমার ছেলেকে হত্যা করতে চাইছে আমাকে তখন তুমি জানিয়ো। আমার বেটাকে আমি এখান থেকে নিয়ে যাবো।---রুস্তম---শুনে নাও--- আমার বেটার যদি কিছু হয়ে যায় তাহলে তুমিও জীবিত থাকবে না। এই হাত দুটি তোমার দেহটাকে টুকরো টুকরো করে ফেলবে---ঐ ডাইনী শিরী---শিরওয়ার মা এখনো জীবিত। সে তার পুত্রহত্যার প্রতিশোধ আমার বেটা থেকে নেবে।'

ঃ 'নাওরীন!'– রুস্তম তাকে আশ্বস্ত করেছিলো– 'তোমার বেটা কতল হবে না। আমরাই তাকে ডেকে এনেছি।

ইয়াযদগিরদ ফৌজী তৈয়ারী দেখছিলো। আর তার মা কেল্লার বুরুজে দাঁড়িয়ে তার ছেলেকে দেখছিলো আর বলছিলো– বাছা আমার! বেটা আমার!

ঃ 'নাওরীন!'– কাছ থেকেই একটি আওয়াজ শুনতে পেলো।

ঃ 'উহ'!– নাওরীন চোখ নামিয়ে দেখলো এবং চমকে উঠে বললো– 'সারান!---- তুমি ---তুমি এসে আমায় যে কি শান্তি দিলে। আমি ঘাবড়ে যাচ্ছিলাম। ঐ যে দেখো আমার বেটা তার ফৌজ দেখে বেড়াচ্ছে। সে আমার চোখের আড়াল হলেই আমার অন্তরটা ফাঁকা হয়ে যায়।'

ঃ 'তোমার অন্তরের কিছুই হওয়া উচিত নয় নাওরীন!'– সারান বললো– 'তার নিরাপত্তার দায়িত্ব আমার। তার সঙ্গে তো সরকারি মুহাফিজ থাকেই। আমি আরো দু'জন বিশেষ মুহাফিজ লাগিয়ে দিয়েছি। যারা কারো নজরে পড়ে না। আর নজরে পড়লেও তাদেরকে কেউ চিনে না।'

ঃ 'রুস্তমকে কি আমার বিশ্বাস করা উচিত?'– নাওরীন জিজ্ঞেস করলো।

ঃ 'হ্যাঁ'– সারান বললো–'রুস্তমকে তুমি বিশ্বাস করতে পারো। ওর প্রতি ইয়াযদগিরদেরই বিশ্বাস আছে।'

যে রুস্তমের প্রতি সারান ও ইয়াযদগিরদের নির্ভেজাল বিশ্বাস ছিলো–সে সেদিন মাদায়েন থেকে খানিক দূরের এক বসতির একটি ঘরে বসা ছিলো। বাহির থেকে বাড়িটি সাধারণই মনে হচ্ছিলো। কিন্তু ভেতরের সাজসজ্জা ছিলো কোন শাহী মহলের। এই বাড়িটি ছিলো কিসরা পারভেজের প্রেমাস্পদ স্ত্রী শিরীর। পারস্যের ভাগ্য এক সময় যার হাত লুটেপুটে খেয়েছিলো।

শিরী যে এখানে লুকিয়ে টুকিয়ে থাকতো এমন নয়। লোকেরা জানতো এটা কিসরার রাণী শিরীর বাড়ি। লোকেরা তার আড়ালে আবডালে বলতো- দেখো অন্যের ভাগ্য নিয়ে যে ছিনিমিনি খেলতো তার আজ কি অবস্থা!

খসরু পারভেজের কন্যা পুরান দখত যখন সালতানাতে ফারেসকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য সিংহাসনে আরোহণ করেছিলো তখন খসরু পারভেজের সব স্ত্রীই মহল ছেড়ে চলে গিয়েছিলো। বিভিন্ন বসতিতে গিয়ে তারা থাকতে শুরু করে। শিরীও মাদায়েনের কাছেরই একটি গ্রামে চলে গিয়েছিলো।

মুসলমান লশকর যখন সাদ (রা) এর নেতৃত্বে মাদায়েন অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছিলো এবং মাদায়েনে বিশাল ফৌজ তৈরি হচ্ছিলো তখন রুস্তম শিরীর ঘরে বসা ছিলো। শিরীর কাছে এটা তার প্রথম আসা নয়। আরো কয়েকবার রুস্তম এখানে এসেছিলো। শিরীর বয়স প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছলেও তার রূপযৌবন যেন তখনো অম্লানই ছিলো। যৌবনের এই টান রুস্তম বেশিদিন ভুলে থাকতে পারতো না।

ঃ 'কি ভেবে এসেছো রুস্তম!'- শিরী রুস্তমকে জিজ্ঞেস করলো- 'তুমি বলেছিলে এবার যখন আসবে তখন তোমার ফয়সালা শোনাবে---- আমি চাই আমার পুত্র হত্যার প্রতিশোধ। এ জন্য যদি পারস্যের শাহেনশাহীও খতম হয়ে যায়- তো যাক না'।

ঃ 'অবস্থা তো আমার সামনেই আছে'- রুস্তম বললো- 'তুমিও দেখছো এ অবস্থায় তোমার উদ্দেশ্য পূরণ সম্ভব নয়। ইয়াযদগিরদকে আমি মসনদে বসাইনি। আমীর উমারারা তাকে এনেছে। তারা বলেছিলো, জেনারেলরা যদি নিজেদের বিরোধ মীমাংসা না করে তবে তারা শাহী খান্দানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু করবে। তুমি দেখছো মাদায়েনে কিভাবে ফৌজ তৈরি হচ্ছে এবং কিভাবে দলে দলে লোক ফৌজে শামিল হচ্ছে। এটাও জেনেছো তুমি- লোকেরা বিদ্রোহ করে মুসলমানদের কাছ থেকে নিজেদের এলাকা ফিরিয়ে নিয়েছে। মনে রেখো, পারস্যের হুকুমত এখন জনগণের হাতে। এ অবস্থা শিগগিরই পাল্টে যাবে। তখন যা বলবো তাই করবো।

ঃ 'কাছে এসো রুস্তম।'- শিরী ফিসফিস করে বললো- 'আমার প্রয়োজন রয়েছে তোমাকে। আমার প্রয়োজন পূরণ করে দিলে এর বিনিময় আমি অবশ্যই দেবো---- একটি গোপন খবর তোমাকে বলে রাখি- আমি একটি ধনভাণ্ডার একখানে লুকিয়ে রেখেছি। এজন্য আমার একজন পুরুষ মানুষ দরকার। আমি একা একজন মহিলা কি করতে পারবো! সেই পুরুষটি তুমিই হতে পারো। তুমি জানো তোমার প্রতি আমার কতটুকু আস্থা রয়েছে।'

ঃ 'ঐ ধনভাণ্ডার দিয়ে কি করবে?'- রুস্তম জিজ্ঞেস করলো।

ঃ 'আমাদের দু'জনের কাজেই আসবে'- শিরী বললো- 'আচ্ছা বলতো পারস্যের ব্যাপারে আমাদের ভবিষ্যত কি?'

ঃ 'ভালো নয় শিরী'।- রুস্তম বললো- 'এখন আমরা অনেক বড় ফৌজ তৈরি করছি। মুসলমানরা এত ফৌজ কখনো সংগ্রহ করতে পারবে না এবং তারা তা দেখেওনি। তারপরও আমার সন্দেহ হচ্ছে আমাদের ফৌজ ময়দানে জমে লড়তে পারবে কিনা!'

ঃ 'তুমি কি কোনভাবে যুদ্ধটা বন্ধ করার কোন চেষ্টা করতে পারবে?'– শিরী জিজ্ঞেস করলো।

ঃ 'তা পারবো।'

ঃ 'তাহলে তাই করো'– শিরী বললো– 'যুদ্ধটা বন্ধ করে দাও---আমি তোমাকে সাফ কথা বলে দিচ্ছি– আমি এই সাম্রাজ্যের সম্রাজ্ঞী হতে চাই। তুমি জানো তখন তোমার পদমর্যাদা কি হবে। আর যদি মাদায়েন মুসলমানরা দখল করে নেয় তখন যেভাবেই পারো কয়েকজন গোলাম নিয়ে আমার পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। গোলামরা ঐ জায়গাটা খোদাই করবে।'

ঃ 'যারা তোমার এই ধনভাণ্ডার লুকিয়েছিলো তাদের পক্ষ থেকে কোন আশংকা নেই তোমার?'– রুস্তম জিজ্ঞেস করলো।

ঃ 'না'– শিরী বললো– 'কোন ভয় নেই। ওরা ছয়জন ছিলো। ধনভাণ্ডার লুকানোর পর ওদের একজন জীবিত রাখা হয়নি। খাবারে বিষ মিশিয়ে ওদেরকে আমি মেরেছিলাম। ওদের লাশ নদীতে ভাসিয়ে দেয়া হয়েছিলো।--- রুস্তম! যুদ্ধ যদি বেঁধেই যায় যেভাবে হোক তুমি জীবিত থাকতে চেষ্টা করবে। এই ধনভাণ্ডার কিসরা পারভেজের সময় আমি চুরি করে পৃথক করে রেখেছিলাম। আমি জানতাম বাদশাহরা খেয়ালী হয়। যখন চাইবে তখনই ছুঁড়ে ফেলে দেবে--- তুমি কি আমার মতলব বুঝতে পারছো রুস্তম?'

রুস্তম খুব ভালো করেই বুঝেছিলো। সে শিরীকে আশ্বস্ত করেছিলো, যুদ্ধে যেতে সে নানান টালবাহানার আশ্রয় নেবে এবং যেভাবেই হোক শিরীকে নিয়ে মাদায়েন থেকে চম্পট দেবে।

সাদ (রা) তার লশকর নিয়ে শিরাফে পৌঁছলেন এবং সেখানেই ছাউনি ফেললেন। সেদিন সন্ধ্যায় যীকর থেকে এক কাসেদ শিরাফ পৌঁছলো। সে মুসান্না ইবনে হারিসার শাহদাতের সংবাদ নিয়ে মদীনায় যাচ্ছিলো। সাদ (রা) মুসান্নার শাহাদাতের সংবাদ শুনে একেবারে বোবা বনে গেলেন। মুসান্নার প্রয়োজন তো এখনই সবচেয়ে বেশি ছিলো।

শিরাফের খবরাখবর জানিয়ে সাদ (রা) মদীনায় কাসেদ পাঠিয়ে দিলেন।

শিরাফে সাদ (রা)কে দীর্ঘ সময় যাত্রাবিরতি করতে হয়েছে। কারণ তখনো বিচ্ছিন্নভাবে বা দলীয়ভাবে অনেকেই লশকরে যোগ দিচ্ছিলো। এভাবে সিরিয়া থেকে হাশেম ইবনে উতবার নেতৃত্বে আট হাজার লশকর এসে যোগ দিলো। শিরাফে বিলম্ব করার আরেকটি কারণ ছিলো– তখনো লশকরকে সুবিন্যস্ত করার কাজ চূড়ান্ত হয়নি।

সাদ (রা) এর পয়গাম উমর (রা) এর কাছে পৌঁছলো। যাতে তিনি এই আবেদনও পেশ করেছিলেন যে, আমীরুল মুমিনীন যেন লশকর বিন্যাসের জন্য লশকরের প্রতিটি অংশের সালারদের নামও লিখে দেন। হযরত উমর তখনই লশকরের কোন অংশের নেতৃত্বে কে থাকবে তা নির্ধারণ করে জবাবী পয়গাম পাঠালেন, তারপর লিখলেন–

---'এই বিন্যাস ঠিক রেখে এগিয়ে যাও। তোমাদের মানযিল হবে কাদিসিয়া। সেখানে তোমাদের সামনে থাকবে অনারবীদের ভূখণ্ড এবং তোমাদের পেছনে থাকবে

আরবের পাহাড় সারি। দুশমনকে ঠেকাতে না পারলে গিরিপথে ঢুকে পড়বে। কাদিসিয়ায় পৌঁছে ওখানকার সব কথা জানাবে। কাদিসিয়া পারস্যের প্রবেশপথ।'

নির্দেশমতে সাদ (রা) তার লশকরের বিভিন্ন অংশের সালার নির্ধারণ করলেন। লশকরে যারা পারসিকদের ভাষা জানতো এবং ইরাকের রাস্তাঘাটও চিনতো তাদেরকে গুপ্তচর করে বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে দিলেন।

এই লশকরের যে দুর্বলতাটা ছিলো তা হলো– এর অর্ধেকের বেশি লোকেরই রণাঙ্গনে লড়ার অভিজ্ঞতা ছিলো না। ব্যক্তিগতভাবে সবারই লড়ার অভিজ্ঞতা ছিলো। তীরন্দাযী, তলোয়ার চালনা এবং ঘোড়সওয়ারী এসবে তারা সবাই দক্ষ ছিলো। কিন্তু সুশিক্ষিত ফৌজের মধ্যে থেকে সালারের নেতৃত্বে লড়া সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার। সাদ (রা) এর এখানেই ভয়টা ছিলো। তার আরেকটি ভয় ছিলো– যে দুশমনের বিরুদ্ধে তারা লড়তে যাচ্ছিলো, সংখ্যায় তারা এদের চেয়ে কয়েকগুণ বেশি ছিলো। তাদের অস্ত্র ছিলো উন্নতমানের, ঘোড়া ছিলো উন্নতজাতের, সওয়ারীর সংখ্যাও ছিলো অনেক বেশি। সবচেয়ে বড় ভয় হলো এই লস্করের কেউ হাতি দেখেনি কখনো।

এই লশকরে যোদ্ধা হিসেবে অনেক প্রসিদ্ধ কবি ও বক্তাও যোগ দিয়েছিলো। আমর ইবনে মাদী কারাব, আশআস ইবনে কায়েস ও খানসা ছিলো এদের অন্যতম। খানসা তার চার পুত্রকে নিয়ে সাদ (রা) এর লশকরে যোগ দিয়েছিলো।

সাদ ইবনে (রা) যীকার থেকে মুসান্না ইবনে হারিসার নায়েবে সালারকে তার লশকর নিয়ে শিরাফে আসার কথা বলাটাই ভালো মনে করলেন। মুসান্না ইবনে হারিসা শহীদ হওয়ার পূর্বে প্রবীণ এক মুজাহিদ বাশীর ইবনে খাসাসিয়াকে তার স্থলে সিপাহসালার নিযুক্ত করেছিলেন। অথচ সেখানে মুসান্নার ভাই মুআন্নাও ছিলেন।

সাদ (রা) যীকার থেকে মুসান্নার স্থলাভিষিক্ত সালারকে নিয়ে আসার জন্য পাঠিয়ে দিলেন। কাসেদ রাস্তা থেকেই ফিরে আসে। তার সঙ্গে মুআন্না ও মুসান্নার স্ত্রী সালমা ছিলো। সাদ (রা) মুআন্নাকে জড়িয়ে ধরলেন। দু'জনের চোখ দিয়েই তখন নীরবে অশ্রু ঝরে পড়ছিলো। সালমা পাশেই দাঁড়ানো ছিলেন। তিনি আচল দিয়ে চোখ মুছছিলেন।

ঃ 'আমার দুই ভাই শ্রেষ্ঠ বীরের মতো প্রাণ দিয়ে দিলেন'– মুআন্না বললেন।

ঃ 'আর সালমা!' – সাদ (রা) মুসান্নার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন– 'ফিরে যেতে চাও?'

ঃ 'না'– সালমা বললেন– 'আমি মদীনায় নয় মাদায়েন যাবো। যা আমার স্বামীর আখেরী মানযিল ছিলো। আপনাদের লশকরের সঙ্গে থাকলে নিশ্চয় আমাকে বোঝা মনে করবেন না! লড়াইয়ের দরকার হলে লড়বো। না হয় লড়াইকারীদের সেবা করবো।'

ঃ 'আল্লাহর কসম!'– সাদ (রা) আবেগপূর্ণ গলায় বললেন– 'আমার লশকরের ওপর তোমার বোঝা ফুলের পাঁপড়ির চেয়ে বেশি হবে না--- তবে সালমা! তোমাকে আমি শূন্য পরিচয়ে যেতে দিতে পারি না। ফয়সালা এখন তোমার হাতে। তুমি এই সম্মানের অবশ্যই অধিকারী যে, তুমি এক সিপাহসালারের স্ত্রী ছিলে এবং সিপাহসালারের স্ত্রী হয়েই থাকো। আমি তোমাকে সেই মর্যাদা দিতে চাই!'

সালমা মুআন্নার দিকে তাকালেন। কিছু বললেন না। মুআন্নাও সালমার চোখের জিজ্ঞাসা বুঝে ফেললেন। সালমা তার কাছে সাদ (রা) এর সঙ্গে পরিণয়ের এজাযত চাচ্ছিলেন। তখন এই সু প্রথাটা প্রচলিত ছিলো যে, সম্মানিত কেউ মারা গেলে বা কোন সালার শহীদ হয়ে গেলে তার সমমর্যাদার কেউ মৃত বা শহীদের স্ত্রীকে কেবল এজন্য বিয়ে করতো যে, সমাজে যেন এই বিধবার মর্যাদা অক্ষুণ্ন থাকে।

সালমা শুধু সিপাহসালার মুসান্নার স্ত্রীই ছিলো না বরং প্রতিটি ময়দানেই মুসান্নাকে সঙ্গ দিয়েছে। তার মনোবল চাঙ্গা করেছে। তাই সালমার মর্যাদা যেমন ছিলো একজন সিপাহসালারের স্ত্রী হিসাবে তেমনি একজন মুজাহিদা হিসাবেও তার স্থান ছিলো অনেক উঁচুতে।

সালমা সাদ (রা) এর এই প্রস্তাব গ্রহণ করে নেয়। মুআন্নাও স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে এজাযত দিয়ে দেন। কয়েকদিন পর উভয়ের পরিণয় সম্পন্ন হয়। প্রথম সাক্ষাতেই সাদ (রা) মুআন্নাকে তার লশকরের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন।

ঃ 'আমি মুসান্নার একটি ওসিয়ত আপনাকে পৌঁছে দিতে চাই'– মুআন্না বলেছিলেন– 'তিনি একেবারে শেষ মুহূর্তে বলেছিলেন– আমার জায়গায় যিনি সিপাহসালার হয়ে আসবেন তাকে বলে দিয়ো পারসিকরা যখন একাট্টা হয়ে যাবে তখন তাদের সঙ্গে যেন না লড়ে। তাদের ভূ-খণ্ডের ভেতরে গিয়েও লড়াই করা ঠিক হবে না। তাদের সীমান্তবর্তী এলাকায় থেকে তাদের সঙ্গে লড়ে লড়ে তাদেরকে দুর্বল করে দাও। তোমরা যদি তাদের ওপর বিজয়ী হও তবে অগ্রসর হও। না হয় সীমান্তবর্তী এলাকায় ঢুকে পড়ো। আমাদের মরুর পথ সম্পর্কে আরবীরা ও অবগত আজমীরা নয়। তারা তোমাদের পিছু নিলে ক্ষতির সম্মুখীন হবে। তখন তোমরা পাল্টা হামলা করতে পারবে এবং বিজয়ীও হতে পারবে।'

ঃ 'সুবহানাল্লাহ!'– সাদ (রা) মুগ্ধকণ্ঠে বললেন– 'এই কথাগুলোই নসীহতস্বরূপ আমীরুল মুমিনীন আমাকে করেছিলেন---এটাই ছিলো মুসান্নার দূরদর্শী দক্ষতা--- দুশমনের খবর কি?'

ঃ 'যেসব এলাকা আমরা জয় করেছিলাম সেখানকার লোকেরা বিদ্রোহী হয়ে গেছে'– মুআন্না জবাব দিলেন– বিভিন্ন শহর ও এলাকায় আমাদের গভর্নরদের তারা হত্যা করেছে। তারাই শুধু বাঁচতে পেরেছিলো যারা সময়মতো পালাতে পেরেছিলো। এসব এলাকার লোকদের ওপর ভরসা করা যাবে না। আমাদের বিজয় হলে দেখবেন এরা আমাদের সঙ্গে আছে। আমরা পিছু হটলেই তাদের ফৌজের সঙ্গে হাত মেলাতে দেরী করবে না।'

ঃ 'এর অর্থ ওদের মধ্যে দেশপ্রেম আছে–' সাদ (রা) বললেন।

ঃ 'আরে না'– মুসান্না বললেন– 'নির্লজ্জতা আর ধোঁকাবাজিই এদের কাজ। বিপাকে পড়লে নিজেদের ফৌজকেও এরা ধোঁকা দিতে ছাড়ে না।'

ঃ 'তাদের নিজেদের ফৌজকে এরা পছন্দ করে না'– সালমা বললেন– 'কোন গ্রামে যদি এরা ঢুকে পড়ে তবে যুবতী মেয়েদের সম্ভ্রম আর অবশিষ্ট থাকে না। লোকদের ঘরে ঢুকে যেটা পছন্দ হয় সেটা উঠিয়ে নেয়।'

ঃ 'এদের মধ্যে আমাদের ভীতি ছড়ানো অব্যাহত রাখতে হবে'– মুআন্না বললেন– না হয় এরা আমাদের নিয়ন্ত্রণে থাকবে না। আপনি যদি এদের থেকে মনোযোগ হটিয়ে আগে বেড়ে যান, দেখবেন এরা পেছন থেকে আঘাত করছে। আর মাদায়েন থেকে বড়ই ভয়াবহ যুদ্ধপ্রস্তুতির খবর এসেছে'– মুআন্না মাদায়েনের বিস্তারিত খবর শুনালেন।

সাদ (রা) এর এই লশকরের অনেকেই নিজেদের স্ত্রী ও শিশু সন্তানদের সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলো। সালমা ওদের তাঁবুতে ঢুকতেই মহিলারা সবাই ভীড় করে এলো। এদের মধ্যে সাহাবায়ে কেরাম ও কয়েকজন মুজাহিদের স্ত্রী আগেও রণাঙ্গনে এসেছিলো। কয়েকজন যুবতী মেয়েও ছিলো যারা এই প্রথমবার রণাঙ্গনে যাচ্ছিলো। মধ্যবয়স্কাও কিছু মহিলা ছিলো যাদের প্রথমবারের মধ্যে রণাঙ্গণে যাওয়ার সুযোগ হয়েছিলো।

মহিলারা সবাই সালমাকে সান্ত্বনা দিতে লাগলো।

ঃ 'কে বলে মুসান্নার কথা আমাদের মনে পড়ে না'– সালমা সবার উদ্দেশে বললো– 'আল্লাহর কসম! তোমাদের কেউ নিজেদের স্বামী ছাড়া স্বস্তিতে থাকতে পারবে না। কিন্তু মুসলিম নারীর সম্পদ শুধু তার স্বামীই নয়। আমাদের নিজেদের স্বামীদের জন্য নয় ইসলামের জন্য বেঁচে থাকতে হবে। তোমাদের মধ্যে যারা এই প্রথমবার রণাঙ্গনে যাচ্ছো তাদেরকে বলছি তোমাদের কেউ কেউ হয়তো তার স্বামীকে রক্তে গোসলকৃত লাশ দেখবে। নিজের সন্তানের পিতাকে রক্তে ছটফট করতে দেখবে। যারা নিজেদের শিশু-সন্তানকে তাদের পিতার সঙ্গে নিয়ে এসেছো তাদেরকে ইয়াতীম অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। কিন্তু তোমরা যদি মাতম করো তবে ইসলামের বাণী আর কারো মুখে ফিরবে না। কোন মুসলিম মেয়ের শাদী শুধু তার স্বামীর সঙ্গেই হয় না, ইসলামের সঙ্গেও হয়। আমাদের স্বামীদের নয় ইসলামকে বাঁচাতে হবে আমাদের। স্বামী তো পাওয়া যাবে আরো। কিন্তু ইসলাম?'

মহিলারা নিঃশব্দে শুনে যাচ্ছিলো।

ঃ 'লড়াই শুরু হলে তোমাদের কি কি করতে হবে তাও পরে বলে দেবো'– সালমা বলে গেলো।

এর কয়েকদিন পরই কাদিসিয়ার দিকে কোচ করার হুকুম এসে গেলো। উমর (রা) পয়গামে সাদ (রা)কে বলে দিয়েছিলেন– কোচ করার দিন-তারিখ তুমি নিজেই নির্দারণ করবে।

জাহেলীযুগে বিভিন্ন বাণিজ্য সফরে উমর (রা) এসব এলাকায় কয়েকবারই এসেছিলেন। তাই তিনি এসব এলাকার খুঁটিনাটি সম্পর্কে ভালোই জানতেন। তার অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি সাদ (রা) এর কাছে পত্র লিখলেন–

----তোমরা যখন কাদিসিয়ায় পৌঁছবে তখন মনে রেখো কাদিসিয়া পারস্যের দরজা। পারসিকদের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় সবকিছু এই দরজা দিয়েই সারা পারস্যে পৌঁছে। এটাও খেয়াল রেখো এলাকাটি সবুজ-শ্যামল। ছোট-বড় অনেক নদীই এখান দিয়ে বহমান। এসবে পুলও রয়েছে। এটি কাদিসিয়া ও মাদায়েনের সীমান্ত প্রতিরোধের প্রাকৃতিক ব্যবস্থা।

ঃ 'এসব পুল ও রাস্তাগুলো তোমাদের দখলে নিয়ে নেবে। সেখানে অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত ফৌজ মোতায়েন রাখবে। আর পুরো লশকরকে এর পেছনে রাখবে---কাদিসিয়া যাওয়ার সময় আজীবের পথ ধরে যাবে। এই নামে দুটি স্থান রয়েছে। একটা হলো আজীবে ইলহাজানাত আরেকটা হলো আজীবে কাতরুস। এই দুই জায়গার মাঝামাঝিতে তোমরা তাঁবু ফেলবে এবং ডান-বামের বসতিগুলোতে বিচ্ছিন্ন হামলা চালাবে। তবে বসতিগুলোর বেশি ক্ষয়ক্ষতি করবে না। সেখান থেকে রসদ সংগ্রহ করে নেবে। আর গোশতের জন্য গাভী ভেরা-বকরী জমা করে রাখবে। সামনে কি ঘটছে তার খবরাখবর রাখবে।'

শিরাফ থেকে কোচ করে দ্বিতীয় দিন লশকর আজীব পৌঁছলো। এটা ছিলো একটি ফৌজি চৌকি। যা ছোট একটি কেল্লার মতো ছিলো। এর ফটক খোলা ছিলো। লশকর কিছুটা দূরে ছিলো তখনো। কোথা থেকে যেন একটি লোক উদয় হলো। এবং দৌড়ে খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লো। কেল্লার কয়েকটি বুরুজ ছিলো। লোকটিকে প্রথম একটি বুরুজে দেখা গেলো। সেখান থেকে সে মুসলিম লশকরকে দেখতে লাগলো। তারপর সেখান থেকে সরে গিয়ে আরেকটি বুরুজে গিয়ে একই কাণ্ড করলো। এমন করে বুরুজগুলোতে লুকোচুরি খেলে হঠাৎ সে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

ঃ 'দ্রুত এগোও'– সাদ (রা) বললেন– 'লোকটি লশকরের সংখ্যা গুনে দেখার চেষ্টা করেছে।' সে কোন সিপাহী হবে। একে যেতে দিয়ো না।'

পদাতিক বাহিনীর একটি দল ভেতরে ঢুকে গেলো। তিন চারটি কামরাই ছিলো ভেতরে। আর চারদিকে বিশাল উঠোন। কামরাগুলোর বাইরে এবং ভেতরে কাউকে পাওয়া গেলো না। পাঁচ ছয়জন সৈন্য আগেই ছাদে উঠে গিয়েছিলো। সেখান থেকে একজন চিৎকার করে বললো– ঐ যে এক লোক কাদিসিয়ার দিকে দৌড়ে পালাচ্ছে।

সাদ (রা) এর কাছে তখন যুহরা বিন জুওয়াইয়া ছিলো, তাকে তিনি লোকটিকে ধরে আনতে বললেন।

যুহরা ঘোড়া ছুটিয়ে দিলো। কিন্তু এলাকাটি নানান টিলা আর ঝোপঝাড়ে ভর্তি ছিলো। এই ঘন ঝোপঝাড় থেকে কাউকে খুঁজে পাওয়া প্রায় অকল্পনীয়। যুহরা ফিরে এলো।

কেল্লার ভেতর থেকে মুসলিম ফৌজ তীর-ধনুক বর্শা এবং তরবারির বিরাট এক ভাণ্ডার আবিষ্কার করলো। সামুদ্রিক মাছের চামড়া দিয়ে তৈরি অসংখ্য মূল্যবান পাত্রও পাওয়া গেলো। এটা পারসিকদের একটা অস্ত্র ভাণ্ডার ছিল। সম্ভবত এটা এজন্য বানানো হয়েছিলো যে, এ এলাকায় কোন যুদ্ধ হলে এবং হাতিয়ারের ঘাটতি পড়লে তা যেন এখান থেকে পূরণ করা যায়।

সাদ (রা) লশকরকে সেখানেই তাঁবু ফেলার নির্দেশ দিলেন এবং সব সালারকে ডেকে পাঠালেন।

ঃ 'বন্ধুরা আমার!'– সাদ (রা) বললেন– 'আজ থেকে আমাদের অভিযান শুরু হয়ে গেছে। আগেই তোমাদেরকে বলেছিলাম এসব এলাকার লোকদের কোন বিশ্বাস নেই।

ধোঁকাবাজি এদের স্বভাবের বৈশিষ্ট্য। আমাদের সঙ্গে বিদ্রোহ করে তাদের ফৌজে ভর্তি হচ্ছে, তারা যখন আমাদের পক্ষে ছিলো তখন নিজেদের হুকুমতেরই বিরোধী হয়ে গিয়েছিলো তারা। পরে তারা আমাদের গভর্ণরদের হত্যা করে আমাদের কব্জাকৃত এলাকা ছিনিয়ে নিয়েছে। মুসান্না পারসিকদের যত ফৌজ লাশ বানিয়ে শিয়াল কুকুরকে খাইয়েছিলেন এর চেয়ে দ্বিগুণ ফৌজ প্রস্তুতের জন্য তাদের ভাই-বেটাদের মাদায়েন পাঠিয়ে দিয়েছে।'

ঃ 'ওদের দেমাগ ঠিক করতে হবে। আমীরুল মুমিনীন নির্দেশ পাঠিয়েছেন আশে পাশের শহর ও উপশহরগুলোতে হামলা করে লোকদের ওপর আমাদের ভয় তাজা করে তুলতে। তাহলে আর তারা গাদ্দারী করার সাহস করবে না--- আমার বন্ধুরা! ওদের ওপর এসব ছোট খাটো হামলার অর্থ এই নয় যে, ওদের ওপর জোরজবরদস্তি বা জুলুম করা হবে এবং নারীদের উঠিয়ে আনা হবে। ইসলাম এর এজাযত দেয় না। কোন শিশু-নারী ও বৃদ্ধের ওপর হাত উঠানো যাবে না। কেউ মোকাবেলা করতে এলেই কেবল তাকে শায়েস্তা করা হবে এবং তার ঘরের মূল্যবান জিনিসগুলো উঠিয়ে নেয়া হবে। বেপরোয়া লুটপাটের পরিস্থিতি সৃষ্টি করা যাবে না কখনো---'

ঃ 'এখানে আমরা ওয়াজ নসীহত করতে আসিনি এবং কেউ আমাদের বক্তৃতা শোনার জন্যও বসেনি। এখন বক্তৃতা দেয়ারও সময় নেই। এসব হামলা দ্বারা আমাদের আরেকটি উদ্দেশ্য হলো রসদ সংগ্রহ করা। গরু-ছাগল দুম্বা এবং তরিতরকারি সংগ্রহ করে রাখা। এজন্য ছোট ছোট দল বানিয়ে নাও। আজ রাত থেকেই এটা শুরু হয়ে যাবে।'

আশপাশের এলাকায় অভিযান শুরু হয়ে গেলো। অভিযানগুলো বিচ্ছিন্নভাবে হচ্ছিলো। মুজাহিদদের এক একটি দল এলাকাগুলোতে এমন ভাব নিয়ে ঢুকতো যে, সেখানকার কাউকেই যেন রেহাই দেবে না। বসতির সবাইকে এক সঙ্গে দাঁড় করিয়ে বলা হতো, তাদের অতিরিক্ত খাদ্যদ্রব্য থেকে যা কিছু আছে তা যেন একস্থানে এনে জমা করা হয়। আর বসতির বাইরে কেউ যেন এক কদমও না রাখে। তাহলে তার গর্দান উড়িয়ে দেয়া হবে। লোকেরা তাদের যুবতী মেয়েদের এদিক ওদিক লুকোতে ব্যস্ত হয়ে পড়তো, কিন্তু মুসলিম সৈন্যের কেউ সেদিকে ফিরেও তাকাতো না।

হীরা পারস্যের অন্যতম কেন্দ্রীয় শহর ছিলো। এ শহরটিও মুসলমানদের হাত থেকে চলে যায়। মুসান্না পিছু হটলে পারসিক ফৌজ শহরটি দখল করে নেয়। মজার বিষয় হলো, এলাকার লোকজন তবুও মুসলমানদেরই ওফাদার ছিলো। তারা কোন বিদ্রোহে অংশ নেয়নি। মুসান্না সেখানে অনেক দিন ছিলেন। এ সময়ে মুসলমানদের সহজ ও মার্জিত আচরণ তাদেরকে মুগ্ধ করেছিলো। হুকুমতের লোকেরা যখন ওদের এলাকায় ফিরে এলো তাদেরকে ওরা স্বাগতও জানালো না আবার প্রত্যাখ্যানেরও সাহস পেলো না। শাহী হুকুমত এক প্রকার জোর করেই মিরযবানকে হাকিম করে ওদের অপর চাপিয়ে দিলো।

আফশা নামে মিরযবানের অতি সুন্দরী একটি মেয়ে ছিলো। শাহী খান্দানের অনেক যুবাই ওর মন চেয়ে ব্যর্থ হয়। আফশার নজর গিয়ে পড়ে শাহী দরবারের এক যুবক

গায়কের ওপর। যুবক দেখতে যেমন সুপুরুষ ছিলো ওর ভরাট গানের গলাও হৃদয়ে কাঁপন ধরিয়ে দিতো। আফশা গায়ক যুবককে নিয়ে তার স্বপ্নের রঙ্গীন প্রাসাদ গড়ে তুলে। নির্জন দুপুরে, রাতের চন্দ্রালোকে, মাদায়েনের বিভিন্ন বাগানে ঝর্ণার ধারে ওদের প্রেমের জলসা বসতে থাকে।

কিন্তু শাহী খান্দানের এত বড় রঈস পরিবারের এমন রূপসী মেয়ের সঙ্গে একজন সাধারণ দরবারী গায়কের পরিণয় কখনো সম্ভব ছিলো না। ওরা পালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। গন্তব্য ওদের সিরিয়া। যার অর্ধেকের বেশি মুসলমানরা জয় করে নিয়েছিলো। তখনই আফশার পিতা মিরযবানকে হাকীম করে হীরা পাঠিয়ে দেয়া হয়।

মাদায়েনের শাহী দরবারে যুদ্ধের ডামাডোলের কারণে নাচ-গানের আসর অনেক দিন থেকেই বন্ধ ছিলো। সেই যুবক গায়ক তাই মিরযবান ও আফশার পিছু পিছু হীরাতে গিয়ে উপস্থিত হলো। মাদায়েনের বাইরে নতুন এলাকা ওদের মিলনের জন্য অবাধ সুযোগ করে দিলো।

পারস্যের আরেক শহর 'সিন্নীন' এর হাকিম একদিন হীরাতে গিয়ে উপস্থিত হলো। আফশার ওপর হাকিমের চোখ পড়তেই বুড়ো হাকিমের মনেও যৌবনের বান ডাকলো। আফশার বাপের কাছে হাকিম শাদীর প্রস্তাব করলো। মিরযবান পরম আনন্দে প্রস্তাব লুফে নিলো এবং শাদীর দিন তারিখও ঠিক করে ফেললো।

আফশা মোটেও বিচলিত হলো না। বিয়ের তিন দিন আগে আফশা ঘর থেকে গায়েব হয়ে গেলো। মিরযবান যুবক গায়ককে আগেই সন্দেহ করেছিলো। এক সরাইখানায় সে উঠেছিলো। সেখানে খোঁজ লাগিয়ে তাকেও পাওয়া গেলো না। মিরযবান শহরের চারদিকে ফৌজ লাগিয়ে দিলো। বেশিক্ষণ লাগলো না। একটি ঘন ঝোপের আড়াল থেকে দু'জনকেই পাকড়াও করা হলো। মিরযবানের কাছে দু'জনকে নিয়ে আসলে মিরযবান হুকুম করলো যুবক গায়ককে উপুড় করে তার দু'পা ঘোড়ার পায়ের সঙ্গে বেঁধে তার শরীরের ছাল না ওঠা পর্যন্ত তীব্র বেগে ঘোড়া দৌড়াতে হবে।

হুকুম পালন করা হলো। তাকে উপুড় করে শুয়ে উল্টো দিক থেকে তার পা ঘোড়ার পায়ের সঙ্গে বাঁধা হলো। তারপর এক ফৌজ ঘোড়া ছুটিয়ে দিলো। ঘোড়া ময়দানের চারদিকে পাক খেতে লাগলো। প্রথমে যুবকের কাপড় ছিন্নভিন্ন হলো তারপর তার দেহ রক্তাক্ত হলো। একটু পরেই তার শরীরের দুমড়ানো মুচড়ানো রক্তাক্ত মাংস দেখা যেতে লাগলো। আফশাকে কয়েকজন সিপাহী শক্ত হাতে ধরে রেখেছিলো। তাদের হাত থেকে সে ছুটার ব্যর্থ চেষ্টা করছিলো, আর আফশা আমার আশিক আশিক----বলে বুকফাটা চিৎকার করছিলো।

মুসলিম ফৌজ বিভিন্ন বসতি থেকে তাদের রসদ সংগ্রহ করছিলো। একদিন একদল মুজাহিদ তাদের হাত থেকে ছুটে যাওয়া হীরা উদ্ধার করার জন্য চলছিলো। মাদায়েনে তখনো মুসলমানদের এসব নৈশ হামলা ও রসদ সংগ্রহের খবর পৌঁছেনি। মুজাহিদ দল যখন হীরা ও সিন্নীন এই দুই শহরের মাঝখানে পৌঁছলো তখন বিয়ের শানাই ও মানুষের হল্লা তাদের কানে গেলো।

এলাকাটি বিভিন্ন টিলা ও ঝোপঝাড়ে ভর্তি ছিলো। কয়েকটি গভীর উপত্যকাও ছিলো। এক মুজাহিদ উঁচু একটি টিলার ওপর উঠে দেখতে লাগলো। বিরাট এক শোভাযাত্রা আসছিলো। সঙ্গে দুই তিনশ ফৌজী ঘোড় সওয়ার ছিলো। কয়েকটি ঘোড়ার সজ্জিত গাড়িও ছিলো। বিভিন্ন বাদকের দল পায়ে হেঁটে আসছিলো। সেই মুজাহিদ টিলা থেকে নেমে এলো। সে যা দেখেছে সঙ্গীদেরকে বললো। দলের কমাণ্ডার আরেকবার টিলার ওপর ঘুরে দেখে এলো। কমাণ্ডার বললো, সঙ্গে যেহেতু ফৌজ আছে তাহলে নিশ্চয় এটা নিছকই কোন বিয়ের শোভাযাত্রা নয়। এর ওপর হামলা করতে হবে। কমাণ্ডার তার দলকে এমন এক জায়গায় লুকালো যে, সেখানে কোন প্রাণের অস্তিত্ব আছে কিনা তাও কেউ সন্দেহ করবে না।

শোভাযাত্রা সেখানে আসতেই মুজাহিদ দল হামলে পড়লো। ঘোড়সওয়ারা তরবারি ও বর্শার দ্বারা সুসজ্জিত ছিলো। তারা মোবাবেলার চেষ্টা করলো। কিন্তু এমন অতর্কিত হামলায় তারা সামলে উঠতে পারলো না। মুজাহিদরা সংখ্যায় কম থাকলেও কাফেলার লোকেরা এতই সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লো যে, কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা পালানোর পথ খোঁজাটা যুক্তিযুক্ত মনে করলো। কয়েকজন ঘোড় সওয়ার যখমী হলো আর সবাই পালিয়ে গেলো।

ঘোড়ার গাড়ির চালকরা প্রথম সুযোগেই পালিয়ে ছিলো। গাড়িটি শাহী সাজে এবং রেশমী পর্দায় সজ্জিত ছিলো। সেগুলোর পর্দা সরিয়ে দেখা হলো। প্রথম গাড়িতে বধূ সাজে অপরূপ আফশা বসেছিলো। তার সঙ্গের দু'জন সখি ভয়ে থর থর করে কাঁপছিলো।

ঃ 'এ তো দুলহান'— এক সখি কোনক্রমে আফশার দিকে ইংগিত করে বললো— 'এ হীরা এর হাকিম মিরযবানের কন্যা। আজই ওর শাদী হয়েছে। ওর বর সিন্নীর হাকিম। এটা ওর বরযাত্রা। তিনি ঘোড়ায় সওয়ার ছিলেন'।

ঃ সে কোথায়? আফশা আশ্চর্য আনন্দিত গলায় জিজ্ঞেস করলো— 'আমার বর?'

ওর নতুন বর জমে লড়ার চেষ্টা করে মারা গিয়েছিলো। আফশাকে এ কথা বলতেই তার চেহারা আনন্দে ভরে গেলো।

ঃ 'আমি বলেছিলাম ওর সঙ্গে আমার বিয়ে হতে পারে না। তাই আকাশের দেবতা ওদের পাঠিয়ে দিয়েছেন'— আফশা আশ্বস্ত গলায় বললো— 'আচ্ছা আমাদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করা হবে?'

ঃ 'এটা তাকে জিজ্ঞেস করে দেখো যার সঙ্গে তোমার শাদী হবে'— মুজাহিদ কমাণ্ডার বললো— 'বিয়ে ছাড়া তোমার এবং এসব মেয়েদের কারো গায়ে কেউ স্পর্শ করবে না। তোমাদের সঙ্গে এমন আচরণ করা হবে না যা তোমাদের ফৌজ তাদের অসহায় নারীদের সঙ্গে করে থাকে।'

আফশা পরম নিশ্চিন্ত বোধ করলো।

এই হামলায় মুজাহিদ দল কাফেলা থেকে খাঁটি সোনার অলংকার ও অসংখ্য হীরার আংটি পেয়েছিলো। কয়েকটি ঘোড়াসমেত ঘোড়ার গাড়িও পেয়েছিলো।

আফশা ও তার সঙ্গের মেয়েদের নিয়ে মুজাহিদরা ফিরে এলো এবং ওদেরকে মেয়েদের তাঁবুতে নিয়ে গেলো। মুজাহিদদের স্ত্রীরা ওদেরকে স্বাগত জানালো। আফশা

তার পূর্ব প্রেমের ঘটনা ও তার বাবা মিরযানের নিষ্ঠুরতার ঘটনাসহ সব কিছু মুসলিম মেয়েদের শোনালো। ওরা তাকে নিশ্চয়তা দিলো যে, তার পছন্দের সম্ভ্রান্ত কোন মুসলিম যুবকের সঙ্গে তার বিয়ে হবে। ওদের ব্যবহারে আফশা দিন দিন মুসলমানদের প্রতি আকৃষ্ট হতে লাগলো। একদিন আফশা নিজেই সালমার হাতে ইসলাম গ্রহণ করলো।

এমন কোন বসতি নেই যেখান থেকে মুসলমানরা রসদ সংগ্রহ করেনি। পারসিকরা বুঝতে পারছিলো মানসিকভাবে ওদেরকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। পারসিকদের হাজার হাজার ফৌজ সেসব এলাকায় মোতায়েন ছিলো। কিন্তু কোথায় তারা। মুসলমানরা সবখানে অবাধে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সাধারণ লোকদের মনেও এই চিন্তা ঢুকে গিয়েছিলো যে, ওদের ফৌজ কি কিছুই করতে পারবে না। ওরা ওদের ফৌজের চেয়ে মুসলিম ফৌজকেই উপযুক্ত মনে করছিলো। যারা না শরাব পান করে না তাদের বধূ কন্যাদের দিকে চোখ তুলে তাকায়।

মুসলমানরা পারসিকদের অধিকাংশ বসতিতে গিয়েই দেখেছে তারা নিজেদের সৈন্য দ্বারাই আক্রান্ত। মুজাহিদদের একেবারে ছোট একটি দল দূরের এক এলাকায় যাচ্ছিলো। পথে ক্লান্ত হয়ে যাওয়াতে একটি জংলী বাশঝারের ঝোপের আড়ালে তারা বিশ্রাম নিচ্ছিলো। পাশের বসতি থেকে অল্প বয়স্কা কয়েকজন মেয়ে এদিকেই দৌড়ে আসছিলো। মুসলমানদের উপস্থিতি সম্পর্কে ওদের জানা ছিলো না। ঝোপের আড়ালে মুজাহিদরা নরম ঘাসের ওপর গা এলিয়ে দিলো। মেয়ে কয়টি তাদের মাঝখানে এসে পড়লো। মুজাহিদরা ধড়মড় করে উঠে বসলো। মেয়ে কয়টিও ভূত দেখার মতো বিষম খেলো।

ঃ 'আমরা ইজ্জত বাঁচাতে পালাচ্ছিলাম'– এক মহিলা কম্পিত গলায় কৈফিয়ত দিলো– 'আমাদের ফৌজের প্রায় পঞ্চাশজন লোক আমাদের বসতিতে ঢুকে পড়েছে। ঘরে ঘরে গিয়ে মদ আর খাবার চাচ্ছে। এবং মেয়েদের যাকেই পছন্দ হচ্ছে তাকে নিয়েই কোন ঘরের দরজা বন্ধ করে দিচ্ছে। আর ভেতর থেকে আর্তচিৎকার ভেসে আসছে। আমরা যেন ওদের কেনা বাঁদী। যখন ইচ্ছা তখন আমাদের ছিঁড়ে খাবে।'

মুজাহিদরা ওদের ফৌজের তুলনায় সংখ্যায় অনেক কম ছিলো। তবুও মেয়ে কয়টির সঙ্গে ওদের বসতিতে চলে গেলো। পারসিক ফৌজ মদের নেশায় উন্মাদ হয়ে সারা বসতিতে হাঙ্গামা করে চলছিলো। বিভিন্ন ঘর থেকে যুবতী মেয়েদের চিৎকার আর ফুপানির শব্দ ভেসে আসছিলো। বসতির পুরুষরা ঘরের দরজা বন্ধ করে ওদের সূর্য দেবতাকে ডাকছিলো। কিছু যুবতী তখনো এদিক ওদিক পালাতে গিয়ে ওদের ফৌজের থাবায় গিয়ে পড়ছিলো। মুজাহিদরা একটি ফৌজকেও জীবিত ছাড়লো না। সবকিছু স্তিমিত হয়ে এলে বসতির লোকেরা মুজাহিদদের সামনে নানান খাদ্যদ্রব্যের বিরাট স্তূপ সাজিয়ে দিলো। মুজাহিদরা চলে যাওয়ার সময় বসতির সবার চোখ টলমল করছিলো।

ইয়াযদগিরদ মাদায়েনেই ছিলো। তাকে জানানো হলো কয়েকজন লোক ফরিয়াদী হয়ে এসেছে। ইয়াযদগিরদ বাইরে এসে দেখলো, বিশ পঁচিশজন অভিজাত শ্রেণীর লোক দাঁড়িয়ে আছে। সবাই তাদের সম্রাটের সামনে রুকূর মতো ঝুঁকে পড়লো।

ঃ 'সোজা হয়ে যাও এবং যা বলার বলে ফেলো'– ইয়াযদগিরদ বললো– 'কি ফরিয়াদ নিয়ে এসেছো?'

ঃ 'শাহেনশাহে ফারেস'– ওদের মধ্যে একজন বাদশাহর আদব পালন করতে গিয়ে মাথা নুইয়ে বললো– 'কিসরার স্বর্ণকান্তি বংশধররা সুমহান। সূর্যের পুত্ররা----'

ঃ 'আহা! যা বলতে এসেছো তা বলছো না কেন?'– ইয়াযদগিরদ বিরক্ত হয়ে বললো– 'এখানে কোন শাহেনশাহ নেই। সময় নষ্ট করো না।'

ঃ 'তাহলে শুনুন শাহযাদা ইয়াযদগিরদ!'– এক প্রৌঢ় আমীর বললো– 'মুসলমানরা আমাদের ঘর খালি করে দিয়েছে। মনে হচ্ছে পারস্য আমাদের দেশ নয়, মুসলমানদের দেশ। অথচ আমাদের ফৌজের টিকিও খুঁজে পাওয়া যায় না। যাই কিছু পাওয়া যায় বা দেখা যায়, ওরা আমাদের লোকদেরই পেরেশান করছে।

ইয়াযদগিরদ ওদেরকে এর প্রতিকারের ব্যবস্থা করার আশ্বাস দিয়ে বিদায় করে দিলো। মহলে এসে বিশ্রাম করছিলো। তাকে জানানো হলো হীরার হাকিম মিরযবান এসেছে। ইয়াযদগিরদ তাকে ভেতরে আসতে বললো।

ঃ 'তোমার চেহারা বলছে কোন ভালো খবর আনোনি তুমি'– ইয়াযদগিরদ বললো।

ঃ 'এই চেহারা আর কাউকে দেখানো যাবে না বাদশাহ ফারেস!'– মিরযবান বললো– 'আরবরা আমার একমাত্র মেয়েকে উঠিয়ে নিয়ে গেছে। ওর বিয়ের লক্ষ লক্ষ টাকার উপহারগুলোও নিয়ে গেছে। বরযাত্রীর সঙ্গে আভিজাত ঘরের ত্রিশজন মেয়ে ছিলো। ওদেরকেও নিয়ে গেছে। আমি যাকে জামাই করেছিলাম তাকে তো মেরেই ফেলেছে----বাদশাহ ফারেস!'

ইয়াযদগিরদ আর কিছু শুনতে চাইলো না, রাগে ক্রোধে লাল হয়ে উঠলো। লম্বা লম্বা পা ফেলে ঘরের চারদিকে কিছুক্ষণ পায়চারী করলো। তারপর মিরযবানের দিকে ফিরলো।

ঃ 'তুমি হীরাতে ফিরে যাও। আমি আরবের সব যুবতীকে তোমার হাতে উঠিয়ে দেবো।' ----রুস্তমকে ডেকে আনো----কে আছো?'

মিরযবান চলে গেলো।

সবার নজর ছিলো রুস্তমের ওপর। ইয়াযদগিরদ থেকে নিয়ে একজন সাধারণ ফারসীও একথাই বলতো যে, রুস্তমই মুসলমানদেরকে পারস্য থেকে তাড়াতে পারবে। রুস্তমই আরবে হামলা করে ইসলামকে খতম করতে পারবে।

কিন্তু রুস্তমের নজর ছিলো তার জ্যোতিষবিদ্যার গণনার ওপর।

রুস্তমের কাছে তখন তার স্ত্রী ও পুরানদখত বসা ছিলো। রুস্তম তার গণকবিদ্যার ফলাফল তাদেরকে জানাচ্ছিলো যে, পারস্যের পরিণাম ভালো হবে না।

ঃ 'তুমি কি নিশ্চিত যে, তোমার এই গণনা সঠিক?'– পুরানদখত জিজ্ঞেস করলো।

ঃ 'যদি তোমার এই গণনা সঠিক হয়'– রুস্তমের স্ত্রী বললো– 'তাহলে কি এর ফলাফল পাল্টে দেয়ার কোন ব্যবস্থা নেই?.... পুরোহিত আছে। জাদুকর আছে'

ঃ 'না'- রুস্তম বললো– 'এটা নক্ষত্র পরিক্রমার ফল। আমি তো নক্ষত্রের কক্ষপথ পাল্টে দিতে পারি না। আকাশের কোন কক্ষপথ তো আমার হাতে নেই যে, আমি আমার পছন্দমত কোন কক্ষপথে নক্ষত্রের পথ নির্ধারণ করে দেবো--হ্যাঁ পুরান! আমার গণনা

একেবারেই নির্ভুল। তুমি যখন পারস্যের মসনদে বসেছিলে তখনো আমি গণনা করে এই পরিণামের কথা বলেছিলাম।'

এমন সময় কাসেদ এসে বললো শাহেনশাহে ফারেস রুস্তমকে ডাকছেন।

ঃ 'এখনই আসছি'– রুস্তম কাসেদকে বিদায় করে দিয়ে তার স্ত্রী ও পুরানকে বললো– 'আমি জানি ইয়াযদগিরদ আমাকে কেন তলব করেছে। আমি খবর পেয়েছি, আরবরা আমাদের বসতিগুলোতে হানা দিয়ে বড় ধরনের রসদ সংগ্রহ করছে। আমি এটাও জানি আরবীদের সঙ্গে আমাদের পরের যুদ্ধ হবে কাদিসিয়ার ময়দানে। এটা হবে অত্যন্ত ভয়াবহ যুদ্ধ। আরবীদের সংখ্যা খুব বেশি হলে ত্রিশ কি চল্লিশ হাজার হবে। আর আমাদের ফৌজ হবে সোয়া লাখেরও বেশি। কিন্তু ---- কিন্তু--- সামনে শুধু অন্ধকার'–

ঃ 'তবে কি ইয়াযদগিরদকে বুঝিয়ে বলবো'–

ঃ 'না'– রুস্তম পুরানকে বাঁধা দিয়ে বললো– 'তাকে বললেও মনে করবে আমি বুঝি লড়াই এড়িয়ে যেতে চাচ্ছি। আমি শুধু এতটুকু পারি যে, পারস্যের এই পরিণাম কিছু দিন ঠেকিয়ে রাখা। ইয়াযদগিরদকে আমি বলবো আমাকে মাদায়েন থাকতে দিন। এখানে থেকে আমাদের ফৌজ লড়িয়ে যাবো এবং সেনা সাহায্য পাঠাবো----আমার আরেকটি পেরেশানী আছে। আমি চাই না পারস্যের পরাজয়ে আমার নাম লেখা হোক। আজ পর্যন্ত আমি কোন ময়দানে পরাজিত হয়নি। আমি পরাজিত করেছি। জয় আমার পায়ে চুমু খেয়েছে। আমার নামটাই বিজয়ের প্রতীক ছিলো এতদিন। আমি কিভাবে সহ্য করবো এমন একটি লজ্জাজনক পরাজয় আমার খ্যাতিকে কলংকিত করবে!'

রুস্তম নিজেই তো যুদ্ধ ঠেকিয়ে রাখতে চাচ্ছিলো। তারপর আবার সে কিসরা পারভেজের প্রেমাস্পদ স্ত্রী শিরীর কাছে ওয়াদা করেছিলো যেভাবেই হোক সে যুদ্ধ এড়িয়ে তার কাছে পৌঁছবেই।

ঃ 'আচ্ছা এতে কি কোন সন্দেহ আছে যে, আজমের সবচেয়ে বড় যোদ্ধা– জেনারেল আপনিই'– ইয়াযদগিরদ রুস্তমকে বললো–'আরবের এই দস্যুদের এই দেশ থেকে কেবল আপনিই ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দিতে পারেন। শুধু তাই নয়, ওদের এক একটি সিপাহী এক একটি সালারকে কেটে কুচি কুচি করতে পারেন। কিন্তু আমি হয়রান হচ্ছি সমস্ত ফৌজের প্রধান সেনাপতি আপনি অথচ সারা দেশে কি হচ্ছে তা দেখছেন না। ফৌজ তৈরি হয়ে গেছে অনেক আগেই। আপনি শিগগির মুসলমানদের খতম করার অভিযানে বেরিয়ে পড় ন----আমার বিশ্বাস--- মদীনাও আপনি শিগগির জয় করে ফিরবেন।'

ঃ 'শাহেনশাহে ফারেস!'– রুস্তম বললো–

ঃ 'না রুস্তম'– ইয়াযদগিরদ বললো– 'আমি আপনার ছেলের মতো। আপনি আমাকে পারস্যের শাহেনশাহ বানিয়েছেন। আপনি আমাকে এখন শাহেনশাহে ফারেস বলবেন না। আগে এই বিপদ দূর করুন যা মাদায়েন পৌঁছেছে।'

ঃ 'আপনার নিজেকে যদি সন্তান এবং আমাকে পিতৃতুল্য মনে করে থাকেন তাহলে আমার কথা একটু মন দিয়ে শুনুন'– রুস্তম বললো–'আমাকে মাদায়েন থাকতে দিন। আমি কাসেদের মাধ্যমে রণাঙ্গনের নিয়ন্ত্রণ আমার হাতেই রাখবো। আমার হাতেই ফৌজ বন্টন করবো।'

ঃ 'কিন্তু এর নিশ্চয় কোন কারণ বলবেন'– ইয়াযদগিরদ বললো।

ঃ 'পারস্যের কল্যাণ হয়তো এর মধ্যেই আছে যে আমি মাদায়েনে থাকবো'– রুস্তম বললো– 'চূড়ান্ত যুদ্ধ আমি একটু বিলম্বে শুরু করতে চাই। মাদায়েন থেকে আমি বিচ্ছিন্ন বাহিনী পাঠাতে থাকবো। যারা আরবদেরকে ছোট ছোট লড়াইয়ে লিপ্ত রাখবে। আরবরা ওদের দেশ থেকে অনেক দূরে রয়েছে। তারা কোন সাহায্য ও রসদ পাবে না। আস্তে আস্তে তারা দুর্বল হয়ে যাবে। আর যে পর্যন্ত আমি নিজে ময়দানে না যাবো আরবদের ওপর আমার ভয় অটুট থাকবে।'

ইয়াযদগিরদ রুস্তমের এই যুক্তি মেনে নিলো এবং রুস্তমও নিশ্চিন্ত মনে ফিরে গেলো।

কিন্তু মাদায়েনে একের পর এক ফরিয়াদীর দল এই অভিযোগ নিয়ে আসতে লাগলো যে, মুসলমানরা আগের চেয়ে অনেক বেশি লুটপাট করছে এখন।

কয়েকদিন পর ইয়াযদগিরদ রুস্তমকে আবার ডেকে বললো, সে যেন ফৌজ নিয়ে মাদায়েন থেকে বের হয়ে যায় এবং মুসলমানদের খতম করে দেয়।

ঃ 'আমাকে মাদায়েন থাকতে দিন'– রস্তম বললো– 'জালিয়ুনুসকে পাঠিয়ে দিন। জালিয়ুনুস যদি মুসলমানদের শায়েস্তা করতে পারে তবে তো বিপদ কেটে গেলো। আর জালিয়ুনুস ব্যর্থ হলে দ্বিতীয় আরেকজনকে পাঠাবো। তারপর তৃতীয় আরেক জেনারেলকে পাঠাবো। এভাবে আমরা দুশমনকে কমজোর করতে থাকবো।'

ইয়াযদগিরদ এই যুক্তিও মেনে নিলো এবং জানিয়ুনুসকে ডেকে বললো, সে যেন কিছু বাহিনী নিয়ে গিয়ে মুসলমানদের খতম করে দিয়ে আসে। জালিয়ুনুস ইয়াযদগিরদকে বললো, সে মুসলমানদের বিরুদ্ধে আগেও লড়েছে। ওদেরকে এভাবে খতম করা মুশকিলের ব্যাপার।

ঃ 'আমাদের ফৌজ প্রস্তুত রয়েছে'– জালিয়ুনুস বললো–'এটাই আমাদের শেষ লড়াই হওয়া উচিত। আমাদের এত ফৌজ রয়েছে যে, মুসলমানরা এতসংখ্যক ফৌজের কথা কল্পনাতেও আনতে পারবে না--- তাই রুস্তমকে সব দায়িত্ব দিয়ে ময়দানে পাঠানো উচিত।'

ইয়াযদগিরদ ছিলো আবেগপ্রবণ যুবক। রুস্তম আর জালিয়ুনুসের মতো ঘাগু জেনারেলের চাল বোঝার মতো মাথা তখনো তার হয়নি। জালিয়ুনুস আগেও একবার মুসলমানদের হাতে মার খেয়ে ময়দান থেকে পালিয়েছিলো। সে এখন এমন ভয়াবহ ও বিপজ্জনক দায়িত্ব নিতে ভয় পাচ্ছিলো।

ইয়াযদগিরদ দুইদিন কোন ফয়সালা করতে পারলো না। তৃতীয় দিন তার কাছে বিভিন্ন এলাকার জায়গীরদার ও এমন সম্ভ্রান্ত লোকের এক বিরাট প্রতিনিধি দল আসলো পারস্যে যাদের প্রভাব রয়েছে, যাদের ইশারায় অনেকে প্রাণবাজি রাখতেও প্রস্তুত হয়ে যায়।

ঃ 'শাহেনশাহে ফারেস!'– প্রতিনিধি দলের প্রধান বললো– 'আপনি নিশ্চয় ভুলে যাননি যে, পুরান দখতকে উঠিয়ে আমরা আপনাকে কেন বসিয়েছিলাম। আমাদের জেনারেলদের বলেছিলাম আপনাদের পারস্পরিক বিবাদ খতম করে পারস্যকে মুসলমানদের হাত থেকে বাঁচান। না হয় আমরা আপনাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবো। আপনি তো জানেন সারা ইরাকে মুসলমানরা ছড়িয়ে পড়েছে। যা ইচ্ছা তাই করে বেড়াচ্ছে, এটা তো হতে পারে না যে আপনি জানেন না। আমরা কি করে মেনে নেবো যে, আমাদের দেশের গর্ব– জেনারেল রুস্তম এসব জানেন না। আমরা হয়রান হচ্ছি, আপনার ও আপনার জেনারেলদের আত্মসম্মানবোধ কোথায় চলে গেছে?'

ঃ 'তোমরা চিন্তা করো না'– ইয়াযদগিরদ বললো।

ঃ 'কেন চিন্তা করবো না আমরা!'– আরেকজন বলে উঠলো– 'আমরা আজ আপনাকে একথা বলতে এসেছি যে, দু'একদিনের মধ্যে কিছু না করা হলে মুসলমানদের আনুগত্য আমরা কবুল করে নেবো। মুসলমানদেরকে আমরা আগেও দেখেছি। আপনার বাদশাহীর চেয়ে মুসলমানদের হুকুমত অনেক ভালো, আমাদেরকে তারা ইয্যত দিয়েছিলো। আমাদের স্ত্রী-কন্যাদের ইয্যত দিয়েছিলো। আমাদের জান মালের নিরাপত্তা দিয়েছিলো।

ঃ 'আপনার এটাও জেনে রাখা উচিত'– আরেকজন বললো– 'জনগণ আমাদের হাতে রয়েছে। আমরা ওদেরকে যে দিকে ইচ্ছে নিয়ে যেতে পারবো।'

ঃ 'থামো থামো'–ইয়াযদগিরদ ছটফট করে বললো– 'তোমরা এখন চলে যাও। জিজ্ঞেস করো না কেন এতক্ষণ নীরব ছিলাম। আজ আমি আবার ফৌজ ময়দানে নিয়ে গিয়ে ঐসব লুটেরা আরবদের লাশ বানানোর হুকুম দেবো।'– ইয়াযদগিরদ তালি বাজালো। দারোওয়ান এসে কুর্নিশ করে দাঁড়ালো– 'রুস্তমকে এখনই আসতে বলে---- তোমরা যেতে পারো।'

এ ছিলো সেই শাহেনশাহ যার প্রজারা বাদশাহকে দেখে সিজদায় ঝুঁকে পড়তো। যতবড় মর্যাদা আর খ্যাতির অধিকারী হোক না কেন শাহী দরবারে গেলে তাকে সিজদায় লুটিয়ে পড়তে হতো। আজ মুসলমানরা এই শাহেনশাহকে এই অবস্থায় নিয়ে পৌঁছেছে যে, প্রজারা দরবারে এসে বাদশাহকে ধমক দিয়ে যাচ্ছে আর বাদশাহ তাদের সামনে মাথা উঠাতে পারছে না।

রুস্তম এসে গেলো। রুস্তমকে দেখতেই ইয়াযদগিরদ রাগে ফেটে পড়লো।

ঃ 'এখন আমি কিছুই শুনবো না'– ইয়াযদগিরদ বললো– 'আপনি ফৌজ নিয়ে এক্ষুণি মাদায়েন থেকে বের হবেন। আপনি যদি অজুহাত দেখান আমি নিজে ফৌজ নিয়ে বেরিয়ে যাবো। আমি শুধু এই আরবী মুসলমানদেরকেই নয় পুরো আরবকে ধ্বংস করে দেবো। এত ফৌজ, এত ঘোড়া, সেরা হাতিয়ার, হাতিবহর----আমাদের সামনে মুসলমানরা কি----কীটপতঙ্গ নয়?---- এটা আমার নির্দেশ ফৌজ নিয়ে মাদায়েন থেকে বেরিয়ে যান।'

রুস্তম কিছু বললো না। বেরিয়ে গেলো। কিছুক্ষণ পর বিশাল এক ফৌজ নিয়ে সিবাত রওয়ানা হয়ে গেলো।

সিবাত মাদায়েন থেকে সামান্য দূরের এক শহর ছিলো। রুস্তম সিবাত পৌঁছে গেলো। কিন্তু ফৌজকে দলে দলে ভাগ করে বিভিন্ন এলাকায় না পাঠিয়ে তার বাহিনীর অফিসারদের আরাম করতে বললো।

এক গুপ্তচর সাদ (রা)কে সংবাদ দিলো, রুস্তম বিরাট এক ফৌজ নিয়ে সিবাত পৌঁছে গেছে। খলীফা উমর (রা) বলে দিয়েছিলেন, ছোটবড় যে কোন ব্যাপারই পয়গামের মাধ্যমে তাকে জানাতে হবে। সাদ (রা) তখনই পয়গাম লিখিয়ে মদীনায় রওয়ানা করিয়ে দিলেন। দূরত্ব তো অনেক ছিলো। কিন্তু সংবাদ পৌঁছানোর মাধ্যম এত তৎপর রাখা হয়েছিলো যে, পয়গাম মাসের জায়গায় দিনে দিনে পৌঁছে যেতো।

আমীরুল মুমিনীনের কাছে পয়গাম পৌঁছতেই তিনি জবাব লিখে পাঠালেন-

ঃ 'বিস্তারিত কথা পরের চিঠিতে জানাবো। তোমরা এখন দুটি কাজ করো। প্রথমে তোমরা কোচ করে কাদিসিয়ায় গিয়ে ছাউনি ফেলো। লড়াইয়ের জন্য জায়গাটি বেশ উপযোগী। তারপর ইয়াযদগিরদকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানাও। মনে রেখো যারা মাদায়েন যাবে তারা যেন তোমারই নির্বাচিত সম্ভ্রান্ত ও বিচক্ষণ লোক হয়। যে জবাব আসবে তা লিখে পাঠিয়ো।'

সাদ (রা) পয়গাম পেয়েই ইয়াযদগিরদের কাছে পাঠানোর জন্য একটি প্রতিনিধিদল তৈরি করলেন। আতা বিন হাজিব, আশআস ইবনে কায়েস, হারিস ইবনে হাসসান, আসেম ইবনে আমর, আমর বিন মাদী কারাব, মুগীরাহ ইবনে শুবা (রা), মুসান্না ইবনে হারিসা, নুমান ইবনে মিকারন, বিশির ইবনে আবী ওয়াহশ, মুগীরা ইবনে যাররাহ প্রমুখ বিখ্যাত লোক এই প্রতিনিধি দলে ছিলেন।

এই প্রতিনিধি দল মাদায়েন গিয়ে পৌঁছলো। ইয়াযদগিরদ তাদেরকে ডেকে পাঠালো। তাদের সবার গায়ে আরবী জুব্বা ছিলো, প্রত্যেকের কাঁধে ছিলো ইয়ামানী চাদর আর হাতে ছিলো একটি করে ছড়ি। ইয়াযদগিরদ তাদেরকে দেখতেই তার ঠোঁটে বিদ্রূপের হাসি খেলে গেলো। তার দরবারীদের বললো-

ঃ 'এরাই মুসলমান?'-দেখো তাদের পোষাকের কি ছিরি। এরা কি এই ছড়ি দিয়েই লড়াই করবে?'

ঃ 'আমাদের দেশে তোমরা কখন এসেছো?'- ইয়াযদগিরদ উদ্ধত ও রাজকীয় গলায় জিজ্ঞেস করলো- 'তোমরা কি ভেবেছো আমাদের ওপর এত সহজে বিজয় অর্জন করবে?'

ঃ 'হে পারস্যের বাদশাহ!'- নুমান ইবনে মিকারন বলিষ্ঠ গলায় বললেন- 'শাহেনশাহী তো শুধু আল্লাহরই। আমরা আপনাকে ইসলামের দাওয়াত দিতে এসেছি'- নুমান ইবনে মিকারন ইসলামের পূর্ণ পরিচয় দিয়ে বললেন- 'আপনি যদি ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান তবে জিযিয়া-কর প্রদানের ব্যাপারটি মেনে নেবেন। এটাও যদি মেনে

না নেন ফয়সালা তলোয়ার করবে। আপনি যদি আল্লাহর দিন কবুল করে থাকেন, আমরা আল্লাহর মহান কুরআন ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস আপনার কাছে রেখে যাবো। তখন আপনার সমস্ত কাজের ফয়সালা এই কুরআন ও হাদীসের বিধান মতে করতে হবে।'

ঃ 'অসভ্য যাযাবরের দল!'- ইযাযদগিরদ ক্রোধ আর ঘৃণার গলায় বললো- 'দুনিয়াতে তোমাদের চেয়ে এমন অসভ্য আর নিকৃষ্ট জাতি আমি দেখিনি। তোমরা কি তখনকার কথা ভুলে গেছো যখন তোমরা অবাধ্য হয়ে মাথাচারা দিলেই সীমান্তবর্তী লোকদেরকে আমরা শায়েস্তা করতে বলে দিতাম- তখন তারা তোমাদেরকে মেরে কেটে তোমাদের মাথা ঠিক করে দিতো। আমাদের ফৌজ কখনো তোমাদের শায়েস্তা করেনি। এজন্য মনে হয় তোমরা বোকার মতো ভাবছো, পারস্য বিজয় করে নেবে। তোমরা যদি এর চেয়ে অনেক বেশি সংখ্যক ফৌজ নিয়েও আসো আমাদের কিছুই করতে পারবে না। আহমকের মতো দাপাদাপি ছেড়ে দাও----হ্যাঁ---তোমাদের দেশে যদি দুর্ভিক্ষ লেগে থাকে বা তোমরা দরিদ্রক্লিষ্ট হয়ে এদিকে এসে থাকো তবে আমরা তোমাদেরকে খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা করবো। যে পর্যন্ত তোমরা চাষাবাদ করতে শিখছো না সে পর্যন্ত আমরা তোমাদের দেশে ফসল ইত্যাদি পাঠাতে থাকবো। তোমাদের সরদারদের মূল্যবান পোষাকাদি পরিধান করাবো, তোমাদের জন্য এমন এক লোককে বাদশাহ বানিয়ে দেবো, যে তোমাদের প্রয়োজনীয় সবকিছুরই ব্যবস্থা করবে এবং তোমাদের সঙ্গে সহানুভূতির আচরণ করবে।'

মুসলিম প্রতিনিধিদল নীরবে সব শুনতে লাগলো। কিন্তু মুগীরা ইবনে শুবা (রা) আর সহ্য করতে পারলেন না। তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন।

ঃ 'আরে বাদশাহ!'- মুগীরা (রা) গর্জন করলেন- 'বাদশাহীর অহমিকা দেমাগ থেকে বের করে নাও। আর দেখে নাও ইনারা সবাই আরবের সরদার ও সম্ভ্রান্ত লোক। সম্মানিত অতিথির সম্মান সেই দিতে জানে যে নিজে সম্মানিত। তাদের কেউ তোমাকে এখনো সব কথা বলেননি। আমার সঙ্গে যা বলার বলো। আমি জবাব দিচ্ছি। তুমি ঠিকই বলেছো' আমরা নিম্নজাতি ছিলাম। হ্যাঁ আমরা নিম্নজাতিই ছিলাম। এখনও হয়তো তাই আছি। কিন্তু ইসলাম আমাদেরকে যে ঐশ্বর্য দিয়েছে তা বোঝার ক্ষমতা তোমার হবে কেন। বোঝার চেষ্টা করো-- শুনে নাও! ইসলাম গ্রহণ করো বা জিযিয়া প্রদান করো। না হয় যুদ্ধের জন্য তৈরি হয়ে যাও। তখন দেখতে পারবে কার অবস্থা নিকৃষ্ট।'

ঃ' যদি দূত আর কাসেদকে হত্যা করা দরবারী নীতির খেলাপ না হতো তোমাদের কাউকে আমি জীবিত ফিরতে দিতাম না'- ইয়াযদগিরদ এবার রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললো- যাও, বেরিয়ে যাও এখান থেকে---না দাঁড়াও। তোমাদেরকে খালি হাতে আমি যেতে দেবো না'- ইয়াযদগিরদ হুকুম দিলো- 'এক টুকরী মাটি নিয়ে আসো। তারপর এদের মধ্যে যে সবচেয়ে বেশি নিজেকে মর্যাদাবান মনে করে তার মাথায় মাটি ভর্তি টুকরী চড়িয়ে দাও। এরপর এদের জন্তুর মতো হাঁকিয়ে মাদায়েন থেকে বের করে দাও'- প্রতিনিধিদলকে সে আবার বললো- 'তোমাদের যে বেকুব সরদার বা সালাররা আছে

তাদেরকে বলে দিয়ো– তোমাদের শায়েস্তা করার জন্য আমি রুস্তমকে পাঠাচ্ছি। কাদিসিয়ার ময়দানে রুস্তম তোমাদেরকে জীবিত দাফন করে আসবে। তারপর রুস্তমকে আরবে পাঠাবো। তখন তোমাদের গোবরে মাথায় এমন হুঁশ আসবে যে, পারস্যের নাম চিরতরে ভুলে যাবে।'

মাটিভর্তি টুকরী দরবারে আনা হলো।

ঃ 'তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত লোক কে?'

আসেম ইবনে আমর এই ভেবে এগিয়ে গেলেন যে, এই বেকুব বাদশাহ মাটিভর্তি টুকরী কোন বুযুর্গ সাহাবীর মাথায়ও রেখে দিতে পারে।

ঃ 'আমি সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি'– আসেম ইবনে আমর বললেন– 'টুকরী আমার মাথায় রাখো।'

মাটির টুকরী আসেমের মাথায় রাখা হলো। সারা দরবার কক্ষ অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো। দরবারীরা হাসতে হাসতে একজনের গায়ে আরেকজন গড়িয়ে পড়তে লাগলো। প্রতিনিধিদল দরবার কক্ষ থেকে বেরিয়ে এলো। সবাই ঘোড়ায় চড়ে বসলো। আসেম ঘোড়ায় চড়ে মাটির টুকরীটি পরমযত্নে তার ঘোড়ার সামনে রেখে মাদায়েন থেকে বেরিয়ে গেলেন।

প্রতিনিধিদল যখন সাদ (রা) এর কাছে পৌঁছলো আসেম মাটির টুকরীটি তার সামনে নামিয়ে রাখলেন। সাদ (রা) বিস্মিত হয়ে তার দিকে তাকাতে লাগলেন।

ঃ 'মুহতারাম সালার।'– আসেম বললেন–'শুভ বিজয়। পারস্যের সম্রাট নিজেই তার দেশের মাটি আমাদেরকে উপহারস্বরূপ দিয়ে দিয়েছেন'।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত

সত্য-সুন্দরের অনুপম আলোকমালার দিকে যারা চিরকাল জ্বালাধরা চোখে তাকিয়েছে, যারা সত্যাশ্রিত শান্তির নির্মল ধারায় আজন্ম বিষ ঢেলে দিয়েছে তারা হলো ইহুদী জাতি।

প্রথম খলিফা আবুবকর (রা)-কে হারিয়ে মুসলিম জাতি যখন দিশেহারা তখনই নতুন রূপে ফিরে এলো সেই ইহুদীরা। এবার তাদের মিশন হলো- এই সুযোগে ইসলামকে ধ্বংসের অতীত ইতিহাসে নিয়ে যেতে হবে এবং এজন্য মুসলিম নেতৃত্বে সুকৌশলে ঢুকিয়ে দিতে হবে অনৈতিকতার বিষবাষ্প। তাই চাই মোক্ষম অস্ত্র নারী ও নারীর রূপের জাদুময়তা। যেই চাওয়া সেই কাজ। মদীনার আনাচে কানাচে ছড়িয়ে দিলো তারা মুসলিম বেশী ইহুদী নারীদের মোহনীয় রূপের অব্যর্থ জাল। যে নেতৃত্বের সুরম্য সৌধতলে মুসলমানরা আজ সমবেত তা কি ধসে যাবে?

এদিকে দ্বিতীয় খলীফা নির্বাচিত হলেন উমর (রা)। নেতৃত্বের কম্পিত সৌধ সিঁড়িতে মাত্র তিনি পা রেখেছেন, ছুটে এলেন পারস্য রণাঙ্গন থেকে সেনা সাহায্যের জন্য মুসান্না ইবনে হারিসা। সেখানে হীরা শহরে পারসিকদের ঘেরাও বেষ্টনীতে মুসলমানরা প্রাণ হাতে নিয়ে ধুকছে। কিন্তু মুসলিম সেনার প্রায় পুরো বাহিনীই সিরিয়ার অভিযানে শত্রুর মুখোমুখি। অনেক কষ্টে মাত্র কয়েক হাজার স্বেচ্ছাসেবক জোগাড় করে আবু উবাইদার নেতৃত্বে তিনি পাঠিয়ে দিলেন পারস্য অভিযানে। জিসিরের লড়াইয়ে আবু উবায়দা অর্ধেকেরও বেশি সৈন্য নিয়ে শহীদ হয়ে গেলেন। আহত মুসান্না ইবনে হারিসা নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ থেকে তিন হাজার সৈন্যকে উদ্ধার করে কোনক্রমে পালিয়ে এলেন। এরপর মুসান্না ও তার প্রেরণাদাত্রী তন্বী বিদূষী স্ত্রীকে বিধবা করে একদিন শহীদ হয়ে গেলেন। সালমা হারালো তার স্বপ্নের পুরুষকে। মুসলমানরা হারালো কিংবদন্তীতুল্য এক সালারকে । আঁতকে উঠলেন উমর (রা)। এখন কি হবে? প্রিয় নবীজীর পত্র মোবারক কিসরা পারভেজের হাতে ছিন্ন ভিন্ন হওয়ার যে দগদগে জ্বালা নিয়ে তিনি পারস্য অভিযানের সূচনা করেছিলেন তা তো ব্যর্থ হচ্ছেই, উল্টো বিপুল বিনাশী ঝড় হয়ে ধেয়ে আসছে পারসিকরা পুরো আরবকে গ্রাস করতে।

উমর (রা) মচকালেন, ভাঙ্গলেন না। প্রত্যাঘাতের পর্বতপ্রাণ দৃঢ়তা নিয়ে পারস্যে পাঠালেন সেনাপতি সাদ (রা)-কে। মাত্র কয়েক হাজার মুসলিম সেনা পঙ্গপালের মতো ধেয়ে আসা লক্ষাধিক পারসিকদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। লড়াই শুরুর আগেই মুসলিম সেনাপতি সাদ (রা) চরম বাতের ব্যথায় প্রায় পঙ্গু হয়ে পড়লেন। ওদিকে মাদায়েনে জাদুবিদ্যায় পারদর্শী ইহুদীরা সম্রাট ইয়াযদগিরদের আশ্রয়ে মুসলমানদের ধ্বংস সাধনে শুরু করল ভয়ংকর এক জাদুর প্রয়োগ। পথহারা মরু ঝড়ে আক্রান্ত এক অসহায় মুসাফিরের মতোই মুসলমানরা আক্রান্ত হয়ে পড়লো সর্বগ্রাসী ঝড়ের কবলে। আর কতক্ষণ টিকতে পারবে তারা এই মৃত্যু-ঝড়ের তাণ্ডবে?